

১৯৩৩

CUK-HA

১৯৩৩

প্রবন্ধ

শ্রীমতি - সত্যেন্দ্র শ্রীমতীলাল

৩১

কলচর

ক. হোডের

অসাধনী



সম্পদক শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

756-3

017/85

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা অনুভূতির উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজে সজ্ঞান মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনার উজ্জ্বল এই গীতাভাষ্য নূতন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বহুর মধ্যে সম্পদক মতিলালের জীবনভিত্তিক লীলাবতী পারোক্ষ সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, যোগ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইয়া ব্যাখ্যাত।

মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার বে চৌধুরীর সূচিত্রিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিতান্তশাস্ত্রের নির্বাক্তি স্বরূপ সুবহু ভূমিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গাজুলী স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

P 10, 536

756.3
017/85

সূচীপত্র, বৈশাখ ১৩৯১

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলো	প্রশস্তি	সম্মগুরু শ্রীমতিলাল	৩
গণা	বাণী	সম্মগুরু শ্রীমতিলাল	৪
গাম	কবিতা	শ্রীনীহাররঞ্জন বসু	৫
শোধ	প্রবন্ধ	গোপাল রায়	৬
গীতে কথা ও সুর	প্রবন্ধ	সুস্মৃতি নাথ	৭
থেকে	কবিতা	ভূপেন্দ্রনাথ শীল	১০
টিটিকতা	প্রবন্ধ	ধীরানন্দ ঠাকুর	১১
মা	কবিতা	গীতা হাজরা	১৪
উন্নয়ন শ্রমিক আন্দোলন	প্রবন্ধ	ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার	১৫
মুম	বড় গল্প	শ্রীঅমর কর	১৯
৭ পুরুলিয়া—একটি সমীক্ষা	সমীক্ষা	বিশ্বনাথ রায়	২১
১ ফীল	উপন্যাস	অমিয়া ভট্টাচার্য	২৬
ম-লিপিমাল	পদ্যগুচ্ছ	অনুবাদক : শ্রীসুধীর গুপ্ত	৩১

প্রবর্তকের নিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি বাংলা মাসের ৯/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পর সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একখানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

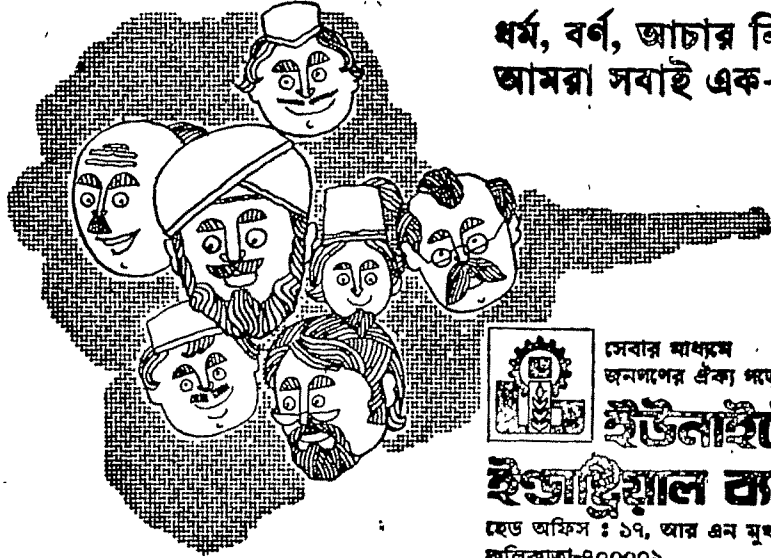
প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত প্রকাশিত হইবে, সম্পাদকের নহে।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক ভাষা, এক ভাষা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার আধার
জনগণের একা পড়ে তোলায় ব্রতী

ইউনাইটেড

ইন্ডিয়ান কংগ্রেস লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

জরুরি অফিস : ৭ রেড ক্রস রোড, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

তেলিগ্রাম : জে এন বিবাস

Progressive/118-16-80





বর্ষ ৬৯তম : ১ম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৯১ : এপ্রিল-মে ১৯৮৪

জীবনের আলো

আমাদের মন্ত্র—গড়া। ভাস্কর স্বপ্ন নাই। গড়তে গেলে ভাঙতে হয়, তা আমরা জানি না।
তার কথাই আমাদের নয়। গড়তে গেলে যা' হয় তা' হোক। লোকে বলুক—ভাঙছে ;
আমি দেখছি গড়ছি। গড়া ছাড়া আমাদের অস্ত্র দৃষ্টি নেই।

গড় নিজের চরিত্র, দেশের চরিত্র, নারী পুরুষের চরিত্র। গড় দেশের মাটি নিয়ে—স্বপ্ন-বিগ্রহ।
মন্দির, অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, কর্মশালা, বিদ্যালয়, শিল্পকুটির। গড় নুতন সমাজ। সৃষ্ণনের
নন্তধারা মাথা পেতে ধর। গড়ার মন্ত্রে পৃথিবী মুখরিত হোক।

ওগো কবি, ওগো শ্রষ্টা, ওগো শিল্প-শক্তিধর বিশ্বকর্মা! নুতন বেদ রচনা কর।
মন মহাভারত আবার ব্যাসের লেখনীমুখে বাহির হোক। নুতন চরক, সুশ্রুত,
ল্লবিস্তান গড়ে উঠুক। যন্ত্রশালায় বিচিত্রাকার বিমানপোত, অর্গব্যান, যন্ত্রশক্তিসম্পন্ন
ক্ষীরাজ, বিদ্যুৎ-যান নির্মিত হোক। পল্লীপ্রান্তর ফলে ফুলে শস্যে শোভাময় হোক। কুঞ্জে কুঞ্জে
গের পারিজাত ফুটে উঠুক সোণার মরাল সরোবরে সীতার কেটে ছুটুক। গড় একটা নুতন
ষ্টি। স্বর্গ মাথা নীচু করে মর্ত্যে নেমে আসুক। হে বিশ্বশিল্পী, সৃষ্ণনের ঋষি। মহাভারত গড়ার
-বপ্ন আমাদের সত্য হোক।

—সঙ্কর শ্রীমতিলাল



সাধন-কণা

সঙ্কল্পগুরু শ্রীমতিলাল

বস্তু কি? যাহা অটল। সে একটা ঘন উদ্ভাদনার অবস্থা। এই উদ্ভাদনা যতক্ষণ স্থায়ী প্রকৃতস্থ না হয়, ততক্ষণ বস্তু যে তরল, তাহাই বুঝিতে হইবে। বস্তু তখনও ঘন, সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই। মাথার খুলিতে তাহা ঢল-ঢল টল-টল করিতেছে। তরল বস্তু ঘন হইলে, দিব্য-জীবনের আশ্বাদ স্থির হয়। বস্তুর সিদ্ধি—অটলে স্থিতি। তাই নিত্য-প্রেমে সিদ্ধ হইলে, মানুষ অটল হয়। এই অটল বা সম্ভাবই সিদ্ধাবস্থার প্রকৃত লক্ষণ।

* * *

বিশুদ্ধ বস্তু-চৈতন্যলাভ করাই আমাদের ধ্যানের একমাত্র লক্ষ্য। পতঞ্জলি ধ্যানে চিন্তের তন্ময়তা লক্ষণ কহিয়াছেন। তন্ময়তার কারণ—বস্তুর আকর্ষণ। চিন্তাবৃত্তি স্ব-কারণেই লয় পায়। এই কারণ-বৃত্তিই 'আসক—উহা মৌলিক বৃত্তি। রূপে যে আসক, উহা সহজ, সহজেই লয় পায়—কোথায়? স্বরূপে। প্রেমের মূল এই আসক—

রূপে রতি হলে স্থির,
আসক-স্বরূপে,
আমক টানিয়া লয়—
শুদ্ধরতি হয় পরকাশ।

—তবে ত সিদ্ধ দেহে, সহজ মানুষের সন্ধান মিলে। এই সহজ মানুষই নিত্যবস্তু। ইনি অপ্রাকৃত-মূর্তি—পুরুষোত্তম। বাংলার বৈষ্ণব ইঁহাকেই ব্রজ-বিহারী, বৃন্দাবন-ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ অস্বয়-জ্ঞান-স্বরূপ তত্ত্ববস্তু। ইহাই ভাগবদ্বস্তু।

* * *

গুরু চিন্তামণি। তিনিই সৎ-নামী শুদ্ধ-ধ্যেয় চৈতন্য-স্বরূপ। যিনি স্বরূপ—তিনিই এখানে গুরুরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। রূপের হাটে, গুরুই নিত্যধনের মালিক—স্বরূপের

ব্যাপারী। তিনি মহাজন—রূপের বিনিময়ে প্রেম-স্বরূপ-রতন-জীবকে যাচিয়া কিনিয়া দেন। গুরুর রতি-সাধনার মূল।

* * *

রতি অর্থে—consecration। Consecrat একটা আশ্বাদ আছে। তাহাই রস। চিন্তে আ-তৈলধারার ন্যায় এই ম্লিক তরল রসানুভূতি, ইহা রতি-আশ্বাদন বলে। এ বড় শূচি ও শাস্তিময় অনুভূতি অবিচ্ছিন্ন হইলে, এই অনুভূতিও নিরবিচ্ছিন্ন ও স্থায় রতির আশ্বাদন যত প্রগাঢ় ও স্বচ্ছ হয়, প্রাণ, মন, ই-শরীর-চেতনা তাহাতে ততই তন্ময়তা পায়। অনুরাগ, জীবনও তেমনি সুন্দর ও ছন্দোময় হয়। এ যেন যে এক বাঁশীর সুর, অহীনশি কানে আসিয়া বাজি-সাপুড়িয়ার বাঁশী শুনিয়া ভুজঙ্গ যেমন তটস্থ হয় তেমনি। জীবনের রক্তে রক্তে যখন এই সুর অনুগ-তখনকার অবস্থাই এই ভাব-সঙ্গীতে ব্যস্ত হইয়াছে—

“নেশায় যখন হবি ভরপুর,
সকল যন্ত্র এক হয়ে গিয়ে
বাজবে একই সুর—”

তাই—

“নেশার কারণ গুরুর ভজন,
যদি পার এই বেলা কেনো।”

গুরুবাণীর অনুগমন কর—এই সুরের সন্ধান মিলি-চিন্ত, তনু, মন আসবে জরিয়ে—ভূমি ডুবিবে, মতি অবধারিত রতি স্থির হইবে তোমার দেহে। Consecr-এর প্রবাহ অগ্নিতে পরমাণুতে সঞ্চারিত হইয়া, সম্ভা-ও নিরাময় হইলে, রতি-স্থির অবস্থা লাভ হয়। প্রকৃত নিষ্কাম অবস্থা।

কবি প্রণাম

শ্রীনীহাররঞ্জন বসু

কবি সার্বভৌম তুমি সাহিত্যের অপার বিশ্বময়
ভারতীর বরপুত্র ! শব্দ দিয়ে কর বিশ্ব জয় ।
অজস্র কবিতা গানে গঞ্জে উপন্যাসে
কল্পনায় অবগাহি বাক্যের বিন্যাসে
পারিতৃপ্ত করিয়াছ মানুষের মন বৈদগ্ধ উন্ময় ।
ক্রান্তদর্শী হে ভাবুক, হে কবি সন্তম,
তোমার কবিত্বশক্তি দেশকাল করে অতিক্রম
মানব অন্তরে করে উদ্দীপিত ভাব নব নব ।
মানুষের হাসিকান্না মিলন বিরহ
তাই দিয়ে গড়িয়াছ তিলোত্তমা কবিতার দেহ,
বাক্য—সে যে কত অর্থবহ
সেকথা তোমার মত বুঝে নাই কেহ
তাই কী সাজালে কাব্য অপৰূপ ছন্দ সুষমায়—
পেলে কী বঙ্কের কাছে মানসী প্রিয়ায় চির অধরায়
আনন্দ রভসে সৃষ্টির উল্লাসে ?

সত্য শিব সুন্দরের বার্তাবহ তুমি—
তোমার জন্ম ধন্য এই বঙ্গভূমি,
হে ঋষিক, যজ্ঞ তব কর উদ্‌যাপিত—
ওগো বাণীব্রত !
কল্পনার ধ্যানলোকে তুমি উন্মাদিত
হিমাদ্রির মত—আত্মসমাহিত
তুমি কবি তুলনা রহিত ।
কবিদের অগ্রগণ্য ভারতের রবি
সবার প্রণম্য তুমি—তুমি বিশ্বকবি
প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের চোখে ।
জানি তুমি প্রাণের আলোকে
জ্বালায়ে প্রদীপখানি এসেছ ধরায়

ভারতের পুণ্যতীর্থে নরদেবতায়
বস্মেছ উদার ছন্দে—পরম আনন্দে ।
শতাধিক বর্ষপূর্বে তোমার উদার অভ্যুদয়
কালের প্রবাহে তাহা ব্যাপ্ত বিশ্বময়
তোমার সপ্তয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু
পথপ্রান্তে ফেলিবার নয় ।
বঙ্গের অঙ্গনতলে বাণীর দেউলে
বচনের অর্থ বিরিচিয়া খুঁজিয়াছ যারে মরমিয়া
সেকী তব জীবন দেবতা !
বুঝি নি স্বরূপ তার, সে তো হাস মোদের মূঢ়তা,
প্রণতি গ্রহণ কর হে কবি সম্রাট !
তোমার সাহিত্য কৃতি বিপুল বিরাট
কালের দ্রুতগতি ভঙ্গে মূল্য তার নহে উপেক্ষিত
আজও যে অম্লান জ্যোতি অমোঘ শাস্ত
মাণিক্যের অঙ্গদের মত
তার দীপ্ত প্রতিভাত ভারতীর কিরীট কিরণে ।

আত্মসের বাণী আজ ধ্বনিতেছে প্রাণে
ভুলি নাই ওগো কবি তাহা ভুলি নাই
‘শূন্যেরে করিব পূর্ণ’ এই ব্রত বহিব সদাই
তোমার অমোঘ সত্য বাণী
অন্তরে নিয়োছি তাহা টানি
প্রতি বর্ষে বৈশাখের দিনে
তোমার নূতন করে লব মোরা চিনে
কবিদের মাঝে তুমি অরণীয় নাম
অসংখ্য ভক্তের সাথে রাখি অনুপ্রণাম ।

পাঁচিশে বৈশাখ

গোপাল রায়

পাঁচিশে বৈশাখকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এইসব অনুষ্ঠানের কর্ম-তালিকায় সাধারণতঃ থাকে কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত, কয়েকটি আবৃত্তি এবং কোন, কোন স্থানে একটি গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন আলোচনা বিশেষ স্থান পায় না। ফলে তরুণ মনে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের কোন পরিচয় ফুটে উঠে না—কেউ হয়ত ভাবে রবীন্দ্রনাথ একজন কবি, কেউ ভাবে রবীন্দ্রনাথ একজন সঙ্গীতকার, কেউ বা ভাবে রবীন্দ্রনাথ একজন নাট্যকার। এ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের খণ্ডিত পরিচয়।

অথও রবীন্দ্রনাথ বা সমগ্র রবীন্দ্রনাথ বিরাট পুরুষ। তাঁর বিরাটত্ব গগনস্পর্শী। তাঁর মস্তক মেঘলোকে গিয়ে ঠেকেছে। সজল মেঘ তাঁর নয়নে কাজল পরিম্নে দেয়। তিনি বলেন—

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে—
নব তৃণ দলে ঘন বন ছায়ে
হরষ আমার দিগেছি বিছায়ে
পুলকিত নীপ নিকুঞ্জে আজ
বিকশিত প্রাণ জেগেছে,
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।
এই বিরাটত্বের জন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন—
ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে
ওরে আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে আজ
নেব যে লুঠ করে।

সুতরাং তিনি কত বিরাট এবার অনুমান করে দেখুন।

তবে আকাশ ভেঙ্গে কি সম্পদ তিনি আহরণ করে এনেছিলেন, তার সম্ভান আমরা অনেকেই রাখি না। আমাদের অনেকেই সমগ্রের অভাব বা উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব। তবে এইটুকু আমি বুঝি যে তিনি আকাশ বাণীকে ধরে এনেছেন প্রকাশের তপস্যায়। অর্থাৎ তিনি আমাদের ভাষা দিয়েছেন। মানুষের অন্তরের অন্তরে যে ভাব প্রকাশের ভাষা খুঁজে গুমরে মরে, তাকে প্রকাশ করবার ভাষা তিনি আমাদের দিয়েছেন। সেই জন্যই তিনি বলতে পেরেছেন—

যারে তুমি বাসবে ভাল
আমার গানের সুরে
বরণ করে নিতে হবে
সেই তব বন্ধু রে
রোদন খুঁজে ফিরবে যখন
মনের বেদনথানি
আমার গানে মিলবে তাহার বাণী।

বহুতঃ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল তিনি আমাদের সকল চিন্তা-ভাবনা কম্পনা-পরিকম্পনাকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। এই অংশেও তিনি বিরাট পুরুষ—শুধু বিরাট নন, মহাপুরুষও বলা চলে।

মহাপুরুষদের মৃত্যু নাই। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মহা-পুরুষদের মৃত্যু স্বীকার করে না। সেইজন্য কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষদের শুধু জন্মতিথি উদ্‌যাপনেরই ব্যবস্থা আছে—মৃত্যুতিথির কোন উল্লেখ নাই। রবীন্দ্রনাথেরও মৃত্যু নাই। আসুন আজকের দিনে আমরা সেই রবীন্দ্র-নাথকে স্মরণ করি, যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর”, যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমার মনের নৃত্য কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লজ্জিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে
চিরকাল তরে সৌক্য থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে।
যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি
সর্বস্বাস্ত নাহি করে পথ প্রাপ্তে ধূলি।
যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্বলিয়া স্বলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।”

এমনি আরও কত কথা। আসুন সেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে উপনিষদের ভাষায় প্রার্থনা জানিয়ে বলি—“আবিঃ আবির্ময়েধি”—হে আবিঃ তুমি আবির্ভূত হও—বলি, “বুদ্র যন্তে দক্ষিণং, মুখং তেন মাং পাহি নিতাম্”—হে বুদ্ধ! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাই দিয়ে নিত্য আমায় অবলোকন কর।”

রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুর

সুস্থতি নাথ

তাল-লয়ের বন্ধনে কথা ও সুরের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় গান। এ গানের মধ্যে কে প্রধান শরিক তার পরিমিত করা খুব কঠিন! কিন্তু কর্মটি কঠিন বলেই তা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথও এড়িয়ে যেতে পারেননি, একটা জবাব তাঁকে খুঁজতে হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে, গানের কোনটুকু আমরা শুন। সংগীতজ্ঞ বলবেন, সবটাই শুন। সুর, তাল, বাদ্য, বাণী সবগুলি মিলেই তো গান। তা ঠিক, কিন্তু মিছরি যেমন একটা সুতোকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধে, গানও একটা কিছুরে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতে স্বকৃ ও সামের মন্ত্রগুলিকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সংগীত। মন্ত্রগুলিই ছিল সুতো। সুর জন্মেছিল তার চারদিকে। এ যুগেও ধ্রুপদের আশ্রয় ছিল ঈশ্বর কিংবা দেবদেবীর স্তব অথবা রাজা-বাদশা বা মহামানবের গুণ-কীর্তন সুতরাং কথাই ছিল কেন্দ্র। কথাকে কেন্দ্র করে রাগসিক্ত গাইয়ে সুরের খেলা দেখিয়েছেন। কিন্তু তার পরে এমন এক সময় এলো যখন শ্রোতা ও গাইয়ে সবাই সুরের বিস্তার, গুণিতকের হিসাবে গতির ওঠানামা, গমকে ও মীড়ে স্বরগ্রামের গতানুগত প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও জটিল ব্যাকরণের কাজেই মনোযোগী হলেন। এখনও আমরা যে খেলা-গান শুন, তাঁর বাণীর রসান্বাদনের জন্য শুন কি? কাজেই কথাকে কেন্দ্র করে গান গড়ে উঠলেও, ধীরে ধীরে এক সময়ে সুরশিল্পীদের সুরশিল্পই গানের মুখ্য প্রাণ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সুর নিয়ে গবেষণা ও প্রয়োগ এগিয়ে গিয়েছে কথার আশ্রয়কে ছাড়িয়ে। তাই দেখা যায়, অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে নিয়ে স্বর প্রদর্শন ও তারানার মতো কণ্ঠকর্মকে নিয়েও পরিবেশিত হতে পারে সুখপ্রাণ্য সংগীতের অনুষ্ঠান। তাই, মূল প্রশ্নটির উত্তর তেমন দুষ্করই রয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে সামগ্রিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত না হয়ে কেবল রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের সদুত্তর সন্ধানে সচেষ্ট হবো। সচেষ্ট হবো তাঁরই ভাবনার পথ ধরে।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ জন্মের পর থেকেই বাড়িতে ব্রাহ্মগণের করণীয় আচারানুষ্ঠান দেখেছেন এবং ব্রাহ্মসংগীত শুনছেন। প্রথম ব্রাহ্মসংগীতের রচক রামমোহন রায় স্বয়ং।

রামমোহন গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে আসেন ১৮১৫ খৃস্টাব্দে, প্রায় ৪৩ বছর বয়সে। কলকাতাবাস-কালে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ টপ্পা ও ধ্রুপদ-গাইয়ে কালী মির্জা নামে খ্যাত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। মির্জা ছিলেন রামমোহনের চেয়ে বয়সে প্রায় ২২ বছরের বড়। সাংস্কৃতিক জীবনে রামমোহনের উপরে এই মির্জার প্রভাব নগণ্য নয়। কথিত আছে, একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে উভয়ের মধ্যে গভীর আলোচনা হতো এবং রামমোহন পিতৃপ্রতিম মির্জার আলোচনা অভ্যস্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন। এছাড়া এঁর কাছে রামমোহন ধ্রুপদ শিক্ষাও গ্রহণ করেন। এ সমস্তই ঘটে তাঁর কলকাতাবাসের প্রথম দিকেই কিংবা তারও পূর্বেই। কালী মির্জার ধর্মীয় চিন্তা যেমন ব্রাহ্মধর্মের ভাবধারার মধ্যে মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি তাঁর ধ্রুপদ গানের শিক্ষাদান কার্যকরী হয়েছে রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসংগীতের মধ্যে। রামমোহন ৩২ খানি ব্রাহ্মগান রচনা করেন। প্রত্যেকটিই সুরে ও তালে গেল। এগুলিই বাংলা ভাষায় প্রথম ধ্রুপদগান। যেহেতু এগুলি উপাসনা সংগীত, তাই এই গানগুলির বাণীর দ্যোতনাই প্রধান। ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের ভাষায় এই 'ব্রাহ্ম সংগীত গুলির মধ্যে তাঁর অকপট আকৃতি ও অনুভূতির স্নিগ্ধ সরসতাই বিদ্যমান। এদের আবেদন ভাবাপন্ন সাধকচিত্তে গভীরতম স্তরে।' তাই চলা চলে, সুর এখানে বাণীকে আচ্ছন্ন করেনি। রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকে এই গানই শুনছেন। যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কালে কলকাতায় প্রচলিত ছিল ঝুঁরি, টপ্পা, কীর্তন, রামপ্রসাদী প্রভৃতি গানের ধারা, কিন্তু তাঁর গৃহে চর্চা হয়েছে ধ্রুপদের এবং পরে ধ্রুপদ-গায়কীর বাংলা ব্রাহ্মসংগীতের।

এই পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত শিক্ষা শুরু হয় বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী নামক রানাবাট নিবাসী এক প্রতিভাধর ধ্রুপদ-গাইয়ের কাছে। এই বিষ্ণুচন্দ্র এবং তাঁর দাদা কালীপ্রসাদ উভয়েই রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের গায়ক। কাজেই, সুরকে প্রাধান্য না দিয়ে কেবল সুরের সাহায্য নিয়ে বাণীর বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহ্য করে তোলার শিক্ষা এঁদের করতাই হয়েছিল। বিষ্ণুর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে ধ্রুপদগান

শেখেন. তার সম্বন্ধে তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তিটি প্রাণধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—‘ওস্তাদরা যেমন তান-অলংকারে প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমনি কিছু করতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন না। ইহা ছাড়া কথার যে একটা মূল্য আছে. সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত।’ এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যাত্রা করেন ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাড়ে সতের বছরের মতো। এই নবীন বয়সেই তাঁর মনে সংগীত সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞানার এবং একটা কিছু করার আগ্রহও যেন প্রবল হয়ে ওঠে। এই আগ্রহ-উন্মুখ দৃষ্টিতে তাঁর হাতে আসে প্রখ্যাত ইংরেজ মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সরের একটি সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ (দি ওরিজিন এ্যাণ্ড ফাংশন অব মিউজিক)। সেটি পাঠ করে সংগীত-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা হয়, তা ‘সংগীত ও ভাব’ নামক একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধটি তাঁর দ্বিতীয় বারের বিলাত যাত্রার পূর্বে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, মেডিক্যাল কলেজ হলে রেভারেন্ড ক্রুমমোহর্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেথুন সোসাইটির একটি সভায় তিনি পাঠ করেন। তাতে তাঁর বক্তব্য ছিল, ‘তাহারা (ওস্তাদরা) গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।’ সভাস্থলে কবি নিজের কণ্ঠে গান গেয়ে বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণও দেন।

বহুতঃ, বাণীপ্রধান ব্রহ্মসংগীত শ্রবণে ও গায়নে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক মনটি প্রচলিত মার্গ-সংগীতের ব্যাকরণগত শাখা প্রশাখার জট থেকে মুক্তির সন্ধান করেই আসছিল, স্পেন্সরের প্রবন্ধ থেকে তিনি সমর্থন সংগ্রহ করেন মাত্র। স্পেন্সরের মতে, ভাবপ্রকাশের স্বাভাবিক আবেগের ফলে কথার সঙ্গে আবেগজনিত সুর আপনা থেকেই এসে যায়। যদিও এই মতপুষ্টি হয়ে তিনি (কবি) নাটকের পাঠ পাঠীদের মুখে কথাকে সুরে প্রকাশ করার

আয়োজন করে লেখেন ‘বাল্মীকী-প্রতিভা’, তথাপি সাধারণ ওস্তাদির কসরৎমুক্ত গানের দিকেও মন তাঁর অগ্রসর হয় এখন থেকেই। বহুতঃ, ‘জীবনস্মৃতি’-তে কবির সে বন্ধন-দশায় পীড়িত মনের খবর আমরা পাই, সেই মনের মুক্তি প্রয়াসই পরিলক্ষিত হলো গানে এসেও। এরপর বিলেতে থাকাকালীন যে বিলিতি গানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাতেও সুরের দাপাদাঁপ কম। বলা যায়, সব দেখে শুনে, সংগীতের হয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি একটু বেশি মাত্রাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সমস্যায় পড়ি তখনই যখন সেই ‘জীবনস্মৃতি’-তেই আবার কবি লেখেন, ‘কিন্তু যে মতটিকে তখন (প্রথম বয়সে) এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতি-কলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ।’

কবির স্বীকারোক্তির পশ্চাদ্গমন করে কবির জীবনীকার শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ও বলেছেন, ‘যে-মতটিকে এই বিশ বৎসর বয়সে এত জোরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই সংগীত সম্বন্ধে তাহার চরম কথা নহে।’ বহুতঃ, চরম কথার কোন চরম অবস্থা নেই। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তজ্জাত অনুভূতিরও বিবর্তন ঘটে। যে পরিবেশের অভিজ্ঞতায় সে-সত্য যে-ভাবে অনুভূত হয়, সে-পরিবেশে তা সে-ভাবেই সত্য। গ্রীষ্মকালে রৌদ্র কষ্টকর, আবার শীতকালে সেই রৌদ্রই আরামদায়ক। সুতরাং রৌদ্রকে কী বলা যাবে? রৌদ্র কষ্টকর ও আরামদায়ক উভয়ই। এর দুই পরিচয়ই সত্য।

কবি স্বয়ং তরুণ বয়সের মতটিকে অপরিপক্ব বলে ভাগ করতে চাইলেন বটে, কিন্তু গান-রচনার ব্যাপারে তো আবার ফিরে গেলেন সেই তরুণ বয়সের পঙ্কতিতেই। তরুণ বয়সে জ্যোতিদাদার পিয়ানোতে গীতি সুরমালার সঙ্গে মিলিয়ে কথার মালা রচনা করতেন অগ্রজবন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে। প্রায় ৫০ বছর বয়সে লেখা ‘জীবনস্মৃতি’-পাঠে জ্ঞানা যায়,

গুন গুন করে সুর ভেঁজে নিলে সেই সুরকে ধরছেন কথার খাঁচায়। কবি কর্তৃক কথিত 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী' গানের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণীয়। এখানে আগে এসেছে সুর পরে কথা। কিন্তু তাতে কী হলো? কবি 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'-এর প্রথম দিকে যে তাচ্ছিল্যে বাণীকে সুরের দরবারে অপাংক্তেয় করেছেন, শেষ প্রান্তের এই তথ্য বর্ণনে সে তাচ্ছিল্য কি আর বজায় থেকেছে? 'আমি চিনি গো চিনি'-র গভীর ব্যঙ্গনাথমী বাণী (যা কবি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন) কি সত্যি তাচ্ছিল্যের বস্তু? অন্য কোন বাণীর আধারে ঐ সুরকে ধরলে কি কবির বক্তব্যের রম্য রূপকতাটি বজায় থাকতো?

বস্তুতঃ কবির প্রথম বয়সের বিদ্রোহ ছিল বাণীকে বাদ দিয়েই যে গুস্তাদি তার দাপটের বিরুদ্ধে। মনে হয়, তরুণ বয়সে যার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ছিল, পরিণত বয়সে তা থেকেই তিনি রস-সংগ্রহের প্রয়াস করে রীতিসিদ্ধ গুস্তাদদের মান ভঙ্গন করেছেন। তরুণ বয়সের অপরিপক্ক মত বলে যাকে তিনি পরিণত বয়সে তাগ করতে চেয়েছেন, সে-মতটি এক সময়ে কিন্তু তাঁর একার ছিল না, তিনি শরিক ছিলেন মাত্র। পরিণত জ্যোতির্বিদ্রনাথ সহ স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও অনুরূপ মতই পোষণ করতেন। ঠাকুরপরিবারের সংগীতশিক্ষকগণও ঐ একই মতাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং, কবি মতটিকে অপরিপক্ক ভেবে পরিত্যাগ করতে চাইলেও কিন্তু বাড়ির অনেকের পরিপক্ক মত হিসাবে তা শ্রদ্ধার্তই থেকে যায়।

প্রসঙ্গত আর একটি তথ্য স্মরণ করা যেতে পারে। এটা 'জীবনস্মৃতি' রচনারও প্রায় ১৪ বছর পরের ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রলালপুত্র সাধক-গায়ক দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে কবির যে আলোচনা হয়, তা থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি নেওয়া যাক। তাতে কবি বলেছেন, 'আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে। এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপন মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার-ব্রত তার

নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী।' এখানে গুস্তাদদের গানের সঙ্গে তাঁর গানের মূলগত প্রভেদের কথা ঘোষণা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বিস্তারধর্মী মার্গসংগীতকে বহুশাখা প্রশাখাবিশিষ্ট বটবৃক্ষের সঙ্গে এবং সরল বক্তব্য-ধর্মী বাংলাগানকে তালবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সুতরাং 'জীবনস্মৃতি'-র সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধের বক্তব্যকে তাঁর নবীন বয়সের বক্তব্যের বিরোধী বিবেচনা করে রবীন্দ্রসংগীতকে নতুন বাটখারায় মাপা যায় না। সুরের স্রোতে গানকে তিনি কোন দিনই বিসর্জন দিতে চাননি। তাঁর গান শুধু সুর দেখানোর জন্যে কথার গোণ আধার নয়, তা এক বিশেষ মহিমায়িত গীতিকাব্যও। রবীন্দ্রনাথের বাউলধর্মী গানগুলি, যা তাঁর শ্রেষ্ঠ দ্যোতক সংগীতের পর্যায়ে পড়ে, বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে বাউলের সুরের জন্যে নয়, বাণীর অর্থ মহিমার জন্য। এই অর্থমহিমার জোরেই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলতে পেরেছেন, 'যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। তবে সব চেয়ে স্থায়ী আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা—শোকে, দুঃখে সুখে, আনন্দে আমার গান না গেলে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এগান তাদের গাইতেই হবে।'।

আমরা জানি, এমন অনেক রবীন্দ্রসংগীত আছে সেগুলি বিশুদ্ধ রাগ ভিত্তিক। কিন্তু রাগের কলাকৌশলপ্রসূত রসের আচ্ছাদনের জন্য বাঙালি ঐ সব গান শুনতে বা গাইতে বাধ্য হয় না। বাঙালি ঐ সব গান গায় ও শোনে বাণীর মাধুর্য ও অর্থব্যঞ্জনার জন্য। গতাজলির নোবেল-পুরস্কার জয় তো সুরহীন বাক্যার্থের জন্যই। তাছাড়া, যে-রবীন্দ্রসংগীত গাইতে শুদ্ধ উচ্চারণের উপর এত জোর দেওয়া হয়, তার বাণীগোরব নিশ্চয় প্রধান। আর এই সুরাশ্রিত বাণী গোরবের জন্যই রবীন্দ্রসংগীতের আবেদন এত স্থায়ী। রবীন্দ্রনাথ নিয়ম-মাফিক গান শিখে গানের গুস্তাদ হয়ে উঠেছেন বলে কখনোই দাবি করেননি, বরং তা যে হতে পারেননি সেই কথাই বার বার বলেছেন। যে-অবস্থার সুরের কাজের জোরে তাঁর গান স্থায়ী হবে, এমন আশা কখনোই করতে পারেন না। তবে, বাক্য যেখানে শেষ সেখানেই যে গানের আরম্ভ, একধার তাৎপর্য হলো, গানের

পরেও গানের আবেদনটি থেকেই যায় এবং তা প্রোতাকে গভীরভাবে ভাবান্বিত করে। বস্তুতঃ, যে-গানের যে টুকু মর্যাদা প্রাপ্য তা কেউ কেড়েও নিতে পারে না, আবার তার বেশিও কেউ দিতে পারে না। রবীন্দ্রসংগীতের স্বকীয়তার জোরেই তাঁর স্থানীয় ও মর্যাদা অপরিণাম। সুর তাঁর গানকে আচ্ছন্ন করেনি, কথার দোসর হয়েই পাশে দাঁড়িয়েছে। সুরের মিতিবোধে এবং কথার গভীরতায় তা জেগে উঠেছে এক নতুন রূপে—অর্থনীরাম মূর্তিতে।

কবি যে সুরকে স্বাধীনতা বা প্রাধান্য কোনটাই দেননি, তার আরও এক প্রমাণ হলো, তিনি কখনো গায়ককে খুশিমতো তাঁর গান গাইবার অধিকার দেন নি। সুরকেই যদি প্রধান মনে করতেন, তবে তাঁর চেয়ে বড় সুরজ্ঞ ওস্তাদের হাতে পড়ে তাঁর গানগুলি আরও মনোরম হয়ে উঠুক, এই কামনাই তাঁর থাকতো। বরং বলেছেন, ‘আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে,

তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার করে।’ তাই, তিনি তাঁর গানের সুর সম্বন্ধে অত্যন্ত সংরক্ষণশীল ছিলেন—যা হয়তো এখনো অনেকে পছন্দ করেন না। তাঁর ভয় ছিল, সুরের বাহুল্যে অর্থ-দ্যোতনা ব্যাহত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো রাগসংগীতের বিরোধী ছিলেন না, তিনি শুধু চেয়েছিলেন—‘সংসারে জ্ঞানী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সংগীতে তাই হওয়া চাই। কথ্য বা সুর কারো প্রতিই পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে এই সমান অধিকারের সিদ্ধান্তেই তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু সাধারণ বাংলা গান থেকে রবীন্দ্রসংগীত বাণীর মহিমায় বিশিষ্ট, সেই হেতু রবীন্দ্রসংগীতে বাণীর গৌরব সমান অধিকারের সংসারেও যেন দায়িত্বশীল কর্তব্যবাহিতার মতোই গৃহপ্রধানরূপেই বিরাজিত।

সহায়ক গ্রন্থনিচয় :

১. জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৩. রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ
৪. রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ—প্রফুল্লকুমার দাস

৫. রামমোহন রচনাবলী—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ-
লিখিত ভূমিকা
৬. Raja Rammohan Roy—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭. বিবিধ কোষগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথকে

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

সুন্দরের পূজারী তুমি।

বেসেছিলে ভাল বহু মানবের প্রেম দিয়ে

ঢাকা এই পৃথিবীকে,

দেখেছিলে মুহূর্তে মানুষের প্রাণের খেলার ঐশ্বর্যকে,
করেছিলে কম্পনা স্বর্গ রচনার এই ধূলার ধরণীতে।

অনন্তের সন্ধানী তুমি।

পেয়েছিলে সীমার মাঝে অসীমের স্পর্শ,
বহনময় জীবনের মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ,
মানুষের মাঝেই উপলব্ধি করেছিলে ‘আনন্দরূপমৃতম্’
দেখেছিলে তার অন্তরের শাস্ত্র সৌন্দর্যকে।

দুঃখকে তুমি করনি খর্ব, করনি অস্বীকার,

দুঃখ দিয়েই জেনেছিলে জীবনের আনন্দকে।

বিশ্বপ্রেমিক তুমি।

দেখেছিলে ব্যথিত হৃদয়ে পৃথিবীতে স্বার্থের সংঘাত,
যুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ।

হে অমর কবি,

আজও প্রাণে নিত্য বাজে যে বসন্তের গান,

সিক্ত হয়েছে তা তোমারি অনুরাগে শতবর্ষ আগে।

তোমার সৃষ্টির উৎসমুখ হ’তে

রাশি রাশি আনন্দের ধারা নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে

বিচিৎ সৌন্দর্যে হবে উৎসারিত।

গীতার নাট্যিকতা

ধীরানন্দ ঠাকুর

মহাভারত সর্ব অর্থেই মহাকাব্য। অর্থাৎ, মহত্ত্ব ও কাব্যত্বের যতপ্রকার অর্থ হোতে পারে তার সর্বকিছুই আছে মহাভারতে। তার বিষয়-বস্তু আর রূপকলায়,—দুইএতেই আছে সম্ভবনীয় সর্বপ্রকার মহত্ত্ব এবং কাব্যিকতা। মহত্ত্ব বলতে যে—বৃহত্ত্ব বা বিরাটতা, বিশালতা, বিচিত্রতা বোঝায় তা আছে তার বাচ্য-বস্তুতে, আছে তার কাব্যরূপে। মহত্ত্ব বলতে বোঝায় যে-মাহাত্ম্য, বা মহিমা সত্তার ও সততার যে-বিশুদ্ধতার আদর্শ তা আছে তার ভাব-বস্তুতে ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায়া। কাব্যের যতপ্রকার রূপ এখনও অবধি কম্পিত ও উদ্ভাবিত হয়েছে, সহানুভূতিক, সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে সন্ধান করার ইচ্ছা থাকলে তাও খুঁজে পাওয়া যাবে তাতে। তার আয়তনের বিপুলতা, বহু বিচিত্র ভাল মন্দ চরিত্র ও ঘটনার সুষ্ঠু সমাবেশ, অসংখ্য আখ্যান উপাখ্যানের সম্মিলন এবং তাদের মাধ্যমে পরিণামে উন্নত উদার জীবনাদর্শের সংস্থাপন, শাস্ত্রত ধর্ম ও নীতির প্রতিষ্ঠা; গীতি কবিতা, কবিতা, নাটিকা ও নাটকের বিবিধ উপাদান-উপকরণ, সুগভীর চিন্তা ও যুক্তিসম্মত বিবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধের অবতারণা, নির্মাণ ও রচনার নৈপুণ্যে বিচিত্র সাহিত্য-রসের স্ফূর্তি ও রুচ্যমানতা মহাভারতকে অদ্বিতীয় মহাকাব্যের গৌরবে মণ্ডিত করেছে। তার মধ্যে আছে যেমন গীতি কবিতা, কবিতা, আখ্যান-উপাখ্যান বা উপন্যাস-ছোটগল্প; নাটক নাটিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, তেমনি আছে তাদের বিবিধ প্রকার—চরিত্র-সাহিত্য, ভ্রমণ-সাহিত্য। তার বিষয় ও রূপের বৈচিত্র্যেরও সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ কথা নয়। নানা ভাব, ভক্ত, রূপ, রস প্রভৃতি সেই বৈচিত্র্যের উপাদান।

॥ ২ ॥

আয়তনের সীমানার মাপে যথাসম্ভব বিচিত্র, এমন-কি ভীষণ-বিপরীত বা বিপরীত চরিত্রের সংঘাতে মৃত ও স্ফূর্ত, বিবিধ ঘটনা ও পরিবেশে বিভাজিত ও অভিব্যক্ত, কেবলমাত্র চরিত্রগুলির সজীব সংলাপে বাচিত, গতিশীলতায় মুগ্ধ জীবন-কথাই নাট্যিক সাহিত্য।

অধীক্ষণ করলে দেখা যাবে, নাট্য-সাহিত্যের ঐ উপাদান আখ্যান বা গল্প-সাহিত্যেও অঙ্গ-বিস্তার থাকে। তবে তার

গতি অপেক্ষাকৃত শিথিল-মহুর। বর্ণনা, ব্যাখ্যান, লেখকের মন্তব্য—সিদ্ধান্ত তার গতিকের করে বিলম্বিত। সজীব সংলাপের ঘনিপনকতা তত নেই তাতে। নাটিকা বা নাটকের সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বরাট। চরিত্রগুলির উজ্জ্বল প্রত্যাঙ্কি বা অঙ্গাংশে স্বগত-বাচনে এবং গীতিক-বাণীতে প্রকাশিত হয় নাট্যিক রচনার বস্তু। গীতিনাট্যে সংলাপ বা উজ্জ্বল-প্রত্যাঙ্কি ব্যক্ত হয় গীতের মাধ্যমে। নৃত্যনাট্যেও তাই; তবে তাতে থাকে নৃত্যের প্রাধান্য। মুক-নাট্যেও ভাব-প্রতিভাবের অন্তরালে থাকে বাণী।

॥ ৩ ॥

মহাভারতে কাব্যই আছে প্রচুর। মনে হয়, নাট্যত্বের ভারবত্তা তাতে অধিক। এই মহাকাব্যের আদি ও অন্তে গভীর প্রশান্তি বিরাজ করলেও তার বিরাট আকারের বিশাল ব্যাপ্তি জুড়ে সংগ্রাম-সংঘর্ষেরই প্রাধান্য। অবশ্য তারই কারণে তার প্রশান্তি তার দেহকে অতিক্রম করে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হোলে নিঃসীম শুক্লতায় হয় অন্তর্লীন।

আয়তনের মাপে মহাভারত মহাকাব্যে গীতা অঙ্গ একটু স্থান অধিকার করে আছে। মহাভারতের আঠারোটি পর্বের একটি হোলো ভীষ্ম পর্ব। তারই অন্তর্গত গীতোপনিষৎ। আঠারোটি অধ্যায়ে বিভাজিত এই গ্রন্থ।

গীতার মুখ্য উপাখ্যানটি হোলো বিষাদে স্নিগ্ধমাণ, সমর-বিমুখ অর্জুনকে কৃষ্ণের যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে সংগ্রামে তাকে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সম্মত করানোর উপাখ্যান। সম্প্রায়তন হোলেও দৃশ্য, সংঘাত, চরিত্র, কথন-উপকথন বা সংলাপের মাধ্যমে এই উপাখ্যান পেয়েছে কিছুটা নাট্যরূপ। অবশ্য এর আখ্যানভাগ সম্প্রায়তন, চরিত্র-সংখ্যাও অঙ্গ, পরিবেশের বৈচিত্র্যও এতে নেই। আখ্যানভাগের আয়তনের অনুপাতে সংঘাত যথেষ্ট স্পষ্ট। সংলাপের সজীবতা আর সংঘাতের স্পষ্টতা একে করে তুলেছে নাট্যিক।

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, দুর্যোধন, আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, কৃষ্ণ, অর্জুন—এ কল্পটি এই নাট্যিক রচনার চরিত্র। এগুলির মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র আর সঞ্জয়ই প্রধান। ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয়, দুর্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন

সমক্ষে বিবৃতি দিলেন। এর মধ্যে দুর্যোধনের সংবোধিত আচার্য্য দ্রোণ নির্বাক। তাঁকে অবশ্য দুর্যোধন স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সেনাদল ও রথী-মহারথীদের পরিচয় দিলেন। (৩-১১ শ্লোক)। প্রত্যক্ষভাবে সঞ্জয়ের বর্ণনাতেই দুর্যোধনের উক্তি জানা যায়। তবে দুর্যোধনের উক্তি এমন সচেতন ও স্পষ্ট যে তার পরোক্ষতার কথা মনেই ধরে না। তাঁর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। সঞ্জয়ের কথা তখন প্রায় মনে থাকে না। দুর্যোধনের উক্তির সজীবতায় নির্বাক দ্রোণাচার্য্যকেও যেন সম্মুখস্থ ব'লে মনে হয়। কুবুজ ভীষ্মদেবেরও কোন উক্তি নেই। তাঁর এখানে শুধু সিংহনাদে শঙ্খধ্বনি করার কথা বিবৃত করেছেন তথ্য-পরিবেশী মহামাত্য সঞ্জয়। তাঁর নিপুণ বর্ণনারগুণে ভীষ্মদেবের উপস্থিতিও প্রত্যক্ষবৎ। তাই, দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মদেবের বর্ণিত উপস্থিতি নাট্যগুণায়িত। ভীষ্মদেবের শঙ্খনাদে স্তব্ব হোলো হর্ষিত দুর্যোধনের কথা। সেই শঙ্খনাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু শঙ্খ, শিঙা, ভেরী প্রভৃতি বেজে উঠলো, যেমন ধার্তরাষ্ট্র-পক্ষে তেজনি পাণ্ডব-পক্ষে।

ধ্বনি হোলো, তুমুল। সে-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হোলো আকাশে বাতাসে। সময়ের উত্তেজনায় বর্ণনা অবশ্যই হোলো নাটকীয়।

স্বৈচ্ছামুত্তরধে সারথি মাধব আর পাণ্ডব ধনঞ্জয়ের দৃশ্য-মানভার বর্ণনা দিয়ে সুদক্ষ সংবাদক সঞ্জয় দৃশ্যটিকে ক'রে তুলেছেন নাট্যিক। সময় আরম্ভ হয়-হয়। অর্জুন আয়ুধ প্রয়োগে উদ্যত হয়েছেন। এমন সময়ে সহসা কী হোলো তাঁর মনে, ধম্কে গেলেন তিনি। যোগ্যমান প্রতিরথদের একবার ভালো করে দেখে নিতে চাইলেন। তাই, সারথি হাষিকেশকে বললেন উভয় সেনাদলের মধ্যে সান্দন স্থাপন করতে। অচ্যুতও তাই করলেন। উভয় সেনাদলে বহু স্বজন-পরিজনদের দেখে অর্জুনের হৃদয় সদয়-সকলুণ হোয়ে উঠলো। এই বর্ণনাও সঞ্জয় দিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে।

গীতার সবটাই সঞ্জয়ের বিবৃতি-দান মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। তারই মধ্যে সংস্থাপিত কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। ব্যাসদেবের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তিনি যোগেশ্বর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার চেয়েছেন এবং দিব্যকণ্ঠ লাভ করে পরম-

গুহ্য, অতিবিস্ময়কর যোগতত্ত্ব-সম্বন্ধিত এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ শুনছেন।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাস্বনঃ।

সংবাদমিমমশ্রোষমস্তুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ১৮/৭৪

ব্যাস প্রসাদাচ্চ শ্রুত বাণেতদ গৃহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বর্য্যং কৃষ্ণং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

রাজন সংস্পৃতা সংস্মৃতা সংবাদমিমমস্তুতম্।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহূর্ম্মহুঃ ॥ ৭৬

তচ্চ সংস্মৃতা সংস্পৃতা বৃপমত্যস্তুতং হরেঃ।

বিস্ময়ো মে মহান রাজন হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণাযত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিশ্রবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮/১৮ শ.অ.

সমগ্র গীতা-গ্রন্থে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রাথমিক ও মৌলিক হোলেও ধৃতরাষ্ট্র মাত্র একবার কথা বলেছেন। বাকী সব উক্তিই প্রত্যক্ষত সঞ্জয়ের। তবে সঞ্জয়-সংবাদিত হোলেও পরোক্ষ-অথচ-স্পষ্ট কিন্তু সাক্ষাৎ বৎ-প্রতীয়মান উক্তি কৃষ্ণ এবং অর্জুনের। মহারাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে মহামাত্য সঞ্জয়ের একেবারে নিজস্ব উক্তি প্রথম অধ্যায়ে ছ'বার (১৩টি শ্লোক—২, ১২-২০, ২৪, ২৫ এর ২, ২৬, ২৭, ৪৬) : দ্বিতীয় অধ্যায়ে দু'বার (তিনটি শ্লোক—১, ৯, ১০) ; একাদশ অধ্যায়ে তিনবার (আটটি শ্লোক—৯-১৪, ৩৫, ৫০) ; অষ্টাদশ অধ্যায়ে একবার (পাঁচটি শ্লোক—৭৪-৭৮) : মোট বারো বার।

এই গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে কৃষ্ণের উক্তি মাত্র একবার (২৫ শ্লোকের আধধানি)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনবার (তেরটি শ্লোক—২, ৩, ১১-৫৩, ৫৫-৭২) ; তৃতীয় অধ্যায়ে দু'বার (চল্লিশটি শ্লোক—০-৩৫, ৩৭-৪৩) ; চতুর্থ অধ্যায়ে দু'বার (একচল্লিশটি শ্লোক—১-৩, ৫-৪২) ; পঞ্চম অধ্যায়ে একবার (আটটি শ্লোক—২-২৯) ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনবার (বিয়াল্লিশটি শ্লোক—১-৩২, ৩৫, ৩৬, ৪০-৪৭) ; সপ্তম অধ্যায়ে একবার (ত্রিশটি শ্লোক—১-৩০) ; অষ্টম অধ্যায়ে একবার (ছাব্বিশটি শ্লোক—০-২৮) ; নবম অধ্যায়ে একবার চৌত্রিশটি শ্লোক—১-৩৪) ; দশম অধ্যায়ে দু'বার (পঁয়ত্রিশটি শ্লোক—১-১১, ১৯-৪২) ; একাদশে চারবার (এগারোটি শ্লোক—৫-৮, ৩২-৩৪, ৪৭-৪৯, ৫২-৫৫) ;

দ্বাদশে একবার (উনিশটি শ্লোক—২-২০); ত্রয়োদশে একবার (তেরিশটি শ্লোক ২-৩৫); চতুর্দশে দু'বার (ছাশিটি শ্লোক—১-২০, ২২-২৭); পঞ্চদশে একবার (কুড়িটি শ্লোক—১-২০); ষোড়শে একবার চল্লিশটি শ্লোক—১-২৪); সপ্তদশে একবার (একটি শ্লোক—১); অষ্টাদশে একবার (একাত্তরটি শ্লোক—২-৭২)। সব মিলিয়ে কৃষ্ণের উক্তি হচ্ছে উনিশবার।

গীতায় অর্জুনের উক্তি আছে প্রথম অধ্যায়ে দু'বার (একুশটি শ্লোক—২১-২৩, ২৮-৪৫); দ্বিতীয়ে দু'বার (ছ'টি শ্লোক—৪-৮, ৫৪); তৃতীয়ে দু'বার (৩টি শ্লোক—১-২, ৩৬); চতুর্থে একবার (একটি শ্লোক—৪); পঞ্চমে একবার (একটি শ্লোক—১) ষষ্ঠে দু'বার (৫টি শ্লোক—৩৩, ৩৪, ৩৭-৩৯); সপ্তমে নেই; অষ্টমে একবার (দু'টি শ্লোক—১, ২); নবমে নেই; দশমে একবার (সাতটি শ্লোক—১২-১৮); একাদশে চারবার (তেরিশটি শ্লোক—১-৪, ১৫-৩১; ৩৬-৪৬, ৫১); দ্বাদশে একবার (একটি শ্লোক—১); ত্রয়োদশে একবার (একটি শ্লোক—১); চতুর্দশে একবার (একটি শ্লোক—২১); পঞ্চদশে ও ষোড়শে নেই; সপ্তদশে একবার (একটি শ্লোক—১); অষ্টাদশে দু'বার (২টি শ্লোক—১, ৭৩)। অর্জুনের উক্তি সব-শুদ্ধ হোলো বাইশবার।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথন-প্রতিকথনের সংখ্যা আধিক হোলোও তা ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়ের সংলাপের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তাকে বলা চলে সংলাপের মধ্যে সংলাপ।

অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ এনে অর্জুনকে তাঁর ঈপ্সিত নিরীক্ষণ করে নিতে বললেন। নিরীক্ষান্তে অর্জুন-হৃদয় হোলো করুণা-বিগলিত। কিন্তু তার পরে যে-উক্তি তিনি করলেন তা কেবলই ভাবোচ্ছাস-সর্বধ্ব নয়। তাঁর উক্তিতে যুক্তির শক্তি আছে যথেষ্ট। পঞ্চম অধ্যায়ে ৩১ থেকে ৪৫ শ্লোকে ব্যস্ত সেই যুক্তি গণ্য ও মন্য। এই উক্তির পরে অর্জুনের ধনুর্বাণ হাত থেকে নামিয়ে রাখার দৃশ্যটি একটি সজীব ছবি। তাই তার নাট্যিকতার লক্ষণটি লক্ষণীয়।

এর সঙ্গে-সঙ্গেই কৃষ্ণ যে বাক্য বললেন তা শাণিত ও তীক্ষ্ণ। ওজস্বতী ভাষায় তিনি অর্জুনকে উদ্‌বোধিত করতে

উদ্যোগী হোলেন। কিন্তু অর্জুন তাতে প্রভাবিত ও শাসিত বোধ না করে আবার উজ্জ্বল যুক্তি দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন, আপন উপলক্ষিতে থাকলেন অবিচলিত। অবশ্য এর মধ্যে তাঁর চিন্তা কিছুটা হোয়েছে বিভ্রান্ত ও সংশয়-সংমূঢ়, নিরুৎসাহ-নিরুদ্যম। তাই, কৃষ্ণের কাছে তিনি চাইলেন উপদেশ, পথ-নির্দেশ। কৃষ্ণ তখন অর্জুনের অশোচ্যের জন্যে-শোক-অথচ-বিজ্ঞের-মতো কথা নিয়ে একটু পরিহাস করলেন। এই অবধি দুজনের বচন-প্রতিবচন তীক্ষ্ণ হওয়ায় পরিমণ্ডল নাটকীয় সজীবতা লাভ করেছে। (২/২, ৩; ৪-৮; ১১)।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে অর্জুনকে সপ্রতিভ এবং সমরমনা করার জন্যে কৃষ্ণ দেহ, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে যে তত্ত্বকথা ও নীতিবচন বললেন তা দীর্ঘায়ত। (২/১১-৩০, ৩১-৫৩)। কিন্তু সেই তাত্ত্বিকতাই এখানে অধিষ্ঠ বস্তু। তাতে নাট্যিকতা কিছুটা শিথিলীকৃত হোলোও উপায় নেই। কারণ, আঙ্গিকের নাটকীয়তা এখানে সচেতনভাবে ঈপ্সিত নয়। কৃষ্ণের অধিকাংশ বিস্তারিত তত্ত্বময় উক্তি সম্বন্ধে ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য ও সার্থ্য।

কর্তব্য কর্ম করার কথা বলতে বলতে কৃষ্ণ চিন্তাসাম্য বা যোগের কথায় এসে পড়লেন। তারই সঙ্গে এলো আসন্তিহীন অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্মের কথা, একাগ্র মনে কর্ম করার কথা। (২/৪১-৫৩)। এইসব তত্ত্বকথা শুনে অর্জুনের মন স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ-সম্বন্ধে জানতে চাইলেন (২/৫৪)। তখন কৃষ্ণ সে-বিষয়ে বিশদভাবে বললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা, চিন্তের প্রসন্নতা ও প্রশান্তি-লাভের কথা। পরিণামে সর্ব দুঃখ-নিরসন ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা। (২/৫৫-৭২)।

কৃষ্ণের এইসব তত্ত্বকথা নীতিবচন শুনে কর্মের চেয়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার ধারণা হোলো অর্জুনের মনে। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন তবে কৃষ্ণ তাঁকে নির্ভর কর্মে নিযুক্ত করছেন। এখনও সম্বোধ-সংশয় কাটোন অর্জুনের চিদাকাশে। স্পষ্ট করে নিশ্চয় করে তিনি জানতে চাইলেন, কোন্‌ মার্গ তাঁর গম্য (৩/১-২)। এর উত্তরে কৃষ্ণ যা বললেন তা হোলো কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের তত্ত্ব। এই দুই এর সাধন যে মানব-জীবনে প্রয়োজন নানা যুক্তি-বিচার দিয়ে তা কৃষ্ণ বোঝাতে

চাইলেন। তবে এখানে কর্ম-বিষয়েই তত্ত্বের অবধারণ বিশেষ-ভাবে করলেন। অবশ্যই সে-কর্ম অনাসক্ত কর্ম, নিষ্কাম কর্ম। (৩/৩-৩৫) অবশ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ কথাই বলেছেন তিনি। তবে এখানকার যুক্তি ও উদাহরণ ভিন্ন। তাই, কৃষ্ণের উক্তি পুনরুক্তির মতো: 'শোনান্ন' না। বরং তা উপলব্ধির, নিশ্চয়তা ও প্রত্যয়ের দার্ঢ্য ধুব। কৃষ্ণের বাণী শুনে অর্জুনের কৌতূহল ও দ্বিগ্ভ্রাসা হোলো উন্মোচিত, উদ্দীপ্ত। একটি মৌল প্রশ্ন করলেন অর্জুন: 'কী সে দুর্বীর শক্তি যা মানুষকে, আসক্তি ও মোহের পথে অর্থাৎ পাপের পথে নিয়ে যায়?' (৩/৩৬)। উত্তরে জানালেন কৃষ্ণ যে সে-শক্তি রাজসিক: তাঁরই সৃষ্ট এক প্রধান দুস্তর-ণীয়া, দুরত্যা শক্তি। এ থেকেই জন্ম কাম আর ক্রোধের। সব অনর্থের মূলে কাম বা কামনা, লোভ-লালসা। এ থেকেই জন্মায় ক্রোধ, লোভ, মোহ-মদ ও মাৎসর্য। 'শুদ্ধ চৈতন্যকে, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে এই কাম। ইন্দ্রিয়নিচয়, মন, বুদ্ধিকে অধিকার ক'রে এই দুর্দান্ত অপশক্তি। এই কামই মানুষের সবচেয়ে করাল অরাত। এই প্রচণ্ড দানবকে নিধন করতে না পারলে সাহিত্যিক জীবন, মহাজীবন লাভ অসম্ভব। (৩/৩৭-৪৬)।

বোধ করি, এই আসক্তি বা মোহে অভিভূত হয়েই অর্জুন কর্তব্য কর্মে বিমুখ হোয়ে পড়েছিলেন। মিথ্যা আত্মীয়তাবোধ তাঁর ঐ রজোগুণজাত কামেরই ফল। কৃষ্ণ

তাঁর সেই সমুদ্রতা কাটিয়ে তাঁকে জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব বা একান্ত সাধ্য বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছেন।

এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদ বা সংলাপ প্রশ্নে-উত্তরে যথেষ্ট সজীব। উভয়েরই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এতে স্পষ্ট। তাই 'চারিত্রিক বৈচিত্র্যে এবং কথন-প্রতিকথনের প্রাণময়তায় সংলাপ পেয়েছে নাট্যিক পরিবেশের আবেশ।

তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্মযোগের কথাই বিশেষ ক'রে বললেন। তারই সঙ্গে সংকেতে ইঙ্গিত করেছিলেন জ্ঞান-যোগ সম্বন্ধে। চতুর্থ অধ্যায়ে তারই কথা বিশদ ক'রে বোঝালেন অর্জুনকে। প্রাসঙ্গিকতায় এসে পড়লো যোগ-তত্ত্বের ইতিবৃত্ত। (৪/১-৩)। সৃষ্টির আদিতে কৃষ্ণ যে সূর্যকে এই যোগতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা বলায় অর্জুন সম্বর কৃষ্ণকে চেপে ধরলেন, তা কেমন কোরে হোতে পারে? সৃষ্টির সেই আদিম যুগে তিনি থাকলেন কী ক'রে? (৪/৪)। অর্জুনের মনে উদ্ভূত কুতূহল তৃপ্ত করলেন কৃষ্ণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় দিয়ে। তিনিই যে অনাদি ও অনন্ত তত্ত্ব, অজ-নিত্য-শাস্ত্র পরমাত্মা, অক্ষয় অব্যয় পরমেশ্বর তাঁরই নির্মিত প্রকৃতিতে নিয়ে জীবনের দৈবী মায়ী দিয়ে নিজেই তিনি যে বারে বারে আবির্ভূত করেন, সে কথা জানালেন অর্জুনকে।

[ক্রমশঃ]

কান্না হাসি

গীতা হাজরা

আমায় জড়িয়ে রেখেছ তোমার কান্না হাসির মাঝে।

আমায় ডুবিয়ে রেখেছ তোমার আঁধার আলোর মাঝে ॥

তাই তো কাঁদি আঁধারে

আর আলোয় শুধুই হাসি।

হৃদয় ভরিয়ে রেখেছ

তাই শূন্য তোমার বাঁশী ॥

হারাই তোমায় ক্ষণে ক্ষণে

লুকিয়ে থাকো গভীর মনে

পরশ তোমার অনুক্ষণ আমার হৃদয় মাঝে।

বিশ্ব ভুবন নয়ন পরে তাইতো মোহন সাজে

তোমার কান্না হাসির মাঝে ॥

শরৎ চেতনায় শ্রমিক আন্দোলন

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনে একটা বিরাট শক্তি হয়ে উঠেছিল। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ও সাহিত্য জগতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য করে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। ছেলেবেলা থেকে তিনি দেখেছেন সামাজিক অত্যাচারের নানা চেহারা। তারপর দীর্ঘকাল রেক্সনে তথা ব্রহ্মদেশে থাকার ফলে তিনি নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়েছিল সেকথা আমরা জানি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধান শক্তি হলেও ভবিষ্যতের সমাজ নির্ধারক শক্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী। একারণেই আমরা দেখি একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছেন, অন্যদিকে এই বৈপ্লবিক সংগ্রামকে শোষণমুক্তির সংগ্রামে পরিণত করার জন্য শ্রমিকদের সংগ্রামকে শূণ্য সমর্থন করেন নি, তাঁদের সচেতন করে তোলার জন্যে লেখনী ধরেছেন এবং তারই মধ্যে এদের ব্যথা-বেদনাকে মূর্ত করতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই বৈপ্লবিক ভূমিকা লক্ষ্য করে তখনকার সম্মতবাদী নেতা এবং বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক সরোজ মুখার্জী বলেছেন, ‘শরৎচন্দ্র সেযুগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের তিনটি ধারার সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধীজী ও দেশবন্ধু পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ! বিপ্লববাদী তরুণদের আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা। আবার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের প্রতিও দারুণ সহানুভূতি।’

আমাদের দেশে শিল্প-বিকাশের পথে অন্তরায় কোথায়, এদেশে শ্রমিক-শ্রেণীর আবির্ভাব, সমাজ বিপ্লবে তাঁদের ভূমিকা, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন এবং রুশ বিপ্লবে তাঁদের ভূমিকা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র গভীরভাবে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারে যে বইগুলি তিনি যত্নের সঙ্গে পড়েছেন ও রেখেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে (১) Factory Labour in India—Rajani Kanta Das (২) The Civil War in France—Karl Marx (৩) Fascism—

Odon Por (৪) The Economic Transition in India—Sir Theodor Morrison (৫) The Bolshevik Theory—R. W. Postgate (৬) Lenin—Valerin Marcu (৭) Lenin—Robins Ransome Williams (৮) Lenin—Trotsky (৯) Socialism—O. D. Skelton (১০) The French Revolution—Louis Madelin.

এই গ্রন্থগুলি যে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন তার চিহ্ন রয়েছে গ্রন্থের মধ্যে। তাছাড়া ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়ার্লিকবহাল থাকার জন্যে তিনি কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীপাদ অমৃত ডাক্তার সম্পাদিত ‘The Socialist’ পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। শূণ্য পড়ানয়, তার সঙ্গে ছিল তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে।

পলাশীতে যে যুদ্ধের প্রহসন হয়েছিল তারপরে বাংলার সব ক্ষমতা চলে গেল বণিক কোম্পানীর হাতে। বৃটিশ বণিকরা তখন এদেশে যে লুণ্ঠন চালিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। তার একশ বছর বাদে সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজ শিম্পপতিরা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিল। তখনও চরিত্রের পরিবর্তন হয় নি। নীল-কুঠির সাহেবদের যে অত্যাচার এদেশে হয়েছে তার চেয়ে কম অত্যাচার বা শোষণ বৃটিশ রাজ্যের প্রতিভূরা করেন নি। ইন্টাইঞ্জিয়া কোম্পানী ভারতের বুকে উপনিবেশ রচনা করে উপনিবেশিকদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে লুণ্ঠন ও শোষণ করে, যাচ্ছিল। এই চরিত্রের পরিবর্তন একশ বছর পরেও হয় নি, শূণ্য পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। ইংলণ্ডের বণিকদের পরিবর্তে সেদেশের শিম্পপতিরা বা শিম্প-বুর্জোয়ারা ভারতে যে শিম্পপনীর অনুসরণ করেছিলেন তা তাদেরই স্বার্থের অনুকূল।

বৃটেনের শিম্প স্বার্থ ভারতের বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে গুচেন্দা চলতে থাকে দেশীয় শিম্প ধ্বংস করার কাজ। তারপর আবার ভারতে নতুন উৎপাদনী শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। তাঁরা দেখলেন উৎপন্ন মাল দিয়ে সমগ্র দেশকে প্রাণিত করতে হলে চাই যোগা-

যোগ ব্যবস্থা। তাই নিজেদের স্বার্থে তারা ভারতের বুকে রেলপথের জাল বিস্তার করলেন। বোধহয় এ কারণেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের তুলা উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটতম অঞ্চল বোম্বেতে রেলপথের প্রতিষ্ঠা হয়। একথা অনস্বীকার্য আমাদের দেশে সেই সময় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন করলেও ভারতকে আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ দেশরূপে গড়ে তোলার কোন সদিচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। এই এই কারণেই তাঁরা দেশীয় সামন্ত নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছিলেন। দেওয়ান, বেনিয়ান, মুছদ্দিদ প্রভৃতি শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। তাঁরা প্রচুর ধন উপার্জন করেছেন কিন্তু যাতে তাঁরা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ না করেন তার জন্যে তাঁরা এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে এক-শ্রেণীর ভূস্বামীর সৃষ্টি করতে এগিয়ে এলেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ের বা অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ কামেয় করে তুললেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ একটি চিঠিতে লর্ড কর্ণওয়ালিস লেখেন^১, 'The large capitals possessed by many of the natives, which they will have no means of employing... will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is declared to be secured.'

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে কর্ণওয়ালিস এদেশের ধনীদেব আকৃষ্ট করলেন জমিতে অর্থলগ্নী করতে। এদেশের ধনীরা সেই টোপ গেলাতে কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য সফল হলো। তাই বাংলার ধনীরা জমিদার হলেন, শিল্পপতি হন নি। কিন্তু বোম্বে অঞ্চলের চিত্র পৃথক। সেখানে মহাজনরা ঋণগ্রস্ত রায়তদের জমি কেড়ে নিয়ে জমিদার হতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে জমি কিনে জমিদার হবার সুযোগ ছিল না। তাই অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা আসা সত্ত্বেও তাঁরা বস্ত্রশিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু বাংলাদেশকে শ্রমবিমুক্ত জমিদারদের উপহার দেয় নি, দিয়েছে আশান। বাংলায় শিল্পস্থাপনের সম্ভাবনা অনেক পেছিয়ে গিয়েছিল।

ইতিহাস সচেতন শরৎচন্দ্র আমাদের দেশে শিল্পসংস্থার অভাবের কারণ নির্দেশ করে বলেছেন^২, 'Permanent settlement-এর জন্যই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য

মধ্যবিত্ত middleman সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয় নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করছে। বোম্বেই প্রভৃতি অঞ্চলে Permanent Settlement না থাকার জন্যই ওদেশে industry-র উন্নতি হচ্ছে। জমি কেনা ও বেশী সুদে লাগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাংলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।'

আগেই বলা হয়েছে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বোম্বে অঞ্চলে ২০ মাইল ব্যাপী রেলপথ বিস্তৃত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য তুলা উৎপাদন কেন্দ্র। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে কয়লা খনিগুলির জন্যে বাংলাদেশে রেলপথ বিস্তৃত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র ভারতে ২৮৮ মাইল রেলপথ স্থাপিত হয়। কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য চালান দেবার সুবিধার জন্যে এই রেলপথের বিস্তার হয়। ব্রিটিশদের অন্য কোন সদিচ্ছা ছিল না। শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীতে জনৈক বৃদ্ধের জবাবীতে তীব্র মন্তব্য করেছেন^৩, 'কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা লাইন পাতবার?... কতারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুধু চালান করে নিয়ে যেতে... শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রক্তে রক্তে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সম্পূর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিসহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতে গোপন রাখিবার যো নাই।'

একথা সত্য যে লুণ্ঠন বা শোষণের অভিপ্রায়ে ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল তথাপি তার পরোক্ষ ফল ছিল শুভ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কার্ল মার্কস বলেছেন^৪, 'ইংরেজ মিলস-তত্ত্বীরা ভারতকে রেলপথ বিচুড়িত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কমদামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা

অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্য যা দরকার সে সব শিম্প-কারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিম্পের এমন সব শাখার যন্ত্রশিম্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিম্পের অগ্রদূত। মার্কসের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে। ব্রিটিশ স্বার্থোপযোগী চা-কফি-রবারের বাগিচা, কয়লাখনি ও চটকল গড়ে উঠলো। ইংরেজ মালিকানায় সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন ভারতীয় অংশীদার নেওয়া হয় নি এবং তাদের মূলধনের অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে ভারত থেকে শোষণ করে।

ব্রিটিশরাজ অনেক বাধা নিষেধ, প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন ভারতীয় শিম্পপতিদের কাছে। তা সত্ত্বেও ভারতীয়দের যন্ত্রশিম্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিদেশী ও দেশী শিম্পপতিদের কলকারখানা স্থাপনের পরেই নতুন সংগ্রামী শ্রেণী 'শ্রমিক সম্প্রদায়'দের আবির্ভাব হয়। লক্ষ্য করা গেছে ব্রিটিশ শিম্পপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিম্পপতিদের স্বার্থ সংঘাতজনিত বিরোধ থাকলেও শ্রমিকশোষণে উভয় দলই ছিলেন একই পথের পথিক। উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল অল্প খরচে সর্বাধিক মুনাফা লাভ। শ্রমিকদের তাঁরা মনে করতেন দাসের মতো। চমনলাল দেওয়ান বলেছিলেন, ভারতের শিম্পক্ষেত্রে দাসত্বই হচ্ছে মূল কথা। তাই মালিকপক্ষ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য পয়সা খরচে রাজী নন। শ্রমিকদের জন্য যে বাসস্থান তৈরী হয়েছিল তা মনুষ্যবাসের অনুপযোগী।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতি-নিষিদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের বাসস্থান সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন তা হলো 'আমরা যখন যেখানে রহিয়াছি তখনই সেখানকার মজুরদের বসতিগুলি দেখিয়াছি। স্বচক্ষে না দেখিলে এরূপ জঘন্য বাসস্থানের অস্তিত্বের কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।... লাইনবন্ধ কতকগুলি ঘর। প্রত্যেক ঘরই একখানি অন্ধকার খুপরি ছাড়া আর কিছুই নয়। টালির ছাদ-ডাঙ্গা একটুখানি ফাঁক ছাড়া ঘরের মধ্যে আলো বাতাস ঢুকিবার আর

কোন পথ নাই...সারিবদ্ধ ঘরগুলির বাহিরে সঙ্কীর্ণ লম্বা যে নর্দমা থাকে তাহাতে আসিয়া জমা হয় যত রাছোর জঞ্জাল আর রাতদিন সেখানে যত মশা-মাছির-পোকার অবাধ আধিপত্য।...দুটি কুলি লাইনের মাঝখানে যে জমিটুকু থাকে তাহার একধারে উন্মুক্ত পয়প্রণালী। এই পয়নালায় স্থানে স্থানে সব রকমের ময়লা জমিয়া চাপ্তর বাঁধিয়া থাকে। এই জমাট-বাঁধা পচা জঞ্জাল হইতে যে অসম্ভব দুর্গন্ধ ছড়ায় তাহা কহতব্য নয়।'*

শ্রমিক বসতি সম্পর্কে এই চিত্র পাওয়া যায় শরৎ-সাহিত্যে। তিনি নানা স্থানে ঘুরে দেখেছেন, ব্রহ্মদেশে মিজীপল্লীতে থেকে শ্রমিকজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, দেখেছেন শ্রমিকরা কি করুণভাবে শোষিত হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি 'পথের দাবী' গ্রন্থে শ্রমিকদের বাসস্থানের বাস্তব চিত্র দিয়েছেন। ভারতী ও অপূর্ব গেছেন বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা শ্রমিকদের জন্যে লাইনবন্দী বেসব নরককুণ্ড তৈরী করে দিয়েছে, সেইখানে। তার বর্ণনা শরৎচন্দ্র এইভাবে দিয়েছেন, 'ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ওধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙা কাঠ ও ভাঙা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি, সুমুখ দিয়া সারি সারি কয়েকটা জলের কল এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া কুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মী, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান জ্ঞী ও পুরুষে প্রায় হাজারখানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।'*

শ্রমিক বসতিতে কলেরা, ডেঙ্গু, প্লেগ ইত্যাদি রোগ যখন মহামারী আকারে প্রকাশ পায় তখন কিভাবে তারা বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে অসহায়ভাবে মারা যায় তার চিত্র শরৎসাহিত্যে আছে। বিশেষতঃ 'শেষ প্রশ্ন' গ্রন্থে আগ্রা শহরের বাহরে চামড়ার কারখানার কাছে মজুর বসতিতে মহামারীর ধ্বংসলীলার বাস্তব ও ইতিহাসসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে রেলপথ বিস্তারের কাজে কর্মরত শ্রমিকদের বিনা চিকিৎসাতে মৃত্যুর বাস্তব

বর্ণনা দিয়েছেন। সতীশ ভরদ্বাজের মৃত্যু তখনকার দিনে শ্রমিক বা ঐ শ্রেণীর কর্মীদের অসহায় জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমর্থন প্রকাশ পেলো এই গ্রন্থে তাঁর শ্রমিক চেতনাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-জাত সাহিত্যিকদের প্রাণের যোগ ছিল না চাষী-মজুরদের জীবনের সঙ্গে। তাই সাহিত্যে তার প্রকাশ সম্ভব হয় নি। মজুর আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখা ও তাঁর বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত করা—আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে এ কাজ সর্বপ্রথম করেছেন শরৎচন্দ্র।’

একথা আমাদের মানতেই হবে অতীতে ভারতে স্বাধীনতার জন্য যেসব বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী কাজ-কর্মে যারা লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের প্রায় কেউই শ্রমিকদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তাই সশস্ত্র বিপ্লবের যুগে নেতারা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কথা ভাবেন নি। অথচ শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সব্যাসাচী চরিত্র সন্ত্রাসবাদী হয়েও স্বতন্ত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তার সম্বন্ধে সব্যাসাচী সচেতন। তিনি ভারতীকে বলেছেন, ‘শ্রমিক ও কৃষক এক নয়, ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিগরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়ারগানের চাষার কুটীরে।’

শ্রমিকরা হলেন কলকারখানার প্রকৃত মালিক যেহেতু তাঁদেরই প্রমে গড়ে উঠেছে শিল্প, পুঁজির যোগানও হয়েছে তাঁদেরই প্রমে। শ্রমিক বস্তুতে গিয়ে ভারতী তাঁদের বলেন, তোমরা ছাড়া কি এত বড় কারখানা একদিন চলে ?

তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক।...এই যে ক্রোড় ক্রোড় টাকা এরা লাভ করচে সে কাদের দোলাতে ? আর তোমরা পাও কতটুকু?...একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বলত, এ নির্ধাতন আমরা আর সহিব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে দেখি।

শ্রমিকরা সচেতন হয়ে যাতে তাঁদের ন্যায্য দাবী আদায় না করতে পারেন তার জন্যে শিল্পপতিরা নানাবিধ কৌশলে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে তাঁদের একত্রে ভেঙে ফেলতে চান। মালিকদের শ্রমিকদরদী মুখোশ খুলে দেবার জন্যে শরৎচন্দ্র ‘পথের দাবী’তে রামদাস তলোয়ারকরের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। শ্রমিকসভায় বক্তৃতা দেবার সময় রামদাস শিল্পপতিদের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, ‘(মালিকরা) কিছুতেই তোমাদের মানুষ হতে দেবে না। কেবল পশুর মত করে রেখেই তোমাদের মনুষ্যত্বের অধিকার তারা আটকে রাখতে পারে, আর কোন মতেই না—এই কথাটা তোমাদের আজ না বুঝলেই নয়। তোমরা অসাম, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়ানুগ—তাদের মুখ থেকে এইসকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেচ। তাই যখনই তোমরা দাবী জানিয়েছ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখকষ্টের মূলে তোমাদের অসংযত চরিত্রকে দায়ী করে তারা তোমাদের সর্বপ্রকার উন্নতিকে নিব্বারিত করে এসেচে। কেবল এই মিথ্যেই তোমাদের তারা অনুক্ষণ বুঝিয়ে এসেচে—ভাল না হলে কারও কোন উন্নতি কোনদিন হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি তোমাদের অসংকোচে একান্ত অকপটে জানাতে চাই ঐ উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়, তোমাদের এই প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের জন্য দায়ী।’

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তথ্যপত্রী :

- ১। গণশক্তি, ১৭. ৯. ৭৫
- ২। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা
—বিনয় ঘোষ, পৃ ১৩০, ১৯
- ৩। শরৎসাহিত্য সংগ্রহ ১৩শ, পৃ ৩৬১
- ৪। ঐ ৩য়, পৃ ১০০
- ৫। উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে
—মার্কস-এঙ্গেলস, পৃ ৮৯

- ৬। আজিকার ভারত ২য়,

—রজনী পাম দস্ত, পৃ ২১৫-১৬

- ৭। শরৎসাহিত্য সংগ্রহ ১৩শ— পৃ ১০২-১০৩

- ৮। শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ

—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৪৮

- ৯। শরৎসাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ) পৃ ১৫০

নীহারকণা সোম স্কুলে জয়েন করতে এসে দেখলো হেডমিস্ট্রেস নেই, অন্যান্য শিক্ষিকারা তাকে অভ্যর্থনা করে। জয়েনিং রিপোর্ট নিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেক্রেটারী তখন বাড়ীতে ছিগেন না। চাকর বলল অপেক্ষা করতে—তার মনিবের ফিরতে দেবী হবে না।

নীহারকণা হাজিগড় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হয়ে এলো আজ। মোটা ভারী দেহ, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। চলনে বলনে অহঙ্কারীভাব। কলকাতার চাকরী ছেড়ে এতদূরে চলে আসার বোধহয় একটা কারণ ছিল। একমাত্র ছেলে জাহানাবাদে চাকরী পেয়ে বউ নিয়ে এসেছে বছর খানেক হল। তাদের ওপর খবরদারী করার সুযোগ তো চাই।

হাজিগড় স্কুলের আগের হেডমিস্ট্রেস ছিল সুনন্দা ঘোষ। দীর্ঘকাল এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত। প্রায় স্কুল তৈরি হওয়ার সময় থেকে ছিল। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৈলাসপতি উপাধ্যায়। প্রথম দিকে নাম ছিল হাজিগড় গার্লস স্কুল। তখন সেক্রেটারী কৈলাসপতি স্বয়ং আপন হেডমিস্ট্রেস সুনন্দার দিদি সুহৃদ্দা। মণিরাম পান্ডে ছিলেন প্রেসিডেন্ট, এখনও তাই।

কৈলাসপতির বেশ বয়স হয়েছিল। মারা গেলেন একসময়। স্কুলের নাম বদল হয়ে হল ‘হাজিগড় কৈলাসপতি বিদ্যাগ্রাম’। সেক্রেটারী হল দিব্যেন্দু রাহা। দিব্যেন্দু চাকরীতে বদলী হয়ে এসেছিল জাহানাবাদ। শিক্ষিত এবং সমাজসেবী হিসেবে খুব অল্প সময়ে হাজিগড়ে পরিচিতি লাভ করে।

দিব্যেন্দু যখন হাজিগড়ে এলো তখন তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এখানে একাই থাকত। কলকাতায় তার চাকরী-রতা স্ত্রী বা ছেলের কথা কোন সময়ে উল্লেখ করেনি কারো কাছে। তার তিনকুলে কেউ নেই এটাই সকলে জানত। হেডমিস্ট্রেস সুহৃদ্দার সঙ্গে মেলামেশাটা ক্রমে আত্মীয় হয়ে উঠল। একসময়ে দিব্যেন্দু সুহৃদ্দাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করল। সুহৃদ্দার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। দিব্যেন্দুর স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার কথা তার অজানা ছিল না।

তারপর একসময় সুহৃদ্দা স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে

অজানার পথে পা বাড়াল দিব্যেন্দুর সঙ্গে। ওদের বিয়েটা তো হাজিগড়েও হতে পারত আর তাতে অসুবিধে তো কোনখানে ছিল না। দিব্যেন্দু আগেই চলে গিয়েছিল হাজিগড় থেকে—চাকরীতে রিটায়ার করে। দিব্যেন্দুর স্বভাবটা ছিল এমনই যে স্থিরভাবে একজায়গায় বেশীদিন থাকা সহ্য হত না। সুন্দরী নারীর উপর অপরিণীত লোভ ছিল তার। বহু নারীকে নানাভাবে ঠকিয়েছে।

সুহৃদ্দা সুন্দরী, যদিও ছোট বোন সুনন্দা নয়। ওদের বাড়ী জাহানাবাদে। সেখানে বিধবা মা আর এক দাদা থাকেন। শহরে কাপড়ের দোকান বাবার আমল থেকে। আর্থিক অবস্থা খারাপ না।

সুনন্দাও তার পুরোনো চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। দিব্যেন্দু রাহা আর সুহৃদ্দা তো অনেক আগেই চলে গেছে হাজিগড় থেকে।

হাজিগড় আধা শহর আধা গ্রাম। মাইল পাঁচেক দূরে মধুকুমা শহর জাহানাবাদ। তাই গ্রামাভাবটা তেমন নেই। মানুষের নিত্য প্রয়োজনের সব কিছু এখানে মেলে। ছেলেদের একটা স্কুল আছে। ডাক্তারখানা, হেলথ সেন্টারও আছে। এখানের স্কুল থেকে পাশ করার পর জাহানাবাদ কলেজে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাতায়াতের অসুবিধে নেই। করিমনগর থেকে হাজিগড় হয়ে জাহানাবাদ পর্যন্ত বাস চলে আধঘণ্টা অন্তর। কৈলাসপতি বেঁচে থাকলে হাজিগড়ে এতদিনে একটা কলেজ হয়ে যেত। যে হারে লোকজন বাড়ছে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দিগ্ধে তা বোঝা যায়।

সেক্রেটারী নন্দকিশোর বা কিছুক্ষণ পরেই এলেন। নীহারকণাকে দেখে বললেন—আপনি এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে। আজই জয়েন করে চার্জ বুঝে নিন।

নীহারকণা বলে—জয়েনিং রিপোর্ট আমি লিখে এনেছি। কিন্তু চার্জ নেব কার কাছে? শুনলাম আউট-গোয়িং হেডমিস্ট্রেস নেই এখানে।

নন্দকিশোর বললেন—হেডমিস্ট্রেসের দরকার নেই। এ্যাসিস্টেন্ট হেডমিস্ট্রেস চন্দ্রাবতী মিশ্রকে উনি চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেছেন, তাঁর বাড়ী জাহানাবাদে। সমস্য়মত এসে

তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন। উনি আগেই ইস্তফা দিয়েছেন—আপনার ইস্টারভিউর আগে। এতদিন চন্দ্রাবতী চালাচ্ছে।

নীহারকণা বলে—তা চন্দ্রাবতী তো পারমানেন্ট হেড-মিস্ট্রেস হতে পারত।

—ওর মাস্টার ডিগ্রি নেই, তাই কমিটি রাজী নয়। তা আপনি হঠাৎ কলকাতার চাকরী ছেড়ে এতদূরে এলেন?

নীহারকণা বলে—সেদিন কমিটির কাছে তো বলেছি, আপনার হয় তো মনে নেই। আমার ছেলে চাকরী করে জাহানাবাদে। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে ওকে মানুষ করেছি, চাকরী জোগাড় করে দিয়েছি, বিয়ে দিয়েছি। ওই ছেলে যখন আট বছরের তখন আমার স্বামী মারা যান।

নন্দকিশোর বলেন—ছেলের কাছাকাছি তাই থাকতে চান? এখানে তো টিচারদের ভাল হোস্টেল করে দিয়েছি, কোন কষ্ট হবে না।

—না আমি হাজিগড়ে থাকব না। জাহানাবাদ থেকে রোজ যাতায়াত করব। মানে ছেলের কাছেই আছি আর কি। আচ্ছা, হেডমিস্ট্রেস সুনন্দা ঘোষ তো এই স্কুলে দীর্ঘদিন ছিলেন—হঠাৎ চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন? শূন্যে বয়স বেশী নয়। বিয়েটিয়ে করবেন বোধহয়, না কোথাও ভাল চাকরী পেয়েছেন?

নন্দকিশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আমি ঠিক জানি না। তবে ওর মত লোক সহজে পাওয়া যায় না। কমিটি তো পদত্যাগপত্র কিছুতেই মঞ্জুর করতে চাননি। শেষে সুনন্দা কাম্বাকাটি শুরু করল।

—কেন, ব্যাপারটা কি?

—সেটা আমি বলতে পারব না। ধরে নিন আমার জানা নেই। সুনন্দার দিদি সুহন্দা তো আগেই চলে গেছেন। সেও একটা ইতিহাস। আপনি যথেষ্ট বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ। আপনি ভালভাবে স্কুলটা চালান। এ স্কুলের রেজাল্টের জন্যে এত সুনাম। শহর থেকে পর্যন্ত কয়েকটা মেয়ে এখানে পড়তে আসে। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি কি এখন জাহানাবাদ ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ, চার্জ বুঝে নিয়ে তারপর যাব। কাল থেকে রেগুলার আসব।

হাজিগড়ের লোকের কাছে সুহন্দা আর সুনন্দা খুব প্রিয়জন ছিল। তাদের বিষয়ে কিছু খারাপ ভাবা কষ্টকর ছিল। তবু ভাবতে হয়েছে নাইলে যে অংক মেলে না। ষড়ই প্রিয়জন হোক বিশেষ করে অভিভাবকহীন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষের চিন্তাভাবনাটা অন্য ধরনের হয়। সত্যি কিছু থাক বা না থাক, মুখরোচক মিথ্যেটা নিয়ে রোমন্থন ভালই লাগে। লোকে জানল যে প্রেসিডেন্ট মণিরাম পান্ডে সুহন্দাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তাই সে চলে গেছে এখান থেকে। কোথায় আর যাবে জাহানাবাদ ছাড়া। আর সুনন্দা নাকি বিপ্লবীক নন্দকিশোর আর সঙ্গে একটা বিদ্রোহী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল, তাই তাকেও চলে যেতে হয়েছে সম্মান নিয়ে।

কদিন বাদে সুনন্দা ফিরে এলো জাহানাবাদ থেকে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে স্কুলে এলো সকলের কাছে বিদায় নিতে। চন্দ্রাবতী কেঁদে ফেলল। বলে—নন্দাদি তুমি যেও না, এখানেই থাক।

সুনন্দা স্নান হেসে বলে—সবাইকে একদিন চলে যেতে হয় চন্দ্রা। তাদের নতুন হেডমিস্ট্রেস জয়েন করেছে?

—হ্যাঁ, এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

ওরা দুজনে সুইংডোর ঠেলে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে ঢোকে। নীহারকণা টেবিলের কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে তাকাল।

বলে—বসুন। শুনলাম আপনি এসেছেন।

সুনন্দা বলে—আপনি আমায় চিনলেন কি করে?

নীহারকণা দেয়ালের দিকে হাত দেখিয়ে বলে—এই এতগুলো ফটো বাঁধানো রয়েছে নানান অনুষ্ঠানের। আপনাকে চিনতে আর অসুবিধা কি। আজই চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, এখুনি যাব। সবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

নীহারকণা বলে—কোথায় যাবেন? ভাল চাকরী পেয়েছেন বোধহয়?

সুনন্দা বলে—না, সেসব কিছু নয়। আচ্ছা চলি। জানি না আবার দেখা হবে কিনা। নমস্কার। চল্ চন্দ্রা।

(ক্রমশঃ)

খরাভূমি পুরুলিয়া—একটি সমীক্ষা

বিশ্বনাথ রায়

১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিহারের মালভূম জেলার খোলাটি থানাগুলি পশ্চিমবঙ্গের আওতাধীন আসে। ওই এলাকা নিয়েই জন্ম হয় আজকের পুরুলিয়া। খরাভূমি পুরুলিয়ার আর্থসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। এবং ঐতিহ্যে রয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতি। প্রাচীন মন্দিরগুলিতে মিশরীয় ভাস্কর্যের সাদৃশ্য রয়েছে। পুরুলিয়ার ছোঁ-নাচ ও লোকসংগীত কুমুরের জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। খরাক্রান্ত জেলার ওপর দিয়ে চলে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা। জেলাটি সবচেয়ে নবীন ও অনগ্রসর। লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। পুরুলিয়ার শিক্ষিতের হার বাঁকুড়ার চেয়েও কম। তপসিলী সম্প্রদায়ের লোকের চেয়ে আদিবাসীদের সংখ্যা বেশি। এখানে দেখা যায় বাংলা, মুন্ডারী ও সাওতাল ভাষার ব্যবহার। তারমধ্যে বাংলাভাষীদের সংখ্যা বেশি। মাহাতো প্রধান পুরুলিয়া। এছাড়াও ভূমিজ, মুন্ডা, খেরিয়া, কোড়া, কুম্ভী, সাওতাল, বাউরী, আহির, কুমার, রাজওয়ার, ভূঁইয়া, লোহার প্রভৃতি লোকেরও বাস রয়েছে। অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে সাওতালই প্রধান। এখানের মাটিবেশা মানুষের সমতল ভূমিকে 'টাঁড়' ও উঁচু ভূমিকে 'ডি' বলে। জেলার নদ-নদীগুলির মধ্যে কাঁসাই, কুমারী, সুবর্ণরেখা, বরাকর, হারকেশ্বর, শিলাই প্রভৃতি সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুলিয়ার ব্যাঙ্কের শাখা মোট ৪২টি। অর্থাৎ প্রতি ৩৪ হাজার মানুষ পিছু একটি। মাথাপিছু আয়ে জেলাটি বাঁকুড়ার চেয়েও পিছিয়ে। প্রসংগত উল্লেখ্য, জাতীয় স্বার্থেই অসাধু লগ্নী ব্যবসায় রোধে ১৯৪৪-৪৫ সালের প্রাপ্তন মহাশূর সরকারের আইনের ধরনের একটি আইন প্রণয়নের জন্য ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধন হওয়া উচিত। অর্থলগ্নী সংস্থাগুলি সমগ্র ভারতে যতো লগ্নী করে তার মোটে ৪ শতাংশ পায় পশ্চিমবঙ্গ। এই লগ্নীর পরিমাণ রাজ্যের সুখম উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু সে উদ্যোগ কোথায়?

কৃষিকাজের মাঝ দিয়ে মানব সভ্যতার সূচনা হয়। এবং মাটির সাথে মানব সভ্যতার বিকাশ অঙ্গাঙ্গী

ভাবে জড়িত। প্রধানতঃ কৃষিকাজের উন্নতি নির্ভর করে মাটির উর্বরা শক্তির উপর। অনেক ক্ষেত্রে মাটির জন্যে শিল্পেরও উন্নতি হয়। জেলার মাটি কাঁকুরে ও লাল। পুরুলিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি কাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষিব্যবস্থায় এই জেলা খুবই অনগ্রসর। ফলস্বরূপ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার অন্তর্গত অঞ্চলে পাঁচ বছর মেয়াদি ভারত-ব্রিটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করার হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কাজ চলছে। দুটি জেলার আটটি ব্লক বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতি ব্লকের দুটি গ্রাম। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার প্রধান সমস্যা হল জল। বাঁকুড়ায় কাঁকুরে জমি হওয়ায় জলধারণ ক্ষমতা কম। অন্যদিকে, পুরুলিয়ার ব্লক-বাল-কাঁকরমিশ্রিত জমিতে বৃষ্টির জলও দাঁড়ায় না। পুরুলিয়ার আর এক সমস্যা ভূমি ক্ষয়। জেলা দুটির উঁচু, নিচু, ঢালু ও পড়ো জমিতেও ওই প্রকল্পের কৃষিবিদরা মাটির গুণাগুণ বিচার করে বিভিন্ন ফসল (ধান, বাদাম, সরষে, ভুট্টা, কলাই প্রভৃতি) ফলানোর উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছেন। মাটি পরীক্ষার জন্য বাঁকুড়ায় ভ্রাম্যমান গাড়িও রয়েছে। এই প্রকল্পের সফল রূপায়নের জন্যে জেলাদুটির সংশ্লিষ্ট গ্রামের পঞ্চায়তগুলি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে। বস্তুতঃ বিভিন্ন শিল্প কৃষিজন্তবোয় উপর নির্ভরশীল। এ সকল শিল্পের উন্নয়নে কৃষির সার্বিক উন্নয়ন খুবই জরুরী। উত্তরাধিকার প্রথার ফলে কৃষিজমির আয়তন কমে যাওয়ায় কৃষি-আশ্রয়ী পরিবারগুলির জমি চাষ আবাদ করে তন্মসংস্থান সম্ভব হচ্ছে না। জেলার সমবায় কৃষির প্রসার হলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, কৃষিক্ষেত্রে উদবৃত্ত কৃষিজীবীদের সরিয়ে নিয়ে আঞ্চলিক শিল্পে নিয়োগ করতে পারলে এবং কৃষিকাজে উন্নত যন্ত্রপাতি, জৈব ও রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ, জলসেচ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রভৃতি প্রয়োগের মাঝ দিয়ে ধানচাষের উন্নতি সম্ভব। পুরুলিয়ার কৃষির বড় দোষ হলো উৎপন্ন ফসলের স্বল্পতা। প্রকৃতপক্ষে, চাষের জমি চাষীকে

না দিতে পারলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন আশাতীতভাবে বাড়ানো অসম্ভব। জেলার বিনিময় অর্থনীতিতে যারা প্রকৃত বিক্রেতা তাদের চাষ-আবাদে সাধে আদৌ কোন সম্পর্ক থাকে না। প্রকৃতপক্ষে বিনিময় অর্থনীতিতে চাষীদের কোন ঠাই নেই। কেননা চাষীরা যা উৎপাদন করে তার সিংহ-ভাগ ওঠে জোতদারদের গোলায়। এবং জোতদারই মুনামফার প্রয়োজনে ওই ফসল বাজারজাত করে। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি প্রতিটি ব্লকে একটি করে ধর্মগোলা পত্তন করা হয়। রাজ্যে জমির মূল্যভিত্তিক ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভিনিউ সিস্টেম চালু হয়েছে। জমির মূল্য ৫০,০০০ টাকার অনূর্ধ্ব হলে, রাজস্ব ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৪২ লক্ষ মালিকানা স্বত্বভোগী কৃষক। শুধু তাই নয়, ১৯৮২'র শেষপর্যন্ত ১২'০৬ লক্ষেরও বেশি বর্গাদারদের নাম নথীভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪'৮২ লক্ষ জন তফসিলী জাতি এবং এবং ২'১৭ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায়। নথীভুক্ত বর্গাদারেরা পেয়েছেন উত্তরাধিকারের স্বত্ব, নিরাপত্তা এবং আর্থিক অনুদানের অধিকার। এর ফলে জেলার অগণিত মানুষ উপকৃত হয়েছে। পুরুলিয়ার মোট ৭১৩,৯২৩ জন শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষক ৫০'৪৬ শতাংশ কৃষিমজুর ২৪'৬৫ শতাংশ এবং নন এগ্রিকালচারাল শ্রমিকের সংখ্যা ২৪'৮৯ শতাংশ।

খরাপ্রবণ পুরুলিয়ার আবাদী-জমির পরিমাণ ২৭৮'৯ হাজার হেক্টর। তারমধ্যে মোটে ৩০'২ হাজার হেক্টর জমি দো-ফসলা। আমন চাষ হয় ৮৫'৬ শতাংশ জমিতে। লাল ও কাঁকুরে মাটিতে খরাসহনশীল বাদাম ও তিল চাষের এলাকা বাড়লে ঘানি শিল্পের বিকাশ ঘটবে। এছাড়াও এখানকার একফসলা জমিকে বহুফসলায় রূপান্তরিত করতে পারলে কৃষিতে শ্রমের যোগান বাড়বে। জেলার সমগ্র আবাদী জমির মধ্যে সরকারী খালের দ্বারা সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ১২,৬৫৫ হেক্টর, নদী থেকে ৭০টি ছল উত্তোলন ব্যবস্থা রয়েছে। কোন শ্যালো ও গভীর নলকূপ নেই। রঘুনাথপুরে জয়চণ্ডী পাহাড়ের কোলে একটি প্রায় তিরিশ একরের দাঁঘি রয়েছে। এই ধরনের দাঁঘিতে বর্ষার জল ধরে রাখার জন্যে খরাক্রিষ্ট অঞ্চলে খুবই উপযোগী। পুরুলিয়ার সেচব্যবস্থার তুলনায় বাঁকুড়া অনেক

ভালো। এমনকি সার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পুরুলিয়া পিছিয়ে।

লালমাটির জেলার গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে প্রায় ৫৮ শতাংশ ঋণগ্রস্ত। উল্লেখ্য, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরবর্তী কালে কর্মপদ্ধতির মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ঃ—(১) লগ্নী বাড়ানো, (২) শাখার সম্প্রসারণ করা, এবং (৩) শহর ও গ্রামে গঞ্জে মাটিঘেঁষা দরিদ্রতম মানুষগুলির কাছে ঋণের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এই লক্ষ্য পূরণে ব্যাঙ্কসমূহ খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছে ঠিকই কিন্তু ঋণের সিংহ-ভাগ ধনী ও সচ্ছল পরিবারগুলিই পেয়েছে। এই চির কমবেশি রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতেও দেখতে পাওয়া যাবে। এমনকি বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে চাহিদার অনুপাতে ঋণের যোগানও যথেষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৭৮) ভাগ-চাষী, ছোটচাষী ও স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের 'সুদ-ভরতুকি' পরিকল্পনার আওতায় এনেছেন। ঋণসরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রাপ্ত ঋণ শর্ত অনুযায়ী ঠিক সময়ে শোধ করলে সুদ দিতে হবে না। এই অভিনব প্রকল্পটি জেলার মাটি-ঘেঁষা মানুষগুলির মনে আশার সঞ্চার করেছে। সরকারী দুশো খামারের মাধ্যমে কৃষকদের চাহিদা মত উষ্মতমানের বীজ যথাসময়ে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে 'রাজ্য বীজ কর্পোরেশন' গড়ে ওঠে। এবং এর ফলে প্রতিবছর বীজ আমদানীর জন্য যে ৩০ কোটি টাকা খরচ হতো তাও রাজ্যেই থেকে যাবে। এই প্রসঙ্গে 'রাজ্য বীজ কর্পোরেশন' যোগ্য ভূমিকা নিতে পারে নি।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির সাথে শস্য রক্ষার ব্যাপারে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এ ধরনের নজর দেখা যায়নি। শস্যরক্ষা তদারিকর জন্যে একটি যুগ্ম-কৃষি-অধিকর্তার পদ মঞ্জুর করা হয়েছে। এবং তার অধীনে তিনটি অঞ্চলে তিনজন উপকৃষিঅধিকর্তার উপর শস্য রক্ষার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতি জেলায় একজন করে শস্য রক্ষার অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের জন্যে কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছেঃ— (১) কৃষকের বীজের চাহিদা মেটানোর জন্যে গঠিত হয়েছে 'রাজ্যবীজ কর্পোরেশন', (২) ডাইল্যাণ্ড ফার্মিং রিসার্চ স্টেশন,

(৩) স্থাপিত হয়েছে ৬টি আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্র, (৮) গঠিত হয়েছে ৬টি কমোডিটি রিসার্চ স্টেশন, (৫) চালু হয়েছে শস্যবীমা প্রকল্প, এবং (৬) কৃষক-পেনসন চালু হয়েছে। এই সমস্ত বহুমুখী প্রয়াসের প্রভাব জেলাগুলিতেও কমবেশি পড়ছে। প্রসংগত উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে একটি সর্বভারতীয় সর্বাঙ্গী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। এছাড়াও জাতীয় বীজনিগম সংস্থাও সর্বাঙ্গের বীজ উৎপাদনে মনোনিবেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বাঙ্গের বীজ উৎপাদনে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের চেয়েও অনেক পিছিয়ে। বর্তমানে গবেষণার মূলকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রগুলির যৌথপ্রয়াসে উচ্চ ফলনশীল ও ভালজাতের প্রজাপতির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তির দিকে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে অর্থকরী সর্বাঙ্গীচাষে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হলে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পরিমাণও বাড়বে।

জেলার খরার প্রচণ্ড দাপটকে রোধের জন্যে চাই কৃষি-বিজ্ঞানী ও সরকারের যৌথ উদ্যোগ। অন্যভাবে বলতে পারি, গ্রামে গাঁথা মানুষের কল্যাণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে অকুপণভাবে নিয়োজিত করতে হবে। কেন না, জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে কৃষি থেকে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষক ও কৃষির সার্বিক উন্নয়নে আঞ্চলিক পরিকল্পনায় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন :—(১) গভীরতম মৌলিক গবেষণা ও খরা অঞ্চলের জন্যে সেচ ব্যবস্থার বিশেষ পরিকল্পনা, (২) পতিত জমি চাষযোগ্য করা, (৩) তিন একর পর্যন্ত জমির করমুক্ত সেচের ব্যবস্থা করা, (৪) অধিক ফসল উৎপাদন করলে যে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আছে তার সম্প্রসারণ করা, (৫) জলকরের বৈষম্য দূর করা, (৬) মাটির অল্পস্থ দূরীকরণের জন্যে চূণের প্রয়োগ করা, (৭) প্রতিটি রকের চাষীদের বিজ্ঞান-ভিত্তিক কৃষির শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, (৮) কম খরচে উৎপাদন বাড়ানোর উপযোগী প্রযুক্তি বিদ্যা ও একফসল জমিকে বহুফসলা করার কার্যসূচী নেওয়া, (৯) পশুগোয়েত-ভিত্তিক কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, (১০) প্রয়োজন-ভিত্তিক সার কৃষিক্ষেত্র ও উচ্চফলনশীল বীজের বণ্টন সুনিশ্চিত করা, (১১) সর্বাঙ্গ-বিপণন ও সংরক্ষণের অভাব দূর করা, এবং (১২) সব মরসুমেই সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

পুরুলিয়ার বনভূমি বাকুড়ার তুলনায় অনেক কম। যদিও ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়ার বনভূমির পরিমাণ ছিল ৩৩৩.২৮ বর্গমাইল। বনভূমির প্রধান গাছ শাল। এছাড়াও রয়েছে কুসুম, পলাশ, মহুয়া, বাঁশ কেঁদ, কুরচি, আমলকী, কুল প্রভৃতি। বন্দাবনপুর ও রামকানালিতে শালগাছের জঙ্গল দেখা যায়। অযোধ্যা পাহাড়ে পাইনগাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জেলার অরণ্যসম্পদ কমে যাওয়ার বনসংরক্ষণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কেননা, কৃষির সুবিধে, জমির ক্ষয়রোধ, আবহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ করা, পশুচারণ ভূমির প্রয়োজনে, ভূমিক্ষয়রোধ করা প্রভৃতি কারণে অরণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে কুসুম, পলাশ ও কুলগাছে লাক্ষাকীট লালন-পালন করা হয়। এবং ওই সমস্ত-গাছের উপর লাক্ষাকীটের জমাট লাফা প্রচুর পাওয়া যায়। ভারতের সর্বোচ্চ লাফা উৎপাদকের এই জেলা। অথচ পুরুলিয়ার মালবাজার, বাগমুণ্ডি, বলরামপুর ও অযোধ্যা পাহাড়কে ছুড়ে যে বিরাট লাক্ষাসম্পদ রয়েছে তা উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, বলরামপুর ও বালদায় লাক্ষা-শিল্প আরো বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পুরুলিয়ায় সরকারী আর্থিক সাহায্যে ছোট যন্ত্রপাতি, দাঁজ, কাঠ, চামড়া, ছাপাখানা, পোলট্রি, ছুতার, গমপেশাই, সংগীত যন্ত্র, ইট, বিড়ি, তসর, সাবান, জুতা, খড়কাটাই প্রভৃতি শ্রমপ্রধান শিল্পগুলির বিস্তারের সরকারী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এই সূত্রে বলে রাখা ভাল, অবিভক্ত বঙ্গদেশে দেশলাই শিল্প ছিল একচেটিয়া। কিন্তু আজ এই দেশলাই শিল্পই তামিলনাড়ুতে সম্ভাবনার নবদীপ্তির সূচনা করেছে। বর্তমানে এই রাজ্যে দেশলাই তামিলনাড়ু থেকে আমদানী করে। বহুতঃ পুরুলিয়ার বনজ সম্পদকে অবলম্বন করে গড়ে তোলা যায় দেশলাই শিল্প। এই ব্যাপারে খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ কমিশন দেশলাই শিল্প বিকাশের উদ্যোগীদের প্রশিক্ষণ, পুঁজি, কাঁচামাল, বাজারে উৎপাদিত দেশলাই-এর বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। শিল্পায়নে অবহেলিত ও উপেক্ষিত পুরুলিয়ায় দেশলাই শিল্পের বিকাশ হলে হাজারো বেকারের কর্মসংস্থান হবে। নিবন্ধীকৃত বেকারের বোঝা পুরুলিয়ার চেয়েও বাকুড়াই বেশি। সাঁওতালডিতে গড়ে

উঠেছে এশিয়ার বৃহত্তম ধার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট। বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে ছোট আকারে ইম্পার্টশিপ্প, পলিয়েস্টার শিপ্প, ম্পান-পাইপ শিপ্প, ইলেকট্রিক, ওয়েল-ডিং শিপ্প প্রভৃতি।

পুর্লিমিয়া রত্নগর্ভা। এবং সে জন্য এখানে রয়েছে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্যে জিওলজিক্যাল সার্ভের একটি স্ট্রাক্স অফিস। জেলার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে রয়েছে লৌহ কয়লা, তামা, চূণাপাথর, কোরাগাম, খাঁড়মাটি, কেওলিন, ফাইনাইট, ডলোমাইট, সোপস্টোন, অগ্নি, কোয়ার্টজাইট, বেলে-পাথর, স্লেট, সীসা প্রভৃতি। সম্প্রতি মাইনিং কর্পোরেশন কালদার মাহাতো গ্রামে উচ্চমানের ফস্ফোর-ক্রে'র সন্ধান দিয়েছেন। ওই সমস্ত অভাবিত সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা যায় শাখাগ্রামে সিমেন্ট শিপ্প, কাশীপুরে রেয়ন শিপ্প, বাঁকুড়াতে-সিটল কারখানা প্রভৃতি। এ ছাড়াও বলরামপুর ও কালদায় গালার কারখানা, রঘুনাথপুরে তসরের কাপড় প্রভৃতি শিপ্পগুলি সম্প্রসারিত হতে পারে। স্বাধীনতা উত্তর পুর্লিমিয়া ক্ষুদ্রশিপ্পের বিকাশের হার আশাতীত নয়। যদিও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে পুর্লিমিয়া শিপ্পপ্রসারে অপরিমিত সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচিত নিচের সারণী (ইকনমিক রিভিউ) থেকে পুর্লিমিয়া জেলার থানা-ভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন শিপ্পের হাসবৃদ্ধির মূল্যায়ন করা যাবে।

সারণী (১) : পুর্লিমিয়া জেলার নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিপ্পের সংখ্যাও—

সাল	শিপ্পসংখ্যার সংখ্যা	শিপ্পবিকাশের হাস (— বৃদ্ধি (+) পার্থক্য
১৯৭০-৭১	২৬	—
১৯৭১-৭২	১২৪	+৯৮
১৯৭২-৭৩	২০৬	+৮২
১৯৭৩-৭৪	২২২	+১৬
১৯৭৪-৭৫	১০২৭	+৮৫০
১৯৭৫-৭৬	২২৬	-৮৪৬
১৯৭৬-৭৭	৪৩৯	+২১৩
১৯৭৭-৭৮	৩৯৩	-৪৬
১৯৭৮-৭৯	৪০০	+৭
১৯৭৯-৮০	৫১৯	+১১৯

বহুতপক্ষে, গ্রামে কৃষি ও কুটীরশিপ্পের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। কিন্তু আধুনিক শিপ্পের দাপটে কুটীরশিপ্প ভেঙ্গে পড়ায় শুরু হয় গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়। সাদা কথায় সরকারী আর্থিক সহায়তায় কুটীরশিপ্পকে অনন্তকাল টাঁকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চাই কুটীরশিপ্পের যান্ত্রিক উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান বাজার, রাস্তাঘাট, মূলধন ও বিদ্যুৎযোগানের নিশ্চয়তা। এখানে বিরাট পশুপালন কেন্দ্র থাকায় ডেয়ারীশিপ্প বিকাশের অটেল সম্ভাবনা রয়েছে। মোদ্দাকথা, আঞ্চলিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে শিপ্পের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া দরকার। এছাড়াও শিপ্পগত স্বনির্ভরতা, দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যা, গ্রামীণ কারিগরদের ঐতিহ্যমণ্ডিত নৈপুণ্য ও দক্ষতাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। পুর্লিমিয়া-কোর্টশিলা রেল লাইনের পত্তনের ফলে রাঁচি হাজারিবাগ ও ধানবাদের সাথে যোগসূত্র গড়ে উঠলে খরাভূমি বাঁকুড়া ও বুদ্ধমাটির জেলা পুর্লিমিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রত্যেকটি জেলায় বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন সেকটরে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। এবং তারমধ্যে উল্লেখনীয়গুলি হলো : (১) ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে গমের মোট উৎপাদন ছিল ০.৪২ লক্ষ টন ; ১৯৭৭-৭৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৫০ লক্ষ টনে। (২) ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্যে ধানের মোট উৎপাদন ছিল ৪০ লক্ষ টন, ১৯৭৯-৮০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৭ লক্ষ টনে ; (৩) ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্যে চাষের মোট উৎপাদন ছিল ৮০৫ লক্ষ কেজি, ১৯৭৭-৭৮ সালে তা বেড়ে ১,১৭৭ লক্ষ কেজিতে দাঁড়ায় ; (৪) ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্যে মেষসাহ পাটের মোট উৎপাদন ছিল ১৫লক্ষ গাঁটে, (৫) ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্যে সকল প্রকার খাদ্য শস্যের মোট উৎপাদন ছিল ৪৪ লক্ষ টন, ১৯৭৯-৮০ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৯ লক্ষ টনে ; (৬) ১৯৫০-৫১ সালে গমের জমির পরিমাণ ছিল মোটে ৫০,৪০০ হেক্টর, ১৯৭৭-৭৮ সালে দশগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫.২ লক্ষ হেক্টরে ; (৭) ১৯৫১ সালে রাজ্যের উত্তোলিত খনিজ সম্পদের মূল্য ছিল ১৪ কোটি টাকা এবং তা ১৯৮০ সালে

বেড়ে ২৩৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায় (৮) ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ৫৪৬ মেগাওয়াট, ১৯৭৭-৭৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৭৪৩ মেগাওয়াট। ১৯৫১ সালে ৩৮৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়, ১৯৮৩ সালের জানুয়ারীর মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭,১৭৮টি গ্রামে, (৯) মাথাপিছু আয় বাড়তির দিকে ঝুঁকছে, (১০) গ্রামের আর্থিক, সামাজিক ভারসাম্য দরিরের দিকে যাচ্ছে। (১১) কৃষি জমিতে বহু ফসলার মাঝ দিয়ে চাষী পরিবারের জমির উপর চাপ ক্রমশ কমছে (১২) কৃষি-উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক শিল্পগুলিও গড়ে উঠেছে। (১৩) ১৯৭৭-৭৮ সালে কৃষিতে খরচের পরিমাণ ছিল ১০৩ কোটি টাকা, ১৯৮২-৮৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৯ কোটি টাকা, (১৪) ১৯৭৬-৭৭ সালে শিক্ষায় খরচ হয়েছিল ১১২ কোটি টাকা, ১৯৮৩—৮৪ সালে শিক্ষায় ৪১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে; (১৫) শিল্পে ১৯৭৭—৭৮ সালে বরাদ্দ ছিল ১০.৭৭ কোটি টাকা, ১৯৮২—৮৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৪৮ কোটি টাকায়; (১৬) ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট উন্নয়নমূলক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৭২-৮৫ কোটি টাকা, ১৯৮২-৮৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৬৩.৪৩ কোটি টাকা, (১৭) ১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব উৎসগুলি থেকে ৩১৭ কোটি টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হতো, ১৯৮৩—৮৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৩ কোটি টাকায়।

রাজ্যের ১৯৭১-৭৭ সালের (৬ বছর) মধ্যে যোজনা খাতে ২৬.৪ শতাংশ লেগেছিল, সেখানে ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে ফ্রন্টসরকার ৩২.২৫ শতাংশ যোজনাখাতে খরচ করেছে। অর্থাৎ ফ্রন্ট সরকারের আমলে যোজনা খাতে ব্যয় বেড়েছে প্রায় তিনগুণ (৬ঃ মিঃ, বসুমতী, ৪৩১ জানুয়ারী, ১৯৮৪)।

জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল পর্যটন। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় করারও পর্যটনের

আর একটি লক্ষ্য। এছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অযোধ্যাপাহাড় ও সাহেববাঁধকে নিয়ে পর্যটন শিল্প বিকাশের ভবিষ্যৎ বিরাট; যদি পর্যটন শিল্পকেন্দ্রগুলিকে দেশী বিদেশী টুরিস্টদের রুচি ও মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গড়ে তোলা যায়। সুপ্রতি রাজ্যসরকার এই অঞ্চলে পর্যটনশিল্প বিকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। বলাবাহুল্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন না হলে পর্যটনে নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনাও লক্ষ্য বার্থ হয়ে যাবে। এই প্রচেষ্টা সফল হলে হোটেল শিল্প, পরিবহন, হস্তশিল্প, কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, পোলট্রি, ডেরারী প্রভৃতি শিল্প সংস্থায় কর্ম-সম্ভান বৃদ্ধি পাবে। অযোধ্যাপাহাড়ের চারদিকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য অপরিসর। অযোধ্যাপাহাড়ের উচ্চতা ২,২২০ ফুট। হেঁটে উঠতে ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। পাহাড়ে ওঠার রাস্তা কাঁচা। এই পাহাড়ে দুটি জলপ্রপাত আছে। জলপ্রপাত দুটির নাম তুর্গা ও বামনী। নদীর নাম আলিডিহা। বামনীর কাছে আছে বনবিভাগের অবজারভেশন টাওয়ার। অযোধ্যাপাহাড়কে আবেষ্টন করে রয়েছে সেচ বিভাগের বাংলা, বাগমুণ্ডির ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, থানা, অনেকগুলি গ্রাম, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, রেষ্ট হাউস প্রভৃতি। পাহাড়ের ওপর রয়েছে নিসর্গ শোভায় সুসজ্জিত বনবিভাগের বাংলা। বাংলার বিদ্যুতের অভাবে রান্না ও আলো জ্বলে গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের কল্যাণে। সত্যি কথা বলতে কি, এখানের সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বার মাসে তের পার্বণ, রংবেরঙের জানা-অজানা পাখীদের ভেসে আশা কুঞ্জন, অভয়ারণ্যের বর্ণাঢ্য জীবজন্তুর রহস্যসুন্দর-রূপ এবং বিচিত্রবর্ণের ফুলের জলসা—যা সৌন্দর্যপিপাসু শৈল পর্যটকদের বারবার হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে পুরুলিয়ার অযোধ্যাপাহাড়ে।



কলকাতা টিল

অমিয়া ভট্টাচার্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৯)

দশটা বাজতেই সহসা অফিসে চলে গেছে। আজ ভারতীর কিছু কেনাকাটা আছে। শীত আসছে উল কিনতে হবে। পুষ্পিতা দেবী বলেছেন সামনে ফেটে, লেডিস ক্লাব থেকে ভাল ভাল সেলাই চাই। মিটিং এ উনি বিশেষ করে বলেছেন—ভারতীদি আপনি কিছু বাবাস্যুটি, টিকেজি, ট্রেক্স ও ন্যাপকিনের ভার নিন। খুব একটা খাটবেন না। মানানসই ছোট ছোট মটিফের ওপর দিগ্বে চাঙ্গিয়ে দিন। এমন কনট্রাস্ট কালার দিন যাতে চোখে পড়ে। এর জন্য দরকার মত বইও কিনে নিতে পারেন। অনেকের চাইতে ভারতী ফ্রী তাই ভার তাকে নিতেই হয়। কিছু উলসূতা, ক্রুশ, কাঁটা, কাপড় আনতে হবে। আচ্ছা চ্যাটিংটা করলে কেমন হয়? ভারতী গুনগুন করল। সহসার একটুও সময় নেই। ওর ওপর কোনরকম নির্ভর করা চলবেই না।

খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম সেরে ভারতী দুটো ইউটিলিটি ব্যাগ নিয়ে বেরলেন। সচরাচর ভারতী গড়িয়া হাটের দিকেই যান। তবে সময় আছে, আজ একটু লিগুসে স্ট্রিটের দিকেও যাবার ইচ্ছে। সহসা ফিরবে সন্ধ্যার পর। ট্রাফিক জ্যাম থাকলে অথবা মিছিল টিছিল বেরলে কখনো দেরীও হয়। যেদিন অফিসের পর অন্য কোথাও যান তা বলে যায়। বেশীর ভাগ শৈলর সঙ্গেই যায়। ফেরবার পথে শৈলও আসে। আজ সেরকম প্রোগ্রাম নেই।

গড়িয়াহাট ঘুরে ঘুরে ভারতী কিছু পছন্দমত কাপড় কিনলেন। তারপর চাই বোনা ও সেলাইর বই। এ-দোকান ও দোকান ঘুরে অনেকটা দেখেও তেমন পছন্দসই বই চোখে পড়ল না। দাম কি, বা-বা! সব পঁচিশ টাকার ওপর। তাই বাদি নিতে হয় তবে আর একটু দেখেই নেব, ভারতী ভাবলেন। শীত আসছে তাই রোদের তীব্রতা কমেছে। এসময় বেরতে খারাপ লাগে না—তবু বেশ টায়ার্ড লাগছে। একটু থেমে নিলে কেমন হয়? সামনের মিষ্টির দোকান-টায় গিয়ে ভারতী একটা টেবিলে বসলেন। ট্রে হাতে বয় সামনে দাঁড়াল। না—মা, চাট নয়। একটা সিঙারা আর দুটো

মিষ্টি, ভারতী অর্ডার দিলেন। ও লসিও আছে দেখছি, তবে এক গ্রাস লসি।

এক কোণে বসে খেতে খেতে ভারতীর কাণে ডাক এল—এই ভারতী। চমকে গেলেন। এখানে কে নাম ধরে ডাকে? পেছন ফিরেই দেখলেন কৃষ্ণা। ততক্ষণে কৃষ্ণা এগিয়ে এসে ভারতীর হাত ধরে বললেন, তুমি কোথেকে? আমিও এখানে ছেলের বিয়ের জন্য শাড়ী কিনতে এসেছি। এই জান, ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সবাই বলে গড়িয়াহাট মার্কেটে যাও। তাই এই ননদকে সঙ্গে নিয়ে এলুম। আজই প্রথম বোড়িয়েছি। মাঘের প্রথমই বিয়ে। তোমার বাড়ীতে ত যাবই। আজ তোমাকে পেয়ে কি যে ভাল লাগছে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করে কৃষ্ণা ননদের দিকে ফিরে বললেন, ফুলদি দেখ আমার বন্ধু ভারতী। একসঙ্গে কলেজে পড়েছি না? বলে ভারতীর সমর্থন চাইলেন। তারপর, ভারতীর হাত ধরে বললেন, চল ভাই একসঙ্গে শাড়ী পছন্দ করি। ভারতী ভাববার আর কোন অবকাশই পেলেন না।

চাকেশ্বরী বজ্রালয়ে গিয়ে ওরা পাঁচশো টাকার মধ্যে ময়ুরকণ্ঠী রঙের একটা বেনারসী পছন্দ করলেন। শাড়ী কেনা হল। ভারতী এবার কৃষ্ণার কাছে বিদায় চেয়ে বললেন, আবার দেখা হবে কৃষ্ণা, আমাকে একটু নিউ মার্কেটের দিকে যেতে হবে।

কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, তুমি একা কোথায় যাবে? আমিও ত শ্যামবাজারে যাব, চল এক সঙ্গেই যাই। আস্তে আস্তে ভারতী বললেন, আমি কিছু উল কিনব লেডিস ক্লাবের ফেট আছে। সেলাই করতে হবে।

বা-বা তুমি এখনো সেলাই কর! কৃষ্ণা বলল। আমি কিছুই করি না। খালি থাই আর শূই, তাতেই হাঁপিয়ে উঠছি। দেখছ ত কি মুটিয়েছি! ছেলের বিয়েটা হয়ে যাকনা, তারপর দেখো আমিও একটা লেডিস ক্লাবে জয়েন করব। কৃষ্ণার নন্দ বলল তাহলে নিজেই সেলাই করতে হবে। এতদিন ত আমাকে দিয়েই চালাচ্ছ। সবাই

ওরা একসঙ্গে হেসে উঠলেন। রাসবিহারী থেকে ওরা এসপ্লানেডগামী ট্রাম ধরলেন। কৃষ্ণা ভারতীকে বললেন, আচ্ছা, আমাদের ইয়ারের আর কারো সঙ্গে তোমার দেখা হয় না?

অনেকদিন আগে পূর্ণ সিনেমায় দূর থেকে সাইপের মহুয়াকে দেখেছিলুম। কোন কথা হয়নি। সবে সিনেমা ভেঙেছে, দূর থেকে চোখেচোখে দেখা। ভীষণ ভীড়। আমার সঙ্গে মেয়েছিল-ভারতী বললেন। কোথায় থাকে ঠিকানা টিকানা কিছুই জান না, না?—কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন। ভারতী মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, যে ভাবে দিন এগিয়ে চলেছে, তাতে যে তুমি আমার চিনতে পারছ, আবার যে আমরা পুরোন দিনের কথা বলছি সেটাই আশ্চর্য। এসপ্লানেডে এসে সবাই নামলেন। ভারতী লিগুসে স্ট্রীটের দিকে গেলেন আর কৃষ্ণারা শ্যাম বাজারের ট্রাম ধরলেন।

লিগুসে স্ট্রীটে কয়েকটা দোকান ঘুরে ভারতী তিরিশ টাকা দিয়ে একটা সেলাইর বই কিনলেন। একটু দাম বেশী নিলেও বইটাতে নিটিং এমব্রয়ডারী দুইই আছে, ডল-হাউসহোল্ড থিংস ইত্যাদি আছে। বইটা সব কাজেই লাগবে। তারপর মনে মনে গুনগুন করলেন, দেখা হয়ে গেল কৃষ্ণার সঙ্গে। ও নিশ্চয় ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে আসবে, আমাকেও কিছু দিতে হবে। যাক তখন ভাবা যাবে।

ভারতী বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অফিস টাইম সুতরাং দাঁড়াতে হবেই। খানিক পরে একটা মিনিবাস পাওয়া গেল। বাসে উঠে কিছু সময় দাঁড়াতে হল। হাতে আবার কয়েকটা ব্যাগ।

বিড়লা প্রানোটোরিয়াম ছাড়িয়ে বাসটাতে একটা বসবার সিট পাওয়া গেল। নিশ্চিত হয়ে হাতের ব্যাগগুলি নিয়ে ভারতী বসলেন। মিন্টোপার্ক পার হয়ে হঠাৎ বাসটা এমন আচমকা ব্রেক কষল যে পেছনের মহিলা বাচ্চাসমেত এসে ভারতীর ওপর পড়ে গেল। ব্যালাস সামলাতে না পেরে মহিলা ছেলেকোলে বাসের মধ্যেই পড়ে গেল, তার ওপরে পড়ে গেলেন ভারতী। ড্যাগাস্ কন্ডাক্টরটা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। নইলে আজ বাচ্চাকোলে অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে ভারতীও চাকার তলায় যেতেন।

আর এরপর বাচ্চার পরিগ্রাহি চিংকার, বাস শূদ্ধ লোকের হই, হই, বকাবকি। এদিকে যার জন্য গাড়ীতে ব্রেক কষেছিল, সেখান থেকে বাস অনেক এগিয়ে এসেছে, সে গাড়ীও হাওয়া। তবু চলল খানিকক্ষণ ড্রাইভার কনডাক্টরকে বকাবকি। সবাই তেড়ে যায় আর কি!

কম ভীড় ছিল বাসটাতে। ভারতী আবার সিটে বসলেন। দেখলেন জিনিষপত্রগুলি; মনে হয় ঠিকই আছে। বেশ সময় লাগবে হার্ট প্যালাপিটেশন কমতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হয়ত সহসা এসেছে, নয়ত এখুনি আসবে। রিক্সা পাওয়া গেল না। হেঁটেই ভারতী ফিরলেন। সুবল দোতলার বারান্দায় বসে ভারতী আর সহসার প্রতীক্ষায় রেলিং বাজিয়ে জোরে জোরে গাইছে 'বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম, দেখা পাইলাম না—বন্ধু'—।

ভারতীকে দেখতে পেয়েই সুবল গান বন্ধ করে দৌড়ে এসে দরজা খুলল। হাত থেকে ব্যাগগুলি নিয়ে সুবল বলল, ঠাকুমা স্টোভে কেটল বসিয়ে রেখেছি। গ্যাস আর বেশী নেই। স্টোভ জ্বলে দেই?

বিছানায় বসে পড়ে ক্লান্ত কণ্ঠে ভারতী বললেন, দে। সুবল ঠিক ধরতে পারল ঠাকুমার শরীরটা ভাল নেই। ভারতী ভাবছিলেন এই দুদিন হয়ত গ্যাসটা চলবে, তবু আগে থেকেই অর্ডার লিখে আসা হয়েছে। কবে আবার সাপ্লাই দেবে কে জানে? কারণ একবার শেষ হলে আর একবার পাবার আগে শুনতে হয়, 'ক্লাইসিস চলছে, নয় স্টাইক, না হয় স্টেপ্প'। এসব এখন গাসহা হয়ে গেছে। ভারতী সুবলকে বললেন—এই সুবল কেরোসিন রেখেছিস ত!

হ্যাঁ ঠাকুমা, পাঁচ লিটার রেখেছি—তুমি যা বলেছিলে তাই। কথা বলতে পেয়ে সুবল বেঁচে গেল। বলল, 'জান ঠাকুমা আজ কেরোসিনের গাড়ীটা গলিতে ঢুকে কেরোসিন—কেরোসিন-বলতেই আগে আমি কিনেছি। নিজের আনন্দে হেসে উঠল। 'আর কল্লাওলা দুদিন আগে যে একবস্তা গুল দিয়ে গেছে তা দিয়ে উনুন সাজিয়ে রেখেছি। ভারতী জানেন সুবল তার থেকেও এককাটি ওপরে যায়। অনেক চিন্তাকরে কাজ করে। কথা বলতে বলতে সুবল চা বিস্কুট নিয়ে হাজির। বলল, 'ঠাকুমা গ্যাসটা বন্ধ করে

দিয়েছি ওটা এখন থাক। পিসিমনি এলে স্টোভেই চা করে দেব। কাল সকালে উনুন জ্বালব সাজিয়ে রেখেছি।

চা খেয়ে ভারতী বললেন, 'সুবল একটু স্প্রেকর বস্তু মশা হয়েছে। আমি ব্যালকনিতে বসছি। পিসিমনি আসবার আগে ও ঘরটাতেও করবি।' সুবল কাজ পেলে খুব খুসী। নাচতে নাচতে স্প্রেকরতে চলে গেল। ভারতী ব্যালকনির ইঁজিচেয়ারে বসলেন।

সহসা আচ্ছ একাই ফিরে এল। মিছিল জ্যামজট এসবের জন্য দেরী হল। তখনো সুবল স্প্রেকর করে। পিসিমনির সাড়া পেয়েই সে স্প্রেকর রেখে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। ওকে এসব বলতে হয় না। কার সঙ্গে কিভাবে, কোন মেজাজে কাজ করতে হবে তা সুবলের মুখস্থ।

সুবলের কাজকর্ম সহসার জানা আছে। তবু ওকে তাড়া লাগাল, 'দশমিনিট টাইম দিচ্ছি, এর মধ্যে সব রোডি চাই।' 'এক্ষুনি দিচ্ছি পিসিমনি, এক্ষুনি দিচ্ছি', বলে দরজা বন্ধ করে সুবল রান্না ঘরে দৌড়ল। সহসা ব্যাগ আর ছাতা টেবিলে রেখে বাথরুমে ঢুকল। চা খাবার খেয়ে সহসা মার কেনা বই আর জিনিষগুলি দেখতে দেখতে মার মুখে শুনল আজ কি বিপদ হয়েছিল বাসের মধ্যে। রান্না-ঘাটের কথা ভেবে দুজনেই চিন্তিত। কিন্তু বেরতে যে হবে সকলকেই। সুবল দূর থেকে শুনে মাথা নাড়ল।

বই দেখে পছন্দ করতে হবে কোন সেলাইগুলি অল্প পরিগ্রমে সার্থক হবে। যদিও পুষ্পিতাদেবী ভারতীর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন, তবু তাকে একবার দেখিয়ে নিতে চান ভারতী। হপ্পা দুয়েক তাঁকে বেশ খাটতে হবে। সহসা বেশ কালার কম্বিনেশন বুঝতে পারে। কাপড় টুকরো করা, কার্বন প্রেসকরা এসবতেই সময় লাগবে। সহসা কিছুটা বিশ্রামের পর কার্বন প্রেস করতে লেগে গেল।

(১০)

কাল ডালি শৈলর সঙ্গে সহসাদের বাড়ী গেছিল। উদ্দেশ্য ওর পরিচিত হওয়া। কিছুদিন ধরেই শৈলর বিয়ের কথা চলছে। তাই শৈল ডালিকে সব খুলে বলেছে। শৈলর চাকরী পার্মানেন্ট হয়ে গেছে। মহীয়ান এ বছরই ইণ্ডিয়াতে পোস্টেড হয়ে আসছে। হয়ত ওকে বোম্বেতে

থাকতে হবে। এতে পরিবারের কারোই আপত্তি নেই-ই বরং খুসী। বিস্তানরা গল্ফগ্রীনে চলে যাবে। পুলকরা আগেই কোয়ার্টার পেয়ে গেছে। এখন শৈলর বিয়েটা হলে সবাই সুখী হয়। যে যার যাগগায় এত দিনের আস্থানা ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু যাবার আগে ওরা এবাড়ীতেই বিয়ে পর্বটা সারতে চায়।

এদিকে ভারতীদেবী অনেক আগে থেকেই মনকে তৈরী করেছিলেন সময়ের অপেক্ষায়। সহসাই একদিন শৈলকে বুঝি দিল যাতে ওদের দু পরিবারে পরিচয় হয়। এই উপলক্ষ্য করে ডালি বেড়াতে এল। ভারতীদেবীর হাতে শুভ মূহুর্ত এসে ধরা দিল। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। আদর যত্ন করে কথাবার্তায় মনের কথা বলে ও শুনে নিলেন। সহসাই ভারতীদেবীর একমাত্র মেয়ে—আর কেউ নেই। কিন্তু তাই বলে শৈল ঘর জামাই হয়ে আসুক তাও তিনি চান না। ভারতীদেবীর অবর্তমানে সহসারই সব। তবু সামাজিক কাজকর্ম ও কথাবার্তা বলার জন্য পরিবারের পরিচয় ও আদান প্রদান লাগে।

ডালিরা বাড়ীতে সবাই একমত তাই পরিচিত হতে এসেছে। ও বলল ওদের মেজমতই মহীয়ান ইণ্ডিয়াতে পোস্টেড হয়ে এবছরই আসছে। সে এলেই শৈলর বিয়ের দিন ওরা ধার্য করতে চায়। কিছুদিন ধরেই ওরা শৈলর মুখে সহসা ও ভারতীদেবীর কথা শুনেছে। মুখে শুনেই বাড়ীর সবাই খুব আগ্রহী এখন ভারতীর ইচ্ছে জানবার আশায় শৈলর সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। ওরা সিঁথিতে কোয়ার্টার পেয়েছে, দাদারা গল্ফগ্রীনে ফ্ল্যাট কিনেছেন। মেজদা বোম্বে থাকবেন। এত আনন্দের মধ্যেও দীর্ঘদিনের এই পুরোনবাড়ী ও সংসার ছেড়ে যেতে মনে কেমন কষ্ট হচ্ছে। এজন্য সবাই চাইছে এ বাড়ীতে বিয়েটা হয়ে যাক।

আজকাল আগের মত দিন নয়। ভারতীদেবীও মনোভাব স্পষ্ট করে বললেন। শৈল যে নিজের ফ্ল্যাট বেলেঘাটার পেয়েছে 'ওন ইওর ওন ফ্ল্যাট স্কীম' সেখানে যেন সব ব্যবস্থা ঠিক করে ও পজেশন নিয়ে রাখে। শৈল একটু আগেই ঠিক করে ফেলেছে নইলে সন্টলেকের দিকটাতে গেলেই ভাল হত। সবাই বলে ওদিকটাই নাকি

সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন। পশ এরিয়া। সরকারের নতুন সব স্কীম ওঁদিকেই হচ্ছে। এত যাগয়া আর কোথায়? নিউ আলিপুর তাঁলিয়ে গেছে কবে।

অনেকক্ষণ বসে গম্প করে ডালি খেয়েদেয়ে খুব খুসীমনে শৈলর সঙ্গে ফিরে গেল। বলে গেল, 'শীগগীরই বিস্তবানও আঁপতা আসবে দরকারী কথা বলতে ও শুনতে। ভারতী বললেন, আমি চিরকাল একা ছিলাম এখনো থাকব-যেকদিন বেঁচে আছি। এরপর সহসা আর শৈলরই সব থাকবে।

ডালি আর শৈল চলে যাবার পর ভারতীর মনে হল বুকের ওপর থেকে মস্ত এক চাপ নেমে গেল। এইবার ভারতী ভাবলো প্রথমেই মধ্যম গ্রামে মামার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আর ত নিজের কেউ নেই। সহসার বাবার দিকের কেউ কখনো খোঁজ নেয় না। মামার সঙ্গে কথা বলে অগসর হবে। তারপরই মনে হল, পাশের বাড়ীর পরামর্শ ও মত দরকার, কারণ এঁরাই তাঁর পরমাশ্রয়। জীবনে এতবড় একটা কাজের আগে চন্দ্ৰিমা পুষ্পিতা ভবানীকান্ত ও যামিনীকান্তর মত নিতে হবে। কারণ সবদিক দিয়ে ভাল মনে হলেও বিবাহব্যাপারে অনেক বোঝাপড়ার থাকে যা মেয়েদের সহজবুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। আবার ভাবলেন, ঈশ্বর না করুন, হয়ত সবই ভাল। তবু তাঁকে নিয়মমাত্তিক কাজ করতে হবে। এতে কোন চুটি না থাকে। সহসা ও সুবলকে খেয়ে নিতে বলে, ভারতীদেবী রাতেই লাইফটী বাড়ীতে চলে।

এত রাতে ভারতীদেবী এবাড়ীতে বড় একটা দরকার না থাকলে আসেন না। চন্দ্ৰিমাদেবী ঘরে বসে বুনিছিলেন। ভারতীকে দেখে বুঝলেন কিছু দরকার আছে। পাশে বসতে বললেন। ভারতী আদ্যপাস্ত খুলে বললেন। তারপর নিজের মনোভাবও বললেন। চন্দ্ৰিমা মনযোগ দিয়ে শুনে বললেন, মনে হচ্ছে ছেলোটিকে আমি তোমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছি। দেখতে ত বেশ। আচ্ছা দাঁড়াও, বলে ভবানীকান্তকে লাইব্রেরী থেকে ডেকে আনলেন। ভবানীকান্ত সবটা শুনলেন। শুনে বললে, খুব ভাল কথা। কন্যা সম্প্রদান করবে বৈকি! তবে রেজিস্ট্রিটা করিয়ে নিতে ভুলবে না। আমি শুনলুম। এবার তুমি তোমার মামার সঙ্গে দেখা কর। বংশ গোত্র সব দরকার হবে। সম্বন্ধকরে

বিয়ে, ঠিকুজীকুঠী লাগবে। মামাকে দু একদিনের জন্য বাড়ীতে নিয়ে এস। তারপর পাশপক্ষকে খবর দাও, কথাবার্তা পরিচয় করিয়ে দাও। আশাকরি সব মঙ্গলময়ের কুপায় সব ঠিক হবে।

অনেক রাতে যখন ভারতী বাড়ীতে ফিরলেন তখন সহসা গভীর ঘুমে। সুবল দরজা খুলে দিল। ভারতী দরজা ভালকরে বন্ধ করলেন। পেট ভরাই ছিল। তবু দুটো সন্দেশ আর এক গ্লাস জল খেয়ে অন্যমনস্কের মত এসে বিছানা আশ্রয় করলেন। এখন তাঁর অনেক কাজ, একাই সব সামলাতে হবে।

(১১)

পাশা স্কুল থেকে ফিরে যথারীতি দুষ্কর্মি লাফাকাঁপি করছে। ডালিদের বাড়ীতেও অফিস যাওয়া পর্ব শেষ হয়েছে। চিক্কার চান খাওয়া শেষ এবার সে ঘুমিয়েছে। বামুনদিকে বাকী রান্নাটা দেখিয়ে ডালি এবার তিথিদের বাড়ীতে যাবে। বাবা-সুটের মোজাজোড়া এখনো বাকী আছে। আজ গোড়ালি ধরবে। শীত শেষ হয়ে গরম পড়তে আরম্ভ করছে। দোলও কেটে গেছে। সোঁদিনকার ঐ মারামারি আর দাঙ্গার পর ডালি আর বের হয়নি। পিপলী সকালের কাজ করে চলে গেছে। সে আবার দুপুরে আসবে। এ বাড়ীতে যে ভাঙন আসছে, ভাই ভাই নিজের নিজের যাগয়ায় চলে যাবে, তা সবই বামুনদি আর পিপলী শুনছে। ওদের মন ভাল নয়। বামুনদি বোধহয় বিস্তবানদের সঙ্গে যাবে। তার আর আছেইবা কে? ঐ নামেই শশীর মা। কোনকালে কেউ তার ছেলেকে দেখেনি। এই বয়সে আর যাবেই বা কোথায়। সঙ্গে থাকলে বিস্তবানরা বেঁচেও যায়। কিন্তু পিপলী ওদের সঙ্গে যেতে রাজী নয়। ঠিকে মানুষ বাঁধাধরা কাজ পছন্দ করে না। তবে ডালিকে খুব ভালবাসে। ওর সঙ্গে হয়ত কিছু দিনের জন্য যেতে পারে। ডালিরও প্রথমটাতে দরকার হবে।

বামুনদিকে বলে, বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে ডালি তিথিদের বাড়ীতে এল। কতর তখন পুছো সারা, জলখাবার খাচ্ছেন। মাসীমা রান্নার জোগাড় করছেন। প্রায় একমাস পর ডালিকে দেখে মাসীমা খুব খুসী। কিন্তু অভিমান তার

কথায় ঝরে পড়ল, বললেন, 'অনেকদিন পর এলে, বাইরে ত সবাই আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কাছের তীর্থ আর হয়না।' আসল কথা মাসীমা কথা বলার কোন সঙ্গী পান না। ডালিই তার কাছে আসা যাওয়া করে। তাই মাসীমা ডালির অনুপস্থিতিটা খুব অনুভব করেন। ডালি বলল, 'সত্যি মাসীমা সেই গোলমালের পর আর আসিনি। বাড়ীতেও নানা ব্যবস্থা হচ্ছে। জানেন ত 'মেজদা' হয়ত এবছরই আসছেন, তবে কলকাতায় নয়, বোম্বেতে। তাছাড়া এবাড়ী ছেড়ে যে যার যাকগায় চলে যাচ্ছে। এর আগে অবশ্য শৈলদার বিয়ে হবে। বিয়েটা ওরাই পছন্দ করেছে। তবে সম্বন্ধ করেই শেষমেস হবে। মেয়ের মার বাড়ী আছে। শৈলদার খুব ভাগ্যা, বলে হেসে উঠল। মাসীমা খুব উৎসাহিত হলেন, বললেন, 'বিয়েটা দেখব তবে।' আবার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলে সবাই যাবে রে মা। এই দাঙ্গা দেখেই আমরা এখন ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর ঢোকাচ্ছি। এবাড়ী তৈরীর আগে কোথায় আমরা ছিলাম জানত, সেই জেলেটোলার গলিতে। সারাটা জীবনই ত সেই গলিতে কেটেছে। সেখানে ঘরে রোদ ঢোকে না। রোদের জন্য রাস্তায় যেতে হয়। এখন এই-বুড়ো বয়সে এখানে এসে একটু হাত পা ছড়িয়েছি। এখন আবার তোমাদের যাবার সময় হল। দাঙ্গা ত দাঙ্গা আমরা ছিলাম যুদ্ধের সময় সেখানে। এখন হরদমই আলো নিভছে পাখা বন্ধ হচ্ছে। এর নাম নাকি লোডশেডিং। সেই যুদ্ধের সময় হত র্যাক আউট। সে আবার আর একরকম।'

মাসীমা ডালিকে পেলে তার জ্ঞান গম্পের খুঁড়ি খানিক নামিয়ে শান্তি পান। কথা বলতে বলতে বলেন নাও দেখি তোমার মোজার গোড়ালি তুলতে তুলতে বলি। এর মাঝেই হঠাৎ মাথা ফিরিয়ে বলেন, 'বুলি কোথায় গেলি—ওঃ কি দাদু আজ ঘুমিয়েছে।' কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে স্নেহ ঝরে পড়ল—'যা—যা শুনিয়ে দে। এদিকে তোমার মেসমশাই আবার একসময় ছিলেন বিপ্লবীদলে। তাঁকে নিয়ে গেল ঘরে। দেশের সব নেতারা তখন বন্দী। যুদ্ধ থামল, দাঙ্গা রাহাজানি থামল। হল ভারত স্বাধীন। তাঁরও কতদিন পর তোমার মেসমশাই পেলেন ছাড়া। তারপর কত লেখাটেলিপি, কত দরখাস্ত, কত দেখাশোনার পর এই সরকারের

স্বাধীনতা সংগ্রামী বৃত্তি। ততদিনে কত কষ্টে শমি উঠে দাড়িয়েছে। বৃত্তির টাকা পেয়েই জমি কিনে এখানে আসা। নইলে ঐ গলিতে একখানা ঘরে জীবন কেটেছে। দুপুর বেলা ন্যাড়াছাদে এক চিলতে রোদ আসত।

কি দিন আমাদের তখন গেছে। ঐ শমি তখন ইস্কুলে পড়ে। যুদ্ধ ছড়াচ্ছে তার বিবাক্ত ঘা। কলকাতার অনেক বাড়ীর সামনে ঝুলছে TO LET বোর্ড। কতবাড়ী খালি পড়ে আছে। লোকসব গ্রামের আশে পাশে চলে গেছে জাপানী বোমার ভয়ে। শহর সব বিপন্ন। কারণ মিলিটারী আর বোমা। রাস্তায়, দোকানে, বাড়ীর ভেতর, সব লাইটের মুখে ঠুলি। সব কাঁচের শার্সির গায় ফালি ফালি কাগজ কাপড়। যাতে বোমা পরলে ভাইব্রেনসনে কাঁচ ফেটে ছড়িয়ে না অনর্থ ঘটায়। খবরের কাগজে আর হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে শেখাচ্ছে বোমা পরার আগে, পরে কি কি প্রকোশন নিতে হয়। সব বাড়ীর ভেতর একটা ঘর পরিষ্কার করে রাখা হত সাইরেন বাজলে ওখানে গিয়ে ঢুকতে হবে, অলক্লীয়ার না বাজাপর্শস্ত। সারা কলকাতা জুড়ে সেকি অজানা ভয়ের আতঙ্ক। পার্ক রাস্তা ফুটপাথ জুড়ে ট্রেণ। বোমা পড়ার সঙ্কেত পেলে ওখানে ঢুকতে হবে। আবার কি কাণ্ড ওখানে বৃত্তির জল জমে কি মশা? তাই কলকাতা ম্যালেরিয়ার ছেয়ে গেল, চোর ডাকাত বেড়ে গেল। কেউ আর সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরয় না। তাই ত বলছি তখন থেকেই 'এসব দেখে দেখে আসছি।

ডালি চোখ বড় বড় করে মাসীমার কথা শুনছিল আর ভাবছিল মাসীমা কত কথা জানেন। মাসীমা তখনো বলে চলেছেন, 'সে একদিন গেছে কি বলব তোমায়। যা হয় সব এমার্জেন্সি। সে সময় কজন মেয়ে রাস্তায় বেরত বল? যুদ্ধ লাগলেই না অভাব বাড়ল, চাকরী বাড়ল। মেয়েরা চাকরীতে ঢুকল। যুদ্ধের তখন এক একদিন এক এক রকম খবর রেডিওতেও। রেডিওতে খবর বলে, এই যেমন এখন টি ভি দেখছে সবাই। তখন কিন্তু অনেক ঘরেই রেডিও ছিল না। ছেলেরা রাইরে থেকে খবর শুনে আসত। কোন জিনিষ পাওয়া যেত না। সবাই বলে সব জিনিষ যুদ্ধে গেছে। তাই তখন আরম্ভ হল র‍্যাশন। সবাই বলত

শ্রী অরবিন্দ-লিপিমালা

অনুবাদক : শ্রীমুখীর গুপ্ত

দেশবন্ধু চিন্তনদ্বন্দ্ব দাশের নিকট অরবিন্দের পত্র

আর্থ কার্যালয়

পাণ্ডুচেরী

১৮ই নভেম্বর ১৯২২

প্রিয় চিত্ত,

আমার মনে হয় কাহাকেও পত্র লিখিবার পরে, বহু কাল—প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল। আমি এত অধিক পরিমাণে নির্জনবাসী ও আমার সাধনার মধ্যে নিমগ্ন যে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ সর্বাধিক স্বল্পতায় পৌঁছুছাই-
গিয়াছে। এখন যখন আমি বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, দেখিলাম যে পরিস্থিতিই তোমাকে সর্ব-প্রথম চিঠি লিখিতে প্রণোদিত করিয়াছে—পরিস্থিতি এইজন্যই বলিলাম যে; এত কালের অপব্যবহারের পরে লেখনী ধারণের আয়োজন হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘ সময়ের আভ্যন্তরিক নিভৃত-বাসের পরে প্রথম যে বাহিরের কার্য গ্রহণ করিতেছি, আয়োজন তদ-
বিষয়ে। বারীন বাংলায় গিয়াছে ও এই ব্যাপারে তোমার সহিত দেখা করিবে কিন্তু আমার দিক হইতে সম্ভবতঃ সামান্য ভনিতার আবশ্যকতা রহিয়াছে, সুতরাং বারীনের মাধ্যমে আমি এই চিঠি তোমাকে পাঠাইতেছি। আমি আমার স্বাক্ষরিত একখানা অনুমোদন-লিপিও পাঠাইতেছি, উহা হইতে যে কারণে তাহাকে অর্থ-সংগ্রহের জন্য পাঠাই-
তেছি, উহার সাম্প্রতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা করিতে

পারিবে। কিন্তু বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিবার জন্য আরও বক্তব্য যোগ করা যাইতে পারে।

জীবন ও কর্ম-বিষয়ক ধারণা ও মনোভাব আমাকে বর্তমানে যে অবস্থায় আনিয়াছে, মনে হয় উহা তুমি জান। কর্ম ও জীবনের আসল ভিত্তি আধ্যাত্মিক অর্থাৎ কেবলমাত্র যোগাভ্যাসের দ্বারাই এই নূতন চেতনা বীজিত করিতে হইবে—
এই ধারণা আমি সর্বদাই পোষণ করিতাম তবে পূর্বে এই উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট ও কম প্রাণবন্ত ছিল; কিন্তু বর্তমানে ক্রমশঃই উহা আমার নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে ও এই বিষয়ে এখন আমি সুনিশ্চিত হইয়াছি। আমি ক্রমেই অধিকতর সুস্পষ্টভাবে দেখিতেছি যে নূতন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিফল ব্তানুসরণের অবশ্যম্ভাবী গতি-বর্ষের বাহিরে আগমন মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে বিশ্বের জন্য এই মহান বিজয় লাভই ভারতের সম্পূর্ণ বিশেষ কার্য। কিন্তু এই মহত্তর চেতনার প্রাণবন্ত শক্তির মূল প্রকৃতি কি? ইহার ফলদায়ক সত্যের শর্ত কি? ইহাকে কোন্ভাবে আয়ত্ত করা যায়, সংগ্রহ করা যায়, সংগঠিত করা যায়, জীবনের উপরে প্রয়োগ করা যায়? কী প্রকারে আমাদের

কল্টোজ। প্রথম কিন্তু বেশ ভাল ভাল জিনিষ দিত।
আবার কল্টোজের কাপড় হল, তার নাম স্ট্যাণ্ডার্ড ক্রপ।

তাই-না বলছি কত কিছুই দেখলুম। আবার এখনও দেখছি। নীরব শ্রোতা পেয়ে মাসীমা আপন মনে বলেই
চলেছেন। ডালিও থ হয়ে শুনছিল। গল্প করতে করতেই কিন্তু মাসীমা মোজার গোড়ালিটা ঠিক তুলে
দিলেন। আজ কোন অসুবিধে হয়নি কারণ পাশা ঘুমিয়েছে। আবার মোজার টো দেখাতে আসবে বলে ডালি
বাড়ী ফিরল।

ডালি চিন্তার দুখ তৈরী করে বোতলে রেখে গিয়েছিল
যদি উঠে পড়ে তবে যেন বামুনদি ফাঁড়টা দিয়ে দেয়।
ফিরে দেখে চিন্তা লক্ষ্মী মেয়ের মত সবটা দুখ খেয়ে নিয়ে
বামুনদির সঙ্গে পুতুল খেলনা সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছে।

এতক্ষণ পর মাকে পেয়ে চিন্তার খুসী আর ধরে না—
খেলনা ফেলে মার কোলে চড়ে বসল। ডালি চান
সেয়েই গেল। বামুনদিকে বলল, এখানেই আমার
খাবারটা নিয়ে এস।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আধুনিক যন্ত্রাদি, বুদ্ধি, মন, জীবন, দেহ এই বিরাট বৃপাস্তরের প্রকৃত ও যথাযথ চালনা-পথের উপযোগী করা যাইবে? আমার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা এই সমস্যারই সমাধানের চেষ্টা করিতেছি এবং এখন ইহার একটি স্থায়ী ভিত্তি, এই বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান ও এই রহস্য উন্মোচনের কিছু শক্তি লাভ করিয়াছি। এখনও ইহার পূর্ণতা ও অখণ্ড আত্মাধীন উপস্থিতি লক্ষ্য হয় নাই সেইজন্যই এখনও আমাকে অজ্ঞাত-বাসে থাকিতে হইবে। যতদিন না এই নূতন কর্ম-ক্ষমতা প্রাপ্ত হই, ততদিন আমি বাহিরের ক্ষেত্রে কার্য না করিতে—পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি ব্যতীত গঠনে হস্তক্ষেপ না করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু একটি কার্য পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিতে হইতেছে—এই সাধনা গ্রহণ করিবার জন্য অন্যান্যকে শিক্ষা-প্রদান এবং ঘেঁষপ করিতাম তদনুরূপভাবে তাহাদিগকে সংগঠিত-করণ,—কারণ ইহা ব্যতীত আমার ভাবিয়া কার্য আরম্ভই করা যাইবে না। অনেকে এখানে আসিতে ইচ্ছুক এবং তাহাদিগকে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি গ্রহণ করিতে পারি, আরও অধিক সংখ্যককে দূরে রাখিয়াই শিক্ষা দান করা যাইতে পারে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না পাইলে এখানে একটি ও বাহিরে একটি দুইটি শিক্ষা-কেন্দ্র চালাইয়া যাইতে আমি সক্ষম নহি। সুতরাং এখন যে সঙ্গতি আছে তদপেক্ষা অনেক বেশী সঙ্গতির আমার প্রয়োজন। আমি মনে করিতেছি যে তোমার সুপারিশের ও প্রভাবের দ্বারা আমার জন্য অর্থ সংগ্রহে তুমি বারীকে সাহায্য করিতে পার। তুমি আমার জন্য ইহা করিবে, উহা আমি আশা করিতে পারি কি?

উদ্দেশ্য বুঝিতে ভুল হওয়া সম্ভব ভাবিয়া একটি কথা লিখিতেছি। বহুকাল পূর্বে চন্দ্রনগরের মতিলাল রায়কে এই ভাব-ধারা ও কয়েকটি মূল নীতি এবং নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের ও শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়া-ছিলাম এবং আমার আধ্যাত্মিক শক্তির সহায়তায় সে তাহার সমস্ত উহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এখন আমি যে বিষয়ে লিখিতেছি, উহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার—আমার নিজের কর্ম আমিই করিব, আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অন্য কেহই উহা করিতে সক্ষম নহে।

তোমার রাজনৈতিক কার্যাবলীকে—বিশেষভাবে অসহ-যোগ আন্দোলনকে অধিকতর নমনীয় ও ব্যবহারিক ফলদায়ক ভিন্ন-গতি-প্রদানের বর্তমান প্রচেষ্টাকে আমি আগ্রহের সহিত অনুধাবন করিয়া চলিয়াছি। এইরূপ প্রতি-শক্তির বিরুদ্ধে তুমি কৃতকার্য হইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তোমার এই প্রয়াসে সফল হও, ইহাই আমার বাসনা। তোমার স্বরাজের ব্যাখ্যান সম্বন্ধে আমি সর্বাধিক আগ্রহশীল; কারণ প্রকৃত ভারতীয় স্বরাজের গঠন বিষয়ে আমি আমার নিজের ধারণার বিকাশ-সাধন করিতেছি এবং এই বিষয়ে তোমার ধারণার সহিত কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, উহা দেখিতে উৎসুক থাকিব।

তোমার
অরবিন্দ

সম্পাদক : শ্রীচুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রিন্ট করা কৰ্ত্তব্য পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটোন লিমিটেড, ৫২৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রিন্টিং করা কৰ্ত্তব্য প্রাপ্ত।

પ્રવચન

પ્રવચન - સ્વામીજી
૫૭૭૭ મહાર

સ્વામીજી
પ્રવચન
સ્વામીજી
પ્રવચન
સ્વામીજી
પ્રવચન

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজ, সজ্জগুরু মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনার উজ্জল এই গীতাভাষ্য নুতন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বহুর মধ্যে সজ্জগুরু মতিলালের জীবনভিত্তিক লীলাবাদী শারীরিক সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, যোগ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নুতন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাভ।

মনোবী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর সুচিন্তিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিখিল ভারতশাস্ত্রের নির্বচন স্বরূপ দ্রুতং ভূমিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

সূচীপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশান্তি	সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল	৩৫
সাধন-কণা	সংকলন	সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল	৩৬
গীতায় নাট্যিকতা	প্রবন্ধ	অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর	৩৭
রামেশ্বরম	ভ্রমণ	শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়	৪২
নিবেদিতাকে	কবিতা	ইলা সিংহ	৪৪
শরৎ চেতনায় প্রমিত আন্দোলন	প্রবন্ধ	ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার	৪৫
আমাদের নজরুল	কবিতা	আরাধনা গুপ্ত	৪৮
বহু পুরাতন একটি রোগ	স্বাস্থ্য	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর	৪৯
ভুল ঠিকানায়	গল্প	রিত্তা মুখোপাধ্যায়	৫২
মন কুসুম	বড় গল্প	শ্রীঅমর কর	৫৪
চিঠিপত্র	...	...	৫৮
সংঘ সংবাদ	...	আশ্রমী	৫৯

প্রবর্তকের নিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি বাংলা মাসের ১/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পর সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে শোঁজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একখানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আকস্মিক রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই, সম্পাদকের নহে।

প্রবর্তকাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য পড়ে তোলার প্রতী

ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

জরিফ অফিস : ৭ রোড কলকাতা, কলিকাতা : ৭০০-০০৬

কোরম্যান : জে এম বিহার





বর্ষ ৬৯তম : ২য় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ : মে-জুন ১৯৮৪

জীবনের আলো

মানুষ তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। এই ধারণাকে দৃঢ় করে তোলার তপস্যা তোমায় গ্রহণ করতে হবে। সে তপস্যা আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প। যে-তুমি বাসনার কুজ্বাটিকায় অস্পষ্ট, কুহেলিকাময়, তাকে সত্যের আলোয় তুলে ধর। আপনার তপোময় মূর্তিকে ফুটিয়ে তোল। যে-কোন শ্রতীকে আত্মস্বরূপের আরোপ করে আপনাকে ফুরিয়ে ফেল। দিয়ে দিয়েই আবর্জনা গ্লানি দূর হবে। যে-সত্যে তোমার নিত্য প্রতিষ্ঠা, সে-সত্য অনন্ত দানেও নিঃশেষ হয় না। সে যে অশেষ অমৃতময়। তার কি মরণ আছে! দেওয়ার খেলায় আপনাকে পাওয়া যায়। নির্ভীক যে, আত্মবিশ্বাসী যে, সে-ই দিতে পারে। ক্ষুদ্রতার মোহে যে আচ্ছন্ন, সে বড় কৃপণ। দিতে তার কুষ্ঠা। মরণদণ্ড বার বার তার মাথা ভেঙ্গে দেয়। তুমি মরণঞ্জয়ী অমৃতের পুত্র, দিব্যজীবনের অধিকারী। তুমি ওঠ, ধর্মের বাঁধন টুটিয়ে। উৎসর্গের হোমানলে আপনাকে আহুতি দাও। এই অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে কোটী সূর্য সমুজ্জ্বল সত্য-স্বরূপের ছোঁয়া পাবে।

ভারতের তপস্যা মনের শাস্তিতে, ভূখণ্ডে শেষ করলে চলবে না। আত্মাকে ফলিয়ে তোলা চাই। সাধনাকে রূপ দিতে গিয়ে অনন্তের লীলাকে খণ্ডিত সন্ধীর্ণ করে ফেলা—ভ্রান্তি। আত্মাকে বিনিয়োগে অটুট সম্বন্ধের বাঁধনে দিব্যস্থিতির রচনা করতে হবে। সে হবে উদার ব্রহ্ম। সেখানে কারু অন্তরাত্মা কুঠায় নত হবে না, কারু স্বীকৃতিকাতরে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ভারতের সর্বজাতি সে সাধনা, সে শিক্ষা সব দিয়ে গ্রহণ করবে। ভারতের ঋষিকে তারই দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।*

—সঙ্কটগুরু শ্রীমতিলাল

সাধন-কণা

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

বাণীর অনুসরণে সর্বৈশ্বর্যর আকুল হয়, তন্মুখী হয়। একনিষ্ঠ মন পশ্চিমস্তরের অভিসারে প্রেমের পথেই যাত্রী হয়। মন মজ্জিলেই ত অর্ধেক কাজ হাঁসিল—যোগে যখন মনের পঞ্চোপচার পূজা নিবেদিত হয়, তখন প্রাণ আর আত্মকামের খোরাক পায় না। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা উপরে লীন হয় বলিয়া, এই অবস্থায় অনেক বাহ্য ভুল হয়। তাহাতে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। ততস্থ সাধককে যোগমায়াই সর্বাবস্থায় রক্ষা করিয়া চলেন। তিনিই সকল সম্বন্ধে যোগ ও যোগী উভয়কে পরিচালন করেন। প্রকৃত যোগীর জীবনে কখনও স্থায়ী প্রত্যবায় দোষ ঘটে না। তবে যতদিন যোগ সিদ্ধ না হয়, ততদিন সম্যক অনর্থ-নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায়, যোগ শক্তিকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভরতাই একমাত্র উপায়। আপদে, ঝগড়াতে, আদি-ব্যাধি-উৎপাতেও যোগীর অন্তর্নিহিত আস্থা, শ্রদ্ধা, তপস, নিষ্ঠা যেন দিন দিন আরও উজ্জ্বল, ঘনিষ্ঠ, অটল হয়।

* * *

অটলের মূর্তি যেমন গুরু, তেমনি তাঁর বাণীই ইস্ট-প্রেরণা। Will-ই বাণী। শব্দ মূর্ত প্রতীক—আজ্ঞাচক্রোপিত ইচ্ছা মহাশক্তিময়ী। এই বিদ্যুৎ-বীৰ্যবৃষ্টিপণী কালীর দেহাধারে অবতরণ করা মাত্র যোগ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ যোগ—তাই এ যুগের সাধনা symbol লইয়া। Symbol-এ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ইহাকেই প্রেমাচারে, স্বরূপে আরোপ বলে। রতি যখন বাণীর আনুগত্যে প্রাণ পূর্বস্তু অধিকার করিতে উদ্যত হয়, প্রাণে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিক্ষোভ প্রাণশুদ্ধিরই কারণ। মনের ন্যায় প্রাণের শোধনেও সাধককে দধুর মত নাশ্তানাবুদ হইতে হয়। ইহার পরই ত রূপান্তর বা নবজন্ম।

* * *

ভাবের উৎসর্গে অটল সত্যের পরশ পাই। তাহা

ভাবরূপে সত্য—ফেনিল, নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ। হৃদয়ের উৎসর্গে, এই অটল টলিয়া উঠে রস রূপে। সেই বিগলিত রসাস'র যখন ধারারূপে অবতীর্ণ হয়, সাধক রতির পুলকে টলটল করে। ভরা হৃদয়ের সেই উজ্জ্বলিত সুখা-প্লাবনে ভাসাইয়া দিতে ইচ্ছা করে বিশ্ব দুনিয়া—কিছুতেই যেন স্থির থাকিতে দেয় না। এ যে রতির অধীরতা। আসকের মাদকভায়, সে তখন মথুর শিহরণ-চঞ্চল। রসযোগী সাধকের ভয় আছে—রস পাছে হৃদয়-ভাঙ টলিয়া উঠাইয়া পড়ে। এইক্ষণেই রূপে রতি স্থির করিতে হয়। ব্যাভিচারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাই সত্য সাবধান হইয়া, অবতীর্ণ রস-ধারা আবার টেলিয়া উপরে প্রেরণ করাই প্রেম-শাস্ত্রের বিধি। এই প্রকৃষ্ট বিধি অমান্য করিলে, বাম বা দক্ষিণাচারে সাধককে ক্ষতিবিক্ষত হৃদয় ও ছিন্নছাড়া হইতে হয়। মূল সুখ্যা-পথে সাধক যখন সিদ্ধি রতিরূপে রসের কেন্দ্র প্রাপ্ত হন, তখনই ক্ষরণ সুপ্রযুক্ত হয়—সাধককে ক্ষম্ব করে। ইহাই রতি-সাধন (Yoga of consecration)-এর দ্বিতীয় অবস্থা।

* * *

রূপ নহিলে প্রেমের আশ্বাদ মিলে না। সে রূপ কাহারও এক নহে। তবে তাহা আশ্বদ্বরূপেরই প্রকাশ। জ্ঞাতাই আমাদের সামান্য রূপ, বিশেষরূপ বিচিত্র। জ্ঞাত-বিগ্রহে আশ্বাদানই তাই এই যোগসাধনার যুগ-বিধি। বিশেষ রূপের কথা আর এখানে বলিব না। সে রূপের উত্থান ও বিলয়, সম্পূর্ণ ও সম্ভোগের কথা, তার সন্ম্যাস, গার্হস্থ্য প্রভৃতি নানা ক্রম ও বিলাস, সামাজিকতা ও সম্বন্ধ—সে সর্ব কথা এত অল্প পরিধির মধ্যে বলাও সম্ভব নয়। কিন্তু ইহাই যে দিব্য-জ্ঞাত নির্মাণের নবীন শাস্ত্র—শুধু সেই দিকেই রসগ্রাহী ভাবুকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কতটুকু মর্মকথা প্রকাশ করিতে পারিতেছি, কে জানে।

গীতার নাটিকতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর

অভ্যাসমান ভাষ্যকে দমিত করে স্নানমান ধর্মকে উদ্ভূত করার নিমিত্ত দুর্জনদের ধ্বংস করে সুজনদের রক্ষার উদ্দেশ্যেই যে তাঁর পৌনঃপুনিক সঙ্কতি, সে কথাও জানানেন কৃষ্ণ । (৪/৫-৮)

ঐ উদ্দেশ্যে যুগে-যুগে কৃষ্ণের বিবিধ অবতার হোলেও স্বরূপে তিনি যে সর্বদা মুক্ত এবং কর্মফলের প্রীতি নিঃস্পৃহ তাও জানিয়ে দিলেন । তাঁর এই নিষ্কাম-কর্মের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন মুনিগুণীরা । সকল ধীমান জনেরই অনুসরণীয় এই আদর্শ । এই প্রসঙ্গে আবার কর্মভক্ত বাচিত হোলো । কারণ, এই তত্ত্ব অতীব দুর্গিবৃত্ত । অবশ্যই নিষ্কাম-কর্ম করার আগে বিচার ক'রে নিতে হবে—কী কর্ম, কী বিকর্ম, কী অকর্ম । বিচারে সামর্থ্য না থাকলে পূর্বজন সুধীজনের আদর্শ গ্রাহ্য হ'বে মনের সামনে । (৪/১৪-১৮) । এমন ফলাসম্বিহীন কর্ম করতে থাকলে মন থাকবে সর্বদা সন্তুষ্ট । জ্ঞানে চিন্তা স্থির ও শুদ্ধ হোলে তা হবে সম্ভব । তখনই কর্ম, কর্মফল—সবই সমীপত ক'রে দেয়া যাবে (৪/১৯-২৪) । একেই বলে যজ্ঞ । যজ্ঞ নানা প্রকারের হয় । তবে, দ্রব্যায় যজ্ঞ থেকে জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ (৪/২৫-৩৩) । ইন্দ্রিয়-সংযম, শ্রদ্ধা, সেবা, প্রণতি দ্বারা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা যায় । জীবনে কী সাধ্য ও আরাধ্য তা নির্ধারণ করতে হোলে সর্বপ্রথম চাই জ্ঞান (৪/৩৪-৪২) ।

কর্মযোগ এবং কর্মভোগ, অর্থাৎ কর্মের করণ ও কর্মফলা-সম্ভার বর্জন (সন্ন্যাস বা সমর্পণ) কৃষ্ণের মুখে এই দুই প্রকার পালন সম্বন্ধে উপদেশ শুনে অর্জুনের চিন্তা আবার হোলো সংশয়-সংকুল । তিনি নিশ্চয় করে জানতে চাইলেন, এ দুই-এর কোনটি শ্রেয় (৫/১) । জিজ্ঞাসায় উজ্জীবিত তাঁর কখন । কৃষ্ণের উত্তরও হোলো বিশুদ্ধতম চৈতন্যে উজ্জ্বল ও ওজস্বল । কর্মযোগ আর কর্মসন্ন্যাস—দুইই ক্ষেমকর ! তবে তার মধ্যে কর্মযোগই বিশিষ্ট । মূলে দুই এর মধ্যে পার্থক্য নেই । এ দুটির যে কোন একটি দৃঢ় নিষ্ঠায় অবলম্বন করলে পরিণামে একই ফল পাওয়া যায় । তা হোলো ভূমি-সুখ-লাভ, ব্রহ্মলাভ । কিন্তু, কর্ম-যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্মের অনুষ্ঠান বর্ষভরকে সন্ন্যাস বা

সমর্পণ হয় না । কর্মযোগীরা মনে-মনে কর্মের সন্ন্যাস বা সমর্পণ ক'রে সুখী হন । তাঁরাও সন্ন্যাসী । জ্ঞানের কল্যাণেই এই ভক্ত অবগত হোতে পারা যায় । এরই অভাবে নৈষ্কাম্যকে সন্ন্যাস ব'লে মনে হতে পারে । নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান বা কর্মযোগ সম্ভব হয় জ্ঞানের কৃপায় । তখনই লাভ হয় ব্রাহ্মীস্থিতি, অক্ষয় সুখ অন্তঃসুখ, অন্তরারাম । তবে তার জন্য প্রথমেই চাই ইন্দ্রিয়-সংযম । (৫/২-২৯) ।

পূর্বধ্যায়ের কর্মযোগ ও সন্ন্যাস-বিষয়ক বাচ্যের অনুসৃত্তিতে বর্ত্ত্যাম্যানেও ধ্যানযোগের প্রসঙ্গে ধ্যানে-অনাসীন জনের সাধনাতেও যে প্রথমে কর্মের অনুষ্ঠান প্রয়োজন তা বলা হয়েছে । এই কর্ম করতে করতে যখন জ্ঞানের কল্যাণে তাঁর কর্মলিপ্তি বা কর্মফলস্পৃহা থাকবে না তখনই তিনি যোগারূঢ় বা ধ্যানযোগী ব'লে পরিচয় হবেন (৬/১-৪) । ইন্দ্রিয়-জয় করার পর তার চৈতন্য যখন হবে প্রশান্ত, ধীর, সমীচিন্ত তখন তা হোতে পারবে ধ্যানস্থ, অন্তর্নিবিন্দ, ব্রহ্ম-সর্বস্ব । (৬/৫) । কিন্তু সেই চিন্তাপ্রসাদ বা মানস প্রশান্তি পেতে হোলে যে কিছু নিয়ম-সংযম ও আচার-আচরণ আবশ্যিক তার কথাও এখানে বললেন কৃষ্ণ (৬/৫-১৭) । এই ভাবে চিন্তা আত্মসংস্থ হোলে যোগ হয় । তখনই উত্তম সুখ, আত্মাস্তিক সুখ লাভ হয় । কোন দুঃখই সে সুখকে নষ্ট ক'রতে পারে না । (৬/৬-৩২) । কৃষ্ণ-প্রোক্ত এই যোগ যে দুঃসাধ্য সে-কথা জানানেন অর্জুন (৬/৩৩-৩৪) । কৃষ্ণ উত্তরে বললেন যে ধৈর্য্যশীল বুদ্ধি, অভ্যাস ও বৈরাগ্য অর্থাৎ নিঃস্পৃহতা দিয়ে সাধন করতে হবে সেই যোগ । (৬/৩৫-৩৬) । অর্জুন আবার প্রশ্ন করলেন যোগদ্রষ্ট তাপসের কী দশা হয় । (৬/৩৭-৩৯) । যোগসাধন যত-দুর্লব তার ফল কখনও নষ্ট হয় না । তাপস্যা, জ্ঞান, কর্ম—সবচেয়ে অধিক হোলো যোগ । যোগীদের মধ্যে আবার যিনি শ্রদ্ধার সহিত সমস্ত সত্তা দিয়ে ভ্রম্য হোয়ে তাঁর অর্থাৎ, গোবিন্দের আরাধনা-ভজনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী : এই উত্তর বাক্য স্থাপন করলেন কৃষ্ণ । (৬/৪০-৪৭) ।

এইভাবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের বাক-প্রতিবাক ঘন-সম্মিলিত হওয়ায় সংলাপ নাট্যিক হোয়ে উঠেছে।

অর্জুনের কোতূহল উদ্দীপ্যমান দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বোঝালেন, তাঁর শরণাগত ভক্ত তাঁতে আসক্ত হোলে কেমন ক'রে তাঁকে সমগ্রভাবে পাবে। যে সর্বিশেষ জ্ঞান জানলে আর কিছু জানার থাকে না, কৃষ্ণ এখন সেই বিজ্ঞানের কথা অর্জুনকে বলছেন। সহস্রের মধ্যে একজন যদি যোগসিদ্ধি লাভে সক্ষম করে তবু তাদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ হয়তো তাঁর স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হয়। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ, অপরা ও পরা প্রকৃতির কথা বললেন। জানিয়ে দিলেন অর্জুনকে যে তিনিই বিশ্বসৃষ্টির স্রষ্টা ও বিনষ্টা, তিনিই পরাংপর-তত্ত্ব; সবকিছুই তাঁতে বিধৃত। তাঁরই মায়া ছেয়ে আছে বিশ্ব। সেই দৈবীগুণময়ী মায়া অপরাধের। সেই মায়ার অভিভাব থেকে রক্ষা পেতে হোলে মায়ামীশ গোবিন্দকে প্রপন্ন হোতে হবে। জ্ঞান না থাকলে সেই প্রপন্নতা আসে না। মায়া সেই জ্ঞান অপহরণ ক'রে নিয়ে জীবকে করে আসুরিক, তামসিক। বিপন্ন, জিজ্ঞাসু, বৈভব-কাম্যী ও জ্ঞানী ব্যক্তির তাঁর শরণাপন্ন হন। (৭/১-৩০)।

অর্জুনের মনে আরও জিজ্ঞাসা উৎসাহিত হোলো : ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ বলতে কী বোঝায় তা তিনি জানতে চাইলেন। (৮/১-২)। উত্তরে কৃষ্ণ অক্ষর, অধ্যাত্ম, কর্ম, অভিভূত, অধি-দৈবত, অধিযজ্ঞ বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেন। (৮/৩-৪)।

তিনিই সব। তাঁকে পেলেই সবকিছু পাওয়া যাবে। মন বুদ্ধি সব তাঁকে অর্পণ ক'রে কাজ করলে তাঁকে পাওয়া যাবে। তার জন্যে অভ্যাস-যোগের দ্বারা চিত্তকে করতে হবে একান্তিক ও ভক্তিমান। (৮/৬-১৪)। তাঁকে পেলে আর জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্তিত হোতে হয় না। সারা বিশ্বে অনাদ্যন্ত কাল কেবলই অব্যক্ত হোতে ব্যক্ত, আবার ব্যক্ত হোতে অব্যক্তে আবর্তনের পালা চলেছে। (৮/১৬-১৯)। সেই পরমপুরুষকে পেতে হোলে চাই অনন্যা-ভক্তি। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি ভক্তি দ্বারা পরম লভ্য স্থান, পরমধাম লাভ করেন। (৮/২৭-২৮)।

মনে হয়, অর্জুনকে শিক্ষা দেবার জন্যে কৃষ্ণ তাঁর মনে

কুতূহলকে অনিবার্ণ রেখে নিগূঢ় যোগতত্ত্ব-বিষয়ে সমৃদ্ধি করেছেন। এখন বলছেন রাজযোগ সম্বন্ধে। রাজযোগ 'উত্তম' যোগ। এ-বিদ্যা শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা, রাজবিদ্যা। জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে এই যোগ সাধন করলে আসুরিকতা-তামসিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে 'সুসুখ' অর্থাৎ, পরম-সুখ লাভ করা যায়। (৯/১-২)। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ আবার তাঁর স্বরূপ-মহিমার কথা ব্যক্ত করলেন। (৯/৩-১০)। তিনি মানুষী তনু ধারণ ক'রেও আবির্ভূত হন। অস্তেরা তা বুঝতে পারে না, এমন কি তাঁকে অবজ্ঞা করে। কারণ রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে তারা আশ্রয় করে। তাই, তাদের জীবন হয় বিফল। দৈবী-প্রকৃতির মানুষেরা কিছু তাঁর সেই আবির্ভাবের তত্ত্ব জেনে একাগ্র মনে তাঁকে ভজন করেন, অনুরাগের সঙ্গে তাঁর উপাসনা, বন্দনা, কীর্তন প্রভৃতি ক'রে থাকেন। দৈবী-প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞানমার্গে তাঁর অর্চনা-বন্দনা করেন। সবই তো তিনি। তবে জ্ঞানে প্রবৃত্ত হোয়ে অনুরক্তি দিয়ে ভজনা করলেই তাঁকে পাওয়া যায়। যে যে-রূপে চাইবে অনন্য মনে সে তাঁকে সেই রূপেই পাবে। তিনিই পিতা, মাতা, পিতামহ, পতি, অধিপতি, সখা। তিনিই সব-কিছুর আশ্রয়। (৯/১১-১৯)।

সজীবতায় সহজ ও প্রাজ্ঞল কৃষ্ণের এই উক্তি। প্রত্যক্ষে অর্জুনের প্রশ্ন না-থাকলেও তাঁর উপস্থিতি স্পষ্টই অনুভব্য। তাই, সংলাপের নাট্যিকতার ভাব লক্ষণীয়।

প্রিয় ও প্রিয়মাণ অর্জুনের কল্যাণ কামনা করেই কৃষ্ণ স্বীয় বিভূতি অর্থাৎ মাহাত্ম্য-মহিমার কথা বলে চলেছেন। (১০/১-৮)। অর্জুন যত কৃষ্ণ-কথিত অমৃতময় তত্ত্বকথা শুনছেন তত তাঁর তৃষ্ণ বেড়ে চলেছে; তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই। তাই তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন 'আত্মযোগ'-তত্ত্ব বিশদ-করে বলতে। (১০/১২-১৮)। কৃষ্ণ বললেন : তাঁর বিভূতির অন্ত নেই। তাই, সংক্ষেপে মুখ্য মুখ্য মহিমার কথা বলছেন কৃষ্ণ। যেখানে-যেখানে যা কিছু বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা যায় সে-সবের মধ্যে তাঁর অনন্ত শক্তির আংশিক স্ফূর্তি অবধান করতে হবে। এই বিশ্ব সৃষ্টি জুড়ে-যে প্রকাশ তা তাঁর সমগ্র শক্তির অংশ অংশ মাত্র। (১০/১৯-৪২)।

কৃষ্ণের মুখে তাঁর পরম-গুহ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শুনে

অজ্ঞানের মন থেকে অপসারিত হোলো মোহ। এখন তাঁর ইচ্ছা হোলো পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শনের (১১/১-৪)। সাধারণ-চোখে সে-রূপ দর্শন করা অসাধ্য বলে কৃষ্ণ অজ্ঞানকে দিলেন দিব্যনেত্র। (১১/৫-৮)।

মনে রাখতে হবে : কৃষ্ণাজ্ঞান-সংবাদেব সবটাই মহামাতা সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলে চলেছেন। এখানে সঞ্জয়ের উক্তি আরিত হচ্ছে। তিনিই অজ্ঞান-দৃষ্ট বিশ্বরূপের বর্ণনা করছেন। (১১/৯-১৪)। বিশ্বরূপ-দর্শনে অজ্ঞানের যে-ভাবে উদয় হোলো তা তিনি ব্যক্ত করতে লাগলেন। (১১/১৫-৩১)। বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীষণতা ও উগ্রতা দেখে ভীত হোলেন অজ্ঞান। ও-রূপ যে কৃষ্ণের তা তিনি ধারণাই করতে পারছিলেন না। তাই তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন অজ্ঞান। তখন কৃষ্ণ তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে তিনিই সর্ববিশ্বংসী মহাকাল। তাঁরই নিমিত্ত হোয়ে যুদ্ধ ক'রে প্রতিপক্ষের যোধগণকে নিধন করতে বললেন তাঁকে। (১১/৩২-৩৪)।

কেশবের কথা শুনে আতঙ্কিত অজ্ঞানের অবস্থা মহারাজার কাছে বর্ণনা করলেন সঞ্জয়। (১১/৩৫)

বিভীষিত অজ্ঞান কৃষ্ণকে প্রার্থনা জানালেন তাঁর সেই পরিচিত প্রসঙ্গ রূপ দেখাবার জন্যে। কৃষ্ণও তাই দেখালেন (১১/৪৭-৫১)। আর বলে দিলেন যে অনন্যা ভক্তি ছাড়া ঐ রূপ দর্শন, তাঁর তত্ত্বের অবগমন সম্ভব নয়। (১১/৫২-৫৫)।

দূর্দশ দৃশ্যের বর্ণনায়, অজ্ঞান, কৃষ্ণ ও সঞ্জয়ের উক্তিতে একাদশ অধ্যায় নাটকীয়তায় মূর্ত ও ক্ষুদ্র।

অজ্ঞান জানতে চাইলেন, কারা এই যোগী?—যাঁরা অনন্য চেতন হোয়ে প্রীতিপূর্বক তাঁর উপাসনা-ভজনা করেন, না যারা অব্যক্ত অক্ষর-ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণা করেন? (১২/১)। কৃষ্ণ বললেন : তাঁতে মন আবিষ্ট ক'রে পরম প্রসন্ন তাঁর উপাসনা করেন যারা তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যোগী। (১২/২)। যারা ইন্দ্রিয়-সংযমী হোয়ে সকল জীবের হিতসাধন করেন এবং অচিন্ত্য, অক্ষর, নিগূণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরাও তাকে পান। তবে, দেহধারীদের পক্ষে অক্ষর-ব্রহ্মের উপাসনা অধিক কষ্টদায়ক। যারা সর্বকর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ ক'রে তাঁর ধ্যান-ধারণা করেন তিনি জীবনের দুঃখ-ভাপ

থেকে তাঁদের রক্ষা করেন। মন-বুদ্ধি তাঁতে নিবিষ্ট করলে অবশ্যই তাঁর শরণ ও সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। চিন্তা স্থির করতে না-পারলে অভ্যাস-যোগের দ্বারা তা করার চেষ্টা করতে হবে। অভ্যাসেও অসমর্থ হোলে ঈশ্বরের ঈপ্সিত কর্ম করলেও সিদ্ধিলাভ হবে। তাও দুঃসাধ্য মনে হোলে সংযত হোয়ে সর্বকর্মফল ঈশ্বরে ন্যস্ত ক'রে দিতে হবে। তাতেই পরাশাস্তি পাওয়া যাবে। এমন যোগীই নিম্নতমানস হোয়ে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, ভগবানের প্রিয় ভক্ত হন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বললেন, কারা তাঁর প্রিয়। (১২/৩-২০)।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গে কৃষ্ণ এখানে আগে কএকবার প্রকৃতি বা মায়ার কথা বলেছেন। (৩/৫, ৩/২৭, ৩/২৯, ৩/৩৩, ৪/৬, ৭/৪, ৭/৫, ৭/১৪, ৭/১৫, ৭/২৫, ৯/৭, ৯/৮, ৯/১০)। সে-বিষয়ে অজ্ঞানের ধারণা স্বচ্ছ না-হওয়ায় তিনি প্রকৃতি বা ক্ষেত্র এবং পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ তথা জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। (১৩/১)। কৃষ্ণ বললেন : জীবকে প্রত্যক্ষত ধারণ ক'রে থাকে যে-আধার তাই হোলো ক্ষেত্র; আর তাকে যিনি জ্ঞানেন, নিয়ন্ত্রিত করেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। বিশ্বের সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হোলেন কৃষ্ণ। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। (১৩/২-৩)। এই বলে তিনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে বলতে গিয়ে জ্ঞেয় ও জ্ঞানের স্বরূপ কী. তাও বললেন। (১৩/৪-১৯)। তারপর বললেন প্রকৃতি ও পুরুষ-বিষয়ে। (১৩/২০-২৪)। এই অনুসঙ্গে বললেন জ্ঞান-লাভ বা আত্মদর্শনের উপায় সম্বন্ধে। (১৩/২৫-২৬)। আরও বললেন জ্ঞান লাভের ফল-বিষয়ে। (১৩/২৭-৩১, ৩৫)। আবার এলো অব্যক্ত, অনাদি পর-মাস্ততত্ত্বের কথা। (১৩/৩২-৩৪)। আর কেমন ক'রে তাঁকে লাভ করা যায় তার কথা। (১৩/৩৫)।

এই ব্রহ্মজ্ঞান বা সর্বজ্ঞানসার-বিষয়ে কৃষ্ণ অজ্ঞানকে আবার বোঝাতে থাকলেন। কারণ, এই তত্ত্ব অতীব দুর্বোধ্য। এই প্রসঙ্গে এলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির কথা। তার সঙ্গে অবধারিত হোলো প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের বিষয়। (১৪/১-২০)। এখানে ত্রিগুণ, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বা মায়ী এবং গুণাতীত ব্রহ্মের তত্ত্বকথা কৃষ্ণ মুখে শুনে অজ্ঞানের মনে কোতুল হোল গুণত্রয়ের লক্ষণ, আচার এবং এগুলিকে

কাটিয়ে ওঠার উপায় সম্বন্ধে জানান। (১৪/২১)। ভগবান কৃষ্ণ জানানেন, যে-মানুষ সর্ব অবস্থায় ধীর ও সমাচিত থাকে, আর যে-বার্ত্তি ভক্তিব্যোগে অনন্য মনে তাঁর ভজনা করে সেই পারে মায়াকৃত গুণদ্বয়কে অতিবর্তন করতে। জানিয়ে দিলেন যে, তাতেই জীব শাস্ত্রধর্ম ও প্রকৃত অনন্ত সুখ লাভ করতে পারে। (১৪/২২-২৭)। এখানেও তৎকথা সম্বন্ধে রক্ষিত হয়েছে সংলাপের সজীবতা, অর্থাৎ নাট্যিকতার দোতনা।

অর্জুনের হৃদয়-কন্দরে শায়িত অশ্রুট কুতূহল-চেতনা অনুমান ক'রেই বুঝি কৃষ্ণ সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসঙ্গে কাব্যিক বর্ণনা দিলেন বিশ্ব সংসারের। (১৫/১-৪)। সৃষ্টির আনন্দামৃত আশ্বাদন করতে হোলে এই সংসারের নম্বর আকর্ষণে আসক্ত না-হোলে পরম-পুরুষের পরম-পদে প্রপন্ন হোতে হবে। যারী নল্লভিমান, নির্মোহ ও নির্লিপ্ত তাঁরাই সেই পরম-পদ পরম-ধাম পেতে পারেন। (১৫/৩-৬)। পরমাখ্যার অংশ জীবাত্মা। এই জীবাত্মা দেহ ধারণ ক'রে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বিষয়সমূহকে উপ-ভোগ করে। এক দেহ ছেড়ে অপর দেহ গ্রহণের সময় জীবাত্মা পূর্ব দেহের সংস্কারগুলি সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা বিমূঢ়, অজ্ঞান তারা বুঝতে পারে না জীবাত্মার এই তত্ত্ব। যারা যত্নশীল যোগী, যারা সচেতন তাঁরা বুঝতে পারেন সে-তত্ত্ব। (১৫/৭-১১)। এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ আবার তাঁর বিভূতি বা মহিমার কথা মনে করিয়ে দিলেন পার্থকে। (১৫/১২-১৫)। আর ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের কথাও বললেন। দৃশ্যমান বিষয়ই ক্ষর-পুরুষ। আর যিনি কুটস্থ, অর্থাৎ, মায়ারূপ তিনি অক্ষর-পুরুষ। এই দুই পুরুষ ছাড়া তৃতীয় পুরুষের কথা এখানে বললেন মাধব। তিনিই পুরুষোত্তম, পরমাখ্যা, উত্তম পুরুষ, ইনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের চেয়েও উত্তম। লোকদ্বয়ে অনুপ্রবিষ্ট হোয়ে ইনি তার পালন করেন। যে-বার্ত্তি তাঁর এই স্বরূপকে জেনেছেন তিনি সকল প্রকারে তাঁর ভজন করেন। (১৫/১৬-১৯)।

সমুদ্রস্থ পাণ্ডবকে (তৃতীয়) সম্বোধন ক'রেই কৃষ্ণ বিশদ ক'রে বললেন দৈবী ও আসুরী ভাবের কথা। পূর্ব-জন্মের সঙ্স্কার অনুসারে কেউ দৈবী কেউ আসুরী প্রকৃতি পায়। যারা দৈবী ভাবের অধিকারী হয় তারা জীবনামৃত

ভোগ করে, ঈশ্বর লাভ ক'রে প্রকৃত সুখ-শান্তি পায়। (১৬/১-৩)। আসুরী-ভাবের অধিকারীরা জগৎ বিনষ্ট করে, নিজেরাও কাম-ক্লোষে মত্ত এবং লোভ-তাড়িত হোয়ে পরিণামে অশেষ অশান্তি পায়। (১৬/৪, ৭-২১)। তাদের এই দুর্গতি প্রবাহিত হয় জন্মে জন্মে। কাম, ক্লোষ আর লোভ—এই তিনটি আত্ম-বিনাশী বা নরকের দ্বার। এই প্রধান রিপুদ্বয়কে যে দমন করতে পারে সেই লাভ করে পরম সৌভাগ্য, সার্থক করতে পারে জন্ম ও জীবন। (১৬/২১-২২)।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে অর্জুনের উক্তি নেই। তবু কৃষ্ণের উক্তির স্মৃতি থেকে পার্থের উপস্থিতি ও কুতূহল-প্রভৃতি অনুভূত হয় সহজেই।

মানুষের মধ্যে কেউ-কেউ শাস্ত্রবিধি জেনেও তা অপালন করে। আবার কেউ-কেউ শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন না-ক'রে শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞ-পূজা করে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, যারা শাস্ত্রজ্ঞান না পেয়েও নিষ্ঠা দিয়ে যজ্ঞ-পূজা করে তাদের সেই শ্রদ্ধা কী প্রকার? (১৭/১)। উত্তরে গোবিন্দ জানানেন যে জীবের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রদ্ধা হয়। জীবের প্রকৃতি তিন প্রকারের। তাই তাদের শ্রদ্ধাও তিন প্রকার : সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যারা সাত্ত্বিক তারা দেবগণের পূজা করে। রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা যক্ষ-রাক্ষসগণের এবং তামসিক-স্বভাবের জীবেরা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে। (১৭/২-৫)।

তিন-প্রকার প্রকৃতির জীবের তিন প্রকার যজ্ঞ-রীতির কথা ব'লে গোবিন্দ তিন প্রকার আহারের কথাও বললেন এখানে। (১৭/৭-১০)। বললেন তিন প্রকার যজ্ঞের কথা। (১৭/১১-১৩)। এর সঙ্গে এলো কায়িক, বাচিক, মানসিক, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তপস্যার কথা। (১৭/১৪-১৯)। এলো তিনপ্রকার দানের কথা। (১৭/২০-২২)। আরও এলো সর্ববিষয়বিনাশন ও বৈগুণ্য-প্রশমন ব্রহ্মবাচক তিনটি শব্দের কথা : 'ওঁ তৎ সৎ'। (১৭/২৩-২৭)।

পার্থের বিবিংসা এখনও নিবৃত্ত হয় নি। 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ' সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা প্রার্থনা করলেন। (১৮/১)। কৃষ্ণের উত্তর-বচন হোলো : কাম্য কর্মের ন্যাসই সন্ন্যাস, আর সর্বকর্মফল ত্যাগই ত্যাগ। (১৮/২)। এই প্রসঙ্গে

আরও বললেন : ‘সর্বকর্মই ত্যাজ্য’—এমন মতও আছে। তবে, যজ্ঞ-দান-তপের কর্ম পরিত্যাজ্য নয়। কারণ, নিষ্কাম-ভাবে তা করলে তাতে চিন্তা শূন্য হয়। (১৮/৩—৬)। ত্যাগেরও প্রকার আছে : স্বাস্থ্যিক, রাজসিক, তামসিক। (১৮/৭—৯)। সকল কর্মেরই কারণ পাঁচটি : দেহ, অহংকার, ইন্দ্রিয়, প্রাণকর্ম ও দৈব। (১৮/১৪—১৫)। আত্মা কিন্তু কোনও কর্মের কর্তা নয়। অবশ্য দ্রাস্তৃবশে তাঁর ওপর কর্তৃত্ব আরোপিত হয়। (১৮/১৬)। জ্ঞান, জ্ঞেয় আর জ্ঞাতা—এই তিনপ্রকার হোলো কর্মের প্রযোজক। কর্তা, ক্রিয়া ও করণ ইন্দ্রিয় এই তিনের সহযোগেই হয় কর্ম। (১৮/১৮)। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ-ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাও হয় তিন প্রকার। (১৮/১৯—২৮)। বুদ্ধি ও ধর্মতর তিন প্রকার ভেদের কথাও বললেন গোবিন্দ। (২৮/২৯—৩৫)। বললেন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিন-প্রকার সুখের কথাও। (১৮/৩৭—৩৯)। স্বর্গ-মর্ত্যে কোন ও কিছুই নয় বন্ধন থেকে মুক্ত। (১৮/৪০)। মানুষেরও প্রকৃতিজাত গুণ-অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম সমূহ নির্ধারিত হয়েছে। (১৮/৪১—৪৪)। মানুষ আপন আপন কর্ম নৈষ্ঠিক-ভাবে করেই যেমন সিজিলাভ করতে পারে তেমনি কর্ম দিয়ে সর্বময় অধিকর্তাকে অভ্যর্থনা করেও। (১৮/৪৫—৪৭)। উপসংহারে আবার নিষ্কাম কর্ম, সর্বভূতে আত্মীয়তা-বোধ, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, পরম জ্ঞান, ঐকান্তিকী ভগবদভক্তি প্রভৃতি সর্বভাবেই ঈশ্বরের শরণাগতি করে পরা-শান্তি লাভ করার কথা বললেন। (১৮/৪৮—৬৬)। তবে, অতপস্ব, অভক্ত, অবিদ্বানসী এবং অনীচ্ছ-বাদী লোকেদের কাছে এসব কথা বলতে নিষেধ করলেন। (১৮/৬৭)। গোবিন্দ দ্বিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর এই সব তত্ত্ব কথা শুনে পার্থের সন্মোহ প্রণষ্ট হয়েছে কি না। (১৮/৭২)। পার্থও প্রসন্ন মনে জানালেন যে কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁর চৈতন্য হোতে সমস্ত চঞ্চলতা হয়েছে দূরিত। নিঃসংশয় মনে এবার তিনি কৃষ্ণের আদেশ-নির্দেশ পালন করতে কৃতসংকল্প হোলেন। (১৮/৭৩)।

বাসুদেব ও পার্থের সংলাপ এখানেই শেষ হোলো। মহামাত্য সঞ্জয় সেই অতি বিদ্বয়কর গোপ্য সংবাদ-বাসুদেবের অনুকম্পায় স্বয়ং গোপেশ্বর গোবিন্দের মুখ থেকে শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন।

মহামতি সঞ্জয়ের অনুগ্রহে তাঁর চমৎকার বর্ণনার গুণে পামর-জন, আমরাও সেই সংলাপ যেন স্পষ্ট শুনলুম।

বিষয়-বস্তু-তত্ত্ব-সংস্কৃত হওয়া সত্ত্বেও সংলাপ আর বর্ণনার নৈপুণ্যে হোয়ে উঠেছে নাট্যিক। অল্প-পরিমাণ হোলেও দৃশ্য-যোজনা, সেই নাট্যিকতাকে দিয়েছে আনুকূল্য। দৃশ্য বলতে অবশ্য ছ’টি কি সাতটি হয় গণ্য। প্রথম দৃশ্যটির কোনও উল্লেখ নেই। তবে সহজেই অনুমান্য যে সেটি ইন্দ্র-প্রস্থের রাজপ্রাসাদের সভা-ভবন। সেখানেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহামাত্য সঞ্জয়ের কাছ থেকে শুনতে চাইলেন কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুধিষ্ঠিরের বার্তা। দ্বিতীয় দৃশ্য হোলো কুরুক্ষেত্রে। সেখানে দুর্যোধনকেই প্রথম দেখা যায় আচার্য্য দ্রোণকে উভয় পক্ষের সৈন্যবলোক্তন করার নিমিত্ত বলতে। দুর্যোধন বচন-মাধ্যমে দুই পক্ষের যুধিষ্ঠির ও মহারথদের সমর সজ্জার দৃশ্য পাঠক বা শ্রাবকদের মনে কোঁতুলন এবং ঔৎসুক্য বাড়ায়। এই দৃশ্যেরই অপরাংশে দেখা যায় শ্বেতাশ্বমুখ-সান্দনে পার্থ ও পার্থ-সারথিকে, আর তাদের সমর-প্রস্তুতি। উদ্যতায়ুধ স্বাস্যাসাটী শত্রু নিষ্ক্ষেপের আগে বিপক্ষীয়দের দেখে নিতে চাইলেন। তাই হৃষীকেশকে দেখা গোলা রথটি উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে। দেখা গেলো, সমরাসনে স্বজনদের দেখে পার্থ বিধাদাক্তান্ত, শিথিল-তনু প্রস্থম্বনু, শূন্য মুখ, দম্বভক্। এর পর সেই একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের সময়ে একটা দৃশ্যান্তর হোলো। এটাকেই বলা যেতে পারে তৃতীয় দৃশ্য। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনে আতর্কিত অর্জুনের প্রার্থনায় কৃষ্ণ সে-রূপ-সংবরণ করে তাঁর সৌম্যবপু দেখিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। এই দৃশ্যকে ধরা যেতে পারে চতুর্থ দৃশ্য-রূপে। শ্রীভগবানের বর্ণনায় সংসার-রূপ অস্বস্ত ভরুর দৃশ্যটি এই নাট্যিকার একটি দৃশ্য-রূপে ধৃত হোতে পারে কিনা বিবেচ্য। তা পার্থ বলে গ্রাহ্য হোলে দৃশ্যটি হবে পঞ্চম। কৃষ্ণের কথা শুনে পার্থের বিবাদ, মোহ ও সন্দেহ কেটে গিয়েছে। তাঁর স্বস্থ-সুস্থ-প্রশান্ত-রূপের দৃশ্যকে ষষ্ঠ বলে ধরা যেতে পারে। শেষ দৃশ্যে দেখি সঞ্জয়কে ধৃত-রাস্ত্রের সভাকক্ষে। এ দৃশ্যটিও বিশেষ স্পষ্ট। এই সাতটি দৃশ্য নিয়ে এই নাট্যকল্প রচনাটি পূর্ণ।

নাট্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে অবশ্য এই গ্রন্থ রচিত হয় নি। তবু তাতে নাট্যিক আঙ্গিকের লক্ষণ আভাসিত হোয়েছে এই পাঠকের মনে। আর মনে হয়েছে যে বাচ্য-বস্তু গ্রাহ্যতর হয়েছে এই প্রকাশ ভঙ্গিমার গুণে। এই ধারণা একান্ত ব্যক্তি-গত। সামান্য পাঠকের এই ধারণা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তা কোবিদজনের বিচার্য্য।

১লা জানুয়ারী, ১৯৮৪ শুভ নববর্ষ, আমার জীবনের একটি চিরস্মরণীয় দিন। ঈশ্বরের অগার করুণায় ভারতবর্ষের চতুর্থতম অন্যতম ঐরামেশ্বরধাম দর্শন লাভ আমার ঐ তারিখে হয়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরাদি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আমি সন্থীক ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ 'করমণ্ডল এক্সপ্রেস' বৈকাল ৪-১৫ মিনিটে হাওড়া থেকে রওনা হই। ২৬শে ডিসেম্বর রাত্র ৮টায় মাদ্রাজ পৌঁছাই এবং বাসযোগে সদুদ্রতীরে অবস্থিত 'সিনাই ইন্টারন্যাশানাল' হোটেলে উঠি। ২৭শে সকালে বাসযোগে রওনা হয়ে এক এক করে কপালেশ্বর শিবের মন্দির, মহালক্ষ্মী মন্দিরে নয় প্রকার ও বিভিন্ন বেশভূষায় 'শোভিত লক্ষ্মীমূর্তি, অঙ্গু'নরথ (ভাল্লভর কোট্রাম), বৈষ্ণবদের পার্শ্বসারথি মন্দির, হাইকোর্ট, বিধান-সভা ভবন, মিউজিয়াম, চীপক ফোর্ডিয়াম দর্শনান্তে হোটেলে রাত্র বাস করি। ২৮শে ডিসেম্বর পুনরায় বাসযোগে পক্ষীতীর্থে দর্শন, মহাবল্লীপূরম, বিষ্ণুকণ্ঠী; শিবকণ্ঠী' ইত্যাদি পরিদর্শনান্তে হোটেলে রাত্র যাপন করি। পক্ষী-তীর্থে প্রায় ছয়শত সি'ড়ি উপরে উঠে পর্বতচূড়ায় শিব-পার্বতী দর্শন করতে হয়। বেলা আশ্রাজ ১১টার সময় ঐপূজার ভোগ সেবন করতে দুইটি বৃহদাকার পক্ষী চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নীচে নেমে এসে প্রসাদ সেবন করে চলে যায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! কতকাল ধরে প্রত্যাশ এই যজ্ঞ চলে আসছে সঠিক বলা যায় না। পক্ষীতীর্থে উপরে হেঁটে উঠতে অক্ষম যাত্রীদের জন্য মাথাপিছু কুড়ি টাকা ভাড়ায় ঢুলি পাওয়া যায়। ২৯শে ডিসেম্বর পুনরায় সারাদিন শহর, সমুদ্রতীর ইত্যাদি পরিদর্শনান্তে রাত্র ১০টায় ট্রেনযোগে পণ্ডিচেরী অভিমুখে রওনা হই। সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে ৩০শে ডিসেম্বর 'ভিল্লিপূরম' ষ্টেশনে পৌঁছাই ও বাসযোগে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাই। আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ ও মাদার-এর অপূর্ব সাক্ষাত ও সযত্নে সংরক্ষিত সমাধিস্থল দর্শন ও দ্বিতলে শ্রীঅরবিন্দের গৃহ ও একতলায় উপাসনা-স্থল পরিদর্শনে ধন্য ও পরিভূক্ত হই। পণ্ডিচেরীতে মাদারের আর্টগ্যালারী, সমুদ্রসকত ইত্যাদি দর্শনান্তে রাত্র ভিল্লিপূরম ষ্টেশনে পুনরায় ফিরে আসি। ৩১শে ডিসেম্বর

সকালে তিরুচিরাপল্লী ষ্টেশনে পৌঁছাই ও মোটরে এক এক করে 'কাবেরীসঙ্গম', 'শ্রীরঙ্গম বা শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির', 'জম্বুকেশ্বরের শিবমন্দির', 'গণপতি মন্দির বা বক্শেমট টেম্পল' সমূহ পরিদর্শন করে অসীম আনন্দ লাভ করি। বৈকালে তাজোরের সুদীর্ঘ ছয় ফিট উচ্চ কাল পাথরের বেদীর উপরে স্থাপিত বিরাট 'শিবলিঙ্গ' দর্শনে মনপ্রাণ ভরে যায়। এখানকার বিরাট কৃষ্ণপ্রস্তরের নন্দী বা বৃষভ দেখে বিস্মিত হতে হয়। মনে হয় বাবার উপযুক্ত নন্দীই বটে। ঐ প্রকার বিরাট আকারের আরও দুইটি প্রস্তর নির্মিত নন্দী বা বৃষভ আছে। একটি রামেশ্বরমে অপরটি বাঙ্গালোরে বুল্ টেম্পলে। ৩১শে ডিসেম্বর রাত্র আমরা রামেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি এবং ১লা জানুয়ারী ১৯৮৪তে বেলা আশ্রাজ সাড়ে এগারোটায় ট্রেনে রামেশ্বরে পৌঁছাই।

রামেশ্বরধামে যেতে সমুদ্রের খাড়ির উপর নির্মিত রেল-সেতুর উপর দিয়ে ট্রেনে যেতে হয়। ঐরামেশ্বর তীর্থে একটি দ্বীপে অবস্থিত। দ্বীপটির বর্তমান নাম রামেশ্বর দ্বীপ। পূর্বে পাষান দ্বীপ বলা হত এবং বর্তমান রেলসেতু নির্মাণ হওয়ার পূর্বে কীমারযোগে সমুদ্রের খাড়ি অতিক্রম করতে হত। বর্তমানে ঐ সমুদ্রের উপর যাত্রী ও যানবাহনাদি চলাচলের জন্য বিরাটাকার পাষান রিজ বা সেতু নির্মিত হচ্ছে দেখতে পেলাম। নির্মাণকার্য দ্রুতগতিতে চলছে মনে হল। সমুদ্রের উপরে রেলসেতুর উপর দিয়ে ট্রেন-যাত্রা এক ভয়ঙ্কর সুন্দর অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছিল সমুদ্রের উপর দিয়ে যেন গাড়ী চলছে। দু'ধারে অসীম সমুদ্রের জলরাশি। ছোট ছোট ঢেউয়ের খেলা। একটা মোচার খোলার মত ট্রেনটা যেন ভেসে চলেছে। অপূর্ব সুন্দর এ দৃশ্য দেখতে দেখতে চলিছি। মন বলছে, 'জয় বাবা ঐরামেশ্বরনাথের জয়।' বেলা সাড়ে এগারোটায় সেখানে পৌঁছলাম। সমুদ্রস্নানান্তে অতি নিকটে মন্দিরে উপস্থিত হই।

ঐরামেশ্বরের প্রস্তরনির্মিত মন্দিরটি বিশালস্বে বোধ হয় অধিতীয়। প্রবেশপথে অত্যুচ্চ গোপুরম্। মন্দিরটি তিন মহলে বিভক্ত। গর্ভমন্দিরকে ঘিরে পর পর তিনটি মহলে তিনটি পরিক্রমা। চার হাজার ফিট লম্বা করাইডর। এই বিরাট স্থানের প্রতি অংশ সুন্দর ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক

মহলে দেবদেবীর বিবিধ লীলা প্রস্তুত খোদিত আছে। বিরীটস্থ ও সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলি। বাইরের মহল অভিক্রম করে ঐরামেশ্বরের মহলে প্রবেশপথে একতলা সমান উচু প্রস্তরের নন্দী বা বৃষভ দেখা যায়। নিকটে এক উচু স্তম্ভ। ঐরামেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি গর্ভমন্দিরে অবস্থিত।

পৌরাণিক আখ্যানুযায়ী শ্রীরামচন্দ্র ঐ ঐরামেশ্বর মন্দির স্থাপনা করেছিলেন। রাবণবধজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার মানসে সীতাদেবীকে নিয়ে এই স্থানে আসেন। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে কৈলাস হতে শিবলিঙ্গ আনতে আশ্রয় করেন। ঐ শিবলিঙ্গ আনতে দেবী দেখে সীতাদেবী বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে মন্দিরে স্থাপন করেন। পরক্ষণেই হনুমান কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে হাজির হয়। শিবলিঙ্গ স্থাপনা হয়ে গিয়েছে দেখে হনুমান ব্যথিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে হনুমানের আনীত শিবলিঙ্গ রামলিঙ্গের পার্শ্বের দালানে স্থাপনা করা হয় এবং শ্রীরামের আদেশে প্রতিদিন প্রথমে হনুমান আনীত লিঙ্গের পূজা হয় এবং পরে সীতাদেবী প্রতিষ্ঠিত ঐরামেশ্বরের বালুকাময় লিঙ্গমূর্তির পূজা হয়। অদ্যাবধি প্রত্যহ ঐরামেশ্বরের গঙ্গাজলে পূজা ও ভোগ হয়।

আমরা পূজার জন্য ডালা কিনে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। আমার স্ত্রী গঙ্গাজলে ঐরামেশ্বরের পূজা করলেন। দশ টাকা পূজারীকে তক্ষণ্য দিলেন। লিঙ্গটি বালুকাময়—প্রস্তরবৎ কঠিন নয়, সর্বদা সুবর্ণ মুকুটে ঢেকে রাখা হয়। স্নানজল ঐ আবরণের উপরই ঢালা হয়। অতি প্রাতে অনাবৃত মূর্তিরও দর্শন পাওয়া যায়। পার্বতীসহ ঐরামেশ্বর লিঙ্গের অনাবৃত মূর্তির ছোটবড় ছবিও প্রচুর কিনতে পাওয়া যায়। এখানের বাজারে ভাল শঙ্খ পাওয়া যায়। মূল্য বড় ৩০/৪০ টাকা। পার্বতীর মন্দির রামেশ্বর লিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত। একটি অীচক ও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দির অভ্যন্তরে সেতুমাদব নামে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত শ্রীবিষ্ণু মন্দির আছে। বিভিন্ন অংশে বাইশটি তীর্থ আছে। প্রত্যেক তীর্থের জল অনেক রোগ উপশম করে বলে প্রবাদ আছে।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরসমূহে পাণ্ডাদের জুলুম বিশেষ

কিছু নেই। বাহির থেকে ঠাকুরের ভোগের জন্য ডালা কিনে, কোথাও আবার ভোগ দিবার জন্য আলাদা টিকিট কিনে, ভিতরে মূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান পুরোহিতের হাতে দিতে হয়। পূজার ডালার কপূর একটি থালায় লইয়া পুরোহিত মূর্তির সামনে ছালাইয়া আরতি করে। ঐ প্রজ্জ্বলিত আলো যাত্রীর কাছে নিয়ে আসে। ঐ তাপ যাত্রীরা গ্রহণ করে। আমরাও ঐরূপ করলাম। ঐরামেশ্বর দর্শনান্তে ভোগ সেবা করে উপবাস ভঙ্গ করলাম। হৃদয়, মন অপূর্ণ আনন্দে ও ভাবে ভরে গেল।

১৩১৭ সালে শ্রীমা দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ স্টেশনে পৌছালে শশীমহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গীদের থাকবার সকল ব্যবস্থা করেন। শ্রীমাকে শশীমহারাজ ঐরামেশ্বর ধামে নিয়ে যান। পাশ্চাত্য স্থাপত্য ও তদুপরি অবস্থিত ঐরামেশ্বর মন্দির তখন রামনাদের রাজার অধীন ছিল। রাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। রাজা কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিলেন, ‘আমার গুরু গুরু—পরমগুরু যাচ্ছেন, সব ব্যবস্থা করবে।’ গর্ভমন্দিরে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু রাজা আদেশে শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গীদের সাদরে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এবং শিবলিঙ্গের কণকান্তরণ উন্মোচন করে দেওয়া হয়। শ্রীমা গঙ্গাজলে ঐরামেশ্বরকে স্নান করান এবং শশীমহারাজ সংগৃহীত একশত আট সুবর্ণ বিষ্ণুপত্রের দ্বারা তাঁর পূজা করেন। অনাচ্ছাদিত রামেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করে শ্রীমা হঠাৎ বলে ফেলোছিলেন, ‘যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।’

ভগবান জগদগুরু শঙ্করাচার্য ভারতের চারি ধামে চারিটি মঠ স্থাপনা করেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারকাধামে ‘শারদামঠ’, পূর্বপ্রান্তে পুরী জগন্নাথধামে ‘গোবর্ধনমঠ’, উত্তরপ্রান্তে বদরিকাধামে ‘জ্যোতির্মঠ’ বা ‘শ্রীমঠ’ এবং ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে রামেশ্বরধামে ‘শৃঙ্গেরীমঠ’। পৃথক পৃথক মঠের সম্মাসীগণের নিমিত্ত পৃথক পৃথক মহানুশাসন দিয়েছিলেন :

দ্বারকাধামে ‘সামবেদ’, জগন্নাথধামে ‘ধ্যবেদ’, বদরিকাধামে অথর্ববেদ এবং রামেশ্বরধামে যজুর্বেদ পঠিত হয়। দ্বারকাধামের সম্মাসী সম্প্রদায়ের নাম ‘কীটবার’,

যিনি প্রাণিগণের প্রতি রূপাবশতঃ কীটাদি জীবজন্তুকে বারণ করেন অর্থাৎ তাহাদের হিংসা করেন না, তিনি ‘কীটবার’ সংজ্ঞায় অভিহিত হন।

“কীটাদয়ো বিশেষেণ বার্থ্যন্তে জীবজন্তবঃ

ভূতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে ॥”

—শঙ্করাচার্য্য

জগন্নাথধামে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নাম “ভোগবার”। ভোগ শব্দের অর্থ বিষয়। যিনি প্রাণিগণের ভোগ নিবারণ করেন, সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় “ভোগবার” নামে অভিহিত।

“ভ্যক্ত্বা সর্বমিদং বিশ্বমারণ্যং পরিকীর্ত্যতে।

ভোগো-বিষয় ইত্যুক্তো বার্থ্যতে যেন জীবিনাম্ ॥”

—শঙ্করাচার্য্য

বদরিকাধামে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নাম “আনন্দবার”। যেহেতু এই সম্প্রদায় জীবগণের বৈষয়িক আনন্দ ও বিলাস বারণ করিয়া থাকেন, সেই হেতু এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নাম “আনন্দবার”।

“আনন্দো হি বিলাসস্ত বার্থ্যতে চেন জীবিনাম্।

সম্প্রদায়ো যতীনাং চানন্দবারঃ স উচ্যতে ॥”

—শঙ্করাচার্য্য

আর রামেশ্বরধামে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নাম “ভূরিবার” ; ভূরি শব্দের অর্থ সুবর্ণ, যে সম্প্রদায় প্রাণিগণের সুবর্ণের প্রতি আসক্তি বারণ করেন, সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নাম “ভূরিবার”।

“ভূরিশব্দেন সৌবর্ণ্যং বার্থ্যতে যেন জীবিনাম্।

সম্প্রদায়ো যতীনাশ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥”

—শঙ্করাচার্য্য

ঐ ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমরা রামেশ্বরের সন্ধ্যার্তি দর্শনে ধন্য ও কৃতার্থ। পরে ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শঙ্করীমঠ পরিদর্শন ও মঠের সন্ন্যাসিগণের দর্শনলাভে জীবন সার্থক করলাম।

এক্ষণে প্রতিদিন আমার মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদের জাবর কাটাছি, আর কেবলই বলছি : প্রার্থনা করি হে ডোলানাথ, হে পরম করুণাময় রামেশ্বর, আমায় রূপা কর, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, যেন আমার গুরুপদে অচলা ভক্তি ও ইচ্ছালাভ হয়।

নিবেদিতাকে

ইলা সিংহ

নিবেদিতা যুগ-মাতা গো,

তব জনমদিনের ভোরে

মনের গোপন শ্রদ্ধাধারা প্রণাম হয়ে করে।

ভারত যখন মগন ছিল,

অমানিশার ঘোরে,

ত্যাগের শিক্ষায় জ্বালিয়ে আলো

আধার দিলে দূরে।

বিবেক-বাণীর ধারক তুমি,

প্রজ্ঞা-পারমিতা।

সহিষ্ণুতায় সাগর-হৃদি

নীল-নয়না-সীতা।

পুরাণের স্বামি দধিচীর মত,

তোমার আশ্রয়দান

ধ্বংস বিনাশের মহাভয় হতে

জাতিরে করিল দ্রাণ।

দীন ভারতেরে ভালবেসে তুমি,

ভিখারিণী হলে হায়।

গৈরিকবাস পেল নব শোভা

সুন্দর চমকায়।

ভাষার বাঁধনে তব মহিমার গীতা

যায় না তো রচা হায়।

তাই শ্রদ্ধা সজল প্রাণের প্রণাম

দিলাম তোমার পায়।

শরৎচন্দ্রের কাছে ধনিকের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকের লড়াই হলো 'ধনী'র বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই।

এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই—জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই—আছে শুধু ধনী-দুঃস্থ মালিক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভিজ্ঞ শ্রমিক।

তাই শ্রমিকশ্রেণীকে তিনি ঘোষণা করতে বলেছেন, 'কেবল টাকাই সবটুকু নয়—বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না—তাই শ্রমিকই ঠিক তোমাদের মত মালিক—ঠিক তোমাদের মত সকল কারখানার অধিকারী'।

ক্যাপিটালিস্ট সমাজে কারখানার মালিকদের থাকে অসংখ্যত মুনাসা লাভসা। সেই লাভসাকে প্রশমিত করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন দুষ্কর্ম করতে তারা পারে। এবং স্বাভাবিকভাবে ক্যাপিটালিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতা করে রাষ্ট্রশক্তি। সেই সুযোগে তারা শ্রমিক মজুরদের উপর পুলিশি তাগুব চালাতে পারে শুধু নয়, তাই তারা করে থাকে। তা ছাড়া প্রচুর অর্থ দিয়ে সমাজ বিরোধী গুণ্ডাদের তারা পোষণ করে যেহেতু শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করতে হবে। সমাজ-সচেতন শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই সত্যটি ধরা পড়েছে বলেই তিনি 'পথের দাবী' গ্রন্থে একাত্তর একটি চিত্র আঁকতে পেরেছেন। মালিক গোষ্ঠী তথা 'ধনিক' শ্রেণী চান না যে শ্রমিকেরা তাঁদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হোন, একবার যদি সচেতনতা আসে তাহলে মালিকের প্রচণ্ড বিপদ।

সুমিয়ার নেতৃত্বে 'পথের দাবী'র সভারা শান্তিপূর্ণভাবে যখন শ্রমিক শোষণের চিত্র তুলে ধরছিলেন, তখন মালিকের স্বার্থে রাষ্ট্রের অধারোহী পুলিশ বাহিনী 'কাঁপিয়ে' পড়ে সভা ভেঙে দেয়। 'রামদাস তলোয়ারকর' (তলওয়ারকর) এদের দেখিয়ে বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এই ডালকুন্ডাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায় না যে, কেউ তোমাদের দুঃখদুর্দশার কথা তোমাদের জানায়।

....শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার-মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পার যে তোমরাও

মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিত হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে এই গোটা কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু?... তোমাদের গানের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাক্ষ্য তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়।

শ্রমিকরা সহজে ধর্মঘটের পথে পা বাড়ান না, কারণ তাঁরা জানেন কারখানা বন্ধ থাকলে তাঁদেরই ক্ষতি বেশী। মালিকের বিলাসী ব্যয়ের স্রোতে খানিকটা ভাঁটা পড়ে কিন্তু শ্রমিকদের সমগ্র পরিবার অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তবুও মরীয়া হয়ে তাঁরা ধর্মঘট করেন। তার জন্যে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হতে হয় এবং মালিকদের হিংস্র আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে পাণ্টা আক্রমণ করতে হয়। তাই ধর্মঘট কখনও নিরুপদ্রব হয় না। কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকদের বিপদের কাছে মালিকদের আর্থিক ক্ষতির তুলনা হয় না। শরৎচন্দ্র ধর্মঘটী শ্রমিকদের জীবনপর্বটার অত্যন্ত বাস্তব রূপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ধনী-আর্থিক ও দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। শ্রমিকের উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলি দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে—তখন পরের অল্প কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবনধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শূভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ বল, সৈন্য বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে—সেই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না—সেদিন নিরস্ত্র দরিদ্রের রক্তে নদী বয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাস এখানেই থামে না। এই সব পীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়, ভিক্ষা পায়। আবার একদিন দলবদ্ধ হয়ে আগেকার অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, আবার সেই পুরোনো কাঁহনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। এইভাবে

ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা আসে শ্রমিকদের জীবনে। তার ফলে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা ও সচেতনতা লাভ করেন তার সাহায্যে একসময় তারা রাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে আসেন। একারণেই শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী ভারতীকে বলেন, ‘বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উঠলে ওঠে সে শাস্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূখ একথা জানে না, শুধু মজুরীর কম বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।’

শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধের জন্য শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে এবং ধনতান্ত্রিক রাজত্বের অবসান হলেই শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ মুক্তি ঘটবে। বর্তমান কালে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা ট্রাইব্যুনাল বা লেবার কমিশনারের সভাপতিত্বে ত্রিপক্ষিক বা ত্রিপক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আর্থিক দাবী দাওয়ার আন্দোলনের ভিতর দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের হাত থেকে বাঁচানো যায় না। একারণেই সব্যসাচী বলেছেন, ‘ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শাস্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়—এই তার বর, এই তার অভিশাপ।’^{১৩}

সংস্কার করে সমাজ ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন করতে তিনি রাজী নন, বরায়র চেয়েছেন শোষণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। বারবার তিনি বলেছেন মেরামত করে জোড়-তাঁলি দিয়ে কোন কল্যাণপ্রদ কাজ হতে পারে না। বিপ্লবে বিশ্বাসী শরৎচন্দ্র অশান্তি বা অকল্যাণকে পরোয়া করেন না। একমাত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়ে তিনি সমাজের বা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনতে চান। যা কিছু অন্ধ সংস্কার, অর্থনৈতিক পুরাতন, যা সব জীর্ণ হয়ে পড়ছে কালের ভায়ে, তাদের নির্মম ভাবে ধ্বংস করে ফেলতে বলেছেন। বুদ্রের তাণ্ডবনৃত্যে প্রলয় আসুক। পিনাকপাণির

হাতের ডম্বর বাজুক, অশান্ত, উদ্বেল হয়ে উঠুক ধরা পৃষ্ঠ। প্রলয়ের অবসানে জাগবে নতুন সূর্য, ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চে দেখা যাবে আর নতুন জগৎ, নতুন মানুষের হবে প্রতিষ্ঠা। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার নাম হলো প্রতিক্রিয়াশীলতা। অবশ্য সে পুরাতন যদি অন্ধ কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে।

‘বিশিষ্ট বামপন্থী তাত্ত্বিক নেতা শিবদাস ঘোষ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘পথের দাবীতেও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা পুরোপুরি মার্ক্সবাদী সম্মত না হলেও নিঃসন্দেহে তা মজুর আন্দোলনের অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে প্রতিফলিত করেছে।’^{১৪}

‘বন্দু মূলক’ বহুবাদ যে প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলে তা বাস্তব থেকে উদ্ভূত। মার্ক্সবাদ অনুসারে যে প্রয়োজন তত্ত্বের আলোকে সমাজের ভাব, আদর্শ ও চিন্তাভাবনাগুলির সত্যাসত্য নির্বৃপিত হয়—তার মূলে কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ বা প্রয়োজন নয়। ‘পথের দাবী’তে এই ধরনের হুঁসি ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। এ দেশের প্রয়োজনে এবং পরিস্থিতিতে সন্যাসবাদ যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার মধ্যে যৌবনের মানবতাবাদ প্রতিফলিত হয়েছে, তথাপি এই গ্রন্থের বহু স্থানে মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে মার্ক্সীয় চিন্তাধারা ও বিচারধারা স্থান দখল করে বসেছে। সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিক থেকে যত বহুবাদী সাহিত্য ও রূপ বিপ্লবের ছাঁচে আকৃষ্ট হয়েছেন ততই তাঁর রচনার ধারা বদলেছে। বোধ করি একারণেই তিনি একদিকে যেমন শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করতে উৎসাহিত হন, সমর্থন করেছেন শ্রমিকদের ধর্মঘট, তেমনি অন্যদিকে স্বদেশী নেতৃবৃন্দের সংস্কার আন্দোলনকে তীব্র বিদূষ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ভক্তিজাজন নেতারা দেশোদ্ধারের জন্য আইন বাঁচিয়ে যে সব জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে বিদূষ করে শরৎচন্দ্র বললেন। ‘বিদেশী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিবি করে বলচি তোমাদের অধীনে আমরা

স্বাধীন হবই হব। দোষ, কার, সাধ্য বাধা দেয়।—এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত।”^{১৬}

গান্ধিজী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘ তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।’^{১৭} গান্ধিজীর কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘সংবাদ আসিমাছে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন।...বোধ করি শঙ্কা তাঁহাদের এই যে, এতবড় ভারতে নেতৃত্ব করিবার লোক আর তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও একথা বলিব যে, যেখানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন অভিমত বারংবার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহাসম্মিতিকে পঙ্গুপ্রায় করিয়া আনিয়াছে, সেখানে মহাত্মার অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্বভৌম অধিপত্য কল্যাণকর নয়।’^{১৮}

আগেও বলা হয়েছে চরকা, শান্তি-অশান্তি, হিংসা-অহিংসা, জাতীয় মুক্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র জাতীয় নেতাদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। শাসকদের অত্যাচার ও আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে জনসাধারণের হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করাকে তিনি সমর্থন করে বলেছেন, দূর থেকে এসে বারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অঙ্গ, তৃষ্ণার জল—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার?

তিনি জানতেন চলার পথ নিরুপদ্রবে কেউ ছেড়ে দেয় না, শক্তির জোরে তা পেতে হয়। তার জন্যে প্রয়োজন শ্রমিক গোষ্ঠীকে সংগঠিত করা। তার জন্যে শরৎচন্দ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এগিয়ে আসতে বলেছেন। পথের দাবীর ডাক্তার বলেছেন, তাঁর কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র সন্তানদের নিয়ে। শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবকে কয়েকজন অভিউৎসাহী সমালোচক মধ্যবিত্ত প্রীতির পরিচয় বলে বাঙ্গ করেছেন। অথবা কটুক্তি না করে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে দেখা যাবে বিংশ শতকের প্রথম দিকে মধ্যবিত্তরাই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংগঠন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

এবং বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মুজফ্ফর আহমদও তখনকার দিনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছেই আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, ‘ভারতের নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এক্ষেত্রে সমবেত হতে হবে। চাষী আর মজুরদের মধ্যে জীবনের বাণী প্রচার করা আর তাঁদের সত্যকারের জীবনের সন্ধান দেওয়াই নবীন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র কাজ।’^{১৯}

এদিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব শরৎচন্দ্র যথেষ্ট দূর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিকতায় প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, শ্রমিক সংগঠনে অধিপত্য বিস্তারের বাসনা সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানতেন মধ্যবিত্ত সমাজের থেকে আসা শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের প্রভু হয়ে বসেন, শ্রমিক-কৃষকের অগ্রগতির পথে তাঁদের শ্রেণী দুর্বলতা আরোপ করেন। এমন কি মালিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তাঁরা শ্রমিককে আন্দোলনের বাস্তবতা থেকে সরিয়ে আনেন বা প্রকৃত সংগ্রামের সময় তিনি বা তাঁরা শ্রমিকদের পরিত্যাগ করেন। শরৎচন্দ্র এই ইতিহাস সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি শ্রমিক নেতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আজ আমাদের দেশের শ্রমিকেরা জাগ্রত নয়, সংঘবদ্ধ নয়, পীড়ন এবং শোষণও তাদের ওপরে অকথা বর্ষরভাবে চলছে, আজ তোমাদের দরকার রয়েছে তাদের জাগাবার কাজে, সংঘবদ্ধ করার কাজে, আত্মনিয়োগ করবার জন্যে।

কিন্তু যেদিন এদের ঘুম ভাঙবে, এদের মধ্যেই আসবে সংঘবদ্ধতা, তখন শ্রমিকদের ভিতর থেকেই নেতা সৃষ্টি হবে, সেদিন মধ্যবিত্ত নেতাদের প্রয়োজন আর হবে না। এ কথা বলে শরৎচন্দ্র নেতাদের বলেছেন, সেদিন পরিচালনার ভার শ্রমিকদের উপর ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। মন তৈরী করতে হবে। ওদের উপর নেতৃত্ব করবার মোহ যেন না জন্মায়।

‘পথের দাবী’ গ্রন্থে বিপ্লবের যে আয়োজন আছে তা কিন্তু ব্যাপক নয়। তার জন্যে সবাসাচীর আক্ষেপ নেই। মাও-জে-দং বলেছেন, ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে দাবানল সৃষ্টি হবে। সবাসাচীও সেই ফুলিঙ্গের কথাই বললেন ভারতীকে^{২০}। যে অগ্নিস্কুলিঙ্গ জনপদ ভষ্মসাৎ করে

ফেলে, আশ্রয়তনে সে কতটুকু জানো? সহর যখন পোড়ো, সে আপনার ইচ্ছা আপনি সংগ্রহ করে দক্ষ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ববিধানের এ নিয়ম কোন রাজ্য শক্তিই কোনদিন ব্যত্যয় করতে পারে না।

সব্যাসাচী বলেছেন, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে কুলি-মজুরের মাঝখানে, কারখানায়—ব্যারাকে কিন্তু চাষীর কুটিরে নয়। শরৎচন্দ্রের এই চিন্তার সঙ্গে ষ্ট্রটস্কির মতের ঞানিকটা মিল আছে, লেনিনবাদী চিন্তার সঙ্গে সাধুজ্য খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন। মার্কসবাদ বলে কৃষক শ্রেণী হলো বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। অবশ্য শরৎচন্দ্রই বলেছেন, ‘কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ-অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।’ এ বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচন করা হবে।

শ্রেণিগত মানুষের জন্যে তাঁর পুঞ্জীভূত বেদনা এবং বহুবাদী সাহিত্য তাঁকে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তুললেন। আজও প্রতিটি শ্রমিকের হৃদয়ে শরৎচন্দ্রের সুদৃঢ় অঙ্গীকার সোচ্চারিত হচ্ছে, ‘মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে

চলবার, সর্বপ্রকার দাবী, অঙ্গীকার করে আমরা, সকল বাধা ভেঙ্গে-চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে, তারা যেন নিরুপদ্রবে হাটিতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন রোধ না করতে পারে।’^{১০}

শিবদাস ঘোষ বলেন, ‘শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এ দেশে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। ফলে, লেনিনের মত একটি সঠিক মার্ক্সবাদী নেতৃত্ব যদি সেই সময় এ দেশে থাকত, এবং সেই নেতৃত্ব যদি ঠিক লাইনে সাহিত্যকে প্রভাবিত করতো, তাহলে গোর্কীর মত শরৎচন্দ্রের মারফৎ এদেশে হয়তো সর্বহারা সাহিত্যের জন্ম হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। আর হলে তা গোর্কীর চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের সাহিত্য হ’ত। কারণ শরৎচন্দ্রের শিল্পশৈলী গোর্কীর থেকে নিঃসন্দেহে উন্নতধরনের।’ এ সম্বন্ধে সকলেই অবশ্য একমত হবেন যে শরৎচন্দ্র তৎকালীন বঙ্গ তথা ভারতীয় সমাজে প্রগতিশীলতার অগ্রদূত।

১০। শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (১০ শ)	পৃ ১৫৩
১১। তদেব	পৃ ১৫২
১২। তদেব	পৃ ২৩২
১৩। তদেব	
১৪। ধুব সংস্কৃতি, অক্টোবর, ১৯৭৫	
১৫। শরৎসাহিত্য সংগ্রহ (১৩ শ)	পৃ ২৯৪-৯৫

১৬। তদেব (৪র্থ.)	পৃ ৩৯৮
১৭। তদেব (১০ম)	পৃ ৩৪০
১৮। প্রবন্ধ সংকলন—মুজফ্ফর আহমদ, পৃ ৯	
১৯। শরৎসাহিত্য সংগ্রহ (১৩শ)	
২০। তদেব	

আমাদের নজরুল

আরাধনা গুপ্ত

ঈশ্বর ছাড়া কারো কাছে যিনি
নত করেননি মাথা
তাঁকেই জানাই-আমরা প্রণাম
হিলেন কর্মে গাঁথা।
‘সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই’—

চণ্ডীদাসের বাণী রূপায়ণে
নজরুলের দান পাই।
মানব প্রেমিক বিদ্রোহী বীর
নজরুল ইসলাম
তাঁকেই জানাই বারে বারে আজ
শত সহস্র প্রণাম।

বহু পুরাতন একটি রোগ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

রোগীরা অথবা রোগীর অভিভাবক যান চিকিৎসকের কাছে রোগ সারাতে। কিন্তু সব রোগীই কি যান? এমন বহু রোগী আছেন, যাঁরা রোগটি পুষে রাখতেই আগ্রহ করেন, সে রোগ মনোরোগ। এ রোগের আক্রমণ হয়নি মানবের মনে, এমন মানব জন্মেছেন কি? মনোরোগ ছোঁয়াচেও বটে, আবার জন্মসূত্রেও আসে, আবার পরিবেশগত কারণ থেকেও আসে।

এই রোগের মৌল কারণ অনেক কি না, আজও তা নিরূপিত হয়নি, শুধু একটি কারণই নির্বাচিত হয়েছে, সেটি হলো—“মৌলিক ও আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝন্ড” অর্থাৎ সেই আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে সামাজিক নিয়ম ও নীতিবোধের ঝন্ড যে নিয়ত লেগেই আছে, সেই ঝন্ড অনেকের জীবনে নানাভাবে মানসিক কারিগরী বা প্রক্রিয়ার দ্বারা দূর করা হয়, যাদের মনে সেই ঝন্ড দূর করা যায় না তাদের প্রবৃত্তিগুলি অবদমিত হয়ে নিজ্ঞান মনের তলায় লুকিয়ে থাকে, কিন্তু সেখান থেকেও প্রবৃত্তিগুলি চূপ করে থাকে না অর্থাৎ নিজ্ঞান হয়ে থাকেন, সেগুলি নানাপ্রকারে আত্মহত্যা বা আত্মবিকাশের পথ খোঁজে; ফলে দেখা যায় বিপর্যয়, সেইজন্য কারও মধ্যে তা ঘন ঘন বিকাশ পায়, কারোর বা ফাঁকে ফাঁকে। সবই হয় পরিবেশ পেলে? না কি এটা যাপ্য রোগ? অথবা অসাপ্য রোগ? এমনি রোগগুলির মধ্যে শূচিবায়ুও তো রোগ (শূচিবায়ু সংজ্ঞাটি দেশীয় ভাষা)।

পুরোহিত যাচ্ছেন নামাবলী গানে, চাদরের ভিতরে ডানহাতের মুঠোয় ধরা আছে নারায়ণ শিলা। তিনি এমন ভাবে পথে চলেন যেন এই বুঝি কাউকে ছোঁয়া গেল। আবার পাণ্ডিত্যশাই তিনিও কারও বাড়িতে (যদি অগ্রাঙ্গণ হয় তবে তো আরও) গেলেন, বসা ওঠা, খাওয়া দাওয়া সবেতেই একটা স্বাতন্ত্র্য রেখে চলেন। পাড়ার কোন নবীনা বা প্রবীণার মধ্যেও একক সম্মান দেখা যায়, বেশ স্বাতন্ত্র্য বোধে চলাফেরা, এসবই সেই শূচিবায়ুর প্রতিক্রিয়া।

এখন প্রশ্ন, এই শূচিবায়ু রোগ কি মানবের সহজাত?

এর উত্তরে মনোরোগীর চিকিৎসকরা বলেন, এটা মানবের

একধরনের সহজাত রোগ। আয়ুর্বেদের যেটি অন্তর্দীর্ঘ সেটি চরকসংহিতার ঋষি শারীরস্থানের ঐর্থ অধ্যায়ে বহু পূর্বেই বলেছেন “মানবের মানস-প্রকৃতিটা গঠিত হয় স্বভূ. রজ, তমো গুণের স্বাভাবিক গুণ প্রকৃতি নিয়ে।” সেই প্রকৃতির বিকাশ হয়—পরিবেশগত অবস্থার মধ্য দিয়ে। এটা সার্ব-কালিক, এবং বিশ্বের মানবসমাজে থাকবেই। যেখানে যেমন পরিবেশ, সেইখানেই সেই তিনটি প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বিকাশ। জলপ্রধান দেশের পরিবেশে একধরনের শূচি-বায়ু, আবার মরুপ্রধান দেশের ভিন্ন ধরনের। এক শ্রেণীর বা এক গোষ্ঠীর যা খাদ্য, হয় তো অপর গোষ্ঠীর তা অখাদ্য, আবার কোথাও তা অস্পৃশ্য বা ঘৃণ্য।

এমনি খাওয়া মাথা, স্নান করা, আলাপ করা, কাপড়-চোপড় পরা, শোওয়া, সবই এক ধরনের নয়। এক উপা-দানের হয় না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ হলেও শূচিবায়ু রোগটির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন। কারণটা একই অর্থাৎ প্রকৃতি সেই তিনটেই। কিন্তু পরিবেশ আলাদা পেলেই প্রকৃতি তিনটির বিকাশ আলাদা আলাদা হয়ে যায় মাত্র।

প্রাচীনগণ বলতেন—

বহিরাচমনং স্নানং

প্রায়শ্চিত্তং চ শূচ্যতি।

অন্তরীয়া স্ব প্রাধান্যং চ

সম্বেহঃ পর প্রত্যয়ঃ।

অর্থাৎ এই রোগটি যেদিন থেকে দেখা দেয়, সেদিন থেকেই লক্ষ্য করা যায়, এ ব্যক্তির ভিতর বার আলাদা হয়ে গেছে। “হাত ধোওয়া, স্নান, অনুষ্ঠান করে শুদ্ধ হওয়ার টান ক্রমেই বাড়তে সেটা কিন্তু বহিঃস্বভাব। আর অন্তরে থাকে প্রত্যেকের প্রতি ঈর্ষা, সম্বেহ (এই বুঝি আমার টেকা দিলে, এই বুঝি আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে) এই হোলো তার অন্তর, আর বাইরের তফাৎ। মূলে থাকে নিজের প্রাধান্য-বোধ। অথচ এরা পরের স্তানে চলতেই ভালবাসে, এবং যে তার মনজুগিয়ে কথা কয় তাকেই বিশ্বাস করে।

প্রাচীনগণ এর কারণ নির্ণয় করতে বলেছেন:

সবাধ ভাবনা বৃত্তো, ভয়ঃ নির্দায় কর্মসু,

মনোবেগ পরিদ্রষ্টঃ ব্যাধয়োমনসি ভবাঃ।

অর্থাৎ যদিও গর্ভাবস্থায় থাকার সময় থেকেই মানবশিশুর মধ্যে সচেতনতা থাকে কিন্তু তা অভ্যন্তরীণ অস্পষ্টতায় থাকে।

একটা বোধ থাকবেই। তাহলেও তার বিকাশও হয় না, আর পরিবেশবোধও হয় না। কিন্তু প্রসূত হবার পরই পরিবেশের আবহাওয়ায় তার মনে একটা বিষয়বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়করণ বৃদ্ধি ক্রমেই জাগতে থাকে। কিন্তু যে-শিশু সর্বদাই তার স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা পেতে থাকে, তখনই, তার মনে হৃদয় দেখা দেয়। অথচ প্রকৃতি অনুযায়ী সেই বাধাকে দূর করার চেষ্টা করে। মনের এই পদ্ধতিটি পরিবেশকে গ্রাস করতে যায়, তখন থেকেই জন্ম নেয় ভয়, ভিন্ন পথে ক্ষতি পূরণ, অলীক কল্পনা, অন্যের প্রতি হীনভাব, নিজের দোষ অন্যের উপরে আরোপ, যুক্তি-পূর্বক অভ্যাস, প্রত্যাশা, আর জোর করে মনের ভাব দমাবার চেষ্টা। মানসিক রোগের বীজ পোঁতা হয় এইখান থেকে। আত্মবর্ষদ বহু পূর্বেই বলেছেন “স্বাধীনতাব্যাপ্তি থেকে আসে ভয়। প্রত্যেকটি কাজে দায়িত্ব গ্রহণ থেকে এড়িয়ে থাক। এর সঙ্গে সঙ্গে মনোবেগের অর্জিত আসে। তারপরেই আসে হৃদয়।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন তারুণ্য প্রোঢ় এবং বাক্যক্য। কোন বয়সেই মনের সেই বেগগুলি নিবৃত্ত হয় না। তবে পরিবেশের অভাবে পূর্ণ না হলে সেটা প্রকৃত ব্যাধিই হয়ে দাঁড়ায়।

শৈশবে শিশুমনের বেগকে অব্যবহৃত প্রসারিত করতে দেওয়া হয় না, বলেই অধিকতর মনোব্যাধি দেয় পড়াশোনায়। তখন সে বুঝতে বাধ্য হয়—পড়াশোনায় মূল্যই বেশী। এইভাবে তার মানসিক হৃদয় দূর করে। মনোবেগের ব্যাধিকে এইভাবে দূর করারই একনাম ক্ষতিপূরণ। আমাদের মন এই ক্ষতিপূরণ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

কোন দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য শিশু এগিয়ে যাবেই। ব্রেড, ছুরি, কাঁচি, কাটারি প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে একটা কিছু কাটাকুটি করার মধ্যে খুব তৃপ্তি পায়। হয়তো নিজেরই ক্ষতি হয় দেহের। কিন্তু এই তৃপ্তিটার প্রেরণার অপূর্ণ নাম একাক্ষতা। আর সেই একাক্ষতার বিকাশ হলেই নতুন নতুন কল্পনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

সেই অলীক কল্পনাগুলিকে আবার গঠন করতে যায়, তখন তাতে বিফল হলেই অভিমান, কান্দা, মাটিতে লাথি মারা, জিনিসপত্র ভাঙ্গা এইসব অবস্থা ঘটতে থাকে। এইসব বৃদ্ধি থাকবেই, তার নামই প্রত্যাশা।

মনোরোগের চিকিৎসা করতে গেলে, রোগীর অতীত জীবনের যতটা স্মৃতি থাকে সব বলতে না পারলেও চিকিৎসক তার মনকে অনুশীলন করে দেখবেন। আত্মবর্ষদে বলা হয়েছে প্রত্যেকটি মানব তার ব্যক্তিগত বা প্রকৃতিটিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একরকম রাখতে পারে না। এও যেমন সত্য, তেমনি তার সমগ্র জীবনের কার্যধারার পর্যায়-গুলিতে যে পরিবর্তন এসে এসে থেকে থেকে চলে যায় বা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে কিন্তু মূল প্রকৃতির স্বভাবটি একই আছে—একেই বলা হয়েছে (চরক খুড়িকা গর্ভাবস্থাস্থি ২২ অধ্যায় ও মহতী গর্ভাবস্থাস্থি ৪৬ অধ্যায়) :

“প্রয়ানাং অপি সন্ধানাং একৈকস্য ভেদাগম

পরিসংখ্যায়ঃ তরতমযোগাৎ বিশেষ ভেদাৎ নানাবিধানি,” অর্থাৎ মূলে সেই সত্ত্ব, রজ, তমো গুণই পরিবেশ ভেদে, নানান মিশ্রণের ফলে অসংখ্য রকমের প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়। যে গুণটার আধিক্য যখন বিকাশ পায়—সেটার বাধা না পেলেই সেই কাজই করে চলে—

মৌল তিনটি গুণই সংমিশ্রণ গুণে এটি।

আবার প্রথমটির ৭ ভেদ। দ্বিতীয়টির ৬টি ভেদ। এমনি করে প্রত্যেকটির ভেদ আলাদা।

আমরা যাকে “শুচিবাসু রোগ” বলি আসলে ওটা বারুণ সত্ত্ব প্রকৃতির প্রাবাল্য হলেই ব্যাধি, আর জটিল হলেই তার চিকিৎসায় ফল ফলে না। আধুনিক ভাষাতে ওইটি নিউরোসিস, সাইকোসিস আর সাইকো নিউরোসিস।

বারুণ সত্ত্ব প্রকৃতির লোক, গা ধোবে, মাথা ধোবে, জামাকাপড় কাচবে, ঘরদোর পুঁছবে। সর্বদা ফিটফাট থাকবে। ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করতে ভালবাসবে। যারা ওই জাতীয় প্রকৃতির লোক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা যদি তোয়াজ ভোবামদ করে, তবে খুব সন্তুষ্ট হবে, তাদিকেই অনুগ্রহ করবে। অথচ মানসিক শুচিতার জন্য যেসব সাহিত্য, চিত্র, শিল্প আছে সে চর্চা করে না। কিন্তু কোথায়

মাদুলী, তাবিজ, ফুল, তুফতাক এবং কোশলে কার্বাসিডি তার ওপরেই নিজের বাহাদুরী প্রকাশ।

এদের প্রকৃতিটি যেমন, সেই সঙ্গে তাদের (সুশ্রুত শারীর) খাওয়া দাওয়া, জলপান করার মধ্যেও সর্বদা ঠাণ্ডা জিনিস পছন্দ। কোমল সুবম বস্তুতে আসক্তি, অথচ কেউ কোমল ভাষায় তার হৃদি ধরে দিলেই বিরক্তি। এদের মাথার চুল একদিন যত্ন না করলেই পিঙ্গল, বৃক্ষ। একটু নির্বিবলি খেতে চাইবে। বাইরের কারোর সঙ্গে খুব প্রিয়ভাষা বলবে, সরল চিন্তের মত হৃদবর করে বলবে। কখনও চড়া মেজাজে কখনও অল্প কথায় কাঁঝিয়ে। কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকবে, তবে তার মধ্যে বাহাদুরী নিতে চাইবে সবসময়। এদের গায়ের রং কারোর ফর্সা, কারোর তামাটে। দাঁতগুলি একটু উঁচু হবে। মনে ঈর্ষা যেমন, আবার আত্ম-প্রাধান্যে আসক্তিও তেমন। এরা পেটের রোগে, শিরশীড়ায় ভোগে।

আর এক রকমের শূচিবায়ু—ছোট থেকেই গানবাজনায় টান, নাচের ভঙ্গীতে হাতের, পায়ে টান দিয়ে কথা বলা, সুর করে কবিতা বলা, স্তোত্র পাঠ করা, সাহিত্য উপন্যাস ইতিহাস পড়ায় রাত জেগেও থাকতে চায়; গল্প শুনতে খুব টান। নিজেকে সাজান, গন্ধদ্রব্য মাখা, সাজগোজ করে বেরোনো, পুরুষ হলে রমণীর প্রতি, নারী হলে পুরুষের প্রতি ভিতরে ভিতরে টান, সুযোগ হলে বাইরেও তাই। কিন্তু বিবেচ করে না, কারোর প্রতি ঈর্ষাও করে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু হালকা ধরনের খেতে ভালবাসে, কথা কইতে গেলেই গোমড়া মুখে বলে না, কাউকে কটু কথা বলতে খুবই সঙ্কোচ বোধ করে, যারা এমনটা করে তাড়িগকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু পরোক্ষে এতটুকুও বিবেচ জানায় না। এদের কিন্তু বাড়িঘরদোর বিষয়াসক্তি, মমত্ব-বোধ সম্বন্ধে খুব উদাসী। সমাজে এদিকে কেউ মধ্যস্থতা করতে ডাকে না, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারেও এদের কাছে কেউ আসতেও চায় না, অথচ এরা সমাজের ভাল কাজগুলির প্রশংসা করে। ঈশ্বরবিশ্বাসটাও এদের আমোদ নিষ্ঠার। কিন্তু নিষ্ঠা ভক্তির সঙ্গে হয় না। এরা

শ্রমণবিলাসী হয়, নৃত্যগীত বাদ্যযন্ত্রের গুণাগুণ খুব ভাল বোঝে। কোনও হাঙ্গামা হুজুতীর ব্যাপারে এরা একেবারে ভিজে বেড়াল। এও একধরনের শূচিবায়ু রোগ। এদের চরিত্রে দায়দায়িত্ব নিতে হলে সঙ্গীত, নাটক, হাস্য পরিহাসের ক্ষেত্রেই ভাল।

এও মনোরোগ। এরা আয়ুর্বেদের ভাষায় সর্বদা খেদোন্মত্ত রোগে আক্রান্ত হয়। আধুনিক ভাষায় এরাই ‘নিউরোস-থ্যানিয়া’ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগটির স্বভাবই এমনি। এদের কোন সমস্যা থাকে না জীবনে, কিন্তু অহং প্রাধান্য এবং আমোদ প্রমোদটা প্রকৃতিগত কারণে থেকেই থাকে, আর তারই জন্য কাস্থিত সমস্যা সৃষ্টি করে। দ্বায়বিক অবসাদে এরা ভোগে। এরোগে আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী। বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের মরণোত্তর জীবনীপাঠ করলেও জানা যায়। আবার যারা তাদের জীবৎকালের জীবনচর্চা দেখেছেন, তারাও তা অনায়াসে বুঝবেন। এরা গান্ধর্ব প্রকৃতি সত্তা নিয়ে জন্ম। এদের প্রকৃতির বিকাশও একধরনের শূচিবায়ু রোগের।

এমনিভাবে আয়ুর্বেদ ব্রহ্ম-প্রকৃতি, আর্ষ-প্রকৃতি, ঐন্দ্র-প্রকৃতি, যাস্য-প্রকৃতি, কোবের-প্রকৃতি, আসুর-প্রকৃতি, রক্ষ-প্রকৃতি, পিশাচ-প্রকৃতি, বনস্পতি-প্রকৃতি, মাংস্য প্রকৃতি, এবং পাশব প্রকৃতি প্রভৃতি বহুপ্রকার প্রকৃতির মধ্যে মানবের অভ্যাসগত তারতম্যগুলি চমৎকারভাবে নিরূপণ করে বলেছেন :

মানবজীবনে যেমন প্রাণৈষণা, ধনৈষণা, লোকান্তরেষণা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তেমন মনের ভাবচিন্তা, আবেগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিও ব্যক্তিত্বের মধ্যেই গূঢ় এষণা হয়ে লুকিয়ে থাকে। সেই গূঢ়েষণাই মানুষকে সর্বদা প্রভাবিত করে চলেছে। সেই গূঢ় এষণাকে প্রকাশ করতে যাওয়ার নামই “শূচিবায়ুতা”। প্রতি মানুষের মধ্যে যেমন গূঢ় এষণা লুকিয়ে আছে, তেমন আছে সেগুলি প্রকাশ করার ব্যগ্রতা। ব্যগ্রতাটা নির্বোধ হলেই তা শূচিবায়ু। এ ব্যাধি সবাইই আছে। প্রবল হলেই ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসা হলো পরিবেশ বদল।

ভুল ঠিকানায় রিক্তা মুখোপাধ্যায়

গেটপাস, গেটপাস আছে তোমার? চমকে ওঠে অলকেশ সামনে বিকট আকারের এক জীব। ওকে জীব ছাড়া আর কি বলবে অলকেশ? কাগজে তুমার মানবের কথা পড়েছে এর সঙ্গে সে বর্ণনায় তেমন মিল কোথায়? তবুও এই কৃষ্ণবর্ণ লোমশ জীবটি যত অপরিচিতই হোক বাংলা বলতে পারে। জীবটি আবার হেঁকে ওঠে, গেটপাস আছে? এটা কিন্তু দক্ষিণ গেট। গেটপাস, দক্ষিণ গেট, এসব আবার কি কথা! অলকেশের সব কিছু যেন গোলমাল লাগে। কিন্তু পেছন থেকে একটা ঝাঁঝাল গলা শোন যায়, গেটপাস আবার কি? ন্যাকামী, নিয়ে তো এসেছ নিজেরা এবং তাও আমাদের অনিচ্ছায়। পরিচিত গলার ঝাঁজে অলকেশ পেছন ফিরে সুবর্ণাকে দেখতে পায়। অবাক গলায় বলে আরে তুমি? এসব কি ব্যাপার বলত?

ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ড, চিরকালই গোপাল বড় সুবোধ বালক রয়ে গেল। এটা বুঝতে পারছনা, যে এটা যমের দক্ষিণ-দোর।

মানে? আমরা কি মরে গেছি?

ঢং, সুবর্ণার গলায় তখনও উদ্ভাপ। সামনের ঐ ঘটোৎকচ মার্কাটাকে দেখেও বুঝতে পারছ না, ডাঙ্গস হাতে কেমন দাঁড়িয়ে আছে।

সুবর্ণার গলার উদ্ভাপে ডাঙ্গসধারী দূতও ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। সেই অবসরে অলকেশের হাত ধরে সুবর্ণা ভেতরে ঢোকে। প্রথমটা অন্ধকারে চোখে কিছু পড়ে না। তারপর অন্ধকারটা সরে আসে। মূর্খ অন্ধ ছাে আলোকিত পথ পার হয়ে দুজনে হাজির হয় এক প্রকাণ্ড সভাকক্ষে। সভাকক্ষ বেশ আড়ম্বরে সাজানো হলেও লোক কিন্তু মাত্র দুজন। না, দুজন নয়। দেওয়ালের ধার বেসে পাথরের স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে ঘটোৎকচ মার্কা আরও কিছু লোক। একটু নীচু আসনে যে বসে আছে তার নাকের ফুটো দুটো বিদ্রী-নোংরা, নসিহতে ঠাসা। অনেকটা পিস্তলশূরের মত। সামনে একটা তেল চিট্‌চিটে জ্বালা খাতা। সেই খাতা থেকে মুখ তুলে লোকটি ওদের গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, নিবাস?

ঢং। সুবর্ণার মুখে আগুনের হলুদ।

লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝখান থেকে ঠিক আমাদের খুঁজে পেতে নিয়ে আসা হল, আর নিবাস জানে না।

নীচের লোকের সঙ্গে উচ্চ আসনে বসা লোকটির দৃষ্টি বিনিময় হল। উচ্চ আসনে বসা লোকটি বলে, এটা জিজ্ঞাসা করা আমাদের নিয়ম। তেঁতো গলায় সুবর্ণা বলে, কেন এটা বিধানসভা নাকি? মিথ্যুককে মিথ্যাবাদী না বলে এটা সত্যভাষণ নয় বলা? অলকেশ এই ফাঁকে কানে কানে বলে, এই বোধহয় যমরাজ। বোধহয় কেন এই যম, তোমার আর আমার। দেখছ না কেমন যাদুদলের মত পোষাক পরেছে। গরমে গল্‌ গল্‌ করে ঘামছে তবুও। কেন একটা বাটিকের পাঞ্জাবী পরলে নরক অশুদ্ধ হত? যমরাজ গম্ভীরগলায় বলে কিসে তোমাদের মৃত্যু হল?

কিসে আবার? সুবর্ণা উত্তর দেয়, টুকে পাস করা ডাক্তারদের চিকিৎসায়। ও গুলোতো তোমারই স্যাঙাৎ, তফাতের মধ্যে ওদের হাতে ডাঙ্গসের বদলে সেটখো আছে।

তা তুমি কি তোমার স্বামীর অনুগামী হয়েছ?

কোন দুঃশে? সুবর্ণা বলে, ওর মরার খবর পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই আর জ্ঞান ফেরাবার জন্য ডাক্তার যে Injection দিয়েছিল, তাতেই চট করে এখানে আসতে পেরেছি। ওষুধটা ভেজাল ছিল কিনা।

যমরাজ একটু সতর্ক হন। যেভাবে যার দ্বারাই সুবর্ণা এখানে আসুক না কেন তবুও সে স্বামীর অনুগামী হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল অনেকদিন আগেরকার একটি ঘটনার কথা। সেই মেয়েটিরও নামের আদ্যাক্ষর “স” দিয়ে। বড় ঠ্যাটা ছিল সাবিদ্রী নামের মেয়েটা। খুব নাস্তানুবাদ হয়েছিলেন তিনি। আজকাল তিনি তাই নিজেকে কোন কেস নিজে হাতে করেন না দুজনের পাঠান। কিন্তু কোথায় যেন একটা গুণ্ডগোল পাকিয়েছে। এরতো আসার কথা নয়। বরং বঁচে থেকে বেশ কিছুকাল মাছ ছাড়া আলোচাল আর কাঁচকলা সেক্স খাবার কথা। এবার চিত্রগুপ্ত বলে, তোমার কাঠকাঠ কথা শুনেন মনে হচ্ছে তুমি কমিউনিস্ট।

অলকেশ একটু আপত্তি জানাতে চায়। ও আবার গোড়া কংগ্রেস। ওকে এক ধমকে থামিয়ে সুবর্ণা বলে, কম খেয়ে

কম পরে, রেশনে কম করে চাল চিনি পেয়ে কমিউনিস্ট।
যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বলে, নোট করে রাখ। তারপর মিহিগলায়
বলে, ইয়ে, সুবর্ণা, তোমাকে ফিরে বেতে হবে মর্ডে।

ঠাণ্ডা গলায় সুবর্ণা বলে বেশতো ওকেও নিয়ে যাব।
তারপর বেশ করে ব্যাটাপেটা করবো পাশকরা
ডাক্তারগুলোকে।

চিত্রগুপ্ত বলে তুমি কি পাশ?

B. A. অনার্স নিয়ে আর একবারও ব্যাক না পেয়ে।

তবে তো তোমার শিক্ষাদীক্ষা আছে, যমরাজ ভরসা
পান। সারিটী নামে সেই মেয়েটার মত একগুয়ে মুখা
নয়। তিনি বলেন, যা ভুলচুক হবার হয়েছে। এখন
তোমার এখানে আসার সময় হয়নি।

মুখের কথা কেড়ে নেয় সুবর্ণা, সে তো জানি, দায়ী তো
ভেজাল ওষুধের কারবারীরা। তাদের গিয়ে বোঝাও না।
নাকি সেখানে কোঁকানি খাবার ভয় আছে।

হিঃ হিঃ এক শিক্ষিত মেয়ের মুখের ভাষা? শিউরে
উঠে চিত্রগুপ্ত। অবজায় নাক কুঁচকায় সুবর্ণা, তবু তো
ইলেকশনের সময়ে অপজিসন্দের বক্তৃতা শোননি।

ওসব কথা থাক। যমরাজ মধ্যস্থতা করেন। সুবর্ণা মা,
ভেবে দেখো তোমার শিশুপুত্ররা মাতৃদুগ্ধ পানে বঞ্চিত হবে।

কে টুকলু বুকলু? তারা মাদার ডেয়ারীর দুধ
খায়।

এবার যমরাজ কিছু উত্তপ্ত হয়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী
তোমাকে ফিরতে হবে। এবার অলকেশ সুবর্ণা দুজনে
বলে, জোর করলে আমরা কিন্তু এখানে আমরণ অনশন
করব। হেসে ওঠে চিত্রগুপ্ত। তোমরা তো কবেই মরে
ভূত হয়ে গেছ।

তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। সুবর্ণা উৎসাহের সঙ্গে
বলে অনশনের সময়ে খড়ের গদির তলায় সিঙ্গাপুরি কলা
আর পাউরুটি লুকিয়ে রাখার ঝামেলা নাই। অলকেশ তো
সঙ্গে সঙ্গেই গদিয়ান হয়ে বসে পড়ে। ক্ষিপ্ত যমরাজের
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে।—দুতেনের আদেশ করে বেশকরে ডাঙ্গস্
পেটা কর।.....

পাঁজরে প্রচণ্ড খোঁচা খেয়ে অলকেশ চোখ মেলতে দেখে
সুবর্ণা বলছে আর কত ঘুমবে? দুধ না আনলে চা হবে না,
আনাজপত্রও কিছু নাই। অলকেশ বাথরুমের দিকে যেতে
যেতে ভাবে যমদূতের ডাঙ্গসের খোঁচা বোধহয় সুবর্ণার নরম
আঙ্গুলের খোঁচার থেকে সহনীয়।

‘মুক্তি চাও, মুক্তি কি পাও নাই? আত্মা এক—নিতা-মুক্ত-স্বভাব, শুদ্ধ, বুদ্ধ, চিদানন্দময়।
বিষাধারে সেই এক-তত্ত্ব ফুটাও, মহামুক্তির চেতনায় সারা দেশ, জাতি, মানবমণ্ডলীকে উদ্ধৃত্ত,
উন্মাসিত করিলা তোলা। তোমরা যে প্রবর্তক, ঈশ্বরকোটির থাক, যুগে যুগে প্রবর্তনই তোমাদের
কাজ। আত্মামুক্তি, মোক্ষ, সিদ্ধি-সাধনায় তোমাদের প্রয়োজন নেই।’

—সঙ্গগুরু শ্রীমতিলাল

(২)

মায়ামাস শেষ হয়ে ফাল্গুন পড়ল। গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে। কৈলাসপতি বিদ্যালয় আগের মত চলছে মনে হলেও যেন তার সেই আগের মত গতি নেই—যখন সুনন্দা ছিল কিংবা সুছন্দা। ক্রমে আরেকটা মাঘ মাস এসে পৌঁছে গেল। হাজিগড়ের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন নেই। আগের মতই করিমনগর থেকে বাস ছুটে চলেছে হাজিগড় ছুঁয়ে জাহানাবাদ পর্যন্ত। স্কুলের প্রেসিডেন্ট মণিরাম পাণ্ডে এই বৃদ্ধ বয়সেও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়ে আছেন দীর্ঘকাল ধরে। দাবড়ে বেড়াচ্ছেন শহরময়। কোথাও যেন এতটুকু মনলা না থাকে, রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা থাকলে ভাড়ি ঘাড়ি মেরামত চাই। অনেকসময় এইসব কাজের জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির তহবিলে টাকা না থাকলে নিজের পকেট থেকে খরচ মিটিয়েছেন। মেজাজটা কৈলাসপতি উপাধ্যায়ের মত খানিকটা। কৈলাসপতি যেমন প্রয়োজনটা বুঝতেন আগে। টাকা কে দিল, কোথা থেকে এলো এসব তাঁর কাছে ছিল গোপ। যখন বুঝেছেন কাজটা জরুরী, তখন করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কাজ শেষ করে তবে শান্তি। হোক ছোট জায়গা, তবু হাজিগড় আজ মনোরম শহর হয়ে উঠেছে। কৈলাসপতির স্বপ্নকে আজ সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মণিরাম পাণ্ডে।

সোঁদন কি কারণে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। অফিসরুমে নীহারকণা কাগজপত্র দেখাচ্ছিল একা বসে। চন্দ্রা এলো।

—বড়দি, আপনার কি দেরী হবে? তাহলে আমি যাচ্ছি।

নীহারকণা মুখ তুলে বললে—তুমি এখনও যাওনি? একটু বোসা, আমার হয়ে গেছে—একসঙ্গেই বেরোবো।

চন্দ্রা একটা চেয়ার টেনে বসল।

নীহারকণা হাতের কাগজপত্র সরিয়ে রেখে বলে—আচ্ছা চন্দ্রা, আমি এই স্কুলে বেশ কিছুদিন হলো এসেছি কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আগের হেডমিস্ট্রেস সম্বন্ধে তোমরা একটা কথাও বললে না। সেক্রেটারী কিছু বলতে চান না। অবশ্য আমার না জানলেও চলবে। অপরের বিষয়ে এমন

কৌতূহল থাকা উচিত নয়, জানি, তবু কেন যে জানতে ইচ্ছে করে।

চন্দ্রা বলে সুনন্দাদির সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল আমরা পছন্দ করি না। তার বিষয়ে কিছু বলতে গিয়ে যদি তাকে কোনভাবে ছোট করে ফেলি, তাই আমরা মুখ খুলি না। সবাইকে তো সবাই ঠিকমত বুঝতে পারে না।

নীহারকণা বলে—চন্দ্রা, এই এতদিনে কি আমি তোমাদের একজন হয়ে যেতে পারিনি?

—না বড়দি আমি তা বলতে চাইনি। আপনাকে শ্রদ্ধা করি।

নীহারকণা গম্ভীর হয়ে বলে—সুনন্দা ঘোষের বিষয়ে কোনভাবেই মুখ খুলবে না ঠিক করেছে। বেশ, আমি আর কোনদিন জিজ্ঞেস করব না। শুধু একটা কথা জানতে চাইব—সুনন্দা এখন আছে কোথা, কি করছে?

চন্দ্রা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—সত্যি বলছি, সুনন্দাদি কোথায় আছে আমি জানি না। হাজিগড়ের কেউ জানে বলে মনে হয় না।

নীহারকণা বলে—ফাইল থেকে ঠিকানা নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়ী।

—জাহানাবাদে?

—হ্যাঁ। সুনন্দার মার সঙ্গে দেখা হল। মেয়ে কোথায় গেছে মা জানে না। মেয়েদের নামে যা তা কথা, গালাগালি দিয়েও ক্ষান্ত নয়—উল্টে শাপশাপাস্ত। তোমরা কিছু না বললেও আমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি।

চন্দ্রা উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে।

বলে—ছি ছি, আপনি সুনন্দাদির ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছেন। আপনি যে এইরকম প্রবৃত্তির মানুষ আমি বুঝতে পারিনি। এতে আপনার কি লাভ?

নীহারকণার ঠোঁটে ক্রুর হাসি। বলে—লাভ আছে, পরে দেখতে পাবে। মনে রেখো তোমাকেও রেহাই দোব না।

পরদিন সেক্রেটারী চন্দ্রাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়ীতে। যেতে উনি বললেন—চন্দ্রা, মিস ঘোষের

একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা তোমার নামে আমার কেয়ারে এসেছে। আমি খুলিনি, একটু বস আনিছি।

নন্দকিশোরবাবু ভেতরের ঘর থেকে একটা খাম এনে চন্দ্রাবতীর হাতে দেন।

বলেন—তোমার বাড়ীতে কিংবা স্কুলের ঠিকানায় না পাঠিয়ে আমার এখানে পাঠাল কেন বুঝতে পারছি না।

চন্দ্রা খামটা খুলতে খুলতে বলে—বোধহয় অন্য কারো হাতে যদি পড়ে এই ভয়ে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়েছে। ইয়া আমাকেই লেখা। কিন্তু—আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমি চলি। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করব।

—আচ্ছা। কি লিখেছেন বলে যেও।

—একটা কথা ছিল স্যার। আমার পক্ষে বলাটা ঠিক হবে কিনা জানি না। আপনি আমাকে নিজের মেয়ের মত দেখেন, তাই হয়ত খানিকটা সাহস পাই।

নন্দকিশোর বলেন—তুমি সংকোচ করছ কেন চন্দ্রা। যা বলার আছে বলে ফেল। আমার মেয়ে বিমলার তুমি বন্ধু, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

চন্দ্রা বলে—সুনন্দাদির জাহানাবাদের বাড়ীতে হেড-মিস্ট্রেস গোয়েন্দাগিরি করতে গিচ্ছল। নন্দাদির মার তো মাথায় গোলমাল, তাই নানান উণ্টোপাণ্টা কথা শুনে এসে আমাকে শাসিয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে এতে কি লাভ আছে।

নন্দকিশোরবাবু বলেন—তুমি ছেলেমানুষ তাই বুঝবে না লাভ কোন্‌খানে আছে। সুনন্দার বিষয়ে হেডমিস্ট্রেস এত কৌতুহলী কেন জান? লক্ষ্যবস্তু সুনন্দা নয়—সুছন্দা।

চন্দ্রাবতী বলে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার।

—তবে শোন। কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোপনে রেখ। দিব্যোদ্যুবাবুকে মনে আছে? নীহারকণার স্বামীর নাম দিব্যোদ্যু রাহা।

—কিন্তু ঠিক পদবী তো সোম। তাছাড়া উনি বলেছেন যে স্বামী মারা গেছে বহুদিন হল।

নন্দকিশোর হেসে বলেন—মারা যাননি, ডিভোর্স হয়েছিল। তা একরকম মারা যাওয়ারই সামিল। নীহারকণার ছেলের নাম জয়ন্ত রাহা, যে জাহানাবাদ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কাজ করে।

চন্দ্রা হতভম্ব। বলে—আপনি এত খবর জানলেন কি করে?

নন্দকিশোর একটু অনামনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর বলেন—স্বদিকে চোখকান খোলা রেখে না চললে স্কুল ভাল চলবে কেমন করে? যাক্‌গে তোমায় এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। যা করার কমিটি করবে, আমি করব। ইয়া ভাল কথা—তোমার রেজাল্ট কবে বেরোচ্ছে?

চন্দ্রা বলে—সামনের মাসে।

—তুমি এক কাজ কর চন্দ্রা। পাটনায় বিমলাকে একটা চিঠি দিয়ে দাও। ওর স্বশুর তো ইকনমিক্সের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট। খবরটা হয়ত আগেই পেয়ে যেতে পার।

—বিমলাকে আমি চিঠি দিয়েছি কদিন আগে।

নন্দকিশোর হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন—সাবাস! এমন নইলে আমার স্কুলের টিচার। ঠিক আছে এখন যাও, তোমার আবার স্কুল আছে। কাল এসে বলে যেও চিঠির খবর।

(৩)

রাতে বাড়ীতে সকলে শূয়ে পড়ার পর চন্দ্রা তার নিজের ঘরে টেবিল আলোর সামনে বসে পড়ছে সুনন্দা ঘোষের চিঠি:

ভাই চন্দ্রা,

অনেকদিন কেটে গেছে তোদের কাছ থেকে চলে আসার পর। ভেবেছিলাম কোন যোগ রাখব না কারো সঙ্গে। কিন্তু মনের সঙ্গে যুক্ত করে জিততে পারলাম না। অন্ততঃ সত্যি যেটা তা জানানো দরকার মনে করলাম। আমার বিষয়ে অনেকে যা জানে তা সব নয়, সত্যি নয়। আমি নিজে থেকে কোনদিন কিছু বলিনি, আর যা রটোঁছিল তার কোন প্রতিবাদও করিনি।

দিব্যোদ্যু ভালবাসত আমার দিদি সুছন্দাকে। দিদি একসময়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে দিব্যোদ্যুর কাছে চলে গেল দানাপুরে। আমি গোপনে দানাপুরের খবর রাখতাম আর মনে মনে রাগে দুঃখে জ্বলতাম। কিন্তু কিছু করার ছিল না।

নন্দীকশোরবাবু মণিরামবাবুর মত সং ও চরিত্রবান লোক। উনি আমার ব্যাপার সব জানেন। সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনতেন, নানান বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। লোকে ভাবল আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অন্য ধরনের। লোকের ভাবনার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার চাকরী ছেড়ে চলে আসার পেছনে যে ঘটনা রয়েছে—সেটা বলে চিঠি শেষ করব।

আগেই বলেছি যে দিব্যেন্দু আর দিদির খবর আমি নিয়মিত রাখতাম। একসময়ে জানতে পারলাম যে দিব্যেন্দু দিদিকে ছেড়ে পালিয়েছে। ইতিমধ্যে ওদের একটা ছেলে হয়েছে। দিদি নিঃশব্দে থেকেছে। জানিস তো দিদির কত সহ্যশক্তি ছিল। ওদের বিয়ে হয়নি, কিছু করার নেই। আরো কিছুদিন পরে জানলাম যে দিদি কষ্টে-স্ট্রেটে টিউশানী করে দিন গুজরাণ করছে। তারপর আরো অনেকদিন কাটল। হঠাৎ জানতে পারলাম দিদি মৃত্যুশয্যা, দিব্যেন্দু এসে ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেছে দেবদুর্গ, সেখানেই নাকি তার আশ্রয়।

আমি বাড়ী যাবার নাম করে ছুটি নিয়ে গেলাম দানাপুর। দিদিকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম। আমাকে চিনতে পারল। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। কথা বন্ধ হয়ে গেছে, কিছু বলার থাকলেও বলতে পারল না।

দিদির মৃত্যুর পর আমার আর কিছু ভাল লাগত না। অনেক কষ্টে দিব্যেন্দুর ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি দিলাম। উত্তরও পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। তাই চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম এখানে শুধু বাচ্চটার জন্যে।

দিব্যেন্দু যথেষ্ট বয়স্ক লোক। হয়ত হিসেবমত ধরতে গেলে আমার বাবার বয়সী হবে। কিন্তু কেন যে দিদি তার ওপর আকৃষ্ট হল তা আজো বুঝতে পারি না। তাকে ভালবেসেছে দিদি, আমারও একসময়ে তাকে ভাল লাগত। কিন্তু সবক্ষেত্রে ভাল লাগা যে ভাল নয়, তা কেমন করে জানব চন্দ্রা।

বেশীদিন তাকে সহ্য করতে পারিনি। ইয়া ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। ছেলেটাকে নিয়ে আমি আছি। ছেলের কি নাম দিয়েছি জানিস? শক্তিমান, শক্তিমান ঘোষ। দিব্যেন্দুর পদবী আমি ব্যবহার করতে দেব না। ছেলে আমার আগে ডাক্তার ‘মাসী’ বলে, এখন বলে ‘মা’।

জানিস চন্দ্রা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হাজিগড় চলে যাই। কিন্তু তা যে হবার নয়। একবার যেখান থেকে চলে এসেছি আবার কোনমুখে সেখানে যাব। তার ওপর আবার ছেলে রয়েছে সঙ্গে। এখানে কাজকর্মের কোন চেষ্টা করিনি, এবার বোধহয় করতে হবে। আমার সারা জীবনের জমানো টাকায় এখনও চলছে—কিন্তু সে আর বেশীদিন নয়। বসে থেলে কুবেরের ধনও একদিন শেষ হয়ে যায়।

চিঠি এখানে শেষ করছি। আমার ভালবাসা নিস্। নন্দীকশোরবাবুকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাস। ইচ্ছে হলে এ চিঠি তাঁকে দেখাস। জুল কেমন চলছে?

ইতি—তোর সুনন্দাদি

চিঠিটা পড়া শেষ করে পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলে দেয় চন্দ্রা। একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে, আলো নিভে যায়। বাইরে নিশ্চিন্ত অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। টেবিলে পরীক্ষার খাতাগুলো পড়ে আছে, দেখা আর হয়ে উঠছে না চন্দ্রার। মনটা কিছুদিন থেকে ভারী হয়ে আছে। দেবী হলে নীহারকণার কাছ থেকে যাচ্ছেতাই সব কথা শুনতে হবে। যা মুখ হেডমিস্ট্রেসের।

অথচ আগের দিনে যদি কারো অসুবিধে থাকত তবে হেডমিস্ট্রেস সুনন্দা নিজে খাতা দেখে দিত। শুধু একবার বললেই হল। চন্দ্রার বেলায় নয়, সব শিক্ষকের ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারতো। সুনন্দার মত মানুষ আর হবে না। এতটুকু রাগ নেই, সব সময়ে হাসিমুখ। ছাত্রীরা ভীষণ ভালবাসত তাকে, আবার ভয়ও করত। এখন যদি কোন ছাত্রীর তিনমাসের মাইনে বাকী পড়ে তার নাম কাটা যায়। অথচ আগের দিনে এই বাকী পড়াটা যদি কোন অভাবী ছাত্রীর পক্ষে ঘটত তবে তা মাপ হয়ে যেত। সুনন্দাদির অনেক গুণ ছিল। জুল চালানোর সে যোগ্যতা নেই নীহারকণার, হোক না কেন ডবল এম, এ।

পরদিন চন্দ্রা নন্দীকশোরবাবুকে চিঠিটা পড়তে দেয়। নন্দবাবু প্রথমে পড়তে চাননি। পরে চন্দ্রার অনুরোধে পড়লেন খুব মন দিয়ে।

তারপর বলেন—চন্দ্রা, মিস ঘোষকে তুমি লিখে দাও এখানে চলে আসার জন্যে। ছেলেকে নিয়েই আসবে।

—কিন্তু স্যার নীহারকণাদির কি হবে ?

—সে ব্যবস্থা হবে। নীহারকণাকে কমিটি আর রাখতে রাজী নয়। শুধু তোমার এম, এ-র খবরটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সে যাক, আমি আজ রাতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলব। কমিটিরও মতামত নেব। সে আটকাবে না চন্দ্রা। সুনন্দার চিঠি পেলে মিটিং ডেকে ব্যবস্থা করে নেব। তুমি বেশ গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে দাও দেবাদুনে। টাকার দরকার থাকলে জানাতে যেন সংকোচ না করে।

—স্যার—

—বল চন্দ্রা, কি বলবে।

—বুঝিছ তুমি কি বলতে চাও। প্রেসিডেন্ট ভীষণ নীতিবাগিশ লোক, কাজেই সুনন্দার এই ব্যাপারটা তিনি কি ভাবে নেবেন সেটাই তোমায় ভাবনায় ফেলেছে, তাই না ?

—হ্যাঁ স্যার।

—সেটা যে আমিও ভাবছি না, তা নয়। তবু ক্ষুলের স্বার্থে তাঁকে রাজী করাতে পারি কিনা দেখব। কমিটির অন্য মেম্বারদের জন্যে চিন্তা নেই, আমি যা বলব তাইতেই তাঁরা রাজী হবেন। যদিও প্রেসিডেন্ট কিছু বললে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে যেতে ভয় পাবে। নীহারকণার অপসারণ অবধারিত কিন্তু সুনন্দাকে আবার তার জায়গায় আনতে পারব কিনা—দেখা যাক। তুমি কালই চিঠি পোস্ট করে দাও, আগে তার মতামতটা জেনে নিতে হবে।

(৪)

অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল। চৈত্রমাস এসে পড়ল। চন্দ্রার চিঠির উত্তর দেবাদুন থেকে এখনও এসে পৌঁছল না। পাতনা থেকে বিমলার চিঠি এসেছে চন্দ্রার এম, এ পাশের খবর নিয়ে।

সোমবার মিটিং হয়ে গেল। নীহারকণার জায়গায় হেডমিস্ট্রেস হল চন্দ্রাবতী মিশ্র। মিটিংয়ে সুনন্দার কোন কথা ওঠনি কারণ চন্দ্রার চিঠির উত্তর তো এলো না।

প্রেসিডেন্ট মণিরামবাবু শুধু একটা কথা বলেছিলেন যে যদি সুনন্দা বোম্ব চাকরী না ছাড়ত তবে এই মিটিংয়ের প্রয়োজন হত না।

কথাটা শুনতে ছোট কিন্তু এ কথার দাম অনেকখানি। এ যেন কমিটির সবার কথা। মণিরামবাবু সেক্রেটারীর কাছে শুনিয়েছিলেন সুনন্দার সব কাহিনী। এখন যদি সুনন্দা আসত তবে ব্যাপারটা কিভাবে তিনি নিতেন তা জানার উপায় নেই।

অবশেষে চৈত্রের শেষে সুনন্দার কাছ থেকে চিঠি এসে পৌঁছল হাজিগড়ে চন্দ্রার কাছে। চন্দ্রা চিঠিটা পড়েই ছুটল নন্দকিশোরবাবুর কাছে।

নন্দবাবু বাইরে কোথাও বেরোচ্ছিলেন। সদর দরজার সামনে দেখা চন্দ্রার সঙ্গে। হেসে বললেন—দেবাদুনের চিঠি বুঝি? বড় দেরী হয়ে গেল। পড়েছে?

চন্দ্রা বলে—এখনও পড়িনি স্যার। খামটা খুলে না পড়েই চলে এলাম এখানে।

নন্দকিশোরবাবু বললেন—চল, ভিতরে গিয়ে বসা যাক। তুমি পড়ে নিয়ে আমার বল কি লিখেছে। এত দেরীতে উত্তর এলো। এখন আমি যে কি করি।

চন্দ্রা বলে—আপনি ভাবছেন কেন? সুনন্দাদি এলে আমার হেডমিস্ট্রেস পোস্ট চাই না। যেমন আগে ছিলাম তেমনি থাকতে পারলেই খুসী।

—কথাটা তা নয় চন্দ্রা। ইতিমধ্যে অনেক ভাবনার জিনিস ঢুকে পড়েছে। নীহারকণা জাহানাবাদে নানারকম কথা রটাচ্ছে। সেইসব কথা—যা কিছু সত্যি কিছু মিথ্যে, এই হাজিগড়েও ভেসে আসছে। যাক্গে, চিঠিটা পড়ে নাও তারপর বল।

—আপনি পড়ুন স্যার।

—না না, তোমার চিঠি আমি পড়ব কেন? পড়ে নিয়ে বস্তাবাটা আমার বল।

চন্দ্রা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। বলে—বসুন ঐ চেয়ারটায়, আমি বরং পড়ে যাচ্ছি আপনি শুনুন।

(ক্রমশঃ)

চিঠিপত্র

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার মাঘ ১৩৯০ সংখ্যায় ‘বারদিনে উত্তর পশ্চিম ভারত পরিভ্রম’ শীর্ষক রচনাটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই, আশা করি আপনার পত্রিকায় চিঠিখানি প্রকাশ করবেন।

জয়দেববাবু লিখেছেন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মৈনুদ্দিন সাহেব শিষ্যগণসহ আজমীরে উপস্থিত। পৃথ্বীরাজের আদেশে তাঁর কর্মচারীগণ শিষ্য মৈনুদ্দিন সাহেবকে আস্তাবল থেকে ভাড়িয়ে দেন। গম্প ফাঁদার পূর্বে জয়দেববাবুর জানা উচিত ছিল যে, পৃথ্বীরাজ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ইস্কুলের নিয়ন্ত্রণের ছাত্ররাও জানে যে, ১১৯১ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ মহম্মদঘোরীকে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করলেও ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাহলে জয়দেববাবু যে কথা লিখলেন সেটা হাস্যকর নয় কি? পৃথ্বীরাজের জননীর নাম উল্লেখ করে মৈনুদ্দিন সাহেবের যৌগিক ক্রিয়াকলাপের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, এটা স্বার্থাঘেযী মহলের মিথ্যাপ্রচার। ভারতের ইতিহাসে ভারতের কোন হিন্দু নরপতি কোন ধর্মাবলম্বীর প্রতি কোনরকম নির্ধাতন করেন নি। বরং তাদের ধর্মচরণের জন্যে ভূমিদান করেছেন, উপাসনা গৃহ নির্মাণে সাহায্য করেছেন—একথা বিদেশী ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন। জয়দেববাবু মৈনুদ্দিন সাহেবের অভিধানে পৃথ্বীরাজের রাজ্যচ্যুতি এবং নিহত হওয়ার কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু অন্যরূপ : প্রথম তরাইনের যুদ্ধে আক্রমণকারী মহম্মদঘোরীকে ছেড়ে দেওয়া পৃথ্বীরাজের মারাত্মক ভুল হয়েছিল। তাঁর উচিত ছিল মহম্মদঘোরীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁর রাজ্য থেকে ঘোড়ীকে উৎখাত করে যোররাজ্যে নিজের অনুগত কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করা। তিনি তা না করে প্রথম তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভের আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজ-নৈতিক মৃত্যুর পরিচয় দিয়ে নিজেই নিজের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেন।

জয়দেববাবুর কাছে অনুরোধ ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক কোন ঘটনা উল্লেখ করবার সময়ে বাস্তব ঘটনা পর্যালোচনা করে যেন লেখনী চালনা করেন। ইতি—

বিনীত

পোঃ গ্রাম—আটুরিয়া

জেলা—২৪ পরগণা

শ্রীদুর্গাপদ ঘোষাল

১৭৬৮৪

মহাশয়,

প্রবর্তক ১৩৯০ ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীউত্তমকুমার মণ্ডল মহাশয়ের ‘শিব কি বৈদিক দেবতা’—শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দ এবং তৃপ্তি পেলাম।

শিব সম্বন্ধে আমার অনেক সমস্যা ছিল। শূনে থাকি শিব তমোগুণী। কিন্তু ছেলে বেলায় পড়েছি, “কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।” শূনেছি—শিব অনার্যদের দেবতা। তবে কেন বলি দেবাদিদেব। তবে কেন বলি শিবহীন যজ্ঞ। ধ্যানে দেখি “স্তুতম্ অমরগণৈঃ...” দেবতারাত্রে যার স্তুতি করেন তিনি শূন্য অনার্যদের, একবার তাৎপর্যই বা কি?

রূপ বর্ণনায় দেখি, শিব নীলকণ্ঠ, ভগ্নমাথা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, নাগমালা বিভূষিত, কঙ্কাল মালা পরিহিত। ব্যাঘ্রায় শূনেছি—জগতের গরল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন, জগতকে রক্ষা করেছেন। কণ্ঠে ধারণ করায় নীলকণ্ঠ হয়েছেন, মারা যান নি। কাম ত্যাগ করেননি তবে কামের দেবতা মদনকে ভগ্ন করে সেই ভগ্ন গায়ে মেখেছেন। কামকে ধারণ করেছেন কিন্তু তাঁর দাহিক শক্তি নেই। ব্যাঘ্র হিংস্রতার প্রতীক, সেই হিংসা ধারণ করেছেন কিন্তু চর্মরূপে। সর্প নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতীক অর্থাৎ জীবনের প্রতীক। নারায়ণ ভক্তের কঙ্কাল গলায় ধারণ করে আছেন। জগতের সমস্ত রিপু ধারণ করেও যিনি মহাসম্মতি তিনি যদি অনার্য হন, তবে আর্য কে?

আমরা শ্রীযুক্ত মণ্ডল মহাশয়ের নিকট হতে আরও জানতে চাই, জানালে আমরা ধন্য হব। বিশেষ করে অষ্টবঙ্গ সম্মেলনের উপাখ্যানটি জানতে চাই। ইতি—

শ্রীঅধুসূদন ভট্টাচার্য

নিউ ব্যারাকপুর

২৪ পরগণা

[শ্রীজয়দেব দে জানাচ্ছেন, তিনি ঐতিহাসিক বা পণ্ডিতও নহেন। সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ। কাজের ফাঁকে সারা দেশটা ঘুরে বেড়ানো হাবি। দর্শনীয়স্থানে প্রচলিত প্রবাদকাহিনী গাইডের মুখে শুনাই লেখা। দুর্গাপদবাবুর শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য বুচিবুদ্ধ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। জয়দেববাবু মনে করেন দুর্গাপদবাবুর ইতিহাসজ্ঞানও সীমিত এবং সেই জ্ঞান নিয়ে পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে নিজেই হাস্যাপদ হয়েছেন। সুধী পাঠকগণই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।—সঃ প্রঃ]

সংঘ সংবাদ

আশ্রমী

প্রবর্তক সম্বন্ধ প্রসার ও প্রচার কমিটি :

প্রবর্তক সম্বন্ধের ভাবধারা জনমানসে প্রচার করা ও সম্বন্ধগুরু শ্রীমতিলালের চিন্তাধারায় মানুষকে উদ্ধৃত্ত করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তক সম্বন্ধের গভর্নিংবোর্ডের অনুমোদন ক্রমে প্রবর্তকসম্বন্ধের সকল স্তরের সভ্যদের এক সম্বন্ধসম্মেলনে 'প্রবর্তকসম্বন্ধ প্রসার ও প্রচার কমিটি' গঠিত হয়। চম্পননগর আশ্রমে ২৫ ৩।৮৪ তারিখের সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী—সভাপতি, শ্রীসৌবীর ঘোষ ও শ্রীসুবলচন্দ্র ভট্ট—সহ-সভাপতি; শ্রীশৈলেন ঘোষ—সম্পাদক, শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষ ও শ্রীকল্যাণকুমার সামন্ত—সহ-সম্পাদক, শ্রীযামিনীকান্ত দাস—কোষাধ্যক্ষ, এবং সর্বশ্রী সুধাংশু দাস, রবি কবর, বিনয় ব্রহ্ম, মধুসূদন দত্ত, ধীরাজ মজুমদার, নন্দদুলাল সাধু, অমল্য নাগ, মিহির আদিত্য, শশীভূষণ দাস, অজিত ঘোষ ও শ্রীমতী মণিকা দাস।

বাদকুল্লা পরিভ্রমণ :-

প্রসার ও প্রচার কমিটির সভ্যগণের একটি দল সম্বন্ধের সহযোগী সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিগত ২১শে এপ্রিল ৮৪ বাদকুল্লা পরিভ্রমণ করেন। দলে-ছিলেন শ্রীযামিনী কান্ত দাস, শ্রীধীরাজ মজুমদার, শ্রীসৌবীর ঘোষ ও শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। সহযোগী সভ্য শ্রীঅবুগকুমার সরকারের বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করা হয়। সন্ধ্যায়

শ্রীসরকারের বাড়ীতে স্থানীয় সহযোগী সভ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে সমবেত উপাসনা ও আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়। উপাসনান্তে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় সমবেত ভাবে আবৃত্তি হয়। তারপর শ্রীযামিনীকান্ত দাস দীক্ষা কেন গ্রহণ করা হয়, এবং সন্মিষ্ট সাধনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন। গুরুর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখা ও মূল কেন্দ্রের প্রতিটি উৎসবে সাধ্যমত যোগদান করা একান্ত কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন শ্রীসৌবীর ঘোষ।

পরদিন সকালে সহযোগী সভ্য শ্রীপ্রবোধ চক্রবর্তী শ্রীসুনীল চক্রবর্তী, শ্রীরমেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীঅমল্য মিত্রের প্রত্যেকের বাড়ীতে সকলের সঙ্গে বসে ঘরোয়া আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরমেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ীতে সমবেত উপাসনার আয়োজন করা হয়। এখানেও শ্রীযামিনীকান্ত দাস আশ্রম কি, মানুষের সাধনার প্রয়োজন কেন, সাধনায় আমরা কিসের অধিকারী হতে পারি, ইত্যাদি বিষয়ে সরল ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। শ্রীসৌবীর ঘোষ গুরু ভক্তনার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেন এবং 'প্রবর্তক' পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন রাখেন। আলোচনার পর স্থানীয় একদল ভক্ত সম্প্রদায়ের মধুর কীর্তনে অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হয়। এর পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সোমবার প্রসার ও প্রচার সমিতির সভ্যগণ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

মৃত্যু তর্পণ

৩/আশুতোষ ভট্টাচার্য

গত ২০শে মার্চ ১৯৮৪ সোমবার রাত্রে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে তিনি সেন্ট মেরী নার্সিং হোমে ভর্তি হন এবং চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে এই প্রতিভা-দীপ্ত মনীষীর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

১৯০০ সালে ময়মনসিংহ জেলার ঢালুয়া গ্রামে এক বার্ষিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরগঞ্জ স্কুলে শিক্ষা সুরু এবং ১৯০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাসাহিত্যে প্রথমস্থান অধিকার করে এম. এ পাশ করেন। পরে সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রথমস্থান অধিকার করে এম. এ ডিগ্রী পান। ১৯৫৯ সালে বাংলা লোকসাহিত্যের উপর গবেষণাকরে তিনি পি এইচ ডি হন। আসানসোল রেলওয়ে স্কুলে তাঁর শিক্ষকতা সুরু। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ব-

বিদ্যালয়, এনগ্রপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন এবং ১৯৭৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৯০টি। তিনি কলকাতার প্রতিটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। 'প্রবর্তক' পত্রিকায়ও তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'প্রবর্তক'-এর সঙ্গে ছিল তাঁর আর্থিক-যোগ। তিনি 'প্রবর্তক' কলেজ অব কালচারের পরামর্শ-দাতা সমিতির সভ্য ছিলেন। সদাহাস্যময় আচারে ব্যবহারে পোষাকে পরিচ্ছদে এমন একজন খাঁটি বাঙ্গালী এযুগে দুর্লভ। তাঁর প্রয়াণে 'প্রবর্তক' আত্মীয়বিয়োগ ব্যথাই অনুভব করছে এবং তাঁর পরিবারদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তাঁর আত্মার উর্দ্ধগতি ও চিরশান্তি হোক। ওঁ শান্তি!

মন্দির নির্মাণ কল্পে আর্থিক সাহায্যের আবেদন

প্রবর্তক সজ্জগুরু ভগবান শ্রীশ্রীমতিলালজীর আদেশে ২৪ পরগণা নববারাকপুরে গড়ে উঠছে একটি মন্দির।

তাঁর আদেশের একটি অঙ্গ—কর্মই ভগবান। তাঁর নিজের কথা—“নাক টিপে ছ’চার ঘণ্টা বসে থাকবার সময় আমাদের নাই। আমরা ক্রিয়াহীন নই। তবে ক্রিয়ার গণ্ডী টেনে তাতে আবদ্ধ হতে চাই না।”

“সন্ন্যাসী হয়েছি বলে ভিক্ষামে জীবনধারণ করব না, খেটে খাব।”

তাই নিষ্কাম কর্মের, পরার্থে কর্মের, জনসেবার কর্মে প্রবর্তক সন্তানেরা দীক্ষিত।

এই মন্দিরটির দ্বিতল প্রাকোষ্ঠ আর্থিক অনটনের জন্য অসমাপ্ত রয়েছে। এই অসমাপ্ত অংশের জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে পনের হাজার টাকা।

সৃষ্টিধর্মী, শক্তিসাধক, ভগবৎবিশ্বাসী মহাত্মাদিগের নিকট তাই আমাদের সর্নির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন আমাদের অনুপ্রেরণা যোগান, আত্মনির্ভরশীলতার পথ প্রদর্শক হয়ে আমাদের কুতজ্ঞভাজন হয়ে থাকেন এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে আমাদের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন।

তাই সন্তোষের সকল শ্রেণীর সভ্যদের এবং ধর্মপ্রাণ ও ধর্মপ্রাণা মা-বোনদের কাছে, আমাদের আবেদন তাঁরা যেন এই মন্দির নির্মাণকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করে আমাদের কৃতার্থ করেন। সকলপ্রকার দানই সাদরে গৃহীত হবে।

ধন্যবাদ। নমস্কারান্তে ইতি—

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

প্রবর্তক সাংস্কৃতিক সাধন চক্র

a/c Payee চেক কাম্য

প্রবর্তক—শ্রীযামিনীকান্ত দাস

(ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রবর্তক ফান্ডেশন লিঃ)

৬১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সম্পাদক : শ্রীতুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপনিবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাবি কর কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটেন লিঃ প্রাইভেট, ৬২/৩, বিপনিবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীকণ্ঠভূষণ রায় কর্তৃক মদ্রিত।

আষাঢ় ১৩৯১

প্রবর্তক

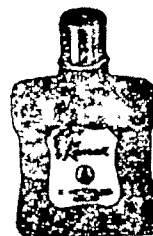
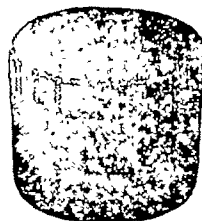
প্রতিষ্ঠাতা - স্বর্গদেব শ্রীমতিলাল

৬৯ বর্ষ ১৯২৪ ৬

কলিকাতা

ক. হোড্জার

অসাধনী



সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজ, সম্ভবগুরু মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনার উজ্জ্বল এই গীতাভাষ্য নুতন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বহুর মধ্যে সম্ভবগুরু মতিলালের জীবনভিত্তিক জীলা-বাদী শারীরিক সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, যোগ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নুতন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত।

মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর সূচিস্থিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিখিল ভারতশাস্ত্রের নির্বচন স্বরূপ সুবহু ভূমিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

সূচীপত্র, আষাঢ় ১৩৯১

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশাস্তি	সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল	৬৩
সাধন-কণা	সংকলন	সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল	৬৪
শিব ও বঙ্গ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে	প্রবন্ধ	ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস	৬৫
ডায়াবিটিস রোগের গবেষণায় নবদীপ্ত	স্বাস্থ্য	নাগার্জুন ভট্ট	৬৭
লাল মাটির জেলা বাঁকুড়া—একটি সমীক্ষা	সমীক্ষা	বিশ্বনাথ রায়	৬৯
ভীর্ণভূমি	গল্প	বাজীরাও সেন	৭৬
বর্ষা—১৯৮৪	কৌতুকা	শোভন শেঠ	৮০
ভুলি নাই	কবিতা	রতীন শীল	৮৩
একটি রাত্রি	গল্প	আন্তন শেখভ	৮৪
স্বগত	স্মৃতিচারণ	অনুবাদক : ধীরেন্দ্রলাল ধর	৮৭
পুস্তক সমালোচনা		শ্রীরণজিৎ কুমার সেন	৮৮

প্রবর্তকের নিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি বাংলা মাসের ৯/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পর সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একখানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই, সম্পাদকের নহে।

প্রবন্ধাদি কালজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মীধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য পড়ে তোলায় রতী

ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আনন্ড এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

রেজিঃ অফিস : ৭ রোড লক্ষ প্রেস, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

চেয়ারম্যান : ডে এন বিহার





বর্ষ ৬৯তম : ৩য় সংখ্যা . আষাঢ় ১৩৯১ : জুন-জুলাই ১৯৮৪

জীবনের আলো

কয়েকটা বড় বড় কাজ হইলেই আমাদের সবখানি পূর্ণ হইল না। এতবড় সাধনা এবং যোগজীবন না লইয়াও দেশে রূহৎ-রূহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও উঠিতেছে। তোমাদের কিন্তু দিব্য-শক্তিকেই জাগাইতে হইবে, ভাগবত প্রকৃতি পাইতে হইবে, অনন্তরূপ ও ঐশ্বর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সাধনা ও সম্ভাষণ গ্রহণ করিও না—সৃষ্টির মূর্তি দিব্য-শক্তিময় ও মাধুর্যমণ্ডিত হওয়া চাই। যেখানে দৃষ্টি দিবে, সেখানেই যেন শ্রী ও সম্পৎ পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয়।

গতি যেন ছন্দোহীন না হয়। মনে রাখিও—তোমার দেহ-প্রাণ-মন তোমার নয় যে, ইহার যথেষ্টাচার করিবে—ভগবানের দেহযন্ত্র তাঁরই ষথানিয়মে চলিবে। সব কিছু নির্ভর করিতেছে ভিতরের জড়তা হইতে মুক্তি পাওয়ার উপর—সংশয় ও কামনার বাঁধনমুক্ত হওয়ার উপর। অন্তঃকরণের যে দুই অংশ মন ও বুদ্ধি, তাহাদের মধ্যে মন সংশয়াত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক। আমার কথাগুলি তোমরা বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়া গ্রহণ কর। এই বিজ্ঞান-যোগের উপর উঠিয়া দাঁড়াও, শীঘ্রই একটা বিশুদ্ধ হৃদয় আবিষ্কৃত হইবে।

—সত্যগুরু শ্রীমতিলাল

শ্রী পুত্র পরিবার মণ্ডলী নিম্নে ঘর করি, মনে হয় কি
সর্বনাশই করি। মায়ার ঘোরে এমন মানবজন্ম বৃথা গেল।
মনের মার বড় মার। ধীরে ধীরে কর্মে ঔদাসীন্য।
তারপর অস্বাভাব। সংসার-ধর্ম চুলোয় দিয়ে, গৃহী কোপীন
নিম্নে ঈশ্বর খুঁজতে বেরুলো। চতুর ঘর আগলে বসে
রইলো। ভাবলে, ঈশ্বর লাভের পথ বড় দুর্গম। ছেলে-
পুলের গলার ছুরি দিয়ে ওপথে যাত্রা করা আমার
প্যেসায়ে না, এক্ষণ্য এমনি করেই কাটুক, জন্মান্তরে দেখা
বাৰে।

* * *

সুখ দুঃখের সংসার। রোগ শোক নিত্য লেগে আছে।
মনটা যখন বড় খারাপ হলো, এখার ওখার ছুটাছুটি করে
প্রতীকার করতে পারলে নিশ্চিন্ত। ত না হলে, ঈশ্বরের
দোরে ধরা দিয়ে যদি অভীষ্ট পূরণ হয় তবেই রক্ষা।
নতুবা, কালিতে দেবতাও মিথ্যে, এই অপবাদ দিয়ে,
অনিবার্য অবস্থাদির মধ্যে হাসিকান্না এই উভয় সঙ্গী নিয়ে
দিনগুজরাণ করতে হলো।

* * *

সংসার-ত্যাগীরও শাস্তি নাই। জগতে নির্জন স্থান
কোথায়? লক্ষ লোকের মাঝে একজনকে দেখতে না
শিখলে নিরিবিলি হওয়া যায় না। সংসারের বাহিরে
গেলেই যদি ঈশ্বরপ্রাপ্তি হতো, তাহলে শঙ্কর বৃক্ষের ডাকে
ভারতের গৃহস্থ-সমাজ উজার হয়ে যেতো। অন্তরে বাহিরে
পাওয়ার নিজের বেদ উপনিষদ পুরাণ থেকে, সহজ জীবন-
যাত্রার ভঙ্গীতেও দুস্ত্রাপ্য নয়। তাঁকে যদি পেতে হয়,
স্বাস্থ্যপ্রদায়ক সহজ ক্রিয়ার মত সহজভাবেই পাওয়া
বাৰে।

* * *

তাই আমরা সর্বাবস্থার মধ্যেই, প্রথমেই স্বীকার করবো—
তিনি আছেন, দূরে নয়, আমার মধ্যেই। আমার ঈশ্বরকে
অটুট বিশ্বাস স্থাপন করাই তাঁকে পাওয়ার প্রথম ধাপ।
তারপর তিনিই কর্তা ও ভোক্তা, এইভাবে তাঁতে স্বাধীন
তুলে ধরার চেষ্টা করা। এইরূপ করা বিশেষ শক্ত নয়।
নিত্য অরণে এইভাবে দৃঢ় হয়। আর ভাবে থাকতে
পারলেই লাভ হাতে হাতে মিলে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ
করেছি। কেমন করে করতে হবে একটু আভাস দিই।

* * *

যদি এমন মানুষ পাও, যাকে তোমার স্বাধীন দিয়ে
ভালবাসতে পার, যার কথা, কাজে, সত্য-মিথ্যা, পাপ-
পুণ্য ত্যাগ করতে কুড়া আসে না, তবেই তুমি ধন্য। কিন্তু
এ সৌভাগ্য সবায়ের ঘটে না। ঘটলেও সে যে ঈশ্বরতত্ত্বের
মানুষ হবে এমন কোন কথা নেই। এখানে দিয়ে ব্যর্থ
হতে হয়। জিহবার সহিত দস্তের যেমন সম্বন্ধ, কুঙ্গনের
পাঞ্জায় পড়লে, জীবন নিয়ে তেমনি কাটাকাটিই চলবে,
কাঁচা ঘুটি পাকা ঘরে উঠবে না।

* * *

এই ভালবাসার উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, পরমতত্ত্বের
জন্য মানুষের কাছেই ধরা দেওয়া। জীবন যৌবন সর্বত্র
দিয়েও, সে যদি ভিন্নভাবে আত্মকাম সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা
রাখে, তবে জেনো, তুমি প্রবঞ্চিত হয়েছো। কিন্তু একথা
ধ্রুব, ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যেখানে সত্য, নির্মল—সেখানে
আরোপের আশ্রয় ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন আর কি হবে? বৃকে
যদি একবার পেরেক পোঁত, তা আর উপড়ে ফেলা যায় না।
হাজার টানাটানি করো, মনে হবে, বুঝি উপড়ে গেল,
কিন্তু সে শুধু রক্তারক্তি হওয়া। দিয়ে ফিরে চাওয়া,
সাধনার অঙ্গহানিই হয়।

শিব ও বঙ্গ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস

এদেশে সর্বাধিক সংখ্যক মন্দিরই হল শিবমন্দির। অনেকে মনে করেন যে, শিবই বিশ্বের আদি এবং একক দেবতা। কারো মতে তিনি শিবানীসহ ত্রৈত। মতান্তরে তিনি পুত্র কন্যাদি পরিবৃত্ত বহু অর্থাৎ যত্র জীব তত্র শিব। খ্রীষ্টপূর্বের অষ্টোত্তর শতনাম হতে পারে, কিন্তু শিবও কম যান না। শঙ্কর, মহাদেব, পশুপতি, দেবেশ দেবাদিদেব, বেদ, যোগ, মোক্ষ, কীলক, দেব, পশুবন্ধনস্তম্ভ, বাহুক, লিঙ্গ, শুভ, মঙ্গল, সুখ, জল, শুভদ, মঙ্গলজনক, রমা, ভোলানাথ, ত্রিশূলধারী, রুদ্র, ভয়রুধারী, জটোধারী, ভীষণ হর, ভয়ঙ্কর, অজৈকপাদ, অহিরব্রহ্মা হিব্রু, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুব্রহ্ম, দ্রাক্ষক, অপরাঞ্জিত, বৈবস্বত, অজ, সাবিত্র, একপাদ, পিনাকী, মহেশ্বর, বৃষকপি, শঙ্কর, ঈশ্বর, সতীপতি ইত্যাদি ছাড়া অম্লক জামাতা, অম্লক পিতা, অম্লক সখা, তমুক বাহিত, তমুক দলন প্রভৃতি ধরে সংখ্যায় তিনি নেহাত কম হবেন না। রূপ কল্পনায় দেখা যায়, তিনি রক্ততর্গিরিসম। চন্দ্রকলা, নাগ, জটা অঙ্কন প্রভৃতি তাঁর ভূষণ। তিনি পদ্মাসীন, তিনি প্রসন্ন। তিনি যুগ, বর ও অভয় দান করেন। তিনিই বীজ ও নিখিল ভয় নাশক। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ামক। তিনি রুদ্ররূপে শরণার্থীকে রক্ষা করেন, রোগাদি দূর করে গ্রামকে সুস্থ রাখেন। তিনি শস্য ও উর্বরতার দেবতা।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস স্তূপে তাঁর জটোধারী দ্রাক্ষক মূর্তি, হরপ্রাতে পোড়ামাটির শিলায় যোগী মূর্তির পিছন দিকে বৃষ ও ত্রিশূলধ্বজ লগ্ন করা গেছে। ঋষিদের রুদ্র হলেন ভীষণ ও সুন্দর। তৈত্তিরীয় সংহিতায় শিব হলেন হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য দেবতা। সেখানে পার্বতী তার স্ত্রী। অথর্ব বেদে ও মহাভারতে তিনি কিরাট। তাও ব্রাহ্মণে তিনি মৃগয়াধিশ। জাতকাদি বৌদ্ধগ্রন্থেও শিবের উল্লেখ আছে। পুরাণ ও তন্ত্রে তিনি দার্শনিক তত্ত্বরূপে বর্ণিত। মধ্য প্রাচ্যের প্রকৃতভেদেও শিব-সংস্কৃতির নিদর্শন আছে।

অসমী়া ঐশ্বর্যশালী হয়েছে শিব চিরদারিদ্র ও নিরহংকার। শৈবদের বিশ্বাস শৈব ধর্মের প্রবক্তা স্বয়ং শিব। শৈব যোগী হলেন নারীত্যাগী একক সাধক। শৈব সাধক আবার উদাসীন নামেও পরিচিত। তাই শৈব সম্প্রদায়ে বহু দল উপদল আছে। তবে শিব মূলতঃ অনার্থ বলেই বৈদিক

যাগ যজ্ঞে তাঁর হবির্ভাগ ছিলো না। দক্ষ এই কারণেই, তৎকর্তৃক আয়োজিত যজ্ঞে, শিবকে আমন্ত্রণ জানাননি। শিব তাই সেই যজ্ঞের আয়োজন আপন অনুচর সহ পণ্ড করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শিবকে অন্যতম যজ্ঞতরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

শিব গ্রাম দেবতাদের মধ্যেও অন্যতম। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাঞ্জন বা চড়কের সময় কৃষিকার্যের অনুকরণে শিল্প-সুখমাস ও জীবনের সুসম আনন্দে যে অনুষ্ঠান হয় তাতে কেবল গ্রামের জীবনের প্রতিফলন হয়েছে। যেহেতু মানুষের আদি সংস্কৃতি-কৃষিভিত্তিক, কৃষকরাই গ্রামের আদি অধিবাসী, সেহেতু জড়ে জীব শিবকল্পনায় বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান প্রভৃতির উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করা হতো—এখনও হয়। লিঙ্গ-যোগি পূজা, শ্মশান-শিব পূজা, ভৈরব পূজা প্রভৃতি মূলতঃ আদিবাসীদের ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠান থেকেই আমরা গ্রহণ করেছি।

আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আদৌ আদিবাসীদের দেবদেবীর প্রতি প্রতিক্ত চিন্তা ছিলো না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে তো গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ। মনু তাদের দেবতাদের পূজারীদেরকে পতিত বলেছেন। আশ্চর্য মনে হলেও এ কথা সত্য যে কোন বিধান বা বিধিনিষেধ এঁদের পূজা তৈকিয়ে রাখতে পারেনি,—বরং ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। জৈন, বৈষ্ণব, অনেক মুসলিমও শিবকে গ্রহণ করেছেন। বাংলার বিখ্যাত লোককবি গোমামী দেওয়ান, মুসলিম হলেও ‘শিব মাহাত্ম্য’ পুস্তক রচনা করে তার মধ্যে এক স্থানে লিখেছেন—‘আমার কর্মজীবনের চলার পথে এই খ্রীষ্টী’ (শিব) ধামই প্রথম অনু-প্রেরক।’

ভারতীয় আদর্শে এটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বৈচিত্র্যের মধ্যেই তো ঐক্য। সব জীবকেই শিবজ্ঞান করার জন্য তো হয়েছে ‘যত্র জীব তত্র শিব।’ আড়ম্বরের বাড়াবাড়ি না থাকলেও শিবকে জনগণ দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের চেয়ে কম গুরুত্ব দেননি। চৈত্রমাসের মাঝামাঝি থেকেই শিবের গাঞ্জন আরম্ভ হয় এবং তা চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত অর্থমাস ধরে চলে। দুর্গাপূজা কোন গ্রামে বা কোন বাড়ীতে বাদ গেলেও শিবপূজা উপলক্ষে মূল সন্ধ্যাসী শিব মাথায় করে প্রতি বাড়ী নিয়ে গিয়ে ডাবজলে

মান পূজা সমাধা করতে হুটি করেন না। শহরে অবশ্য ঠিক এ দৃশ্য দৃষ্ট হয় না। আমরা জানি, সমগ্র দেশই গ্রাম গরিষ্ঠ এবং গ্রামাভিত্তিক। গাজন উৎসবে সারা দেশ ব্যাপী কৃষ্ণ-সাধনের নিপীড়ন দেখা যায়। বান ফোঁড়া, বঁড়িশ ফোঁড়া, কুলে থাকা, আগুনে বা কাঁটায় বা বঁটিতে ঝাঁপ দেওয়া, চড়কে ঘূর্ণন প্রভৃতি শিবকে জীবনের চরম অবস্থার মধ্যে গ্রহণের প্রতীক ছাড়া আর কি হতে পারে? নানাবিধ দেবদেবীর সঙ্গে মুখোমুখি সহযোগে নৃত্য, সংনাচে আনন্দপ্রকাশ জীবন রসের বহিঃপ্রকাশই বটে। তা ছাড়া নীলের গান, অষ্টক গান, বাকুটি গান, বোলান গান সহ নৃত্যাদি মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশ শিবভক্তের জীবনের গাঢ় অনুভূতির বহির্বিপ্লব মাত্র। শিবের বিবাহ, পার্বতীকে নিয়ে ঘর সংসার, ভিক্ষা, পারিবারিক কোমল তো আমাদেরই দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবচিত্র। এতে মধ্যবিস্তৃত গৃহস্থ সাধারণ কৃষক—তা তিনি হিন্দু হন আর মুসলমান হন, একই সমস্যা, সুখ-দুঃখ অনুভব করেন। এইসব কারণে শিবপ্রভাব বঙ্গে যথেষ্ট রয়েছে।

শিব-প্রভাবের সূত্রপাত বঙ্গে কবে হয়েছে তা তার পাপুরে প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য। আগেই বলা হয়েছে যে কৃষি জীবনকে আশ্রয় করে মানুষ জীবনে ধর্ম কর্মানুষ্ঠান তথা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ভূমিকর্ষণ করে বীজবপন, ধান উৎপাদন, ফল ফসল উৎপাদন প্রভৃতি ভিত্তিক পূজা আচারের সঙ্গে প্রজনন শক্তির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। এই প্রজনন ধ্যানধারণা থেকেই শিব পূজার কল্পনা। চৈত্র বৈশাখের বৃষ্টিপাতের সূত্রপাত থেকে সেই প্রজননশক্তি তথা শিবপূজার রত আরম্ভ হয়। চম্পা-চন্দনরত গোকাল রত, অশ্বখ পট রত, জয়মঙ্গল রত, তারণ প্রভৃতি রতের একই ভাব কল্পনা কালক্রমে শিবপূজা—শিবচতুর্দশী ছাড়া অন্যান্য সময়ে এমনকি

নিত্যপূজা হওয়ার রীতিতে প্রবর্তিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে (পাহাড়পুরের সমসাময়িক) চার নম্বর দামোদর-পুর লিপিতে উত্তর বঙ্গের এক দুর্গম প্রান্তে লিঙ্গরূপী শিব পূজা প্রবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকে মহারাজ বৈন্য গুপ্তের রাজপ্রসাদ সহায়তায় পূর্ববাংলায় শৈবধর্ম বিস্তৃত হয়। সপ্তম শতকে গোড়রাজ শশাঙ্ক ও কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মাকে পরম শৈব রূপে দেখা যায়। শশাঙ্কের মৃত্যু তো মহাদেব ও নন্দী-বৃষের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। বহুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ দুই পাহাড়পুরের ফলকে পাওয়া গেছে।

শিব শিবভক্তগণের নিকট পরম গৌরবের দেবতা। পঞ্চম শতাব্দীর বহু আগে থেকেই ভারতের অন্যান্য স্থানে শিবের যে ব্যাপক প্রভাব ছিলো, সে কথা স্মরণ রেখে আমরা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারি, ব্রহ্ম রোষে শিব দুষ্কের দমন করেন তাঁর দ্বিশূলের আঘাতে—সমস্ত অশুভকে তিনি বিনষ্ট করে শিষ্টের কল্যাণ করেন। তাই শিব সর্বময়, ভক্তরা ধান ভানতেও শিবের গীত গেয়ে থাকেন। জীবোপে প্রেম দ্বারা যে শিব-ঈশ্বরের সেবা করার ঋষি-উপদেশ আছে তা ভক্তগণের আচরণে প্রকাশ পেলে দেশে এত যে ধনবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, জাতি বৈষম্য প্রভৃতি বিঘ্ন আবহাওয়া আছে তা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই মৌল বিঘ্নের প্রতি শিবভক্তগণ কি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরও তৎপর হয়ে দেশের দেশের আরও কল্যাণের জন্য রতী হবেন?

তথ্যসংগ্রহ সূত্র : ১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন। ২। বাঙ্গালীর ইতিহাস : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ৩। ভারত কোষ (শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্যের রচনাংশ) : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

“অসাধ্য কোন বস্তু নাই। স্বপ্ন স্বপ্ন হইয়া থাকে, যখন আমরা শক্তিহীন। যে নিরন্তর শক্তি প্রয়োগের সজ্জান পায়, সে কল্পসৃষ্টি পৃথিবীর বুকে মূর্তি দেয়। সংগঠনের দিনে হে দ্রষ্টা, হাত গুটাইয়া থাকিও না, একটা নুতন জগৎ গড়িয়া তোলা।”

—সঙ্গগুরু শ্রীমতিলাল

ডায়াবিটিস রোগের গবেষণায় নবদিগন্ত

নাগাজুন ভট্ট

প্রায় প্রতিবছর ডায়াবিটিস রোগের নানাধরনের ওষুধ বের হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই রোগ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। ইজরায়েলের প্র্যানটেস ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে ডাঃ এনজো টি দেশি (Dr. Enzo Te Deschi) একটি নতুন খাবার ওষুধ বের করেছেন, নাম হলো 'ডি, আই, ডি, ৪২'। বলা হচ্ছে যে এর কার্যকরী সময় নাকি অনেক বেশী। এই কোম্পানী দাবী করেন যে এই ওষুধ দেহের মাংসপেশী ও চর্বি তন্তুর মধ্যে (fatty Tissue) গ্লুকোজকে বেশী পরিমাণে দহন করে, ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যায়। এই ওষুধ নাকি রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাই-গ্লিসেরাইডের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। আর গ্লুকোজের মাত্রা নাকি স্বাভাবিকের চেয়ে কমে না।

পোল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা 'এস, পি, সি-৭৮৩' (S. PC. 783) নামে একটি খাবার ওষুধ বের করেছেন। এটিও নাকি পূর্বোক্তটির মতো। আর একটি উদ্ভেদক সংবাদ হলো, আমেরিকার জোসলিন রিসার্চ ল্যাবরেটরী ও হার্ভার্ড ব্যায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে বীজাণু (Bacteria) দিয়ে ইনসুলিন তৈরী করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা একাজের জন্য ই. কোলাই (E. Coli) বীজাণুকে ব্যবহার করেছেন। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে নতুন বীজাণুর সাহায্যে মানবদেহে ইনসুলিন তৈরী করা সম্ভব হবে।

কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় (Artificial Pancreas)

এর তিনটি অংশ আছে। একটি অংশে গ্লুকোজের পরিমাপক যন্ত্র থাকে যা দিয়ে অনবরত রক্তপ্রবাহে গ্লুকোজের পরিমাণ মাপা হচ্ছে যাচ্ছে। আর একটি অংশে আছে কম্পিউটার যন্ত্র। এই যন্ত্র স্থির করে, ঠিক কতটা ইনসুলিন দেহের বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়। তৃতীয় অংশে থাকে ইনসুলিন পাম্প। এর সাহায্যে নির্দিষ্ট মাত্রার ইনসুলিন রক্তে প্রবেশ করে। কৃত্রিম যন্ত্রটি তৈরী হয়েছে ১৯৭৫ সালে। এর একটি অসুবিধে হলো শরীরের সঙ্গে নিয়ে চলার মতো হালকা এখনো হয়নি।

বিদেশে কৃত্রিম প্যাংক্রিয়াসের নানা কেন্দ্র আছে। ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্র চালু হবার পথে। গ্লুকোজ পরিমাপক বা

নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি হবে এক ইঞ্চি (৩ সে. মি) চওড়া ও ১ ইঞ্চি (৫ মি.মি) পুরু। পাম্পটি হবে সিগারেটের প্যাকেটের মতো। ফলে পুরো যন্ত্রটি পেটের চামড়ার নীচে বসানো যাবে এবং দৈনিক বা সপ্তাহান্তে ইনসুলিন ভর্তি করে নিলেই চলবে। আগামী সাত-আট বছরের মধ্যে এ ধরনের যন্ত্র বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে।

ইনসুলিন ইনফিউশন পাম্প—এটি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। এটি হলো কৃত্রিম প্যাংক্রিয়াসের তৃতীয় অংশ। গ্লুকোজ পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে আজকাল রোগীরা দিনে তিন থেকে আটবার নিজের রক্তের গ্লুকোজ মেপে নিচ্ছেন। তারপর চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন কতটা ইনসুলিন নিতে হবে। কম্পিউটার যন্ত্রটি ঠিক ভাবে চালু হলে আর অসুবিধে থাকবে না। বিদেশের বিভিন্ন চিকিৎসায়তনে ১৯৭৭ সাল থেকেই ইনসুলিন ইনফিউশন পাম্প বসানো হয়েছে। তবে এগুলি এখনও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাম্পটি বেণ্টের সঙ্গে লাগানো থাকে। আধার (reservoir) থেকে একটি সরু প্রাস্টিকের নলের ভিতর দিয়ে চামড়ার ঠিক নীচে ঢুকে যায়, অবশ্যই সূচের সাহায্যে। বিদেশে অনেকে তিনবার, আবার অনেকে প্রতিবার খাবারের আগে পাম্প মাত্রায় ইনসুলিন নিয়ে থাকেন। যে জাতীয় পাম্প এখন চালু আছে তা দশ ইঞ্চি (২৫ সে. মি) লম্বা, ৩ ইঞ্চি (৮ সে. মি) চওড়া ও ১ ইঞ্চি (৩ সে. মি) পুরু। আশা করা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই উন্নতর যন্ত্র বের হবে।

প্যাংক্রিয়াস সংস্থাপন (Pancreas transplantation)

ডায়াবিটিসের রোগীর দেহ থেকে তার প্যাংক্রিয়াস বাদ দিয়ে অন্য একটি সুস্থ প্যাংক্রিয়াস সংস্থাপন করলে ডায়াবিটিস রোগ সেরে যায়। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারের স্থান খুব বেশী নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা এসেছে, তবে সফলতাও এসেছে।

প্যাংক্রিয়াস হলো একটি ছোটখাটো কারখানার মতো। এর অধিকাংশ কোষ উৎপাদন করে পরিপাকের জন্য এনজাইম (Digestive enzyme) যাদের কাজ হলো

প্রোটিন, ফ্যাট এবং স্টার্চ বা খেতসর বা কার্বোহাইড্রেটের জটিল অণুকে সরল অণুতে পরিণত করা যাতে তা অজ্ঞানশয়ে অবশোষিত হতে পারে। ডায়াবিটিসের রোগীদের অবশ্য পরিপাক এনজাইম স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে।

অস্ত্রোপচারের কাজটি অত্যন্ত জটিল। প্যাংক্রিয়াসের মধ্যে 'আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান' গুলি অর্থাৎ বিটা-কোষগুলি ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। তারা সমগ্র প্যাংক্রিয়াসের মাত্র দুই শতাংশ। তাই, শল্যবিদেরা চেষ্টা করেন যাতে এই বিটা-কোষগুলি সরিয়ে ফেলে নতুন বিটা-কোষ বসানো যায়। এই কাজ নিঃসন্দেহে দুর্ভূহ। তারপরে আর একটি বাধা হলো দাতার কোষগুলি গ্রহীতার প্যাংক্রিয়াসে বসিয়ে দেবার পর গ্রহীতার দেহে কতগুলি প্রতিকূল ক্রিয়া বা উপসর্গ দেখা যায়। আইলেট কোষ সংস্থাপনের পর চিকিৎসকেরা সতর্ক থাকেন যাতে এই বিদেশী কোষগুলি গ্রহীতার দেহে ধ্বংস হয়ে না যায়। তাই স্টেরয়েড ও অন্যান্য ঔষধ খাইয়ে ও ইনজেকশন দিয়ে ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টাকে বাধা করে দেওয়া হয়।

প্রথম দিকে বিশেষজ্ঞরা পুরো প্যাংক্রিয়াস তুলে ফেলে নতুন একটি সংস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে এই প্রয়াস সফলতা আনে নি। ডায়াবিটিক ইন্সুলিনের ক্ষেত্রে আইলেট কোষ সংস্থাপনের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তবে মানুষের ক্ষেত্রে এখনও সফলতা আসে নি।

ভ্রূণের আইলেট কোষ সংরক্ষণ (Foetal islets preservation) : আইলেট কোষ (বিটা-কোষ) বেশী পাওয়া যায় না বলে, তাদের উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। আইলেট কোষগুলিকে শীতলীকৃত (Freezing) অবস্থায় রাখা হয়। পদ্ধতির নাম ক্রায়ো-প্রিজারভেশন (cryopreservation) কিন্তু শীতলীকরণের সময় প্রায় অর্ধেক কোষ মরে যায়। তাই ভ্রূণের দেহ থেকে আইলেট সংগ্রহ করা হয়। কোন গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হলে, বা অসময়ে ভ্রূণ গর্ভচ্যুত হলে, অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রূণের অকাল মৃত্যু হলে, সেই ভ্রূণের দেহে অস্ত্রোপচার করে তার প্যাংক্রিয়াস থেকে আইলেট কোষ সংগ্রহ করা হয়। তারপর অনুকূল কালচার মিডিয়াতে রেখে ঐ সব কোষের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। এই

পদ্ধতিতে কয়েক হাজার কোষ অল্প সময়ের মধ্যে বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এবারে এদের সংরক্ষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ভ্রূণের আইলেট কোষ কোন ডায়াবিটিস রোগীর প্যাংক্রিয়াসে বসালে অন্য উপসর্গ হবে না বললেই চলে। কারণ ভ্রূণের আইলেট কোষকে গ্রহীতার দেহে আগন্তুক বলে ফিরিয়ে নাও দিতে পারে। তারপর, ভ্রূণের কোষগুলি পূর্ণাঙ্গ হয় নি বলে, গ্রহীতার দেহে আলোড়ন সৃষ্টি না করা সম্ভব। তাছাড়া স্টেরয়েড ইত্যাদি ঔষধগুলি অধিক মাত্রায় দেবার প্রয়োজন হয় না। অস্ত্রোপচারের ব্যাপারটিও সরল। অনেক সময় আবার ভ্রূণের আইলেট কোষকে ইনজেকশন দিয়ে ডায়াবিটিসের রোগীর পেটের মধ্যে (peritoneal cavity) ঢুকিয়ে দিলে কাজ চুকে যায়। আবার কখনো বা পোর্টাল শিরায় (portal vein) ইনজেকশন দিয়ে এই কোষ ঢুকিয়ে দিতে হয়। শেষের কাজে সামান্য চিরতে হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, ট্রান্সপ্লানটেশন হলো ডায়াবিটিস রোগ চিরতরে নির্মূল করার একমাত্র রাস্তা। বর্তমানে দেশে বিদেশে নানা পন্থা ব্যবহৃত হচ্ছে রক্তের গ্রুপকে বাগে আনার জন্যে, কিন্তু হচ্ছে না। ডায়াবিটিসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

শৈশব কাল থেকেই শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বংশে ডায়াবিটিস রোগ থাকলে তাদের চিহ্নিত করণ করতে হবে। রক্তের গ্রুপ এবং রেসাস ফ্যাক্টর (Rh factor) পরীক্ষিত না নেগেটিভ তা লিখে রাখতে হবে। বাচ্চা রোগীরা কোন শ্রেণীভুক্ত তা জানতে হবে। বাচ্চাদের পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়াতে হবে, হামের ভ্যাকসিন নিতে হবে, যাতে ভাইরাস ঘটিত এইসব রোগ না হতে পারে। কারণ আমরা জেনেছি, ভাইরাসের আক্রমণে প্যাংক্রিয়াসের আইলেট কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুর বাবা ও মায়ের ডায়াবিটিস থাকলে তাদের সূচিকৎসার বন্দোবস্ত প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় মায়ের যদি Rh-negative থাকে তাহলে মায়ের দেহে অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। ফলে নবজাত শিশুর প্রচণ্ড ন্যাবারোগ (Jaundice) হয়, কারণ মায়ের অ্যান্টিবডি শিশুর রক্তকণিকাকে (RBC) ধ্বংস করেছে। অবশ্য এ আজকাল কোন সমস্যা নয়। উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে মায়ের দেহে কোন অ্যান্টিবডি (antibody) তৈরী হয় না, এবং নবজাতকেরও ন্যাবারোগ হয় না।

লাল মাটির জেলা বাঁকুড়া—একটি সমীক্ষা

বিশ্বনাথ রায়

১৮৮১ সালে পশ্চিম বর্ধমানের নাম বদলে রাখা হয় বাঁকুড়া। বর্তমানে জেলার উত্তরে বর্ধমান, দক্ষিণে মেদিনীপুর, পূর্বে বর্ধমান আর হুগলী ও পশ্চিমে পুরুলিয়া। বাঁকুড়ায় জৈনদের দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। কেননা, প্রাচীন মূর্তি ও মন্দিরগুলি দারকেশ্বর ও কংশাবতীর দুই তীরে পাওয়া গেছে। মল্লরাজদের আমলে এই জেলা ছিল সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। কলানগরী বিষ্ণুপুর আজো টেরাকোটার ভাস্কর্যে প্রাণবন্ত এবং বাংলা ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্রষ্টা। বেশিরভাগ মন্দিরই পোড়ামাটির নিখুঁত অলংকরণে সমৃদ্ধ। বাঁকুড়ায় সবচেয়ে সংখ্যায় ও বন্দনায় রয়েছে দেবতা শিব। দেবীদের মধ্যে রয়েছেন হৃদয়ের কাছটিতে নানারূপে মনসা। লোকউৎসব ও পূজাপার্বণ বাঁকুড়ার প্রাণ। কালী ও রক্ষাকালীর মন্দির বেশিরভাগ থানাগুলো ছাড়িয়ে রয়েছে। মেলা ও গাজন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও মাঘমাসে অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধমাটির জেলা বাঁকুড়া হলো নানাজাতি, উপজাতি, আদিবাসী অধ্যুষিত ঐতিহ্যময় জনপদ।

বাঁকুড়া জেলার আয়তন ৬৯ হাজার বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ২৭.৭৪ লক্ষ। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৪৫ জন। জেলার সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে তপশিলী ২৮.২২ শতাংশ, আদিবাসী ১০.২৮ শতাংশ। বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার সম্প্রসারণে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। তার ফলে ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের তিরানরই শতাংশ বিনা বেতনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। এমমকি, বিনামূল্যে বই পেয়েছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে তাদের টিফিনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং শিক্ষকরা আজ সম্মানজনক বেতনও পাচ্ছেন। আদিবাসী শিশুদের জন্য ৪৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। নারীশিক্ষা, তপশিলী ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তিদান প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। বিগত ৬ বছরে

৪,৬০০ প্রাথমিক ও ১,৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এছাড়াও বয়স্ক শিক্ষার সুফল পাচ্ছে ৪ লক্ষ মানুষ।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭৬২টি, বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৪১০টিতে। এবং ৮৩৬টি গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করেন। রাজ্যের ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাখাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সাঁওতালদের ‘অলটিচক’ হরফ সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে। বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র পাঠ মহাশয়ের নিবন্ধের নিম্ন উদ্ধৃতিটি থেকে জেলার সেকাল-একালের শিক্ষাবিস্তারের চিত্রটি এক উজ্জলতর রূপ পরিগ্রহ করবে :

“বাঁকুড়া জেলার ১৯টি থানার মধ্যে অনেক থানা, যথা ছাতনা, গঙ্গাজলঘাট, মেজিয়া, ইন্দ্রপুর, রাণীবাঁধ, সিমলাপাল ইত্যাদিতে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না এবং অনেক থানা সদরেও ছিল না। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই জেলায় ২০।২১টি স্কুল ছিল। অবিভক্ত বাংলায় যখনমাত্র ৪০ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিত তখন এই জেলায় সাড়ে চারশতর মতো মাত্র পরীক্ষা দিত। বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ছিল এই জেলার একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র। বর্তমানে এই জেলার একটি থানা হইতেই ৬০০/৭০০ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতেছে। তখন ২৫।৩০ মাইল দূরবর্তী কোন গ্রামে কোন আখীরের বাড়িতে ও সস্তায় বোর্ডিংয়ে থাকিয়া পড়িতে হইত, আজ কোন ছাত্র-ছাত্রীকেই দেড় দুই মাইলের বেশি দূরবর্তী স্কুলে যাইতে হয় না। বিশিষ্ট গ্রাম লইয়া ১২ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত ছাতনা ইউনিয়নে তখন মাত্র একজন এম, এ ছিলেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ গ্রামে ম্যাট্রিক পাশ করা একজনও ছিলেন না। এখন প্রতি বছর এখান হইতে বহু ছাত্র-ছাত্রী পাশ করিতেছে এবং উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা বিভিন্ন স্থানে কর্মে নিযুক্ত আছেন। আদিবাসীরা অনেকেই শিক্ষার সুযোগ পাইয়া বিভিন্ন সরকারী

বিভাগের চাকুরিতে বা শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন এবং কেহ কেহ গ্রিস্তর পণ্ডায়েত্তের সদস্যও হইয়াছেন।" বাঁকুড়ায় শিক্ষিতের হার ৩৬.৫০ শতাংশ। তারমধ্যে আক্ষরিক জ্ঞানের অধিবাসীদের সংখ্যাই বেশী।

বাঁকুড়ার মোট ৭৮১,০০৭ জন শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষক ৪৯'০৯ শতাংশ, কৃষি-মজুর ৩৪'৩৪ শতাংশ ও নন-এগ্রিকালচারাল শ্রমিকের হার ২৪'৫৭ শতাংশ (আদমসুমারী, ১৯৮১)। ধানই জেলার প্রধান ফসল। গম, আখ, পাট, আলু, ডাল, তৈলবীজ ও সবজি চাষের এলাকা ক্রমশঃ বাড়ছে। জমির প্রধান বাধা ভূমিক্ষয়। জেলা বাঁকুড়ায় দুটি সেচ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও ১৬টি বীজ খামার, ৯টি বীজরক্ষণাগার, ১টি কৃষিফার্ম ও ১টি ধান গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। সবুজ বিপ্লবে যে পদ্ধতিতে উচ্চ-ফলনশীল বীজ তৈরী করা হয়েছে তাতে অনেক প্রাচীন জাতি বিনষ্ট হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষীদের হাতে গেলে বহুকালের লালন-পালন করা পুরানো বীজ ব্যবহার করা ছেড়ে দেয়। এইভাবে বহু প্রজাতি চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রজাতির সংরক্ষণের ব্যাপারে রাজ্যের কৃষিদপ্তরের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, জীবজগতে পোষ্টসাইড-গুলির মারাত্মক বিষের সুদূর প্রসারী প্রতিভা সন্দেহে দেশবাসীকে ওয়াশবাহাল করার উদ্যোগ খুবই সীমিত। বহুতঃ এদেশে পোষ্টসাইডের ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা ও লেখালেখি প্রায় নেই। বৈজ্ঞানিকেরা কৃষিতে পোষ্টসাইড বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারে কৃষিজাত সামগ্রীতে বিষের সন্ধান পেয়েছেন—যা আমরা রোজ (চাল, গম, তেল, শাক, ভেড়ি, বেগুন, কপি, গাজর প্রভৃতি) খেয়ে থাকি। সুতরাং জীবজগতের সাবিক কল্যাণে এই জঘন্য মানবিক সমস্যাটি নিয়েও জাতীয় স্তরে ভাবমা চিন্তা করা প্রয়োজন।

খরাপিড়ীত বাঁকুড়া জেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ৩৭৮'১ হাজার হেক্টর এবং ওই আবাদী জমির মধ্যে ৩১'০ হাজার হেক্টর দো-ফসলা জমি। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম ও মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকায় জল ধারণ ক্ষমতাও

কম। উপরন্তু, মাটিতে চূনের ভাগ বেশি থাকায় আবাদী জমির উর্বরশক্তি ও উৎপাদনশীলতার হারও খুবই কম। জেলার সমগ্র আবাদী জমির মধ্যে সরকারী খালের দ্বারা সেচস্বস্ত্র এলাকার পরিমাণ ১৩০,৩৩৭ হেক্টর, ১৪৪টি নদী থেকে জল উত্তোলন ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে ৬৪টি গভীর নলকূপ, শতাধিক পুকুর। সত্য বলতে কি, বাঁকুড়ার সেচ ব্যবস্থার ক্রমবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও শালতোড়া, মেজিয়া, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাট, ইছাপুর, রাণী-বাঁধ ও খাতরা বিশেষ খরা অঞ্চলগুলিকে খরামুক্ত করা আজো সম্ভব হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে ৫টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রভাবিত দ্বারকেশ্বরের ভালুকগড়া ঘাটে বাঁধ তৈরী ও গন্ধেশ্বরী ঘাটে সাব-ক্যানালের কাজ শেষ হলে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ খরা অঞ্চল সেচের আওতায় আসবে।

এই প্রসঙ্গে আরো গুটি কয়েক কথা উল্লেখ করা দরকার। রাজ্যের বড় বড় ঋতু প্রভাবিত সেচ প্রকল্পের সভাবনা খুবই সীমিত। কেননা, বর্তমানে মজে যাওয়া জলাধারগুলি সংস্কার করা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এবং বৃষ্টিপাত নির্ভর বড় সেচ প্রকল্প গড়ে তুলতে টাকা বিনিয়োগ ও সময় প্রচুর লাগে। এমন কি, ওইসব বড় সেচ প্রকল্প থেকে দ্রুত ফলও পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে, মাঝারি ও ক্ষুদ্রসেচের অনেক সুবিধাও (বিনিয়োগের টাকা কম, হাতে-নাতে ফল পাওয়া যায়, শ্রমের যোগান বাড়ে, বিনিয়োগের চেয়েও বেশি দামের উৎপাদন হয়; পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, ভূমিক্ষয়-রোধে সহায়তা করে) রয়েছে। এ রাজ্যে জলকর দিয়ে ৫ লক্ষ একর জমিতে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই সুযোগের অর্ধেক কৃষিজীবীরা নিয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা দক্ষিণবঙ্গের জমিতে ক্ষুদ্রসেচের জল ব্যবহার হয় বেশি। কৃষিকাজে বিদ্যুতের ব্যবহার হয় পাজারি ও হরিয়ানার ৪০ শতাংশ এবং এ রাজ্যে মোটে ৪ শতাংশ। রাজ্যের সেচের জলের অপচয় রোধে ৮ হাজার হেক্টর জমিতে মাঠনালা তৈরী হয়েছে। লাল মাটির জেলা বাঁকুড়ায় ও পুরুলিয়ার দুটি অভূতপূর্ব খরায় কৃষি উৎপাদন ও ফসল বাঁচাতে ক্ষুদ্র সেচের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। যদিও এ

ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কোন সহযোগিতা ও অনুদান পাননি। রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সৌরশক্তি চালিত পাম্পসেট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হলে গ্রাম-বাংলার ক্ষেত সুজলা-সুফলা হয়ে উঠবে।

বাঁকুড়া জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার চাষআবাদ হলেও বেশির ভাগ অঞ্চলে সনাতন কৃষি ব্যবস্থাই বহাল রয়েছে। তাছাড়াও চাষীরা উৎপন্ন ফসলের লাভ-জনক মূল্য পাচ্ছে না। উপরন্তু, তারা বাধ্য হচ্ছে দৈনন্দিন দ্রব্যসামগ্রী অগ্রিমূল্যে কিনতে। তা সত্ত্বেও ১৪টি অত্যাবশ্যক জিনিসের দাম বেঁধে সরকারী বটন ব্যবস্থার মধ্যে সরবরাহের (রাজ্যের) দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপেক্ষিতই রয়েছে। এমনকি ন্যায্য মূল্যে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর সরবরাহ করার ব্যাপারে দেশের ক্রেতাসমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা মোটেই সন্তোষজনক নয়। যদিও বর্তমানে দেশের নানান অঞ্চলে ৫০ হাজার প্রাথমিক প্রামাণ্য সমবায় সমিতি ও ২ হাজার পাইকারী সমবায় সমিতি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৮,৬০০টি ন্যায্য মূল্যের দোকান রয়েছে। তার মধ্যে ১৫,০০০টি বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে। দোকানের সংখ্যা যিগুণ করার দরকার।

ক্ষেত মজুরেরা সর্বত্র সর্বনিম্ন মজুরী ও বর্গাদাররা ন্যায়সঙ্গত ফসলের ভাগ পাচ্ছে না। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের মোট কর্মসংখ্যার মধ্যে কৃষক ৫৫.৬১%, কৃষিমজুর ২৬.১০% এবং ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কৃষক ৪৪.৫০% কৃষিমজুর ৪২.৫০% এবং দশবছরে ১৬.৪০% কৃষিমজুর বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রামীণ মহাজনী ঋণ ও দাদন প্রথার মাধ্যমে নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছে কৃষি আশ্রয়ী পরিবারগুলি। যদিও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষিজীবীদের গ্রামীণ মহাজনী ঋণের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু দাদনদার ও মহাজনেরা বহুবৃপীর মত রঙ বদলে আজও কৃষক কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে শোষণ অব্যাহত রেখেছে। বহুতঃ শোষণের এ বৃপ হলো সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুসৃতনীতির বিষময় ফলশ্রুতি।

ফলে ঋণের শোষণ থেকেও কোনক্রমে মুক্ত হতে পাচ্ছে না। স্বাধীনতার সাড়ে তিনদশক পরেও বেশিরভাগ কৃষি আশ্রয়ী পরিবারগুলির বিশেষ করে আদিবাসী ও তপসিলীদের আর্থিক অবস্থা আজো দারিদ্র সীমার অনেক নীচে রয়েছে। তবে সর্বাগ্রে চাই কৃষিতে আধুনিকীকরণের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভিত্তিক পরিকল্পনা। কেননা, কৃষকের ও কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির উপর জেলার সামগ্রিক উন্নতি নির্ভরশীল। স্বভাবতই জেলার সার্বিক কৃষিউন্নয়ন প্রকল্পে যুক্ত করা প্রয়োজনঃ (১) প্রতিটি ব্লকে একটি করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (২) সরকারী উদ্যোগে সঠিক সময়ে ও সুলভে ব্লক অফিসগুলির মাধ্যমে নির্ভেজাল রাসায়নিক ও জৈবসার, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও কীটনাশক ওষুধ সরবরাহ করা, (৩) সমবায় প্রথার সার্থক বৃপায়ন করা, (৪) অল্প সুদে ও সহজ শর্তে প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষিঋণদানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, (৫) উৎপন্ন দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ও জলকরের রেট সর্বত্রই এককরা, (৬) কংসাবতী সেচ প্রকল্পের জল খরিপ শস্য, রবিশস্য ও বরোধান চাষে নিয়মিত জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা, (৭) ভূমিসংরক্ষণ কর্মসূচীর বাস্তব বৃপায়ন করা, (৮) মাটির নীচের জলসংক্রান্ত জরিপের কাজ দ্রুত শেষ করা, (৯) সেচের খালগুলি নিয়মিত মেরামত করা, (১০) আলোচিত খরা অঞ্চলগুলিতে বিশেষ সেচ পরিকল্পনা জরুরী ভিত্তিতে বৃপায়িত করা, (১১) প্রতিটি ব্লকে একটি করে সর্বাধুনিক গো-প্রজনন কেন্দ্র ও মাটি পরীক্ষাগারের পত্তন করা, এবং (১২) আলোচিত খরা অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলের জলসেচের সম্প্রসারণ করা। এছাড়াও সাথে সাথে কৃষিজীবীদের আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করার স্বার্থে কৃষির উপর থেকে অব্যাহত শ্রমশক্তির চাপকে কমিয়ে আনার জন্যে কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক শ্রমপ্রধান শিল্পগুলির বিকাশ খুবই জরুরী। কেননা, ওই সমস্ত শিল্পগুলিই কৃষি-আশ্রয়ীদের একটা বিরাট অংশকে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।

রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশ অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, কৃষিপণ্যের বাজার প্রভৃতি যোগাযোগের উন্নতির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭৭-৮০

সালের মধ্যে রাজ্যের ১,৬২১ কি. মি. রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। এবং গ্রামবাংলার রাস্তা তৈরীর বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফারাককে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। ১৯৭৭-৮০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৯টি সেতুর কাজ শেষ হয়েছে এবং ১৪টি সেতুর কাজ চলছে। এইসমস্ত কাজে সারা বছর ধরে অগণিত শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের যৌথ উদ্যোগে বাঁকুড়া শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে একটি কর্মপ্রহেন্সিত পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার প্রধানতঃ দুটি কাজ হলো : (১) বাঁকুড়া শহরের উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদীর তীর বরাবর পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ বাইপাস রোড, যা শহরের উপর যানবাহনের চাপ কমিয়ে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করা, এবং (২) কুটীরশিল্প অস্থায়িত লোকপুত্র—রাজগ্রাম ঘাটে দ্বারকেশ্বর নদের উপর ‘বল টাইপ ব্রিজ’ তৈরী করা। ফলে জেলার শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ অনেক সুগম হবে।

গ্রামোন্নয়নে ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। রাজ্যের ৯০ জনেরও বেশি মানুষ গ্রামবাসী। ১৯৫০ সালে নূতন সংবিধান চালু হয়। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ গড়ার অনুমোদন করেন। ১৯৫২ সালে গ্রামোন্নয়নের জন্যে সমিতি উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু হয়। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়। ১৯৬৪ সালে ওই আইন সংশোধিত হয়। ১৯৭০ সালে নূতন করে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়। বর্তমানে গ্রামপঞ্চায়েতে একাধিক গ্রাম যুক্ত। ওই আইনে গ্রামসভার ঠাই নেই। সুতরাং গ্রামের কোন পরিকল্পনায় তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারে নি। স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চায়েত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হলেও কাজের কিছুই হয়নি। ১৯৭৭ সালে নূতন এক সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালে গ্রিস্তর (জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) পঞ্চায়েত-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে জনগণের প্রত্যেকটি অংশ—কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেত, মজুর, শিক্ষক, ভাগচাষী প্রভৃতির ভেতর থেকে প্রতিনিধি-নির্বাচিত

করে নিজেদের গ্রাম প্রশাসনের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত করেছে। নূতন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের নিপীড়িত মানুষের মধ্যে গণ-তন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। অন্যভাবে এস.কে. দে-র ভাষায় বলতে পারি, “রাজ্য ও জনগণের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদ ভাগাভাগিই হল পঞ্চায়েতী রাজ। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জনসংস্থাগুলিতে রাজ্যের কর্তৃত্ব কমিয়ে সেগুলিকে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া। চূড়ান্ত পর্বে রাজ্যের হাতে শুধু থাকবে রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কাজকর্ম, রাজ্যের যোজনা পরিকল্পনা ও কার্যসূচি এবং জেলা, আন্তঃরাজ্য ও কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের বিষয়গুলি। রাজ্যের হাতে থাকবে জরুরী অবস্থার অবশিষ্ট কিছু ক্ষমতা পরিসেবা, বিনিয়োগ ও অন্যান্য তদারকির কাজ।” পঞ্চায়েতগুলির ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ ও ‘জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান’ কর্মসূচি জনবান্ধিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গত পাঁচ বছরের পঞ্চায়েতী রাজের মাঝ দিয়ে জেলার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক বৃদ্ধান্তের সূচনা করেছে। সেগুলি হলো : (১) দুটি অদ্বৈতপূর্ব খরা ও বন্যায় পঞ্চায়েতগুলির যোগ্য ভূমিকা সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে, (২) আঞ্চলিক সম্পদ ও শ্রমের বিনিময়ে পঞ্চায়েতগুলি বর্গাদার, প্রান্তিক ও ছোটচাষীদের জন্যে অতিরিক্ত জমিকে সেচের আওতায় এনে অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে, (৩) রাস্তা, কালভার্ট ও বনসৃষ্টির ক্ষেত্রে অদ্বৈতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, (৪) দরিদ্র গ্রামবাসীদের উন্নতিকল্পে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তুলেছে, (৫) প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, (৬) অল্পশ্রমদীবস সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে মজুরদের শ্রমহীনদীবস আশাতীতভাবে কমে গেছে, (৭) পঞ্চায়েতের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বাড়তির দিকে যাচ্ছে, (৮) কৃষিআশ্রয়ী পরিবারকে উদ্ধৃত কৃষিজমি বণ্টন করা হয়েছে, (৯) বাহুজমি ভূমিহীন গ্রামীণ পরিবারের স্বপক্ষে নথিভুক্ত করেছে, (১০) নথিভুক্ত বর্গাদারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং (১১) বর্গাদার ও পাটাদারদের জন্যে বিকল্প ঋণ-সহায়তা দান ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পঞ্জীসমাজের অর্থনৈতিক

পুনর্গঠনে পঞ্চায়েতগুলির অসীম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গত ৫ বছরে পঞ্চায়েতী নীতি ও উন্নয়ন গ্রামবাংলার মানুষের বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবন ধারায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ছোঁয়া লেগেছে। এই আর্থিক সচ্ছলতার ঢেউ রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও কম বেশি লেগেছে। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি গ্রামীণ উন্নয়নে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য হলো মাছচাষ, দুধ উৎপাদন, কৃষি, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সভ্যবনাময় সমবায়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার ও সম্প্রসারণ করা। বর্তমানে কৃষিকে ভিত্তি করে সমবায়ের প্রধান কাজ। সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি সমস্ত রাজ্য জুড়ে রয়েছে। এই সমিতির সংখ্যা প্রায় ৬,৬০০। এ ছাড়াও ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক জমির উন্নয়নে, ছোটসেচ, ফলের বাগান, পুকুর সংস্কার প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এবং কৃষি বিপন্ন সমবায় সমিতি ব্রহ্মসুত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। বস্তুতঃ গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, পঞ্জাব ও হরিয়ানার তুলনায় এ রাজ্য অনেক পিছিয়ে। মহারাষ্ট্রে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ৬০০ কোটি টাকা ব্যবসা করেছে। আর পশ্চিমবঙ্গ ৩০০ কোটি টাকাও করতে পারে নি। এমন কি সমবায় সংস্থাগুলির সদস্যরাও ঋণ সময়মত পরিশোধ না করায় ঋণদান ব্যবস্থা ক্রমশঃ সংকুচিত হতে পড়েছে। এই চিত্র রাজ্যের সব জেলাগুলিতে কম বেশি দেখতে পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলার তাঁতশিল্পকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে সমবায়ের সাম্প্রতিক উদ্যোগ প্রশংসার দাবী করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ঋণদান সমিতির সংখ্যায় ভারতবর্ষের শীর্ষে। এই রাজ্যের সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৬ হাজার। এই সমিতিগুলির হ্রদী-বিচ্যুতি, নানান অভিযোগ, দুর্নীতি প্রভৃতি কৃষক, ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, পাটাদার ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থে দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। সম্প্রতি সমবায় সংস্থায় তৈরী সামগ্রীর প্রচারের জন্য অনুষ্ঠিত ‘সমবায় ও গ্রামীণ উন্নয়ন মেলা’-টি বামফ্রন্ট সরকারের একটি অভিনব প্রয়াস।

বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন ধরনের ঋণদান সমিতির সংখ্যা

৭২৯, সভ্যসংখ্যা ৫১ হাজার ও সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন ৮৬ লক্ষ (ইকনমিক রিভিউ)। ওই সমিতিগুলির বেশিরভাগই নানান সমস্যায় ধুঁকছে। তাঁতশিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে মূলধনের অভাব, বাজার ব্যবস্থা, উৎপাদন পদ্ধতির অনগ্রসরতা, কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা, সংগঠনের অব্যবস্থা, তাঁতশিল্পীদের চরম দারিদ্রতা ও ঋণগ্রস্থতা প্রভৃতি। সুতরাং তাঁতশিল্পে ও তাঁতশিল্পীদের স্বার্থেই এই সমস্ত সমস্যাগুলির আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

বাঁকুড়ার অফুরন্ত কাঁচামালের উৎসগুলি থেকে বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র, কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার অটেল সভ্যবনা থাকা সত্ত্বেও শিল্পায়নে এই জেলা খুবই অনুন্নত। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের সংযোগস্থলে আট মাইল লম্বা চার মাইল প্রস্থ জুড়ে গ্রানিটশিলা রয়েছে মজুত। এবং বিহারীনাথ থেকে মেজিয়া পাহাড় পর্যন্ত পালালিক শিলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। অর্থগ্রাম, শালতোড়া, বড়জোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লা পরিব্যপ্ত। জেলার পাহাড়গুলোর মধ্যে বিহারীনাথ সবচেয়ে উঁচু। এই অঞ্চলের নীচে রয়েছে অটেল কয়লা। বিহারীনাথ থেকে মেজিয়া সংলগ্ন শুধু পাহাড় আর টিলা। মেজিয়া থানার রামলালপুরে চূণাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। শূশুনিয়া পাহাড়ের উপরিভাগ ‘চাকী’ তৈরীর উপযুক্ত কোয়ার্জাইট পাথর পাওয়া যায়। বাঁকুড়া শহর ও তার পশ্চিমদিকে ‘নাইশিলা’ প্রচুর পাওয়া যায়। রাণীবাঁধ থানার ঝিল-মিলিতে ও শালতোড়া থানার গৌসাঁড়িতে অল্প হাদিস পাওয়া গেছে। রায়পুর, খাতরা, রাণীবাঁধ প্রভৃতি অঞ্চলে চিনেমাটি প্রচুর মজুত রয়েছে। বয়লারের চুল্লী, ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি তৈরীর উপযুক্ত ফায়ার-ক্রে সাহারজোড়া, পিডারবনী, সোনমুখি, গঙ্গাজলঘাট মজুতে পরিপূর্ণ।

বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ জমি অনুর্বর, রুক্ষ, পাথুরে হলেও খনিজ সম্পদে রত্নগর্ভ। কৃষিপ্রধান জেলা বাঁকুড়ার কৃষিশিল্পের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। খনিজশিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণের সাথে কৃষিশিল্পের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কৃষিজ-তেল (লেমনগ্রাস তেল, তুষ তেল, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি) ভিত্তি করে সংখ্যাধিক শিল্প গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। দেশবিদেশে ডেজজ তেলের বিরাট

বাজার রয়েছে। গুড় থেকে অ্যালকোহল তৈরী হচ্ছে— যা থেকে ক্রোরাইড, পলিভিনাই, অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি পাওয়া যাবে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ওষধি গাছের চাষ করতে পারলে রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ হতে পারে। প্রতিটি জেলায় আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস প্রাপ্ত তৈরী করা অসম্ভব নয়। এই প্রকল্পের কল্যাণে (১) পরিবেশ দূষণ ঠেকান যাবে, (২) ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, (৩) উনুনে রান্নাও করা যাবে। একসময় বিষ্ণুপুরের সুগন্ধী তামাক ছিল প্রসিদ্ধ। এবং শুলুনিয়া পাথরের থালা, গেলাস, বাটি, পুতুল, ধূপদানী প্রভৃতি শ্রমপ্রধান শিল্প অনেকেরই রুচি-বুজির সংস্থান হয়। এছাড়াও বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী রেশম-শিল্প সমৃদ্ধ। ফুলের নক্সা তোলা থালা, ঘটি, কলসীর জন্যও কলানগরী বিষ্ণুপুরের সুনামে ভাটা পড়েনি। কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র বাঁকুড়া শহর, মদনমোহনপুর, সোনামুখী, লক্ষীসাগর, অযোধ্যা, পাতসায়ার, বেজাকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। শ্যামপুরের অধিবাসীদের ছুরি, কাঁচি, দা প্রভৃতি শ্রমপ্রধান শিল্প কর্মসংস্থান হয়েছে। বড়জোড়া থানার ঘুটুঘেরিয়ার বড়শির সুনাম আজো অক্ষুণ্ন রয়েছে। কেদুয়াডিহ ও লোকপুরে ভেড়ার চাষ ও লোম দিয়ে কবল তৈরী করে অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। জেলা বাঁকুড়ার দারুশিল্পের (কাঠের রথ, মূর্তি প্রভৃতি) খ্যাতি একটুও কমেনি। জেলার সোনামুখী, পাঁচমুড়া, মরলু ও রাজগ্রামের তৈরী ঘোড়ার বৈচিত্র্য জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। এবং এখানে মৃৎশিল্পীদের তৈরী কলমদানী, পেপার-ওয়েট, ছাইদানী প্রভৃতির কদর দিনদিন বাড়ছে। আজো বিষ্ণুপুরী লঠনের জনপ্রিয়তা কমেনি। শুধু তাই নয়, চামড়ার বুটজুতা, চপ্পল প্রভৃতি শ্রমপ্রধান শিল্প অনেকেরই অঙ্গসংস্থান হয়েছে। বাঁকুড়া বিড়িশিল্পও সমৃদ্ধ। এই শিল্পে প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক যুক্ত। কেঁদপাতা এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। এবং অধিকাংশ পাতা বাইরে চালান দেওয়া হয়। প্রতি বছর দশ হাজার শ্রমিক তিন মাস ধরে পাতা সংগ্রহ করে। বাঁকুড়ায় প্রস্তাবিত স্পিনিং মিলটি ও নাইলন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। রাজ্যের তাঁতশিল্পের উন্নয়নে বহুমুখী ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সূতোর দরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব

হয় নি। নিচের সারণী (১) থেকে বিভিন্ন ধরনের সূতোর সারাংশিক দর বাড়ার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে :

সারণী (১) সূতোর দাম : ১৯৭৮-১৯৮২ (টাকায়)			
বিভিন্ন ধরনের সূতো	১৯৮০	১৯৮০	১৯৮২
৮০ সুপার (১০ পাউণ্ড)	২০৮	২২২	২৬৮
১০০ কোটারী	৩১০	৩২৮	৩৫৫
২/৮০ সূতো	২১০	২২১	২৪৮
২/৪০ সূতো	১০৮	১২৭	১৪২
মুগা (প্রতি ভরি)	১০	১২	১৬

বাঁকুড়ায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পে তৈরী শাড়ী, গামছা, কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি তাঁতশিল্পীদের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়তে সাহায্য করেছে। এ রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ১২ হাজার তাঁতে ৫ লক্ষ মাটি ঘেঁসা মানুষের অঙ্গ-সংস্থান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামীণ কর্মসংস্থানে কৃষির পরই তাঁতশিল্পের স্থান। রাজ্যের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বিকাশ ও তাঁতশিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প দপ্তরের বহুমুখী কার্যসূচীতে রয়েছে :

(১) ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ হস্তচালিত তাঁতকে সমবায় সমিতির আওতার মধ্যে আনা, (২) আদর্শ সমবায় সমিতি গড়ে তোলা, (৩) উন্নততর সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা, (৪) তাঁতের কাপড় বিক্রির উপর ভরত্বিকর ব্যবস্থা করা, (৫) ব্যাস্ক ঋণ ও সুদের উপর ভরত্বিকর ব্যবস্থা করা, (৬) তাঁতহীন বয়নশিল্পীদের তাঁত বর্ধন করা (৭) কার্যকরী ঋণের ব্যবস্থা করা, (৮) সমবায় সূতো-কলের টেকোর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা, (৯) তাঁতশিল্পীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সম্প্রসারণ করা, এবং (১০) সমবায় সমিতিগুলিকে (ক) প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা, (খ) কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করা, (গ) পরিচালনা সম্পর্কিত সাহায্য, (ঘ) কার্যকরী মূলধনের বন্দোবস্ত করা এবং (ঙ) বিপননের ব্যবস্থা করা।

মেজিয়াতে ডি, ভি, সির বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিল্পায়নে প্রভূত সাহায্য করবে। সম্ভবত, প্রস্তাবিত বাঁকুড়া-মেজিয়া-রাণীগঞ্জ রেললাইনটি বাস্তবায়িত হলে কল্লা ও ডলোমাইট শিল্পের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। জেলায় ব্যাস্কের শাখা ৪১টি

অর্থাৎ ৫০ হাজার লোকের জন্য ১টি ব্যাঙ্ক। এবং বিদ্যুৎ পৌঁছেছে ৭১০টি গ্রামে ও ৫টি শহরে। ব্যাঙ্কের শাখার আরো সম্প্রসারণ হওয়া দরকার, কেননা, সিংহভাগ মূলধন মহাজনদের কাছ থেকে গৃহীত হয়। যদিও লাল মাটির জেলা বাঁকুড়াকে স্বনির্ভর করার জন্য ১৯৭৬ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে।

নিচের সারণী (ইকনমিক রিভিউ) থেকে বাঁকুড়া জেলার সামাজিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের হ্রাস বৃদ্ধির মূল্যায়ন করা যাবে। ১০ বছরের মধ্যে ১৯৭৪-৭৫ ও ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৭৯-৮০ সালগুলিতে বাঁকুড়াতে উচ্চহারে শিল্প-বিকাশ হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার বাঁকুড়ায় তাঁতশিল্প গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

সারণী (২) বাঁকুড়া জেলার নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের

সংখ্যাতথ্য ১৯৭০-৭১-১৯৭৯-৮০

সাল	শিল্প সংস্থার সংখ্যা	শিল্পবিকাশের হ্রাস (—) বৃদ্ধির (+) পার্থক্য
১৯৭০-৭১	১৬০	(—)
১৯৭১-৭২	১২৭	— ৩৩
১৯৭২-৭৩	১৭০	+ ৪৩
১৯৭৩-৭৪	২৬৮	+ ৯৮
১৯৭৪-৭৫	১৬৮০	+ ১৪১২
১৯৭৫-৭৬	৩১৪	— ১৩৬৬
১৯৭৬-৭৭	২১৫	— ৯৯
১৯৭৭-৭৮	৩২৯	+ ১১৪
১৯৭৮-৭৯	৬৬৮	+ ৩৩৯
১৯৭৯-৮০	৪৮৩	— ১৮৫

এই জেলার বনভূমির পরিমাণ ১৪০'৪ হেক্টর। এই অরণ্য ভূমিতে অজুন, মহুয়া ও শালগাছের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু বনজসম্পদের প্রাচুর্যের তুলনায় কাঠ ও ফাঁটিয়ার শিল্প সম্প্রসারিত হয়নি। খাগরা ও সোনামুখীতে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী গালা শিল্পের প্রসারের অঙ্গ সন্ধান রয়েছে। বাস্তব আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদভিত্তিক নিচের প্রমুখ শিল্পগুলি গড়ে তোলাও অসম্ভব নয়। (১) শালতোড়ার মাটি থেকে টালি শিল্প,

(২) পাল্পসেট মেরামতী শিল্প, (৩) খাতরা ও সিমলাপালের চীনা মাটির উপাদান থেকে চীনা মাটির বাসনপত্র ও খেলনাশিল্প, (৪) ট্যানারি ও হাড় থেকে সার কারখানা ; (৫) ডেয়ারী ও পোলট্রি (৬) স্যাকারিং ও অক্সেসারের কারখানা, (৭) আম প্রসেসিং শিল্প, (৮) শীথ ও সিমেন্ট শিল্প, (৯) মধু ও মোমশিল্প, (১০) কাগজ ও কাগজবোর্ড শিল্প, (১১) সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, এবং (১২) ধাতব ও অধাতব খনিজশিল্প। বহুতঃ উপরোক্ত শিল্পগুলি জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসারকল্পে ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের ভিত্তকে তৈরী করতে সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, জেলার সমগ্র অঞ্চলের সম্পদ, মূলধন ও কর্মদক্ষতার সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রত্যাশিত কর্ম-সংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে। তার ফলে জনবসতি-পূর্ণ শহরাঞ্চলে জনগোষ্ঠীর অসুপ্রবাহও রোধ করা যেতে পারে।

বাঁকুড়ার মুকুটমনিপুর, মেজিয়া, সিমলাপাল, রায়পুর, বিষ্ণুপুর ও জয়পুর বার্ড সাংচুয়ারিগুলি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে। পোড়ামাটির দেশ বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরের দলমাদন কামলী কারুকার্য আকর্ষণীয়। যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি গৃহটি পর্যটকদের মন কেড়ে নেবে। শূশুনিয়া পাহাড়কে পর্বত অভিযাত্রীদের অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এখানকার ডোকরা শিল্পের নাম আছে। শূশুনিয়ায় চন্দ্র বর্মার শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। হাছীরের ঝামা-পাথরে তৈরী রাসমণ্ডিও চিত্তাকর্ষক। এছাড়াও রাধামাধব মন্দির, রাধাগোবিন্দ, কালাচাঁদ, রাধেশ্যাম লালজী, মল্লেশ্বর, মদনমোহন, মুরলীমোহন, মদনগোপাল, শ্যামরায়, জোড়-বাংলা প্রভৃতি মন্দিরগুলি মল্লরাজদের ঐতিহাসিক অঙ্গ কীর্তির নিদর্শন। এইসব সম্ভাবনাময় পাখি-উপনিবেশ, মন্দিরস্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চারুশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে পর্যটনশিল্পের বিকাশের মাঝ দিয়ে দেশী-বিদেশী প্রকৃতি-প্রেমিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করে আঞ্চলিক বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এই অঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানো অসম্ভব নয়। বাঁকুড়ার প্রাকৃতিক, খনিজ ও কৃষি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলা অসম্ভব নয়।

এবং তার ফলে জেলার মাথাপিছু আয়ের স্বপ্নভার গ্রানি ও বেকারীর জ্বালা অচিরেই দূর হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক সূত্র :

(১) বিশ্বনাথ রায়—গোথ অব অল-স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : এ স্ট্যাণ্ড, সোস্যালিস্ট পারসপেক্টিভ, ক্যালকাটা, ভলিউম-৪ ; নং ৪, ১২-৪১, ১৯৭৭

(২) এস, কে, দে—পণ্ডায়ত : পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষা. আনন্দবাজার, ১৫ই আগস্ট. ১৯৮৩

(৩) গোপালচন্দ্র পাত্র—গ্রামের উন্নতি আর্থিক ও বহির্ক, মানুষ তৈরী হয় নাই, যুগান্তর, ১৫ই আগস্ট ১৯৮৩

(৪) তরুণদেব ভট্টাচার্য—পশ্চিমবঙ্গ দর্শন : বাঁকুড়া, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৮২

(৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকার—পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ২৪শে জুন—১ ও ৮ই জুলাই, ১৯৮৩

গল্প

তীর্থভূমি

বান্ধীরাও সেন

শহর ছাড়িয়ে ডানদিকের রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে একটা রিক্সা এসে থামলো কলেজ গেটের সামনে।

—আর যাবেন না বাবু? রিকশাওয়ালা জানতে চায়।

—না, এইখানেই নামবো, বলতে বলতে এক বুড়ো ভদ্রলোক নেমে এলেন নীচে।

মাঘ গেলেও শীত যায় নি তখনও। বাতাসে হিমেল আমেজ। পরিষ্কার আকাশ থেকে ঝকঝকে রোদ নামছে লুটোপুটি খেয়ে। কেমন বড় বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল চারিদিক।

ভদ্রলোক রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সব খুঁটিয়ে। প্রায় মানুষ প্রমাণ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট কলেজ কম্পাউণ্ড। নতুন কলি ফেরানো সার সার দোতারা তিনতলা ঘর। ক্লাস-রুম, অফিস, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী।

সামনের টানা আয়তাকার জমিনটায় নানান রকমের ছায়ার ঘেরা গাছ।

দেখতে দেখতে ভদ্রলোকের সারা মুখ আলো হয়ে উঠেছে খুশীতে। নিজের মনে মনেই বলে উঠেছেন—বাঃ ভারী সুন্দর তো।

—কি এমন সুন্দর দেখলেন আপনি?

এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু কথাটা কে বললো, জানতে গিয়ে দেখলেন, গেটটার ওধারে বামপাশের পাঁচিলে ছোট্ট একটি বাঁশের খাট্টা পাত।

ওভেই আধবসা, আধশোওয়া ভঙ্গীতে আরাম করে একটি তরুণ টেপ রেকর্ডে গান শুনছে। সম্ভ্রান্ত হিন্দী ফল্মী গান। যা মাঝে মাঝে হাটে বাটে, গাঁয়ের ভাঙা আলের গুঁড়ি পথেও মুখে মুখে ফেরে। তারই চটুল একটা সুর।

ধোপ দরস্ত তরুণের পরনে সার্জের প্যান্ট, চিস্তির বিস্তির দামী উলেন পুল ওভার। হাতে ইলেকট্রনিকের ঘড়ি। ঘাড় গড়িয়ে নামা সম্বর ব্যাকব্রাশ বাবরী।

গানের সুরে মাথা দোলাতে দোলাতে ঐ তরুণই সকোতুকে জানতে চাইছে—কি এমন সুন্দর দেখলেন আপনি?

—কলেজের ছিমছাম এই ঘরগুলো। চারধারে চমৎকার পাঁচিল। এমন পরিবেশ।

—এই সেদিনই হয়েছে সব। গত কয়েক বছরে মাত্র। এখন কত ছাত্রছাত্রী পড়ে। তার উপর বছরে হাজার হাজার টাকা সরকারী সাহায্য। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট

কর্মিশনের মঞ্জুরী। আর্টস, সায়েন্স, কমার্স সব শাখাতেই অনার্স।

—ভারী ভালো লাগছে শুনতে। ভারী সুন্দর।

—অথচ আগে এক বুড়ো পাত্রীর কাছ থেকে কেনা ভাঙা বাড়ীর ক'টা কামরায় ক্রাস হতো। কুড়িয়ে বাড়িয়ে জনা কয়েক ছেলে। শুনছি প্রিন্সিপ্যাল নাকি ছুটির দিনে বাড়ী বাড়ী সাহায্য চেয়ে ফিরতেন। কত কষ্টেই যে চলতো।

—শুরুতে সব কিছুরই এইভাবে চলে। চেয়ে, চিন্তে সাহায্য নিয়ে একটু একটু করে গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠান।

—কিন্তু আপনি কি কারো ভর্তির ব্যাপারে এসেছেন?

—না, ঠিক ভর্তি নয়।

—তবে?

—ঐ একটু দেখতে শুনতে।

—তাহলে এভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যান ভেতরে যান।

কয়েক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

—তোমার নামটাতো জানা হলো না এখনও।

—সোঁগত সেন।

—চমৎকার নাম। কিন্তু কি করো তুমি এখানে?

—চাকরী।

—কিসের?

—কিসের আবার! দেখতেই তো পাচ্ছেন গেটেই রয়েছি।

গেটে রয়েছি! মনে মনে কৃথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন ভদ্রলোক। মানে গেটম্যান? দারোয়ান?

কিন্তু খাটিয়ায় এমন আধ-শোওয়া ভঙ্গী? এমন শৃঙ্খলা-হীন যথেষ্টাচার! গলার স্বরও কেমন কর্কশ, অমসৃণ! কিন্তু এই নিয়ে অন্য কিছু বলার আগেই সে টেপেরেকর্ডে ভ্রূনা একটি গান ধরেছে।

সাম্নে চওড়া মোরামমোড়া রাস্তার দুই দিকে ফুলের কেয়ারি। কত রংয়ের মরশুমী ফুটেছে। জোড়ায় জোড়ায় উড়ছে প্রজাপতিরা। যেন পাখা ছড়ানো চঞ্চল কিছু ফুলই বুঝি ইতস্তত সঁতার কাটছে বাতাসে।

দেখতে দেখতেই এগুচ্ছিলেন ভদ্রলোক। এগুতে এগুতে ম্লিন এক তুপিবোধে মনটা উপচে উঠেছে বারবার।

অদ্ভুত, শান্ত, নিষ্পাপ পরিবেশ। বিদ্যাতীর্থেরই উপযোগী। একটু একটু পরিচর্যায় কুঁড়ি যেমন ধীরে ধীরে ফুল হয়ে জাগে, তেমনি সমান পরিবেশে শিক্ষার বিকাশ ধারাও পরিপূর্ণ হয়, সার্থক হয়।

ভাবতেও ভীষণ ভালো লাগছে তাঁর।

কিন্তু কিছুদূর এগুতে না এগুতে ভাবনাটা ভীষণ ধাক্কা খেল হঠাৎ। হঠাৎই ডানদিকের বড় একটা হলঘর থেকে দর্জাগলোকে সশব্দে প্রায় আছড়াতে আছড়াতে অধীর একদল ছেলেমেয়ে একসাথে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। প্রত্যেকের পকেটে এবং মুঠোয় ভর্তি আবার। অনবধান স্থলিত বেশবাস। প্রায় বেপথু ভঙ্গীতে পরস্পর পরস্পরকে ইচ্ছেমতো মাখাচ্ছে, মুখে, গালে, চুলে, বেনীতে। সে কি প্রখর উল্লাস! খালি রং, রং আর রংয়ের ছড়াছড়ি।

—কি হয়েছে কি?

সকলেই উধেলিত ও চঞ্চল। প্রায় নাচতে নাচতে চলেছে। কেউই মনোযোগ দিচ্ছে না তাঁকে।

তবুও তারিমধ্যে কোনক্রমে একজনকে থামাতে, সেও সমান ব্যস্ততায় বলেছে—বলুন দাদু, কি বলতে চান বলুন।

কলেজের ছেলের মুখে একজন অপরিচিত বয়স্ক ভদ্র-লোককে দাদু ডাক বড় লঘু, ভীষণ অস্বস্তিকর। তবুও জানতে চেয়েছেন—কি হয়েছে কি তোমাদের?

—কেন?

—এমন আবার ওড়ানো?

—জিতোঁছি যে।

—কিসে?

—কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে। আমাদের ছাত্রতোষণী দলই এবার দখল করেছে ক্ষমতা।

মুহুর্তে অধীর ছাত্র ছাত্রীরা উত্তেজিত, উত্তাল হয়ে উঠেছে। বুদ্ধের জিগিরের চঙে মুঠো করা হাত আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে আকাশকেই আলোড়িত করে তুলেছে চীৎকারে—ই-ন ক্রাব।

—জিন্দাবাদ।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু কেন, কিসের জন্যে বিপ্লব? ভদ্রলোক নিজের মনে যেন নিজেকেই বজ্রেন কথাত। যা অন্যান্য, যা মানুষকে কষ্ট দেয়, বণ্ডনা করে সেইসব পাপ, পাপাচারকে মুছে সরিয়ে আগামী কালের এইসব নবীন যাত্রীরা আবার এক নতুন যুগের ভোর আনবে, এইই প্রত্যাশা এবং প্রার্থনা।

কিন্তু এরা নিজেরাই যদি চারিদিক বিকাশের এমন প্রভাত লগ্নে স্থিত না হয়, সংযম অনুশীলন না করে, শিক্ষাশালায় শৃঙ্খলাকে যত্নে লঙ্ঘন করে, তাহলে বড় হবে কোন ঐশ্বর্য?

বিপ্লব করবে কিসের জোরে?

ক্ষোভে, অসন্তোষে যতটা পারেন বেগে সাথে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ততক্ষণে নির্বাচন জেতা ছাত্রছাত্রীরাও প্রেরণীকৃত হয়ে শহর পরিভ্রমণের জন্যে তৈরী হয়েছে। তবে আপাতত বিপ্লবের দীর্ঘজীবন নয়, এখন তারা বিরোধী পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার ফরমান জানাচ্ছে ঘন ঘন—কবর দাও, কবর দাও।

ভদ্রলোক কিন্তু এগিয়ে চলেছেন সমানে।

ডানদিকে সারি সারি ক্লাশরুম। বুড়ো পাদীর কাছ থেকে কেনা আগের ঘর ক'টার সমান্তরাল রেখায় আরো ক'টি পাশাপাশি বড় মাপের নতুন রুম বানানো হয়েছে। রুম নয়, হল। প্রতিটি হলের নামানুকরণও করা হয়েছে দেশবিদেশের বিভিন্ন সব মনীষীদের নামে।

অনেকগুলোই খালি। একটাতে তো বেশ কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী কিসের একটা পরীক্ষার মতো দিচ্ছে মনে হয়। পরীক্ষাই বটে। বেয়ারার কাছ থেকে জানা গেল, আর্টসের ফাইন্যাল ইয়ারের টেস্ট চলছে এখন।

কিন্তু ইচ্ছে মতো, একে অপরের খাতা কাড়াকাড়ি, দেখাদেখি করে লেখা, এস্তার বই ঘাঁটা ও। কোথাও বা কেউ নোট দেখে বিশেষ কোন প্রশ্নের উত্তর জোরে জোরে হাকাচ্ছে। বাকিরা লিখছে ইচ্ছে অনুযায়ী।

পরীক্ষা নয়, একালের নতুন এক প্রহসন।

সাক্ষী গোপালের মত কে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন চেয়ারে। সম্ভবত বিভাগীয় অধ্যাপক অথবা ইন-ভিজিটর। কিন্তু মুখ দেখলে মনে হবে যেন, তাঁর

রক্তমাংসের দেহটাই কেবল রয়েছে মর্তের মাটিতে, আর তিনি নিজে পাড়ি জমিয়েছেন, অন্য কোন গ্রহে অথবা উপলোকে। চোখের সাম্নেও যা দেখছেন, তাও কেবল মায়া, দৃশ্য বিভ্রম মাত্র।

গাঢ় কষ্টের ছায়া ফুটেছে ভদ্রলোকের চোখেমুখে। ওদিকে ক্লাশরুমের বাইরের দেয়ালে কয়েকজন ছাত্র অতি যত্নে পোস্টার সাঁটেছে—অধ্যক্ষের নির্বাচনী সিদ্ধান্ত আমরা মানছি না। মানবো না। তারই প্রতিবাদে আগামী কাল ময়দানে বিশাল এক ছাত্র সমাবেশ।

আশ্চর্য! কোথাও কোন দেয়ালের এতটুকুও খালি নেই। খালি পোস্টার আর পোস্টার আর পোস্টার। পোস্টারের নামাবলী।

নানারকমের দাবী আর প্রতিবাদ।

চুকতেই অজস্র ফুলের সেই নান্দনিক বাতাবরণ মনকে যা জুড়িয়ে তুলেছিল তা এখন নেই আর। কেমন একটা সামরিক কঠিনতা আত্মপ্রকাশ কচ্ছে ক্রমশ। চারিদিকে সংশয়ের ইঙ্গিত। অবিশ্বাসের আভাস।

দু'এক যায়গায় ক্লাস হচ্ছে ঠিকই তবে তা নির্ভাহীন, একাগ্রতাহীন। কেমন একটা নেতিবাচক মানসিকতা। ভাঙা হাট বলেই মনে হয় যেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ভাঙলেন ভদ্রলোক। ভেঙে, চুরে উড়িয়ে দিলেন শূন্যে। সাথে বাগানটায় তেঁতি অবিরাম ছায়া বিস্তার। করা পাতারা পাক খেতে খেতে নামছে। কোথাও বা গুঁড়ি বেয়ে ওঠানামা ক'ছে পিঁপড়েরা। ভেবেছিলেন, কিছুক্ষণ জিরোবেন সেখানে। দেখবেন তাঁর নিজের শরীরের মতো গাছগুলোরও শাখায় প্রশাখায় বয়স কেমন জরার স্বাক্ষর এঁকেছে। কিন্তু সেখানেও কিসের যেন বাদানুবাদ চলছে। উত্তেজনায় হাতাহাতি হওয়ার অবস্থা।

অনেকেই মজা দেখছে ঘিরে। ক্লাস থেকেও ছুটছে কেউ কেউ।

তার মধ্যেই অনতিদূরে নিভুতে অন্য একটি গাছের আড়ালে চলেছে, দুটিরে মিলানো নিম্নে খেলা। সেকালের দুঃস্বপ্ন আর শকুন্তলার একালের নতুন কাহিনী।

ওদিকে প্রিন্সিপালের চেয়ারের সামনেও অনেক ছেলে-

মেয়ের এলোমেলা জটিলতা। ষিক্ ষিক্ ক'য়েছে। হয়তো সিলেবাস অথবা ক্লাসের বুটিন নিয়ে ভেগ্নন কিছু বলতে এসেছে সব।

কিন্তু কাছে গিয়ে যা দেখলেন, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি কখনও। এযে কারখানাকেও হার মানিয়েছে অবলীলায়।

কারখানার মতোই লাগাতার ঘেরাও। বেচারী প্রিন্সিপ্যাল! স্বিধায়, কুঠায় উঠে দাঁড়ালেন একসময়। ভালো করে চেয়ে দেখলেন, তাঁর প্রিয় ছাত্রদের সারি সারি মুখ। কিন্তু সৌজন্যে উজ্জ্বল, নম্রতায় দীপ্তিময় নয়। প্রতিহিংসায়-কঠিন, আঘাতে তৎপর।

তবুও প্রিন্সিপ্যাল মাটিতে চোখ নামিয়ে থেমে থেমে বলেছেন—আমি অসুস্থ। ঘেরাও তুলে নাও তোমরা।

—তার আগে লিখে দিন, নির্বাচন বাতিল।

—তা কি করে হয়? আইন মাফিকই করা হয়েছে সব।

—এসব চামচাগিরি চলবে না আর।

—চামচাগিরি?

—আলবৎ। বেশী বাতেলা ঝাড়বেন না স্যার। যা বলা হচ্ছে তাই লিখে দিন। নাহলে ঘেরাও চলবে।

—সেই সকাল ন'টা থেকে আটকে রেখেছি। একবার বাথরুমে যাবো।

—কেন?

আবার অসহায় করুণ চোখে এদিকে ওদিকে তাকালেন প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু কোথাও ছায়া নেই। ছায়ার আভাস মার্গও নেই কোন মুখে। খালি যুদ্ধ রোম আর অশোভন অসংযম। তাই বাধ্য হয়েই বলতে হয়েছে—পেছাব করবো।

—এইখানে করুন।

—এইখানে?

—ফিকির কিসের? আমরা সব চোখ বন্ধ করেই রয়েছি।

একি শুনলেন তিনি! সহসা তড়িতাহত কোন মানুষের মতো বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন থমকে। কথা নয়,

যেন গনগনে আগুনের টুকরো ছিটোচ্ছে শরীরময়। সুতরাং আর এগুনো নয়, ফেরার জন্যেই ঘুরে দাঁড়ালেন দ্রুত।

দুই ধারে কেমারি করা মরশুমীর সমারোহ এখন দীর্ঘ বহিমান চিতা বিশেষ। তাঁর সারা বুক, সমস্ত অস্তিত্বই পুড়ছে তখন। পুড়তে পুড়তে অঙ্গার হচ্ছে।

সৌগত কিন্তু আগের মতোই গান শুনছে। আগের মতোই সমান মেজাজে। দেখেই আধ-বসা, আধ-শোওয়া ঐ একই ভঙ্গীতে জ্ঞানতে চেয়েছে—এরি মধ্যে হয়ে গেল সব?

—কি?

—দেখা?

না, দেখার আর কোন স্পৃহাই নেই তাঁর। তিনি এবার ফিরতে চান। ফেরার জন্যেই ব্যস্ত বড়।

কিন্তু কেন কে জানে, সৌগতই সাম্নে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ—কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে?

—আমাকে?

—ই্যা চেনা চেনা লাগে। কোথায় কোথায় যেন দেখেছি।

—কোথায় বলোতো?

স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করেছে সৌগত।

হাতড়াতে হাতড়াতেই একসময় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে খুশীতে। প্রিন্সিপ্যালের রুমে একটি ছবি আছে। অবিবর্তন সেই মুখ। হুবহু। তাহলে কি আপনি আমাদের আগের ঐ—।

না, না, আমি নই, আবার চলতে শুরু করেছেন ভদ্রলোক। চলতে চলতেই মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছে, যাবেন নাকি ফিরে? দেখে আসবেন ছবিটা? বিশ বছর আগের ঐ ছবি?

না, সেখানে আর ফেরা চলে না তাঁর। যা তিনি সারা জীবনের শ্রমে নিষ্ঠায় গড়ে তুলেছিলেন, অবসরের এতো বছর পরেও যার স্মৃতির সৌরভের আকর্ষণে এসেছিলেন আবার, তাঁর সেই স্বপ্নের, আদর্শের তীর্থভূমিতে এখন অশালীন অসংযম, দুর্ভিক্ষের ব্যাভিচার।

সেখানে তাঁর আর ফেরা চলে না কিছুতে।

রজকাকা অনেকদিন পর আমাদের বাড়ী আসামাত্র হৈ হৈ পড়ে গেল। বাবা কিন্তু হৈ হৈ না করে রজকাকার কিছুতপোশাকের দিকে অঙ্কুত চোখে তাকিয়ে বললে, এটা কি পরেছ হে।

রজকাকা একগাল হেসে বললে, গামছা। চিনতে পারছ না।

বাবা অবাক হয়ে বললে, গামছা পরেছ কেন?

রজকাকা সবাইকে অবাক হতে দেখে নিজে অবাক হয়ে বললে, এক ইঞ্চি জল হলেই কলকাতায় এক কোমর জল জমে, চলার দাপটে রাস্তার কাদা মাথায় ওঠে। জামা কাপড় নোংরা হয়। তাই গামছা পরেছি। গামছায় বিপদ নেই। এক কোমর জল পেরিয়ে গামছা নিংড়ে আবার পরা যায়।

বাবা বললে, কিন্তু ভিজ়ে গামছায় অসুখ হবে যে।

রজকাকা বললে, মোটা ভিজ়ে প্যাণ্টের চেয়ে ভিজ়ে গামছায় অসুখ কম হবে। তাছাড়া আগে দেশের কোণে কোণে নেতা ছিল। এখন প্রতিটি ঘরের কোণে কোণে নেতা। তাদের মুখে সবসময়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা। সেই বক্তৃতার সামনে গামছা ধরবে। নিমেষে শুকিয়ে যাবে।

বাবা বলল, তুমি তাহলে কলকাতাবাসীকে গামছাবাহিনী হতে বলছ।

রজকাকা বললে, আর লেখপড়া শেখার আগে সাঁতার শেখাটা কলকাতাবাসীর প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

আমরা সবাই বললুম, সাঁতার শিখতে হবে কেন?

রজকাকা বলল, এটা আগে বুঝি। এখন বুঝি ভাবতাম কলকাতায় জন্মেছি সাঁতার শিখব কেন। এখানে তো পুকুর নেই। আর বন্যাও হয় না। কিন্তু পাতাল রেলের দৌলতে দিকে দিকে যে পাতালপুকুর তৈরী হয়েছে তাতেই এই বুড়ো বয়সে শিখতে হবে। বর্ষায় পাতালপুকুরে পড়ে যাতে প্রাণ না যায়, তাই এটা শিখতে হবে।

রজকাকা একটু ধেমো বললে, অবশ্য এটা আমার কথা নয়। এ হলগে মা দুর্গার কথা। আমার এই নির্দেশ দিয়েছেন।

বাবা বললে, মা দুর্গা তো স্বর্গে থাকেন। তোমার সাথে তার মোলাকাত হলো কি করে?

রজকাকা হাতে তালি দিতে দিতে বলল, ক'দিন আগে স্বর্গের এক স্বর্গীয়সভায় যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে গম্পই আজ বলব।

বাবা হু কোঁচকাল। আবার তোমার গুল শুরু করলে।

রজকাকা বললে, গুল তো গুল। তুমি না হয় শুনো না।

রজকাকা শুরু করল:

আমি সেদিন ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার দেহ থেকে, সূক্ষ্ম আত্মা বেরিয়ে দরজার ফাঁক বেয়ে শূন্যে উড়ে চলল। উড়তে উড়তে স্বর্গে থাকা খেলায়। দেখি সেখানে সব দেবতাদের সভা বসেছে। লোভ হল। সেখানেই একটা জায়গায় ঘাপটি মেরে বসলাম। তখন জোর কদমে সভা চলছে।

ব্রহ্মা বরুণকে বলছেন, এ তোমার ভারি অন্যায়। ছিঃ, ছিঃ, এত বৃষ্টি দিচ্ছ কেন? এই সব বর্ষার শুরু। এরমধ্যেই তুমি সস্তর ভাগ ঢেলে দিয়েছ। আর যত আক্ৰোশ তোমার কলকাতার ওপর। তুমি সেখানে ১১৬৮ মিলিলিটার জল দিয়েছ। কলকাতায় বন্যা বইয়ে দিয়েছ। তুমি জানো কলকাতায় একটুতেই হাঁটু জল হয়। নর্দমা অপরিষ্কার। জল নিকাশী ব্যবস্থা বাবরের আমলের। খাল মজে গেছে। গঙ্গার গভীরতা কমছে। করপোরেশন ট্যাক্স বাড়িয়ে ঘুমোয়। উন্নয়নের পাঁচকোটি টাকার তিন কোটি উদরে গিয়ে বায়ু নিষ্কাশন করে। জল বাড়লে পাম্প অচল হয়ে পড়ে। পাতালরেলে জল ধই ধই করলে মানুষের পাতাল প্রবেশ ঘটতে পারে। তাছাড়া কলকাতার মানুষ বন্যা দেখতে অভ্যস্ত নয়। বন্যা শুনতে অভ্যস্ত। কলকাতা গ্রাম নয়। রাতে গ্রাম হলেও দিনে সে সুসভ্য শহর। মিছিলের শহর। ব্যাঙ্ক ডাকাতির শহর। পণপ্রথার শহর। গ্রামের লোক গামছা পরে জলে কাঁপ দিতে পারে। শহরের লোক হাঁটুর ওপর প্যাণ্ট লুণ তুলতে লজ্জা পায়। গ্রামের লোক খালি পায়ে হাঁটতে অভ্যস্ত। কোলকাতায় জুতো হল পথের সাথী। জল জমলে

ভারি বিপদ। জুতো বগলে নিয়ে ছপাং ছপাং হাঁটিতে হয়। এতসব জেনেও কেন এত বৃষ্টি দিচ্ছ কলকাতায় ?

বরুণদেব বললেন, সবই মানলুম। কিন্তু একটা কথা। ঐ কদিন কলকাতায় একটাও মিছিল দেখেছেন। মিটিং শুনছেন। কোন আন্দোলন দেখেছেন কি। তাছাড়া আমার কি দোষ। এবৎসর আমি তো শনিদেবের নির্দেশ মতই চলছি।

ব্রহ্মা অবাক হয়ে বললেন, শনিদেবের নির্দেশ মানে ?

বরুণ বললেন, কেন মনে নেই, শনিদেব এবারে জলাধিপতি।

ব্রহ্মা বললেন, হ্যাঁ; হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। ওহে শনিবাবা, বৃষ্টি এবার ধামাও।

শনিবাবা গর্জে উঠলেন, হ্যাঁ, ধামাতে বললেই ধামব কিনা। আমি তেঁ তখন পই পই করে বলেছিলুম, আমার কারোর পতি করবেন না। তা আপনি শুনলেন ? এতো আর মর্ত্য নয় যে পত্নীদের দাপটে পতিদের বোকা গাধা হয়ে থাকতে হবে। এটা স্বর্গ। পতিদের দাপট এখানে একটু বেশী। আপনি কেন আমায় জলাধিপতি করলেন ? আপনি তো জানেন, আমি যেদিকে চাইব, সেদিক শূন্য করে ছাড়ব। খরাপতি করলে খরায় সব ছালিয়ে দিতুম। আর জলাধিপতি মানেই জলে সব ভাসিয়ে দেব। তবে কেন আমায় কারোর পতি করেন ? আর তাছাড়া আমার কলকাতার ওপর খুব রাগ।

রাগ ! কেন, রাগ কেন ? ব্রহ্মা বললেন।

শনিবাবা বললেন, রাগ কেন শুনুন। ওরা আজকাল আমায় কম অপমান করছে ? গ্রামে এত অনাচার নেই। আমায় নিয়ে যত অনাচার কলকাতার বুকে। আমায় নিয়ে কম ছেলেখেলা হচ্ছে। যেখানে সেখানে আমায় ওরা বসাচ্ছে। আগে আমি মন্দিরে মন্দিরে থাকতুম। এখন ওরা আমায় রাস্তার ফুটপাথে নামিয়েছে। আমি কি হকার, না অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার ফুটপাথের ভিখিরি খে ফুটপাথে থাকব। শুধু কি ফুটপাথ ! নর্দমার পাড়ে, খাটা পান্থখানার ধারে। গরমে রোদের তাপ আছে। বর্ষায় জলের ছিটে আছে। শীতে উত্তরে হাওয়া আছে। আমি কি সর্বহারা নাকি ?

ব্রহ্মা সায় দিলেন, এ ভারি অন্যায়।

শনিবাবা বললে, অন্যায় মানে। ঘোরতর অন্যায়। শনিবার হলেই আমার পূজো। আমার আদর। কেননা পুরোহিত ব্যাটা দুপয়সা কামাতে পারে। রবিবার থেকে শুক্রবার আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। খেতেও দেয় না। দিনকে দিন যত অভাব বাড়ছে, যত দুর্নীতি বাড়ছে, তত আমার ভক্ত সংখ্যা বাড়ছে। চোর আসছে, খুনে আসছে, নেতা আসছে, মন্ত্রী আসছে, কালোবাজারী আসছে, ভেজালদার আসছে। বেকার যুবক আসছে, অবিবাহিতা যুবতী আসছে। লটারী বিক্রেতা আসছে, ফুটপাথের ভিখিরি আসছে। আমি যে কার দিকে তাকাই। আমার নজরটা আবার একটু উঁচু দিকে তো। তাই পুরোহিতেরা মোটা পাওনার লোভে আমায় নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে।

বরুণদেব একটু উস্কে দিলেন। শিয়ালদায় উড়াল পুলের কাছে একটা বৌ দেখি প্রতি শনিবার সকালে আপনার একটা মূর্তি ফুটপাথে বসিয়ে রেখে যায়। আবার সন্ধ্যায় পূজো হয়ে গেলে এক সপ্তাহের জন্যে কোথাায় উধাও হয়ে যায়।

শনিবাবা বললেন, আমি কারও কথা মানব না। এবারে ভাসিয়ে দেব সব। কলকাতার লোক বড় আরামে আছে। পয়সা ঢাললে সব পায় কিনা। চাষীর কথা বোঝেনা। চাষীর দুগ্ধ বোঝেনা। চাষী খাটে, খেতে পায়না তবু। পয়সার জোরে শহরের বাবুরা খাবার কিনে মজুত করে। এবার ঠ্যালা বুঝুক। কলকাতা এবার আটকুট জলের তলায় থাকবে।

ওং, গরীব চাষীর শোকে বাবু উথলে উঠলেন। এতক্ষণ মহাদেব এককোণে চুপ করে বসে ছিলেন। এবার ফুট কাটলেন। কলকাতাকে যে ভাসাবে বলছ,—বড়বাজার, কলকাতার পোর্ট আর ফ্যান্সী মার্কেট ডুবে গেলে তোমার কি দশা হবে ? তুমিও ডুববে যে।

শনিবাবা ক্ষেপে গেলেন : তুমি মাতাল বলে আমি বেতাল নাকি। আমার সব হিসেব আছে। একটু ডোবালেই আমার পাওনা বাড়বে। মন্ত্রী মানত করবে, ব্যবসায়ী মানত করবে। কনট্রাকটর মানত করবে, ট্রাফিক পুলিশ মানত করবে। ফুটপাথের ভিখিরি মরবে তো আমার কি। ওরা মরতেই জন্মেছে।

বরুণদেব বললেন, আমারও কি কম রাগ। যখন গরম পড়বে, আকাশে মেঘ থাকবে না, তখন কি আমার কম গালাগাল দেয় সব। বলে, মুখপোড়া আকাশ, হারামজাদা আকাশ, বৃষ্টি নেইকো মোটে। ঘাটে গেছে যেন। যেন পুড়িয়ে মারবে। ওমন আকাশের মুখে ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

শুধু কি তাই একটু বৃষ্টি হলেও জ্বালা। বর্ষার নিম্নম কি? কিম্ব কিম্ব বৃষ্টি। রিম্ব কিম্ব বৃষ্টি, সারাদিন বৃষ্টি, কখনও রোদ, কখনও মেঘে আকাশ কালো। তাতেও রাগ। গালাগালি দিয়ে বলবে, মরে গেছে, মুখপোড়া মরে গেছে। যমের বাড়ী গেছে। বার বার কাপড় জামা রোদে দিচ্ছি আর তুলছি। মুখপোড়ার সহ্য হচ্ছে না। বুক চড়চড় করছে। ওমন আকাশের মুখে লাথি মার। এই হোল মর্ত্যের গিল্মীদের মুখের ভাষা।

পবনদেব পাশ থেকে বললেন, আর গানের ব্যাপারটা?

বরুণদেব বললেন, হ্যাঁ, ১লা আষাঢ় পড়লেই দিকে দিকে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে শুরু হয়ে যায়। বর্ষার গান হয় রেডিওতে। আবার যেই একটু বৃষ্টি হয়েছে অমনি 'কি বৃষ্টি', 'বৃষ্টি থামাও, বৃষ্টি থামাও' গান শুরু হয়ে যায়। কোন দিকে যাব। এবার জ্যৈষ্ঠকেই আষাঢ় বানিয়ে দিয়েছি। ব্যাস। বাছাদের আর আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে করতে হয়নি। কবিরা মনমরা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

পবনদেব বললেন, আমিও কি কম গালাগাল খাই। যখন গরমকালে ফুরফুর করে বই তখন লোক প্রশংসা করে। বলে, আহা কি ফুরফুরে হাওয়া, কি আরাম, কি মিষ্টি। প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আর যেই একটু জ্বরে বই; কারো পাঁচল ভেঙে পড়ে, কারোর হয়ত টিনের চাল উড়ে যায়। কারোর পুরানো বাড়ী ভেঙে পড়ে। অমনি গালাগালি। হারামজাদা ঝড়ের দাপট দেখ না। যেন মেরে ফেলবে।

ব্রহ্মা বললেন, তোমরা বৃষ্টি থামাও। ডি, ডি, সি, ও ওপাশে ভাসাচ্ছে।

শনিবাবা বললেন; ডি, ডি, সি, তো ভাসাবার জন্যেই তৈরী হয়েছে। কেন মেঘনাদ সাহা বলেনি আটটা ড্যাম করতে। রাজনৈতিক নেতারা বৈজ্ঞানিকের ওপরে গেল। বললে, চারটেতেই হবে। ব্যাস হয়ে গেল। বন্যা রোধ করতে গিয়ে আরও ডেকে আনল। আর বন্যা হবে না-ই

বা কেন? নদীর পলি সরানো হয়? খাল পরিষ্কার করা হয়? বাঁধ মেরামতি করা হয়? কিছুই হয়না। নদী গভীরতা হারাচ্ছে। তার বেলার দোষ নেই। বর্ষাকালে বেশী বৃষ্টি হলেই যত আমাদের দোষ।

বরুণদেব বললেন, বৃষ্টি আর বন্যা হলেই কত লোকের লাভ।

লাভ! বন্যায়, লাভ! ব্রহ্মা অবাক হলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বরুণদেব বললেন, বর্ষায় রাস্তার ছাল চামড়া উঠে যাবে। কন্ট্রাক্টর, রাস্তা মোরামতির টাকা পকেটে ভরবে। বাজারদর আগুন হবে। ফড়েরা জিনিসের দাম বাড়াবে। ডবল লাভ করবে। কেরোসিনের লাইন লম্বা হবে। কমলা ওজনে ভারী হবে। রিলিফের টাকা পকেটে ঢুকবে। নেতারা ছুটোছুটি করবে। দুগ্ধ কাতর হবে। চোখের জল ফেলবে। প্রতিশ্রুতির তুফান ওড়াবে। আকাশে হেলিকাপ্টার উঠবে। দিল্লী থেকে মন্ত্রী ছুটে আসবে। সাহায্যের জন্যে পাঠান সরকারী গুপ্ত; ইন্জেক্সন দোকান পালাবে। রাস্তায় রাস্তায় বন্যায় সাহায্যকারীর দল বের হবে। নতুন গান তৈরী হবে। কিছু টাকায় গ্রাণ হবে কিছু যাবে পকেটে। মন্দিরে মানত বাড়বে। আরও কিছু ভিখিরি বাড়বে।

মা দুর্গা এতক্ষণে মুখ খুললেন: অতশত জানি না। আর দুমাস পরেই পুজো। এবারের পুজোয় যেন ৭৮ সালের মত ছমছাড়া অবস্থা না দেখি।

শনিবাবা ফিচিক হাসি হাসলেন: নিশ্চয়ই। আপনার পুজো বন্ধ হলে যে আপনার সন্তানবাহিনী বাঁচে না। মদ মুগী ওড়েনা, লোকের গলায় কোপ পড়ে না। ডিস্কো সংস্কৃতি বাঁচে না।

মা দুর্গা বললেন, ওসব নয়। গরীব মানুষের কত কষ্ট।

আহো, শোকে উথলে উঠলেন। কত দরদ! শনিবাবা আবার বললেন, সামনেই ইলেকশন। আপনার যা দরদ দেখছি জিতে যাবেন। আহা, বছরে তো একবার করে যান, কটা অসুর নিধন করতে পারেন? আপনি হলেন অসুরদের দালাল আর আপনার ঐ শূঁড়মুখো ছেলে বড়বাজারের দালাল। মা ব্যাটায় বেশ হয়েছে। শূঁড় বাবাজীও তো আপনার ট্রেনিংয়ে আপনার মতই হচ্ছে।

দুর্গা খতমত খেলেন। বললেন, ভুল করছ কেন। বাঙালীর এই একটাই বড় পুজো, কত আনন্দ। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দুগ্ধ দেখলে আমার কষ্ট হয়।

আহা একটু কাঁদুন, নইলে মানায় না। শনিবাবা বললেন : আনন্দ হবে কিসে। মাথার ওপর ছাদ নেই। পেটে খাদ্য নেই। গায়ে সুতো নেই। আপনাকে দেখলে পেট ভরবে। সেই বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষের বাঙালী শেষ হতে বসেছে। মুখে তেজ নেই, বুকে বল নেই গায়ে রক্ত নেই। সুস্থ পরিবেশ নেই। শিক্ষার মত শিক্ষা নেই। পথ দেখাবার মত নেতা নেই।

ধামো দেখি ৪২০। মহাদেব ধামিয়ে দিলেন : তোমরা সব সমান। তুমি জ্ঞান দিচ্ছ কাকে? তোমরাও তো মর্ত্যের জ্ঞান দেনেওলা, মানুষের মত কথা বলছ। তারা নিজেরা ঠিক না হয়ে একে অপরকে দোষারোপ করে। তুমি যে অত জ্ঞান দিচ্ছ, তুমি নিজেকে কি? একটু আগে তুমি কি বললে, তোমার নজর উঁচু দিকে। গরীব মানুষ মরুক।

শনিবাবা রেগেমেগে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। যেতে

যেতে বললেন, দেখব কে বাঁচায়। ভাসিয়ে দেব আবার। আমি হলুম জলাধিপতি।

মা দুর্গা এতক্ষণে আমায় দেখতে পেয়ে বললেন : আরে রজ্ঞ এখানে যে। যাও মর্ত্যে গিয়ে বল, ভয় নেই। যতই বৃষ্টি হোক। সবাইকে গামছা পরতে আর সাঁতার শিখতে বল। তাহলে কলকাতায় ভয়ের কিছু নেই।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : মা, কুমোরটুলীতে গিয়েও কি বলব যে, আপনাদেরও গামছা...

দেবীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করতে পারলাম না।

একটু দম নিয়ে বললুম, ঠিক আছে। মস্তানবাহিনীকে বলব, ছুরী আর চাঁদার বিল নিয়ে তৈরী থাকতে। যত বৃষ্টিই হোক, যত অভাবই হোক আপনি আসছেনই।

তারপর আমি মর্ত্যে ফিরে এলাম।

রজ্ঞাকার গুল শেষ হলে বাবা বললেন : যাও একগেলাস ঠাণ্ডা শরবত করে আনো। গুল দিয়ে দিয়ে রজ্ঞটার মাথাটাও গরমে গোলমাল হয়ে গেছে দেখছি।

ভুলি নাই

রতীন শীল

অগ্নিমনে দীক্ষিত সেই তরুণ কিশোর দল,
নয়নে যাদের মুক্তি স্বপন অন্তরে দাবানল,
দুর্গম পথে করেছিলো যারা দুর্জয় অভিযান,
বন্ধ কারায় পেয়েছিলো যারা মুক্তির সন্ধান,
বিজ্ঞান নিশিথে তাহাদের লাগি আজো গান গেয়ে যাই ॥

মানুষের চির অধিকার লাগি যারা করেছিলো পণ,
চূর্ণ করিতে নেমেছিল যারা শৃঙ্খল বন্ধন
পুঙ্খার অর্থ্য সাজিয়েছে যারা প্রাণের প্রদীপ জ্বালি,
মহান যজ্ঞে দলে দলে যারা আপনারে দিল ডালি,
আকাশে বাতাসে তাহাদের ছবি আজিও দেখিতে পাই ॥

মায়ের দুলাল সন্তান যারা গাণ্ডব ধনু হাতে,
দুর্ধোগ রাতে যুদ্ধেছিলো যারা কাল-নাগিনীর সাথে,
মৃত্যুর মুখে শপথ বাণীরে দেয়নি বিসর্জন,
হাসি মুখে যারা সয়েছে নীরবে চরম নির্বাতন,
ঝঞ্ঝার রাতে পদধ্বনী সেই আজিও শুনিতে পাই ॥

কণ্ঠে যাদের গান ছিল শুধু 'বন্দে মাতরম',
বক্ষে ছিল কালবোশাখির ঝড়ের আলোড়ন,
জন্মদাত্রী মায়ের আঁচল ছিন্ন করিয়া যারা,
স্বদেশ মাতার বেদনা কাতর আহ্বানে দিল সাড়া,
ঝড়ের রাতে অশ্রুনি আলোকে তাহাদের দেখা পাই ॥

ফাঁসির মণ্ড করেছিলো যারা সাধনার পীঠস্থান,
ফাঁসির মাণ্ডে নিয়েছিলো যারা মায়ের পরম দান,
ফাঁসির বেদীতে পুরিয়েছে যারা জীবনের অভিলাষ,
তপ্ত শোণিতে লিখে গেল যারা কালের ইতিহাস,
অমর তাহারা—চির ভাস্কর—তাদের মৃত্যু নাই ॥

ভুলি নাই—ভুলি নাই—তাহাদের ভুলি নাই—
স্মৃতির দেউলে তাহাদের লাগি—

আজো দীপ জ্বলে যাই ॥

ভুলি নাই—ভুলি নাই—তাহাদের ভুলি নাই ॥

একটি রাত্রি

আন্তন শেখভ

ভাবানুবাদ : শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বন্ধুর বাড়ীতে সেদিন প্রেতাশ্বার বৈঠক বসানো হয়েছিল। বৈঠক শেষে বাড়ী ফিরতে রাত হলো।

অমাবস্যার রাত। কোথাও এতটুকু আলো নেই। গালি পথ ধরে ফিরছে। গাড়ি অন্ধকার। তার উপর মনটাও বিষম হয়ে আছে। সেদিনকার বৈঠকে যে প্রেতাশ্বা এসেছিল, সে ভবিষ্যৎ বাণী করেছে—আইভ্যানের জীবনের মেলাদ শেষ হয়ে এসেছে। আইভান ভৈরী হও...

একবারই বলেছিল, দ্বিতীয়বারে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় তখন সে বলেছিল—আজই আইভ্যানের শেষ রাত্রি।

মৃত্যু, এবং আজকেই মৃত্যু—এই মৃত্যুর চিন্তা আইভানকে বিষম করে তুলেছিল। মৃত্যু অনিবার্য, প্রত্যেককেই মরতে হবে, তবু মৃত্যুচিন্তা প্রতিটি মানুষের কাছে অপরিচিত।

চারিদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। হিমেল হাওয়া। বৃষ্টি পড়ছে অপ্রাস্ত ধারায়। কড়ো হাওয়া আর্তনাদ তুলছে। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। মন ছম ছম করতে থাকে।

আইভ্যান তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে। তার কোন কু-সংস্কার নেই। তবু আশে পাশে পিছনে তাকাতে তার সাহস হয় না। মনে হয় পিছন পানে তাকালেই যেন দেখতে পাবে ছায়া মূর্তির মতো মৃত্যু অননুসরণ করছে। অজানা ভয় যেন ছাড়তে চায় না। জোরে জোরে চলে আইভ্যান হাঁপাতে থাকে।

বাইরে বাতাসের হা-হা শব্দ। বাড়ী পৌঁছে চার ভল্লার উঠে ঘরের দরজা খুলল আইভ্যান।

ঘর অন্ধকার।

গা ছম ছম করে উঠলো। প্রেতাশ্বার ভবিষ্যৎ-বাণী আজ তাকে মরতে হবে। ঐ প্রেতাশ্বার কথা কি বিশ্বাস করা চলে? হাসি পেল। কিন্তু তবু ভয় তো কাটলো না। আশে পাশের ঘরের জানালাগুলো বাতাসে ঝটখাট করে শব্দ করছে, ওরা কি তাকে ভয় পাওয়াতে চাইছে! আজ বড় দুর্ভোগের রাত।

শাক, দেশলাই জ্বালল আইভ্যান। সেই আলোর চারিদিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ দৃশ্য দেখে চমকে

উঠল। ভয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো। সে চীৎকার করে উঠল। পিছু হটে এল দরজার কাছে। চোখ বন্ধ করল।

ঘরের মাঝে দরজার সামনে একটি কফিন রয়েছে। দেশলাই কাঠিটা নিভে গেলেও মনে হলো, কফিনের কাঠামো সে যেন অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে কফিনের উপর সোনালী ক্রুশ চিহ্ন। মৃত্যুভয়ের জন্য দেখেছে কিন্তু তবু তার প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন চোখের সামনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। মাঝারী আকারের কফিন। গোলাপী রং। জমকালো জরী দেওয়া, পায়রা রয়েছে, ব্রোঞ্জের হাতল রয়েছে, কোন পয়সাওয়ালা কিশোরীর জন্য এই কফিন।

ঘর থেকে আইভ্যান বেরিয়ে এলো। পালিয়ে এলো। ভাববার অবকাশ নেই। সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় করে নেমে এলো। মনে হলো পা জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পড়ে যায় নি। এইটাই আশ্চর্য।

রাস্তায় এসে ল্যাম্প পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আইভ্যান হাঁপাতে লাগলো। বুক টিপ টিপ করছে, জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

খানিক দাঁড়িয়ে থাকার পর উত্তেজনা কিছুটা কমলো।

ঘরে যদি আগুন লাগতো, কি চোর ঘরে ঢুকতো, যদি মাথার উপর ছাদ ভেঙে পড়তো, যদি পায়ের তলার মেঝে সরে যেতো, বা ঘরের দেয়াল ধসে পড়তো তা হলেও বোধ হয় আইভ্যান এতটা আশ্চর্য হতো না। কারণ সেসব ঘটনা ঘটে বুদ্ধির সীমার মধ্যে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কি করে একটা কফিন এলো, কোথেকে এলো দামী কফিন?

কফিনটা কি খালি, না ভিতরে কোন মৃতদেহ আছে? কফিনে শোয়ানো মৃতদেহ ঘরে এসেছে, আইভ্যানের সঙ্গে দেখা করতে! বিস্ময়কর সাক্ষাৎকার, নিষ্ঠুর কৌতুক!

কোন খুনের ব্যাপার নয়তো?

নানা ভাবনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো আইভ্যান।

সে বাড়ী ছিল না। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ঘরের চাবি যেখানে থাকে অন্তরঙ্গ বন্ধ ছাড়া তা কেউ জানে না। সে বন্ধুরা ঘরে তো একটা কফিন রেখে যেতে পারে না। কোন কফিন প্রস্তুতকারী কফিনটা ভুল করে আইভ্যানের ঘরে ডেলিভারী দিয়ে গেছে? কিন্তু, রশিদে সই করলো কে?

চক্রে যে প্রেতাগ্নি আইভ্যানের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সেই হয়তো আগাম কফিনেরও ব্যবস্থা করে দিলে। আইভ্যান ভূত প্রেত বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই কফিনটা আসার পরেও মনের সে বল আর থাকে না।

কিন্তু এটা চোখের ভুল ভো হতে পারে। বাড়ী ফেরার সময় মন, বিবাদে আচ্ছন্ন ছিল। তার উপর ঠাণ্ডা স্নায়ু-মণ্ডলীও দুর্বল হয়েছিল। সেই নার্সাস অবস্থায় ঘরের মধ্যে একটা কফিন দেখা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। এ চোখের ভুল।

কম কম করে মাথার উপর বৃষ্টি পড়ছে। আপাদমস্তক ভিজে সপসপে হচ্ছে গেছে। ঝড়ো হাওয়ায় মুখে জলের ঝাপট মারছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কোথাও একটা আশ্রয় নিতে হবেই। ঘরে ফিরবো, কিন্তু ওই কফিন যদি সত্য হয়, সে দৃশ্য সহ্য করা আইভ্যানের পক্ষে সম্ভব নয়। কোথাও মানুষের সাড়া নেই। এই সময় একটা কফিনের সামনে মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব। কফিনের মধ্যে কার মৃতদেহ আছে কে জানে। সেই কফিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সে এখন মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। অথচ বাইরের এই ঠাণ্ডা আর মুখল-ধারায় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাও তো সম্ভব নয়।

বন্ধু রেস্টোভের বাড়ীতে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে বলে আইভ্যান মনস্থ করলো। বেশ সাজানো গোছানো ঘর। অসুবিধা হবে না। বাড়ীটা ডেভ লেনে। আইভ্যান সেখানে চললো।

রেস্টোভকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পাওয়া গেল না। জানালার কোণে চাবিটা থাকে জানতো। চাবিটা নিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লো। ভিজে ফারকোটটা খুলে ফেললো।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সোফায় গিয়ে বসে পড়লো। জানালার শাশির গান্ন কম্বল কম্বল করে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে ঝিঝি পোকা ডাকছে। ক্রেমলিনের রাজপ্রাসাদে ক্রিসমাসের বণ্টী বাজতে শোনা গেল।

ঘর অন্ধকার।

দেশলাই জ্বাললো। সেই আলোয় আইভ্যান আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লো। চীৎকার করে উঠলো। টলতে টলতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বন্ধুর ঘরের মাঝে আইভ্যানের ঘরের মতই একটা কফিন রয়েছে।

এ কফিনটা বড়। বাদামী রঙের। আগেরটার চেয়েও ভয়াবহ। বাঁড়ৎস।

এই কফিন এখানে এলো কি করে? এও কি চোখের ভুল? প্রত্যেক ঘরেই তো একটা করে কফিন থাকতে পারে না। আইভ্যানের সমস্ত স্নায়ু-মণ্ডলী দুর্বল হয়ে পড়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জেগে জেগেই সে দুঃস্থ দেখছে। যেখানেই যাবে সেখানেই এই ভয়াবহ কফিন দেখতে পাবে। মাথার গোলমাল হয়েছে, মনে কফিন-ম্যানিয়ার বিকার দেখা দিয়েছে। এই মানসিক চাপ্তলোর সূত্রপাত হয়েছে আতঙ্কের প্রেতচক্রে। ভূত নামানো ও প্রেতাগ্নির ভবিষ্যৎ-বাণী তার মানসিক স্ফূর্তি নষ্ট করেছে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সে মাথাটা দুহাতে চেপে ধরলো, বলে উঠলো—ভগবান বলে দাও আমি এখন কি করবো?

মাথাটা শিথিল হয়ে আসছে। বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এসে বিঁধছে। গায়ে এখন কোট নেই, মাথায় টুপি নেই। ঘরের ভিতর থেকে সেগুলি নিয়ে আসবে সে সাহস নেই। এদিকে হিমে কাঁপছে। আতঙ্ক যেন জড়িয়ে ধরেছে। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। এ তো এক মহা দুঃস্থ।

এখন সে কি করবে? মনের সমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই ঠাণ্ডায় ভিজে তো অসুখ করবে।

কাছাকাছি আর এক বন্ধুর বাড়ী আছে। সেও প্রেত-চক্রের বৈঠকে ছিল। আইভ্যান ছুটলো তার বাড়ীর দিকে। এক বাড়ীর পাঁচতলায় সে থাকে।

পাঁচতাল্লি উঠতে উঠতে চাঁচামেচির আওয়াজ কানে এলো। কে যেন উপরে ছুটোছুটি করছে। পায়ের দুমদাম শব্দ, ধড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। তারপর আর্তনাদ—বাঁচাও বাঁচাও।

ফারকোট পরা একটি মানুষ দূরদূর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। দেখেই চিনতে পারলো। আইভ্যান জিজ্ঞাসা করলো—কি রে? কি হয়েছে?

বন্ধু উত্তেজিতভাবে আইভ্যানের হাত চেপে ধরলো। সে হাঁপাচ্ছে। কাঁপছে। চোখের দৃষ্টি ভীতিব্যাকুল। ধরা গলায় সে বলে উঠলো—আইভ্যান, তুই। সত্যি তুই? তোর মুখ শুকিয়ে গেছে, অমন দেখতে হয়েছে কেন? তুই যেন কবর থেকে উঠে এলি।

—তোর চেহারাও তো সেই রকম, কি ব্যাপার বল ত?

—বলছি, বলছি। আগে একটু হাঁফ ফেলতে দে। তোকে দেখে ভারি খুঁসি হলাম। আজকের প্রেতচক্রের বৈঠক আমার স্নানমণ্ডলীকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এইমাত্র ঘরে ঢুকে দেখি আমার ঘরের মধ্যে একটা কফিন।

নিজের কানকে আইভ্যান বিশ্বাস করতে পারলো না। বললো—কী?

—কফিন। আমার ঘরের মধ্যে একটা সত্যিকারের কফিন।

বন্ধু অবসন্নভাবে সিঁড়ির উপরই বসে পড়লো। তারপর বললো—আমি সহজে ভয় পাই না। কিন্তু প্রেতচক্রের বৈঠকের পর বাড়ী এসে ঘরের মধ্যে একটা কফিন দেখলে মন অতিকে উঠবে না?

আইভ্যান বন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। বিমূঢ়। তারা দুজনেই কি দুঃখ দেখছে।

বন্ধুকে আইভ্যান নিজের কথা বললো।

বন্ধু বললো—আমরা দুজনেই স্বপ্ন দেখিনি। দুজনেরই একই রকম চোখের ভুল হতে পারে না। আমরা সত্যি কফিন দেখেছি। কিন্তু এখন কি কর্তব্য?

সেই ঠাণ্ডা সিঁড়িতে দুজনেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। শেষে দুজনেই আবার ঘরে যাওয়া স্থির করলো।

ঘরে ঢুকে মোমবাতি জ্বাললো।

সত্যি মেঝেতে একটা কফিন পড়ে আছে। সোনালী ব্যালর দেওয়া একটা কফিন।

কফিনটা দেখা দরকার—খালি না কোন মৃতদেহ আছে।

বন্ধু তখনও কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতেই সে কফিনের উপর ঝুঁকে পড়লো। একটানে ডালা খুলে ফেললো।

কফিন শূন্য।

মৃতদেহের বদলে রয়েছে একখানি চিঠি।

বন্ধু চিঠিখানি পড়লো :

প্রিয় বন্ধু,

আমার স্বশুরমশাইকে তোমরা জানো, সম্প্রতি তাঁর ব্যবসায়ের দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। তিনি সেনায় ডুববে গেছেন। আগামী কাল, কি পরশু, তাঁর সম্পত্তি ক্রোক করতে কোর্ট থেকে পেয়াদা আসবে। তাঁর সর্বনাশ, সেই সঙ্গে আমারও সর্বনাশ। সম্মান ও মর্যাদা দুই যেতে বসেছে। এই ব্যাপারে আমরা ঠিক করেছি যে, বাড়ীতে যা কিছু মূল্যবান দ্রব্য আছে, সব অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। স্বশুরমশাইয়ের মূল্যবান সম্পত্তি বলতে তো এই কফিন-গুলি। এই কফিনের কারবারেই তাঁর নাম আর প্রতিপত্তি। কাজেই এই কফিনগুলি সরার আগে সরিয়ে ফেলা দরকার। একটা মূল্যবান কফিন তোমার কাছে পাঠালাম। এটিকে তোমার ঘরে লুকিয়ে রাখতে হবে। ষতদিন না চেয়ে পাঠাব ততদিন তোমার ঘরেই থাকবে। আশা করি তোমরা আমাকে এটুকু সহায়তা করবে। আমার মর্যাদা এখন তোমাদের উপরেই নির্ভর করছে। তোমাদের সাহায্য না পেলে আমাদের সর্বনাশ অনিবার্য। যাদেরকে আমি সত্যিকারের বন্ধু বলে মনে করি তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে আমি একটি করে কফিন পাঠাচ্ছি। আশা করি সপ্তাহ খানেকের বেশী এগুলি তোমাদের কাছে রাখতে হবে না। তোমাদের সহৃদয়তার উপরেই এখন আমার একান্ত ভরসা। ইতি/আইভ্যান জয়ন।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ তিনমাস আইভ্যানের স্নানবিক দূর্বলতার চিকিৎসা করাতে হয়েছিল।

তবে বন্ধু জয়নের ও তার স্বশুরমশায়ের মর্যাদা ও সম্পত্তি রক্ষা পেরেছিল। জয়নই পরে স্বশুরমশায়ের ব্যবসায় মালিক হয়। সে কফিন বেঁচে, সমাধির স্মৃতিফলক বিক্রী করে।

এখনও রাতে বাড়ী ফেরার সময় আইভ্যানের মনে হয় ঘরে গিয়েই হয়তো দেখবে কোন কফিন বা মর্মর স্মৃতিফলক।

শিশুকাল থেকে চিরকাল আমি শুধু স্বপ্ন দেখলাম।

এ স্বপ্ন শুধু জীবন সম্পর্কে নয়, স্বদেশ সম্পর্কেও। জীবনটাকে কিভাবে ফলবান করে তুলবো, কিভাবে এই জীবনটাকে অগণিত মানুষের প্রয়োজনে যুক্ত করে ভাগ্যবিধাতার পায়ে নিজেদের পুষ্পের মতো অঞ্জলি দিতে পারবো, এ স্বপ্ন আমার শিশুকাল থেকেই। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বদেশের মুক্তি। তাই একদিন মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে আহুতি দিয়েছিলাম। কাজটা সুদূরপ্রসারি হলেও একদিন তাতে ছেদ পড়লো। বিদেশের শৃঙ্খল-মুক্তি ঘটলো স্বদেশ-জননীর। মনে হতো—দেশের জন্যে যারা দীর্ঘকাল নির্বাতন সহ্য করে অকাতরে প্রাণ দিল, আমি সেই পুণ্যরতী সন্তানদের এক কনিষ্ঠতম নির্ভীক আত্মীয়। আমার স্বপ্নক্ষেপেদিন ফুল ফুটছিল। সে-ফুল অঞ্জলি ভরে তুলে দিয়েছিলাম আমার ধ্যানলব্ধ গরীয়সী স্বদেশ-জননীর শৃঙ্খলমুক্ত পায়ে। কিন্তু জননীর মূর্তি যেখানে সন্তানের চরিত্র-সুখমায় ক্ষুরিত, দেখলাম—সেই সুখমায় পদ্ম-পুকুর কবে চর পড়ে আশান হয়ে উঠেছে! আবার স্বপ্ন দেখলাম—কি করে এই আশান পুষ্পবিতান হয়ে উঠতে পারে! একদিন ভাগ্যবতী বুদ্ধদেব বলেছিলেন : ‘আত্মদীপো ভবঃ’, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ‘সর্বাত্মে নিজের কাছে সত্য হয়ে ওঠা চাই, চাই সত্যপ্রাপ্তি হয়ে ওঠা’, গান্ধীজী বলেছিলেন : ‘চাই হৃদয়ের পরিবর্তনঃ’—এই তিনটি সত্যকেই নিজের স্বপ্নমূর্তি করে নিয়েছিলাম। তার একটু সমাবেশ ঘটলেই সেই আশান আবার পদ্মে সুখমায়িত হয়ে উঠতে পারে, পারে মায়ের সন্তানদের মানসিক সুকুমার বৃত্তির ক্ষুরণ ঘটতে। সেই লক্ষ্যেই আমার লেখনী সোঁদন সঞ্চারিত হলো নানা রচনার মধ্য দিয়ে অগণিত মানুষের চিন্তা-শতদলকে প্রক্ষুণ্ণিত করে তুলতে। তাতে কতটুকু সার্থক হলো, জানি না; কিন্তু সেই কর্ম-প্রেরণাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমি কখনো হুঁটি রাখি নি। একদিন স্বপ্ন ছিল শিল্পী হবার, লেখক হবার। কিন্তু লেখক-জীবনেরও একটা সত্য আছে। আমি যা লিখবো, যে চিত্র আঁকবো, তার মধ্য দিয়ে শুধু আমার দেশ নয়, অগণিত লোকচিত্তে যে মহাবিশ্ব রচিত হয়ে আছে, তার যদি সমূহ সমুন্নতি ও সম্ভাব্য ভাব-বিকাশ না ঘটে, তবে লেখক

হিসেবে, শিল্পী হিসেবে আমার অস্তিত্বের কি মূল্য আছে? এইটেই একজন শিল্পীর পক্ষে তার শিল্পকর্মের প্রথম সত্য! এই সত্য পালনই একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিকে একজন সত্যসন্ধ দ্রষ্টা হিসেবে গড়ে তোলে। সেই সত্যের সঙ্গেই আমার স্বপ্নলব্ধ প্রথম গাঁটছড়া বেঁধেছিল। জীবন ভরে আমি যা ভাবলাম, যা রচনা করলাম, তা শুধু সেই সত্য পালনের জন্যেই। শিল্পের যে স্বাধীনতা একজন শিল্পীকে মনোমুগ্ধ করে, সেই দৃষ্টান্তের প্রত্যাপন আমার আত্মপক্ষকে যতই সূর্য্যাত করতে চাই না কেন, জানি—মনোমুগ্ধ জীবনচর্য্যাই উৎসাহিত রূপ, তা মাত্র বহিঃস্বের চর্চাসাপেক্ষ নয়; তাই চিরকাল আমি জীবনের গভীরে ডুবতেই চেয়েছি। তার যোগফল কি দাঁড়ালো, তা কখনো অক্ষ কষে দেখিনি। যা দেখেছি, সে শুধু স্বপ্ন। সমস্ত জীবনটাই একটানা একটা স্বপ্ন হয়ে উঠলো। তার মধ্যে যেটুকু বাস্তব, তা আমার অক্ষ লেখনী সঞ্চারিত মাত্র। যা লিখতে চেয়েছি, যে প্রাণদ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি, তা কতটা আমার শক্তিসম্মত সার্থকতার রূপলাভ করেছে, সে-বিচারও তো একজন পাঠকের চাইতে আমার নিজের উপরেই বর্তাবার কথা। পাঠকের বিচার বহিঃস্বা; একজন শিল্পীকে তারা যতখানি গ্রহণ করতে সক্ষম, তা নিত্যন্ত তাদের আপন রুচির ছাঁচে ফেলে। সেইটেই একজন লেখক বা শিল্পীকে প্রকৃত উপলব্ধি করা নয়। তাকে উপলব্ধি করতে হলে তার সম-মানসিকতা ও সম-দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে হয়, পৌঁছাতে হয় তার দার্শনিক তত্ত্বে, তার জীবনের গভীরে। সেখানে একজন লেখক বা শিল্পীই তার নিজের শ্রেষ্ঠ বিচারক। এই মানদণ্ডে যখন নিজেকে বিচার করি, তখন মনে হয়—আমার লেখনী যত অক্ষমই হোক, সে অন্ততঃ আমার আমিকে কালির আখরে উপস্থাপিত করতে কখনো কোনো অসতর্ক মুহুর্তেও দুর্বলতার পরিচয় দেয়নি। যুক্তিবাদী সমালোচকের ন্যায়দণ্ড তাকে কখনো দণ্ডদানে উদ্যত হলেও মহাকাল একদিন সেই যুক্তিবাদীর ক্ষুরধার পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করে নেবে না। সেখানে লেখকের অন্তরের লীলাই নব নব ভাবমাধুর্যে লীলায়িত হয়ে উঠবে। এই বিশ্বাসই আমাকে চিরকাল বিষয় থেকে

পুস্তক সমালোচনা

এক মুঠো ছড়া—দীপঙ্কর বিশ্বাস। নয়ন পাবলিশার্স, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য—৩ টাকা।

যুগে যুগে মানুষের বুচির পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তন ঘটে মানসিকতার—আর এ পরিবর্তন ঘটে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সাহিত্যও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। তাই কালে কালে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা—উপন্যাস, কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির। আরতনে ক্ষুদ্র হলেও ‘ছড়া’ সাহিত্যেরই একটি ধারা আর এর আবেদনও সাবিক। অর্থের গভীরতায়, ভাব প্রকাশের সরলতায় এবং জীবন-বোধের স্বচ্ছতায় এগুলি আ-বহমান কাল ধরেই সজীব এবং গতিময়।

দীপঙ্কর বিশ্বাসের ‘এক মুঠো ছড়া’ এই গতির জগতেরই সমস্রানুগ সুদৃঢ় সংযোজন। নিম্নত পরিবর্তনের সামাজিক পটভূমিতে রচিত ছড়াগুলো যেন বলিষ্ঠ ভাবনার ইংগিত,

তত্ত্ব, তথ্য ও অভিজ্ঞতায় যেন একএকটি হৃদয়বদ্ধ ক্ষুদ্রলিঙ্গ। সহজ কথা সহজ করে বলার মধ্যে যে আনন্দ, শোনার মধ্যে তার কম নেই, কিন্তু অনুভবের মধ্যে যে অনুরণন, শিহরণ, জাগরণ, সে আনন্দ অসীম অক্ষয় আনন্দেরই ভগ্নাংশ—রচয়িতা সেখানেই সার্থক। তবু সন্দেহ, আমরা যেখানে ‘ছেলে ভুলানো ছড়া’ শুনতেই অভ্যস্ত, সেখানে মানুষ জাগানো ‘এক মুঠো ছড়া’ তার ন্যায্য দাম পাবে কি? কিন্তু আশাহীনের আশা করতে বাধা নেই, দুরাশা হলেও তা আশারই সমতুল।

‘এক মুঠো ছড়া’ বহু মুঠো ভরিয়ে দেবে, মনকে রাসিয়ে দেবে নতুন ভাবনায়, সুস্থ ও সচল জীবনের ব্যাপক-তায় হয়ে উঠবে সত্যিকারের দিশারী এবং রসিকজনের রসানুভূতিতেই একদিন ‘ওরাও আলোয় গলবে, সোনাল জ্বলবে।’

শ্রীশ্রীবোধচন্দ্র দত্তচৌধুরী

বিষয়াস্তরে চালিত করে নিয়ে চলেছে। স্বপ্ন যে কখনো বিশ্বাসের শরীর ধারণ করে কলেবরসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, তা বিশ্বাসের স্থির বিন্দুতে এসে পৌঁছালে তবেই উপলব্ধি হয়। আমার স্বপ্নগুলি তাই বিশ্বাসের পাঁপড়িতে রং ধরে কখন যে রঙিন হয়ে উঠলো, নিজেই বুঝতে পারিনি। একজন শিশুর কাছে এই বিশ্বাসই আত্মবিশ্বাস। যার আত্মবিশ্বাস নেই, তার স্বপ্নও নেই। স্বপ্ন যদি পাখি হয়, আত্মবিশ্বাস তবে শক্ত দুটি ডানা। মহাশূন্যে এই দু’টি ডানায় ভর ক’রেই স্বপ্নের পাখি নির্ভয়ে আকাশচারী হয়। তার কাছে তখন ভূমি হয়ে উঠে ভূমা, আর ‘যো বৈ ভূমা তৎসুখম’, ভূমাতেই সুখ। আমার চিরকালের স্বপ্ন এই ভূমা-সুখেই সার্থক হতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ না নিজেকে আমি সকলের মধ্যে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার স্বপ্নের জোনাকী আলো দিচ্ছে না। অথচ ঐ আলোটাই প্রত্যাশিত। আমরা কেবলই আলোতে উত্তীর্ণ হতে চাই। শিশু তাই

মাতৃজঠর থেকে সূর্যালোকে বেরিয়ে আসে ভূমিশয্যায়, আর সেই ভূমিই তার জীবনে একদিন হয়ে ওঠে ভূমা। এ তার স্বপ্ন। আমাকে যদি সেই শিশুটি ধরি, তবে তার সেই উজ্জলন্ত আলোয় ভূমায় উত্তরণের স্বপ্ন যে আমারও স্বপ্ন! সেই স্বপ্ন নিয়েই আমি চিরকাল কথার মালা গাঁথলাম, আর সেই মালা পরালাম আমার চিরবার্হিতা স্বদেশ-লক্ষ্মীকে। স্বদেশ-লক্ষ্মীই আমার জন্ম-আরাধ্যা জননী জন্মভূমি। আমার স্বপ্নে তার জাগ্রত মূর্তি, আমার মনে তার ধ্যানমগ্ন, আমার প্রসাবনী লেখনীতে তারই ভাবা এক-একটি শব্দ শিশু হয়ে জন্ম নিয়ে গড়ে তুলছে আমার দিন-রাত্রির ভাবনাগুলিকে। আমি ক্রমেই আমি হয়ে উঠছি, ক্রমেই নিজেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি দেশকালের অতীত এক মহাবিশ্বে, এক বিরাট স্বপ্নরাজ্যে—যার কাজলচিহ্ন সকলের চোখে। চিরকাল স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি আজ নিজেই স্বপ্ন হয়ে উঠেছি ॥

সম্পাদক : শ্রীচরণাশঙ্কর মহলানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯২ হইতে শ্রীবিব কর কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটেন লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ৯২ হইতে শ্রীকান্তবাবু রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

প্রতিষ্ঠাতা - সত্যেন্দ্র শ্রীমতীলাল

১৪-৬৩ ৭৫৫৪ ৪

জনপ্রিয়তায় গৌরবমণ্ডিত

ক. হোডের

প্রসাধনী



মহাভদ্ররাজ
আম্বুর্বেদীয় সুবাসিত
কেশ তেল

কনক ট্যাল্ক
কনক সেন্ট



সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজ, সঙ্ঘগুরু মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনায় উজ্জ্বল এই গীতাভাষ্য নূতন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বহুর মধ্যে সঙ্ঘগুরু মতিলালের জীবনভিত্তিক জীলা-বাদী শারীরিক সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, যোগ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত।

মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর সুচিন্তিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিখিল ভারতশাস্ত্রের নির্ধন স্বরূপ সুবহু ভূমিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

সূচীপত্র শ্রাবণ ১৩৯১

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশান্তি	সত্যগুরু শ্রীমতিলাল	৯১
সাধন কণা	সংকলন	সত্যগুরু শ্রীমতিলাল	৯২
ভারতের দিব্যাপিতৃগণ	প্রবন্ধ	ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার	৯৩
অরণ্যীয় যোগেশ ব্রহ্মচারী	স্মৃতিভূষণ	শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ, ভক্তিরত্ন	৯৭
জন্মকর্ম	গল্প	নন্দদুলাল চক্রবর্তী	৯৮
প্রাচীন তাম্রলিপ্ত	প্রবন্ধ	শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য	৯৯
বন্ধুত্বের বন্ধন	গল্প	টগর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
মন-কুসুম	বড় গল্প	অমর কর	১০২
কল্লিকাতা স্ত্রীল	উপন্যাস	অমিতা ভট্টাচার্য	১০৭
বল মা কেন ?	কবিতা	শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ঘটক	১১০
কে আসে কে যায়	প্রবন্ধ	শ্রীকান্তি চট্টোপাধ্যায়	১১১
জন্ম	কবিতা	সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১১২
ঋদেশ ও সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি	প্রবন্ধ	ডঃ যাদবচন্দ্র দাস	১১৩
ভারতীয় সংস্কৃতি	...	স্বামী অঙ্কিতানন্দ	১১৪

প্রবর্তকের নিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি বাংলা মাসের ৯/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পর সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে শোজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একখানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আকুপাখ্যক রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই, সম্পাদকের নহে।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

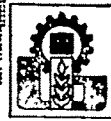
যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মীধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক ভাষা, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য পড়ে তোলায় রতী

ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

রেজিঃ অফিস : ৭ রোড লস ফোর্স, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

ডেপোজিট : জে এন বিহার

Progressive/JIS-18-80





বর্ষ ৬৯তম : ৪র্থ সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৯১ : জুলাই আগষ্ট ১৯৮৪

জীবনের আলো

আমাকে ভালবাসিলে, ভক্তি করিলে, আমি তৃপ্তি পাই না—পরস্পর পরস্পরকে প্রেমের চক্ষে দেখে কি-না, সেই দিকেই আমার দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ রাখিলে, আমার ষোগ সিদ্ধ হইবে না। নিজের যাহা দোষ, তাহা অনেক সময়ে নিজে দেখা যায় না, অশ্রের চক্ষু দিয়া দেখা উচিত। অশ্রের কাছে যাহা অসদৃশ অশ্রায় বলিয়া মনে হয়, তাহা সবখানিই ভুল ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, নিজের মহত্বে আস্থা করিও না। সকলে তোমায় পাইয়া যদি আনন্দ পায়, তবেই তুমি ঋণী ভগবানের মানুষ।

...যতক্ষণ আমরা তীর্থবাসী, ততক্ষণ আমাদের ভিতর ভেদকে কোন মতেই প্রশ্রয় দিব না। বিশ্বাস ক্ষুন্ন করিব না। সহ্য করিবার শক্তি অসাধারণ। যাহা অত্যাচার বলিয়া মনে হয়, তাহা অনেক সময়ে মনের ধর্ম। এই মন থাকিতে খুবই ব্যথা পাইতে হয়, এমন কি দেহ পর্যন্ত ভগ্ন হয়। তাহা হউক না—মানুষের সঙ্গে মিলিতে, মানুষকে আপন করিতে ছ' চারটা জীবন না হয় বলি পড়িবে। যে ঐক্য চাও, যে প্রেম দিয়া ভগবানকে নিজের সহিত যুক্তির বন্ধনে নিত্য সম্বন্ধের রসে অভিসিক্ত হইতে চাও, সে ঐক্য ও প্রেমের বীৰ্য যদি আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়—সে অমৃতের প্রবাহে বিশ্ব ভাসিয়া যাইবে। মানুষের চক্ষে সম্মুখের বাধা জ্বলংঘ্য, কিন্তু সে বীৰ্য যদি পাই, সে সজ্জ যদি গড়ে, সে সম্বন্ধ যদি ঘটে, উদ্দেশ্য আমার সফল হইবে। আত্মত্যাগে উদ্ধুদ্ধ হয়। নিজের পুঁতি যেন তোমায় মোহগ্রস্ত না করে। ঈশ্বরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চল।

—সঙ্কল্পরু শ্রীমতিলাল

সাধনকণা

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

আত্মপ্রত্যয় যখন নিশ্চয় হয়, তখন চারিদিকে আঁধার ঘনাইয়া আসে, বিশেষ আমাদের দেশে। পারিপার্শ্বিক চাপে আমরা একপ্রকার মুমূর্ষু, প্রতিমুহুর্তেই আত্মলোপের সম্ভাবনা, বিশ্বাস তলাইয়া যায়, দৃঢ়মূল হয় না।

বিশ্বাসের আরোপ, আর বিশ্বাসের সত্যমূর্তি, দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ যে আকাশ পাতাল, তাহা অনান্যসেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু কার্যকালে কোনটি সত্য বিশ্বাস তাহা নির্ণয় করা যায় না। পরিণাম যখন প্রস্তুত হয় তখনই বুঝা যায় কোথায় বিশ্বাস, আর কোথায় বিশ্বাসের আরোপ।

সাধ্য বিশ্বাস, সাধনা আরোপ। সাধনার উত্থান পতন আছে, জয় পরাজয় আছে, সত্য মিথ্যা আছে। সাধ্যে উপনীত হইলে পতন নাই, পরাজয় নাই, মিথ্যা নাই, উহা কেবলই উত্থান, কেবলই জয়, কেবলই সত্য। ছাতির আত্মবিশ্বাস আজ সাধ্যবল্য। সাধনার আবর্ত ভেদ করিয়াই উহা পাইতে হয়। আজ আমাদের জীবন তাই এত স্বন্দ্রময়।

বিশ্বাসের জাগরণ হয়, আরোপের সাধনায়। যেমন বিধেয়কে পাইতে হয়, অনুবাদের সাহায্যে। বিধেয় বাহ্য অপ্রাপ্ত, আন্তর্গত; অনুবাদ বাহ্য প্রাপ্ত, জ্ঞাত। বিশ্বাস আজ বিধেয়তত্ত্ব, আরোপ ইহার অনুবাদ। এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া ধৈর্য ও নিষ্ঠার সহিত কিছু ত্যাগ স্বীকার করিলেই আমরা বিশ্বাস জয় করিব। তাই বিশ্বাসের আরোপ লইয়া

সাধনার ক্ষেত্রে বাঁহারা কেবলই ব্যর্থ হইতেছেন, আমরা জ্ঞান সাফল্যের স্বর্ণমুকুট তাঁহাদেরই শিরে শোভা পাইবে। ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই জয়ের শুভাগমন হইবে।

চাই ধৈর্য, চাই ভরসা, চাই আত্মত্যাগ। ধৈর্যহীন হইলে বিশ্বাসের আগুন জ্বলিবে না। সাহস না থাকিলে এই দুর্গম পথে যাত্রা অসম্ভব হইবে। ত্যাগ না থাকিলে জয়ের আশা আদৌ নাই। সাধ্য প্রাপ্ত বস্তু হইলে কোন ভাবনাই নাই। যতক্ষণ অপ্রাপ্ত ততক্ষণই স্বপ্ন, ততক্ষণই দুঃখের সাগর সাঁতার দিয়া পার হইতে হয়।

লাভের দিকে ঝাঁক যেখানে সেখানে আছে সম্মোহন। গৌজামিল দিয়া বাঁচার চাতুরী যেখানে, সেখানে অকাল মৃত্যু অবধারিত! ক্ষতি করিয়াই আজ নতুন দৃষ্টি লাভ করিতে হইবে। সত্য ঋজুপথে চলিয়াই অমৃতের সন্ধান করিতে হইবে। বাঁচার জন্য কোথাও আপোষ করিলে চলিবে না। তির্যক বক্রপথ অবলম্বন করিলে আমরা ব্যর্থ হইব। বাঁচিতে হয় আত্মবিশ্বাসের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া বাঁচিব। কিছুকে আড়াল করিয়া নহে। সোজা উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া জীবনের পথে চলিব। এইরূপ বাঁচা ও চলার পথে বাধায় নত হয়—মিথ্যা। সুতরাং সত্যের জন্য যে জীবন, প্রভুর জন্য যে প্রাণ, তা নিত্য অমর। ইহার বিপরীত যদি আশ্রয় করি, তবে মরার কি শ্রেয় নহে?

ভারতের দিব্যপিতৃগণ

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তিনটি স্তর মেলে—দেবভাব, ঋষিভাব পিতৃভাব। দেবযুগে দেবভাবের প্রাধান্য, ঋষিযুগে ঋষিভাব বা স্বিজ্ঞভাবের এবং পিতৃযুগে পিতৃভাবের প্রাধান্য দেখতে পাই। মানব সৃষ্টির আদিযুগে ধীশক্তি ও দিব্যভাবে দীপ্ত যেসব পুরুষেরা সভ্যতার বা উন্নতির পথ তৈরী করে দিয়ে গেছেন তাঁরা দেবতা। তাঁরা শুধু যে সভ্যতার উদ্বোধন করে দিয়ে বিবর্তনের ধারাকে সুগম করে গেছেন তা নয়, জ্ঞানের নবোন্মেষ তাঁরাই এনেছিলেন। এই উন্মেষের অপূর্ব মাধুরী প্রভাতের উষার মতো সুন্দর ও স্নিগ্ধ আলোকে পরিপূর্ণ। সভ্যতার শৈশবকালে দেবপুরুষেরা প্রকৃতির কোলে সহজভাবে লীলা করে গেছেন। কৃষ্ণমতা ছিল না বললেই চলে। এই যুগ হলো দেবযুগ। তখন দেবভাবাপন্ন মানুষের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী ছিল।

তারপরে ঋষিভাব বা স্বিজ্ঞভাব। সভ্যতার মধ্যাহ্ন যুগে ঋষিদের প্রাধান্য। বৈদিক ঋষিদের সময় থেকে জ্ঞান ও বিদ্যার শূভ্র আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এযুগে লীলা নেই। ঋষিরা জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করলেন। কাজেই ব্রীড়ার্ধক ‘দেব’ শব্দকে উল্টে তাঁরা জ্ঞানার্ধক ‘বেদ’ শব্দের উদ্ভাবন করলেন। তাঁরা হ্রস্বাবদ্ধ বাক্য দিয়ে মনোভাব প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। বৈদিক গানের সূত্রপাত ঋষিযুগে। দেবযুগ অপসৃত হলে ইন্দ্রাদি দেবতাদের কার্যকলাপ স্মরণ করে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হতো। ঋষিরা এ কাজকে পূর্বসূরীদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রকাশ বলে মনে করতেন। বেদের জন্ম হলো। জ্ঞানের প্রভাৱ চারদিক ঝলমল করতে লাগলো।

তারপর উন্নতির তৃতীয় স্তর। এই যুগে সভ্যতার চরম অবস্থা এলো—অনেকটা অন্ত্যকালীন সন্ধ্যার মতো। এসময় পিতৃগণের বিশেষ প্রভাব দেখা গেল। এই পিতৃগণ কারা? তাঁরা ঋষি সম্প্রদায়েরই এক শাখা বা সম্প্রদায়। প্রাচীনকালে ঋষিসমাজও ঋষি ও পিতৃসম্প্রদায় এই দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল। পিতৃভাবই ছিল এই পিতৃসম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। তাঁরা শুধু বিদ্যা ও জ্ঞান লাভে সন্তুষ্ট থাকতেন না, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মজলের জন্মে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে

নানা যন্ত্র করতেন। ঋষিদের তৃপ্ত হচ্ছে জ্ঞানে আর পিতৃগণের তৃপ্তি বিজ্ঞানে। পিতৃসম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিরা কঠোর বিজ্ঞানী ছিলেন। পিতৃগণের কাল থেকেই ভারতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব। দেবভাব ও পিতৃভাব বিপরীত। দেবভাবে বলা হয় প্রকৃতির কল্যাণে সবই সহজে নিষ্পন্ন হয় আর পিতৃভাবে বিজ্ঞানের বলে নানা কৃত্রিম উপায়ে সব নিষ্পন্ন করতে হয়।

মানব সমাজের শৈশবাবস্থায় দেবগণের প্রাধান্য ছিল এবং পরিপক্ক অবস্থায় পিতৃগণের প্রাধান্য দেখা গেছে। পিতৃযুগে মানুষ শৈশবসুলভ সহজভাব ছেড়ে বিজ্ঞানের পদভরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বৈদিক যুগের অন্ত্যমে অথর্ববেদের কাল থেকেই পিতৃকালের শুরুর হয়েছে একথা বলা চলে। অথর্ববেদ ও তার শাখা আয়ুর্বেদ এবং তন্ত্র ইত্যাদি পিতৃগণেরই বিজ্ঞান চিন্তার ফলশ্রুতি। ঋষিরা অথর্ববেদকে উচ্চ আসন দিতে চাইতেন না, কারণ সেখানে অভিচারাদি মন্ত্র স্থান পেয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর অথর্ববেদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অথর্ববেদ বিজ্ঞানের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেয়। চিকিৎসা ও ভেষজ বিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচনা দ্বারা অথর্ববেদ ক্রমেই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সমগ্র জগতে বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন পিতৃগণ।

এই মহৎ কাজের জন্য পিতৃগণ বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা কঠোর সাধনা করেছেন। গহন অরণ্য, বিজন অশ্রয়, উদ্ভূত পর্বত কোন কিছু প্রাক্ষেপ না করে তাঁরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কারের জন্যে গেছেন। সবই লোকহিতের জন্যে। বাড়ীতে যেমনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে পিতা শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি পিতৃগণও জনসমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আকাশের উচ্চে স্থান লাভ করেছেন।

পিতৃগণের স্থান আকাশ এবং দক্ষিণদিক। দক্ষিণদিকের সঙ্গে পিতৃগণ এক সূক্ষ্ম সম্বন্ধে জড়িত ছিলেন। তাঁদের অন্তরের টান ছিল দক্ষিণদিকে। তাঁরা দক্ষিণমুখে লক্ষ্য রেখে সব কাজ করতেন। তাঁরা যজ্ঞে বসতেন দক্ষিণদিকে জানু পেতে।

ঋষেদে পিতৃলোক সম্বন্ধীয় সূক্তে বলা হয়েছে 'আচ্য জ্ঞান দক্ষিণতো নিষদোমং যজ্ঞমভিগূর্ণাত বিস্বে।' হে পিতৃগণ, তোমরা দক্ষিণদিকে ভূমিনিহিত জ্ঞান হয়ে উপবেশন করে এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর। দক্ষিণদিক প্রাণিতর একটি প্রধান কারণ হলো আর্ষাবর্তের দক্ষিণদিক যেমন অনন্ত ওষধির আকর তেমন অমূল্য রত্নরাজিরও আকর স্থান ছিল। অন্তরেও তাঁরা দাক্ষিণ্যাদি গুণভূষিত হয়ে সংসারের মঙ্গল করতেন। রোগীর চিকিৎসা, ওষুধ দেওয়া, ভ্রম দিয়ে প্রজার ভরণপোষণ ইত্যাদি দাক্ষিণ্যগুণ পিতৃভাবের একটি প্রধান লক্ষণ। মনে হয় দানার্থ দক্ষিণা ও দাক্ষিণ্য এই শব্দদুটিও 'দক্ষিণ' থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

গৃহস্থ সংসারে পিতা যেমন সহস্র ক্লেশ সহ্য করেও পুত্রাদির ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমন পিতৃগণও নানা কঠোরতার সাধনা করে পুত্রসমাজের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান ছিলেন। তাই তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। শাস্ত্রকারেরা তাই পিতার মতো পিতৃগণের জন্যও শ্রাদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। অগ্নিদ্বাস্তা, সোম্য বা সোমপা, হবিষ্যস্ত, উরুপা, সুকালিন, আজ্যপা, বাঁহিষদ এই সাতজন দিব্য পিতৃগণ।

মহাভারতে আছে—

‘আপ্যায়য়ান্তি যে পূৰ্বং সোমং যোগবলেন বৈ।

তস্মাৎ শ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিগান্তু বিশেষতঃ ॥’

—এঁরাই (পিতৃগণ) শুধু আগে যোগবল দিয়ে সোমকে আপ্যায়িত করতেন। এ কারণে বিশেষ যোগীদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ দ্রব্যসমূহ প্রদান করা উচিত।

পিতৃগণের সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা লিখেছেন—

‘পিতৃণাং হি বল যোগো যোগাৎ সোমঃ প্রবর্ততে।’

পিতৃগণের যোগই বল এবং যোগের স্বারা সোম প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ দেহ, মন ও আত্মার রসের সঞ্চার হয়। পিতৃগণের হৃদয় অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল। বিজ্ঞান সাধনার জন্য তাঁরা সকলের কাছে এত শ্রদ্ধা পেতেন যে সনৎকুমার ভৃগুপুত্র মার্কণ্ডেয়কে বলেছেন, ‘যিনি ভক্তিসহকারে পিতৃগণের প্রতিবিধান করেন, পিতৃগণ তাঁকে প্রীতিযুক্ত করেন। পুষ্টি, বিপুল প্রজা, স্বর্গ, আরোগ্য ও অন্য যা কামনা থাকে সব তাঁরা দান করেন। হে য়নি, দেব কাজের চেয়ে

পিতৃকাজ উৎকৃষ্ট। দেবগণের আগে পিতৃগণের পরিচরিত্তি বিধান করা উচিত। পিতৃগণ শীঘ্র প্রসন্ন হন, তাঁদের ক্রোধ নেই। তাঁরা লোকের পরম তৃপ্তিবিধান করেন। ভৃগু বংশ প্রভব মার্কণ্ডেয়, পিতৃগণের প্রসন্নতা সর্বত স্থির থাকে। তুমি তাঁদের নমস্কার কর।’

আয়ুর্বেদসত্ত্ব রসায়নবিৎ পিতৃগণ চিকিৎসা ও ওষুধ দিয়ে লোকের আরোগ্য, পুষ্টি ও সুখ স্বচ্ছন্দ্যাদি বিধান করতেন। তাই পিতৃগণ প্রসন্ন হলে আরোগ্য, পুষ্টি ও পুত্রাদি দান করেন একথা বলা হয়েছে। পিতৃগণের বিজ্ঞানচক্ষুর কথা উল্লেখ করে সনৎকুমার বলেছেন, ‘হে মার্কণ্ডেয়, আমি তোমাকে যে বিজ্ঞান চক্ষু দান করেছি তা পিতৃগণের পরমগতি। এই বিজ্ঞানচক্ষু দেবগণেরও দুর্লভ।’

যোগবলের সাহায্যে পিতৃগণ যেমন অধ্যাত্মবিজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন, তেমন জড়বিজ্ঞানেও প্রগাঢ় পানদর্শীতা দেখিয়েছেন। যখন বিষ্ণুপদ অনুসরণ করে ঋষিরা উত্তর-দিকের দেবদ্বার থেকে প্রথম হিমালয়ের পাদদেশে ভারতের ব্রহ্মাবর্তে এসে পৌঁছালেন তখন সেই ঋষিদের কাছে ভারত স্বদেশরূপে বিবেচিত হতে পারে নি। ক্রমে ঋষি বংশধরেরা দক্ষিণে আর্ষাবর্তের দিকে গেলে হিমালয়ের উত্তর দেশের কথা লোকের স্মৃতির বিষয়ীভূত হলো এবং ভারতই ক্রমে পিতৃগুরূপে পরিগণিত হতে চললো। এইভাবে ঋষিরা আরো দক্ষিণে অগ্রসর হতে লাগলেন। একসময় ভয়াবহ রোগ, মহামারী প্রবলভাবে দেখা দিয়ে ভারতকে অশ্বিনে পরিণত করতে চেষ্টা করলো। মৃত্যুর এই অন্ধকার সময়ে পিতৃগণের উদ্ভাদয় হলো। ঋষিযুগের অবসানে দেবলোকের কিরণরেখা অন্তিমিত হলো এবং সোমাত্মক পিতৃগণের আবির্ভাব হলো।

সোমাত্মক পিতৃগণেরই যজ্ঞে অগ্নিমাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত হয়েছিল। চন্দ্রের সঙ্গে সোমাত্মক পিতৃগণের একটা মূলগত সম্বন্ধ ছিল। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, ‘পিতৃগণের যোগই বল, আর যোগের দ্বারা সোম প্রবর্তিত হয়।’

দক্ষিণায়ণ প্রভৃতি পিতৃমার্গে গমনশীল যোগী চান্দ্রমস জ্যোতি হয়ে সংসারে আসেন। চিন্তবৃত্তি নিরোধের অন্য নাম যোগ। এই যোগের সাহায্যে সোমরস পান করে পিতৃগণ সোমময় হয়ে বিরাজ করতেন। ঋষিদের ধ্যান

ধারণা ও তপস্যা ঘনীভূত হয়ে পিতৃগণের যোগে পরিণত হয়েছিল। যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতৃগণ তার জন্যে কখনো সংসারের ইষ্টকর্ম থেকে বিরত ছিলেন না। রসের আধার চন্দ্র যেন রসসগ্গার করে ওষধির পরিপোষণা করে, তাই তার নাম ওষধিপতি। রাসায়নিক পিতৃগণও তেমনি ওষধির তত্ত্বজ্ঞ বলে তাঁদেরও ওষধিপতি বলা হয়। বিজ্ঞানী পিতৃগণ ওষধিসমূহের গুণাগুণ ও তাদের বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁরা ভারতের ওষধিসমূহকে আহার ও যজ্ঞকার্যে এবং ওষধরূপে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার লোক পালনের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম তাঁদের ইষ্টকর্ম ছিল। ঋষেদে তাই ওষধিপতি পিতৃগণকে ‘যজ্ঞিয়’ বলা হয়েছে। ঋষেদের দশম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তে আছে ‘তেষাং বরং সুমতো, যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমন সে স্যাম।’—সেই যজ্ঞিয় পিতৃগণ যেন আমাদের শুভানুষ্ঠান করেন, আমরা যেন তাঁদের প্রসন্নতা লাভ করে কৃতার্থ হই।

পিতৃগণকে কবি বলা হতো। ‘কবি’ শব্দের অর্থ হলো ক্রান্তদর্শী, পরমজ্ঞানী। ভৃগুনন্দন অসুরগুরু শূক্ৰাচার্য ‘কবি’ নামে খ্যাত হতেন। বেদে আছে ‘সা স্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্তেনারাজন হবিষ্যামাদয়ন্ত’—তোমার উদ্দেশ্যে কবিদের মুখোচ্চারিত মন্ত্রসমূহ চলতে থাকুক। মহাভারতে ‘ওষধিতত্ত্বজ্ঞ কবি কন্যা স্বযাতে যেসব সোমপ পিতৃগণ উৎপন্ন হয়েছেন, তাঁদের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যাঁদের আমরা কবিরাজ বলি, তাঁদের এই নাম আয়ুর্বেদের জন্মদাতা ক্রান্তদর্শী পিতৃগণের ‘কবি’ নাম থেকে এসেছে। পিতৃগণ একদিকে অন্ন ও মৃতসঞ্জীবনী ওষুধ ও অন্যদিকে মৃতসঞ্জীবন যোগ বল দিয়ে লোকের প্রাণদান করতেন বলে পিতার উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। ভক্তদের স্তুতিতে পিতৃগণ আধ্যাত্মিকতার অমররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিন্তু তাঁরাও একসময় আমাদেরই মতো মানবদেহ নিয়ে জগতের মঙ্গল সাধনে রত ছিলেন।

অঙ্গিরা, অথর্বা ও ভৃগু এই তিন ঋষির বংশধরেরা প্রধানতঃ পিতৃসম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। ঋষেদে আছে, অঙ্গিরা, অথর্বা ভৃগু ও নামক পিতৃলোকগণ এইমাত্র এসেছেন, তাঁরা সোমরস পাবার অধিকারী। বিশিষ্ট এবং অন্যান্য ঋষি-মুনিদের বংশধরেরাও অনেকে পিতৃসম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন।

শিব দেবাদিদেব কিন্তু তাঁর মধ্যেও পিতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। যোগবল, দাক্ষিণ্যগুণ, ওষধিতত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব গুণই শিবে বর্তমান।

প্রধান সাতজন পিতৃগণের নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ পিতৃগণ প্রধানতঃ সপ্তগণে বিভক্ত ছিলেন। তার মধ্যে কয়েকজন অমৃত, বাকিরা সমৃত। অগ্নিহোত্র বর্হিষদ প্রভৃতি তিনটি গণ অমৃত। ‘বিস্বধর্মোত্তর’ গ্রন্থে আছে—

সুভাস্বর্য বর্হিষদ অগ্নিহোত্র্য স্তুতিবচ।

এয়োমূর্তি বিহীনাস্তে রাজন্ পিতৃগণাঃ স্মৃতা ॥

এঁরা কেন অমৃত? কারণ অতি প্রাচীন কালে এঁরা ছিলেন, তাই তাঁদের মূর্তি লোকের স্মৃতিপথ থেকে মুছে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ দেবযুগে এঁরা ছিলেন, তাই মনু অগ্নিহোত্র প্রভৃতি পিতৃগণকে দেবগণের পিতৃগণ, এ নামে অভিহিত করেছেন। সৌম বা সোমপা, আজ্যপা প্রভৃতি পিতৃগণ সমৃত। কারণ তাদের অভ্যাস দেবযুগের চেয়ে অনেক আধুনিক। তাই তাঁদের মূর্তি লোকের স্মৃতিপথে স্থানিকটা জাগরুক আছে। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি বর্ণ বিভাগ শুরু হয়েছে, সমৃত পিতৃগণ সেই সময়ের।

সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাং হবির্ভূজঃ।

বৈশ্যানাম্ আজ্যপা নাম শূদ্রাণাস্তু সূকালিনঃ ॥

ঋষেদে সুগতিপ্রাপ্ত ও দেবযুগপ্রাপ্ত পিতৃগণের উল্লেখ আছে মাত্র। মনুসংহিতায় দেখা যায় ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও শূদ্রের স্বতন্ত্র পিতৃগণ রয়েছে। ঋষেদে সোমপ ও হবির্ভূক পিতৃগণের বিষয় বলা হয়েছে ‘যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোমুহিরে সোমপীথং বশিষ্ঠাঃ’—যে পূর্বতন বিশিষ্ট বংশীয় সোমপ পিতৃগণ যথা নিয়মে সোমপান করেছিলেন।

আবার আছে ‘অগ্নিহোত্র্যঃ পিতর এহ গচ্ছত সদসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।’—হে অগ্নিহোত্র্য সুগতি প্রাপ্ত পিতৃগণ! তোমরা এখানে এস, এক এক আসনে সবাই বসো।

বর্হিষদ পিতৃগণের সম্বন্ধে ঋষেদে আছে ‘বর্হিষদঃ পিতর উতর্বাগমা বো হব্য চকুমা জুযস্বৎ’—হে বর্হিষদ পিতৃগণ! এখন আমাদের আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এইসব দ্রব্য প্রস্তুত করেছি, ভোগ কর। অগ্নিহোত্র্য পিতৃগণকে দেবগণের পিতৃগণ বলা হয়েছে কারণ তাঁরা দেবগণের

সমসাময়িক ও দেবপথের পথিক ছিলেন। তাই বলা হয়েছে ‘আয়াস্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিহোতাঃ পথিভি দ্বেবযানৈঃ।’—হে সোমপ অগ্নিহোতা পিতৃগণ তোমরা দেব-যানের পথ দিয়ে এখানে এসো।

যোগী যান্ত্রবক্ষ্য ও অগ্নিহোতা পিতৃগণকে ‘দিব্য পিতৃগণ’ নামে অভিহিত করে বলেছেন—

কব্যাবালং বলং সোমঃ যমমর্ময়ং তথা

অগ্নিহোতাঃ সোমপাক তথা বহিষদঃ পিতৃন ॥

যদি স্যাক্ষীর্বাণ্ডক এতন্ দিব্যান্ পিতৃগুণাঃ।

যেভ্যো বাপি পিতা দদ্যাৎ তেভ্যো বাপি প্রদাপয়েৎ ॥

—যদি পিতা জীবিত থাকেন তাহলে কব্যপাল, নল, সোম, যম, অর্ষমা, এবং অগ্নিহোতা, সোমপ, বহিষদ এই সকল দিব্য পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করবে।

অগ্নিহোতা, সোমপ, বহিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ আমাদের গৃহের মৃত পিতৃগণের প্রেতাত্মা মাত্র নন। তাঁরা ভারতের ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ করে লোক পালনাদি সংকার্য করে গেছেন।

আর্যাবর্তের দক্ষিণাংশ একসময়ে জনশূন্যতা ও অন্ধাঙ্কুর কারণে প্রেতভূমি বা অশানভূমি বা চেতভূমি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অশানভূমি হলেও দক্ষিণাদিকবর্তী এই বঙ্গদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল পিতৃগণের প্রধান বাসভূমিতে পরিণত হয়েছিল। তাই আজও গান্ধার্য পিতৃতীর্থ হিসেবে বিখ্যাত। বিহার, বঙ্গদেশ অনন্ত ঔষধির আকর বলে দক্ষিণ-প্রাণ পিতৃগণের প্রধান বাসভূমি বা পিতৃভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে পিতৃগণের স্থান আকাশ ও দক্ষিণ-দিক। পিতৃলোক অর্থে অনেকে চন্দ্রলোকের কথা বলেছেন, কারণ চন্দ্রকে ঔষধিপতি বলা হতো। যেহেতু পিতৃগণ ঔষধি বিজ্ঞানে পারদর্শী, তাই চন্দ্রলোককে তাঁদের অর্থাৎ পিতৃলোক বলা হতো। আবার জনমানব, প্রাণহীন হিসাবেও চন্দ্রলোককে অশানলোক বা পিতৃলোক বলা হতো। পিতৃস্থানকে অনেকে অশান বলেন। চন্দ্রের গতি অনেকটা দক্ষিণপ্রবণ। শরৎ ও হেমন্তকালে যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ফিরে আসে তখন ঔষধিপতি সোমের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন কাল দক্ষিণায়নের। এক-

সময় ভাদ্র-আশ্বিনকে বর্ষা, কা্তিক-অগ্রহায়ণকে শরৎ ও পৌষ-মাঘকে হেমন্ত বলা হতো। তাই ভাদ্র থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত দক্ষিণায়ন কাল।

কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন পিতৃগণের দিন অর্থাৎ পিতৃকাল। অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুরূপক্ষ, উত্তরায়ণকাল প্রভৃতি সময়ে ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং ধূম, রাগ্নি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন এই সময়ে গমনশীল যোগী চান্দ্রমস জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে এই সংসারেই পুনরাগমন করেন একথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের দিন ও শুরূপক্ষ তাঁদের রাত। উত্তরায়ণ হলো দেবতাদের দিবাভাগ। দক্ষিণায়ন তাঁদের রাগ্নি। পিতৃপক্ষে বা দক্ষিণায়নে মৃত্যু শ্রেয়স্কর নয় এমন একটা ধারণা আগে ছিল।

পিতৃলোক অর্থে যেমন অশানলোক তেমনি তার অন্য অর্থ হলো অন্নপতি বা পালক। পিতৃকালও তেমনি একদিকে অশানকাল বা মৃতকাল এবং অন্যদিকে অন্নপালনের কাল।

সূর্যের দক্ষিণায়নে অবস্থান কালে পৃথিবীকে মৃতপ্রায় করে তোলে। শীতের প্রভাবে পৃথিবী প্রাণহীন অশানে পরিণত হয়। গ্রাহের পাতা ঝরে পড়ে। চারিদিকে রিক্ততা দেখা দেয়। জীবজন্তুরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা করে। তাই দক্ষিণায়নের কালকে একসময় প্রাণহীনতার কাল বা মৃত কাল বলা হতো। আবার দক্ষিণায়ন মারী-মড়কের সময়। ভাদ্র, আশ্বিন ও কা্তিক মাসে একসময় এদেশে প্রচণ্ড রোগাক্রমণ হতো। এই সময় ‘যমের দুয়ার খোলা’ বলা হতো। শরৎকাল একসময় মারাত্মক কাল ছিল। কা্তিক মাসে ভাইফোঁটায় বলা হতো। ‘যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।’ অর্থাৎ বোনেরা ভাইদের দীর্ঘজীবন কামনা করতেন।

ভাদ্রমাসে সূর্য প্রথম দক্ষিণায়নে প্রবেশ করে বলে এই সময় হিন্দুরা পুরোনো হাঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দিয়ে নতুন আয়োজন করতেন। বিদেশ যাত্রা, শুভকর্ম ইত্যাদি বন্ধ থাকতো। আবার দক্ষিণায়নে ধান্যাদি, ফল ঔষধি ইত্যাদি ফলপ্রসূ হয়। ধান, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিশস্য, নানাবিধের ঔষধি ও শাকশস্ত্র এই সময় প্রচুর পরিমাণে

(১১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্মরণীয় যোগেশ ব্রহ্মচারী

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ ভক্তিরত্ন

মহৎ ব্যক্তি সর্বকালে স্মরণীয়। মহতকে স্মরণ করে আমরাও পবিত্র হয়ে থাকি, ধন্য হয়ে থাকি। স্মরণীয় শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারীর দেহাবসান হয়েছে গত ২৮শে জুন ১৯৮০ সনে। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। তাঁর দেহান্তের সংবাদ পেয়ে আমরা সেই স্মরণীয় ব্যক্তির প্রাণহীন দেহ দর্শন করেছিলাম বালিগঞ্জ গ্রাম্য যোগাগ্রামে। ঐ টাই সেই কর্ম-যোগীর প্রাক্তন কর্মকেন্দ্র। অবশ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম, পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে তাঁর জনসেবার কিছু প্রতিষ্ঠান আছে।

শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারীজীর জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলায়। যে চট্টগ্রাম অঞ্চল বৃহৎবঙ্গের পূর্বাঞ্চলে পাহাড়-পর্বত, বন-উপবন নদনদী বিধৌত শ্যামলভূমি। আদিকাল থেকেই চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পবিত্রতীর্থস্থান। মহা-ভারতের সর্বাঞ্চলের লোকই ঐ পবিত্র তীর্থ দর্শন করতে আসতেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য সেই চট্টগ্রাম এখন খণ্ডিত ভারতেরই অংশ, ভিন্নরাষ্ট্র “বাংলাদেশ”।

সেই বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর পরিবাহিত বারিধারার স্নিগ্ধ পরিবেশের গ্রাম গুজরা নয়াপাড়াতে জন্ম হয়েছিল ১৮৯৫ সনে ব্রহ্মচারী যোগেশচন্দ্রের। পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং স্নেহময়ী মাতার নাম বামাসুন্দরী। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল চন্দ্রকুমার আর উপনয়নের সময় নাম হয় যোগেশচন্দ্র। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবে জীবন উদ্ভাসিত। গুজরার বুড়াকালী মন্দিরে সাধনা করেছিলেন, অপর সাধু ক্ষ্যাপা তারা-পাগলা, পরবর্তীকালে তিনিই তারাচরণ পরমহংস নামে সর্বজনের প্রণয় সাধু। এই মহানগরী কলকাতা, দুই সাধুরই কর্মকেন্দ্র, বালিগঞ্জ আর টালিগঞ্জ।

শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী বাল্যাবধি ধর্মনিষ্ঠ। বাল্যের চন্দ্রকুমারের অপর নাম ছিল “ধর্মাকুর”। নৈঠিক ব্রাহ্মণ-কুলের সন্তান চন্দ্রকুমার ইসলাম ধর্ম মতেও বিশ্বাসী ছিলেন, সেই মতে সাধন করেছিলেন “জমিরআলি” নামে। গুজরা গ্রামে জন্মের প্রভাবে যোগেশ ভট্টাচার্য হিন্দু ধারানুযায়ী যোগ-শিক্ষা রতী হলেন, তখন নাম গ্রহণ করেন দ্বিজলালানন্দ।

তিনি কিছুকাল “সুপ্রিয় রত্ন” পালন করেছিলেন অচলানন্দ নামে।

তারপরে চট্টগ্রাম সহরে এসে ইংরেজী ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে থাকেন এবং ১৯১৬ সনে বি এ পাশ করেন। বাল্যকালে অতি দুরন্ত স্বভাব সম্পন্ন ছিল। গর্ভবতী মাতৃদেবী অঙ্গে অসাবধান আঘাতের কিছুকাল মধ্যে মায়ের দেহত্যাগের পর বিমর্ষ যোগেশচন্দ্রের মনে তীব্র বৈরাগ্য জন্মে, আর তিনি গৃহ পরিত্যাগ করে জগৎপুর আশ্রমবাসী হয়ে জীবন গঠন করতে থাকেন। তখনকার কালের প্রভাবে যোগেশচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য বিপ্লবপন্থী হয়ে ছিলেন এবং সংগোপনে ১৯০৫ সনে বিপ্লবপন্থীদের সহযোগিতায় জার্মান দেশে গমন করেছিলেন, আবার দেশে ফিরে এসে কর্মজীবন ধর্মজীবন দুই বাঁধত করতে থাকেন।

ক্রমে তিনি শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সঙ্গলাভ ও পাদস্পর্শ করে জীবনের গতি পরিবর্তিত করলেন। ঐ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দই যোগেশচন্দ্রের ধর্মগুরু। ধর্মনীতির সঙ্গে রাজনীতি সংযোগ করে ১৯২০ সনে তিনি বঙ্গদেশে রাজনীতিতে মহাত্মাজীর অনুগামী হয়ে অনেক গঠনমূলক কাজ করেছিলেন।

আমরা তাঁকে কলকাতার বালিগঞ্জে এক ধর্মীয় সভাতে ভাষণ দানকালে দর্শন করেছিলাম। তখনকার ভাষণ দান কালে তিনি বলেছিলেন অনেক কৃচ্ছ করে স্বদেশ থেকে উধাও হয়ে সোভিয়েৎ রাশিয়ান পরিভ্রমণ কালে ওখানকার রাষ্ট্রগুরু লেনিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় সাম্যবাদ আলোচনা করে লেনিনকে মুগ্ধ করেছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মপদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। জনগণের সেবা আর উন্নতিকল্পে, ১৯৪৬ সনে বালিগঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তে গ্রাম্য যোগাগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র জনসাধারণের সেবা-কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর নশ্বর দেহ ঐ গ্রাম্য যোগাগ্রাম প্রান্তরে সমাহিত করা হয় মৃত্যুদিবসের (২৮ জুন ৮০) দু দিন পরে। আমরা তাঁর চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি।

অবস্তীর কীৰ্ত্তমান মহারাজা সিংহাসনে বসেছিলেন। দু' পাশের আসনে মন্ত্রী-পরিষদ। আর স্ত্রানী গুণী সভাকবির দল। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল।

সহসা এক বিকট চেহারার দৈত্য প্রহরীর নজর কেন্দ্র করে যেন এড়িয়ে রাজসভার মাঝে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কটকটে চোখে মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তন্নষ্টম্'। এমন একটা শ্লোক তৈরী করে দিতে হবে যার ভেতর থাকবে এই কথাটা। সাত দিন পরে আবার আমি আসব মহারাজ। যদি এর মধ্যে শ্লোকটা তৈরী করে এই দিন আমাকে শোনাতে পার ভালো, নইলে তোমার রাজ্য এই দিনেই গুঁড়িয়ে দেব।

সকলের হকচকানির মধ্যে দুম দুম শব্দে সে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলেই বিষয়। হতভয়। সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হল। প্রধান সভা কবি শ্লোকের কথা চিন্তা করতে করতে বাড়ি চলে গেলেন।

রাজ্য বুঝি সত্যি চলে যায় দতি-দানের হাতে। ছ' ছ'টা দিন এগিয়ে এল তবুও প্রধান কবি অত বড় জগদ্বিখ্যাত কবি হয়েও 'তন্নষ্টম্' দিয়ে একটা শ্লোক রচনা করতে পারলেন না! নতমুখে তিনি বললেন, 'মহারাজ চলুন, প্রজাদের নিয়ে অন্য দেশে চলে যাই। ব্যাপার গোরবের নয়, তবুও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে ভালো। নইলে আমাকে হত্যা করুন, অনেক দিন আপনার নিমক খেয়েছি অথচ এই বিপদে আমি কিছুই করতে পারলুম না।

মহারাজ মনে মনে চিন্তা করলেন, সভাকবিকে হত্যা করলেও আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অথচ রাজ্য ছেড়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হল।

বিরাত দল বেঁধে সকলে চলেছেন। দুপুরের ঝাঁঝী রোদ। পথে পড়ল আবার মরুভূমির মতন তপ্ত বালুর একটা বড় প্রান্তর।

রাজবাড়ির লোকজনদের জন্য অবশ্য আছে অশ্ব আর শিবিকা বা পাল্কি। মুশকিল হয়েছে সভা কবির। তিনি ইচ্ছে করেই অশ্ব নেন নি। পায়ে যদিও তাঁর খড়ম-জাতীয় কাঠ পাদুকা ছিল তবুও চলতে কষ্ট হচ্ছিল বালুর প্রান্তরে।

চলতে চলতে কবি দেখলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খালি পায়ে তাঁর সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পোড়া বালিতে তাঁর পা পুড়ে যাবার মতন অবস্থা। কবির প্রাণে ব্যথা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের খড়মখানা ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করে খালি পায়ে তিনি অগ্রসর হলেন। খানিকটা দূর গিয়ে দেখলেন এক তাজব ব্যাপার। রাস্তার পাশে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে, অথচ কোনো সওয়ারি নেই। রাজবাড়ির কবি—ঘোড়ায় চাপা অভ্যাস ছিল, দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ সেই ঘোড়ায় চেপে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটাও পালটে গেল। দ্রুত রাজ্যের ঘোড়ার পাশাপাশি উপস্থিত হয়ে বলে উঠলেন : মহারাজ, ফিরে চলুন নিজের রাজ্যে। ভয় নেই। শ্লোক আমার মাথায় এসে গেছে। আগামী কাল সপ্তম দিবস, দৈত্যের সভায় আসার কথা, একেবারে তার মুখের ওপর শ্লোকটা শুনিয়ে দেব।

মহারাজ যেন অধীরে আলো দেখলেন। তবুও ভয়ে ভয়ে বললেন—দেখুন, ঠিক পারবেন তো, এতগুলো মানুষের জীবন-মরণ কিন্তু আপনার ওপর নির্ভর করছে।

: আমার ওপর আস্থা রাখুন, মহারাজ। —সভা কবি ঘোষণা দিলেন দৃঢ় গলায়।

* * *

সপ্তম দিন।

আবার সভা বসেছে মহারাজের খাস রাজ্যে।

প্রজারা দল বেঁধে সভার প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাদের চোখে-মুখে ভয় আর উৎকণ্ঠার ছাপ।

যশী দৈত্য সভায় উপস্থিত হল। কটমট করে মহারাজের দিকে তাকাতে বলে উঠল : আমার শ্লোকটা তৈরী হয়েছে কি ?

মহারাজ নীরবে তাকালেন সভাকবির দিকে।

আসন্ন ছেড়ে সভাকবি উঠে দাঁড়ালেন। মুখটা গম্ভীর। দীঘল কুণ্ডিত মাথার চুলের দু' একটি শ্রবক মধ্যে মধ্যে মুখের ওপর এসে পড়ছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘামের ফোঁটা। পাকা ধানের মতো গায়ের রঙে রক্তিম আভা।

সভার হাজার হাজার চোখ যেন ছিটকে তাঁর মুখের ওপর

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত

শ্রীমুখাংশুশেখর ভট্টাচার্য

প্রাচীনকালে যে কয়েকটি বন্দর বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল তাম্রলিপ্ত তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তই আজকের তমলুক। বর্তমানে এই তমলুক রূপ-নারায়ণ নদ হতে মাত্র আশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

কতকাল পূর্বে তাম্রলিপ্তের জন্ম হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে মহাভারতের যুগে তাম্রলিপ্তের অস্তিত্ব ছিল। ‘মহিষাসুরের ইতিহাস’ রচয়িতা ভাগবতীচরণ প্রধান বলেন, “হাজার হাজার বৎসর পূর্বে তাম্রলিপ্ত খুব সম্ভবতঃ একটি দ্বীপ হিসাবে বঙ্গোপসাগরে জেগেছিল।”

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্পর্কে ‘বিশ্বকোষে’ এইরকম আছে : “যখন বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্রের শুভন হইয়াছিল। পরে সূর্যদেব সারথিকে বলিয়াছিলেন আমি ভারতে করিব দিন, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উদ্ভিত হইল। তখন (তাম্রবর্ণ) অম্লণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল। যেই স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেই স্থান ‘তাম্রলিপ্ত’ নামে খ্যাত হয়।”

‘তমলুক মঙ্গল’ রচয়িতা মদীয় বংশজ পূর্বপুরুষ পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সরস্বতী মশায় লিখেছেন, “তাম্রবর্জ রাজা লুপ্ত হইলে তাহার নামানুসারে এইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে আখ্যাত হয়।”

মহাভারতের অনেক জায়গায় তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাম্রলিপ্তাধিপতি অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত উপস্থিত ছিলেন। ভীষ্মপর্বে সঞ্জয় অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সেকালের পুণ্যবান নদী ও জনপদের নাম বলতে গিয়ে তাম্রলিপ্তের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আশ্বমেধিক পর্বে তাম্রলিপ্তাধিপতি

গিয়ে পড়ল। সকলের মরা-বাঁচা এখন এই একটি লোকের ওপর নির্ভর করছে।

সভাকবি তখন নিজের তৈরী শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন—

‘জিজ্ঞাস্য পাদুকাং দত্তা শতবর্ষীয়জর্জরাঃ।

তৎফলাদশ্বলাভো মে তম্রকৃত্য যশসদীয়তে ॥’

—আমার বহু পুরনো পাদুকা ব্রাহ্মণকে দান করার ফলে

ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজের সহিত যজ্ঞাশ্ব নিয়ে অর্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাম্রধ্বজের হাতে অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণ সাতাকী প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ পরাজিত হয়েছিলেন।

বিভিন্ন পুরাণেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। প্রাতিমা ১ম ভাগে এ রকম আছে : একবার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে প্রভু, পৃথিবীর মধ্যে আপনি কোন তীর্থে সবসময় বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনে হেসে বলেছিলেন, সেখানে তাম্রলিপ্ত ছাড়া আর প্রীতিপ্রদ স্থান ভূমণ্ডলে নাই। তাম্রলিপ্ত তীর্থ আমি কদাচ পরিত্যাগ করতে পারি না।

ব্রহ্মপুরাণে তাম্রলিপ্তকে ‘কপালমোচন তীর্থ’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কাহিনীটি এরকম : দক্ষযজ্ঞে মহাদেব দক্ষ প্রজাপতিকে বধ করায় ব্রহ্ম হত্যার মহাপাপে দক্ষমুণ্ড শিবের মাথায় আটকিয়ে যায়। এই মহাপাপ থেকে উদ্ধারের জন্য মহাদেব বিষ্ণুর নির্দেশমত ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাতীর্থে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হলেন। এই তীর্থে স্নান করলে মানুষ পাপমুক্ত হয় এবং স্বর্গে যায়। মহাদেব বর্ণভীমার মন্দির ও জিহ্মহরির মন্দিরের মধ্যবর্তী একটি সরসীতে গিয়ে স্নান করলেন। অর্মান্ত তাঁর মাথা থেকে দক্ষমুণ্ড চ্যুত হল। সেইদিন থেকে তাম্রলিপ্তও ‘কপালমোচন’ তীর্থ নামে খ্যাত হোল।

মৎস্যপুরাণ ও বৃহদ্রকম্ সংহিতায়ও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ যুগে বন্দর হিসাবে তাম্রলিপ্ত, সমতট, কুমিল্লা, সপ্তগ্রাম বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। সেই সময় তাম্রলিপ্তে একজন খুব বড় বৌদ্ধ পণ্ডিতের আবিস্কার হয়। তাঁর নাম কীলক। দণ্ডীর ‘দশ কুমার চরিতম্’-এর এক কুমার

আমার অশ্বলাভ হয়েছিল। অতএব সেই জিনিষ নষ্ট হয় (তম্রকৃত্য) বা দান করা হয় না।

দৈত্য শ্লোক শুনে খুব খুঁসি হল। রাজাও সভাকবির প্রশংসা করে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই সভাকবি হচ্ছেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরঙ্গ-সভার প্রধান রঙ্গ মহাকবি কালিদাস। তাঁর পাণ্ডিত্যের এমনি বহু উপাখ্যান আজও দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

‘মিত্রগুপ্ত’ প্রায়সী কুম্ভকাবতীর অধেষণে সুম্মদেশের দাম-লিপ্তে (প্রাচীনকালে এক সময় বাংলা সুম্ম নামে এবং তাম্র-লিপ্ত দামলিপ্ত নামে পরিচিত ছিল) উপস্থিত হয়েছিলেন। ভীমধন্য নামে এক দস্যু তার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল।

সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করেছিলেন সত্য, আর কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তস্রোত অশোকের মনে অনুশোচনা সৃষ্টি করেছিল এটাও সত্য। পরিণামে দুর্দান্ত অশোক ধর্মাগ্ৰন্থী অশোকে পরিণত হন। যারা এই দুর্দান্ত অশোককে ধর্মপথে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ী ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্যে। সম্রাট অশোক একবার কয়েকজন বিদেশী দূতকে বিদায় সর্জন্য জানানোর জন্য নিজে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত এসে তাঁদের জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তমলুক দিয়ে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দস্তখত জাহাজে কোরে সিংহলে পাঠানো হয়েছিল, যা আজো সিংহলে রক্ষিত আছে।

গুপ্ত সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি পৃথিবীর নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিউয়েন আর্ষাবর্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তাম্রলিপ্তে তখন ব্রাহ্মণধর্মের হাস ও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ছিল। সেই সময় হীনযান ও মহাযান নামে বৌদ্ধ ধর্মের দুই সম্প্রদায়ের প্রায় সাতশো সন্ন্যাসী তাম্রলিপ্তের বিভিন্ন মঠে বাস করতেন।

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্তকে একটি উচ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধশালী বন্দর বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি দুইশত ফুট উচ্চ একটি অশোক স্তম্ভ তাম্রলিপ্তে দেখে-ছিলেন। কিন্তু সেই স্তম্ভটির অস্তিত্ব আজ নাই। অনেকে হ্যামিলটন সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ একটি ভগ্ন স্তম্ভকে সেই স্তম্ভ বলে মনে করেন। তখন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ছিল এক হাজার চারশত লি। প্রবাদ আছে তমলুক থেকে চার পাঁচ মাইল পশ্চিমের একটি গ্রাম ‘দরজা’ নাকি তাম্রলিপ্ত বন্দরেরও দরজা ছিল। এই সময় তাম্রলিপ্তের এক রাজা চীনদেশে দূত প্রেরণ করেছিলেন।

তাম্রলিপ্তের যে নিদর্শনটি খুব প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে তা হোল তাম্রলিপ্তের অভীষ্টদায়িনী দেবী বর্গভীমা

মন্দির। এই মন্দির নিয়ে কিম্বদন্তীর শেষ নাই। এরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে তাম্রলিপ্তের রাজা তাম্রধ্বজ একদিন কোন ধীবর পল্লীর কাছ থেকে মরা মাছ বেঁচে ওঠার খবর পেয়ে পরে অনুসন্ধান করে জলাশয়ে বর্গভীমার সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনিই দেবী মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা ও পূজাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। কালা-পাহাড় উড়িয়া পর্যন্ত অনেক মন্দির ও অনেক বিগ্রহ স্বয়ং করেছিলেন কিন্তু তাম্রলিপ্তের বর্গভীমার মন্দিরের কোন ক্ষতি করতে পারেন নি।

কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় সতীর মৃত্যুতে যখন মহাদেব পাগল হয়ে সতীর দেহকে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকেন তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহকে ৫১টি খণ্ডে বিভক্ত করেন এবং তার শেষ খণ্ড অর্থাৎ বাম গুল্ফ তাম্রলিপ্তে পতিত হয়েছিল এবং তার উপর বর্গভীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় তাম্রলিপ্ত বিভাসক নামে নামে পরিচিত ছিল।

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে লিখেছেন—

গোকুলে গোমতীনামা তাম্রলিপ্ত বর্গভীমা

উত্তর বিদিত বিশ্বকাসা ॥

‘তমলুকের ইতিহাস’ লেখক সেবানন্দ ভদ্রতী লিখেছেন, ‘মহাভারতীয় যুগের রাজা তাম্রধ্বজ হতে বর্তমান রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ পর্যন্ত একই শোণিতধারা প্রবাহিত এবং এই বংশ দেববংশ নামে খ্যাত।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান রাজবংশের উত্তরাধিকারী হলেন সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ।

আমরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব দেশের বিশেষত্ব বাড়ীর ব্যাপারে কিন্তু ততটা আগ্রহ প্রকাশ করি না। আজকের তমলুক কি সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত—এ সম্পর্কে হাটার সাহেব বলেন—Tamalities, moreover which has been satisfactorily identified with Tamluk. Tamalities represent the Sanskrit Tamralipti the modern Tamluk.

বন্ধুত্বের বন্ধন

টগর বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা চার বন্ধু। বড়ো অস্তরঙ্গ, বড়ো গভীর ওদের বন্ধুত্ব। ছটফটে একটি ছাগল-ছানা, একটি কচ্ছপ, একটি দূরন্ত ইঁদুর আর চক্চকে কালো একটি দাঁড়কাক।

সুন্দর সকাল। রোজকার মতো বিরঝিরে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার ধারে একে একে তিন বন্ধু এলো। কিন্তু ছাগল-ছানা অনেক দেরী হওয়া সত্ত্বেও এলো না। উদ্ভিগ হয়ে উঠলো তিন বন্ধু। কাক উড়ে গেলো। একটু পরেই ফিরে এসে শব্দ দিলে : সর্বনাশ! এক শিকারীর জালে ধরা পড়ে বন্ধু আমাদের ছটফট করছে।

উত্তেজিত ইঁদুর বললে : আমি ওই জাল কেটে ছিঁড়ে ফেলবো।

—খুব ভালো। দেরী নয়। এখনি চলো তাহলে। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

কাক তক্ষুণ ইঁদুরকে নিয়ে উড়ে গেলো।

ভারি চটপটে ইঁদুর। কি তাড়াতাড়িই না জালটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো। ছাগলছানা এখন মুক্ত।

কিন্তু, এ কী? কচ্ছপ সেখানে এসে উপস্থিত।

নতুন বিপদের আশঙ্কায় চণ্ডল হয়ে বাস্তব ছাগলছানা বললে : তুমি আবার এখানে কেন এলে? শিকারী যদি এখনি এসে পড়ে, আমরা তো ছুটে পালাবো। কিন্তু তুমি তো আর দৌড়তে পারো না।

কচ্ছপ আগ্রহভরে বললে : কিন্তু, বন্ধু তোমাদের এই বিপদে আমি যে স্থির থাকতে পারলাম না...

ওর কথা শেষ হতে না-হতেই হঠাৎ শিকারী এসে হাজির।

চোখের নিমেষে ছাগলছানা দিলো ছুট। কাক উড়ে গেলো আকাশে। ইঁদুর দৌড়ে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কিন্তু...

বেচার কচ্ছপ হাত-খানেকও এগোতে পারে নি, শিকারী চট করে তাকে ধরে থলের মধ্যে পুরে নিলো।

অমন হঠকপুষ্ট ছাগলটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে শিকারী একেবারে রেগে টং। মনে মনে তবু নিজেকে

সান্ত্বনা দিতে চাইলো এই ভেবে যে, যাক খালি হাতে ফিরতে হলো না। নিদেনপক্ষে কচ্ছপের মাংসও তো ছুটবে।

অপর তিন বন্ধুর তখন দুশ্চিন্তায় প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। বেচার কচ্ছপ,—তার কি হবে?

আমাদের চোখের জল আমাদের বিপন্ন বন্ধুর কোনো কাজে লাগবে না, তাকে বাঁচাতে পারবে না।—ছাগল-ছানা তৎপরতার সঙ্গে বললে : আমাদের চটপট, কাজ সারতে হবে। একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। হয়তো সেই উপায়ে আমাদের বন্ধুকে বাঁচাতে পারবো।

অপর দুই বন্ধু মতলবটা শুনে ভারি খুশী। আশায় ওদের বুক ভরে উঠলো। বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে নিশ্চয় বাঁচানো যাবে।

একটু পরেই শিকারী দেখতে পেলো, সামনের একটা ঘোপের আড়াল থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা ছোটো ছাগল বেরিয়ে এসে যেন অতি কষ্টে এগিয়ে চলছে।

শিকারী ভাবলে, এই তো সহজ শিকার পেয়ে গেছি। মহা আনন্দে সে কাঁধের থলেটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ছাগলের পিছনে ছুটে লাগলো। খোঁড়া ছাগলের চেয়ে জোরে দৌড়ে নিশ্চয়ই সে ওটাকে ধরে ফেলতে পারবে। খাসা নধর ছাগলটা।

ছাগল হলে কি হয়,—মহা তুখোড়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটেছে। ছুটেছে যেন বেশ কষ্ট করে। শিকারী ভাবছে ল্যাংড়া জানোয়ার আর কতদূর ছুটবে? তারপর? লোভে ওর চোখদুটো চক্চক করে উঠলো।

শিকারী কাছাকাছি এসে পড়াতে প্রাণভয়ে ছাগল মরি-কি-বাঁচি করে জোর ছুট দিলো।

শিকারীও নাছোড়বান্দা। ভাবছে : ওই খোঁড়া পায়ে তোর দৌড় কতদূর দেখি। শেষ অবধি তোকে থেকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তেই হবে। ততক্ষণ আমার ধৈর্য ঠিকই থাকবে।

খুঁত ছাগলছানা আর ছাগল-বুদ্ধি শিকারী বহুদূর ছুটে এসেছে। যেখানে কচ্ছপপোরা থলেটা ফেলে এসেছে, সেখান থেকে অ-নে-ক দূর.....

ইতিমধ্যে ইন্দুর সেই খেলের মুখ বাঁধা সুতুলিটা কুচিকুচি করে কেটে ফেলেছে। বন্দী কচ্ছপ ছটফট করে বোরিয়ে এসেছে বাইরে। নিরাপদ, নিশ্চিন্ত সে। আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় সে তখন কাঁপছে।

ইন্দুর বললে : আর দেবী নয় বন্ধু। শিগুগির ওই ঘোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ো।

তাই হলো।

এখন ছাগলছানা ভাবল : অনেক সময় তো কেটে গেলো। এতোক্ষণে ইন্দুর নিশ্চয়ই তার কার্যসিদ্ধি করে ফেলেছে। আরো নিশ্চিত হলো সে যখন বন্ধু কাক মাথার ওপর দিয়ে কা...কা চীৎকার করতে করতে উড়ে গেলো।

সহসা ছাগলছানা, মোটেও খোঁড়া নয়,—বরং সবল সতেজ পায়ের দৌড়ে ওপরে উঠতে লাগলো সামনের ছোটো সবুজ পাহাড়টার গা বেয়ে।

ছাগলের ভাঙা পা চোখের ওপর ভালো হয়ে যেতে দেখে শিকারী তো অবাক! হতবাক।

দেহের ক্রান্তি আর মনের হতাশা নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলো শিকারী যেখানে সে কচ্ছপ-পোরা খলেটা ফেলে রেখে গিয়েছিলো।

কি আশ্চর্য! খেলের মুখ খোলা আর কচ্ছপ নিরুদ্দেশ।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো শিকারী। ভাবতে লাগলো : পরম্পরের প্রতি বন্ধুত্বের ভালোবাসা দিয়ে কিভাবে ওই ক্ষু-জ্ঞানোয়ারগুলোও ওকে ঠকিয়ে দিলো, হারিয়ে দিলো। *

* প্রায় দুই হাজার বছর আগেকার ভারতীয় উপকথা। অজ্ঞান এমন গল্প-কাহিনীতে সহজভাবে বোঝানো হয়েছে যে “ভালো-বাসাই শক্তি ॥”

মন-কুসুম

অমর কর

(পূর্বানুবর্তি)

ভাই চন্দ্রা,

তোর চিঠি পেয়ে যে কি আনন্দ হল তা বলার নয়। তোরা যে আজো আমার মনে রেখেছিস তা জেনে মনটা আমার ভরে উঠেছে সুখে। নন্দকিশোরবাবুকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবি যে আমি তাঁর প্রস্তাবের জন্যে তাঁকে নিছক ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন তাঁর উদার মনটা নিয়ে দীর্ঘজীবী হয়ে সবার উপকারে লাগেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম করুণার প্রধান সর্ভ হল পাত্র হবে অপাত্র। যাক সে কথা।

চন্দ্রা, ভেবে দেখলাম যে আমার হাজিগড়ে আর যাওয়া চলে না। আমার মনটা যদিও তোদের আশেপাশে সবসময়

ঘুরছে। যখনই অবসর পাই তখনই মনটাকে পাঠিয়ে দিই হাজিগড় স্কুলটাকে প্রদক্ষিণ করতে। হায়রে মন!

আচ্ছা, সেই যে স্কুল কম্পাউন্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে আমি একটা আমগাছ পুতেছিলাম সেটার বোধহয় এবার ফুল আসবে। আমি তো কত অপেক্ষা করেছিলাম প্রথম ফল দেখার জন্যে। যদি—

চন্দ্রা এখানে থামল। নন্দকিশোরবাবু একমনে শুনছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল জানলা দিয়ে বাইরে দেখা লালসুরকী বিছানো রাস্তার দিকে। চন্দ্রা থামতেই ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন—কি হল থামলে কেন? আর নেই?

চন্দ্রার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। ঠোট দুটো ধরতর করে কাঁপছে। বলে—আছে, পড়ছি।

“জানিস চন্দ্রা আমার ছেলে সেদিন তোর চিঠিটা দেখে জানতে চাইল কার চিঠি। আমি কি বললাম জানিস? আমি বললাম—তার একটা মাসী আছে, তার নাম চন্দ্রা। সে থাকে হাজিগড় বলে একটা জায়গায়। সেখানে থেকে লিখেছে চিঠি—তোর কথাও আছে। ছেলে জানতে চাইল হাজিগড় কতদূরে। আমি বলেছি হাজিগড় অনেক অনেক দূরে। বহুদূরে, পৃথিবীর বাইরে। ছেলে আবার জিজ্ঞাস করে—সেখানে কি করে যাওয়া যায়? হেসে বলি—সেখানে যাওয়া যায় না, যাওয়ার সব রাস্তাগুলো হারিয়ে গেছে। সেখানে—”

চন্দ্রা আবার থামল।

নন্দকিশোরবাবু বললেন—কি হোল আবার থামলে কেন?

চন্দ্রা আর থাকতে পারল না। চিঠিটা ফেলে দিয়ে দুহাত মুখে চেপে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কান্নাজড়ানো স্বরে বলে—আমি আর পড়তে পারছি না স্যার।

নন্দকিশোরবাবু বললেন—থাক আর পড়তে হবে না তোমায়।

(৫)

নীহারকণা অনেকখন দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—তুমি যে এখানে এসে হাজির হবে আমি ভাবতে পারিনি।

দিব্যেন্দু বলে—ভাবতে তো অনেককিছুই তুমি পারনি, তাবলে কিছু কি আটকে আছে? তোমার ছেলেকে দেখছি না?

—সে এখানে নেই। বৌমাকে রাখতে গেছে তার বাপের বাড়ী। কিন্তু তুমি এখানে এলে কেন বললে না তো?

দিব্যেন্দু হেসে বলে—আম্বাজ কর না। নিশ্চয়ই তোমার এখানে থাকতে আসিনি। তুমি তো খুব ধুরন্ধর লোক, ওবু চাকরীটা রাখতে পারলে না। শোন আমি রিটার্নার করে গ্র্যাডুয়টী আর প্রভিডেণ্ড ফণ্ড মিলিয়ে পেরেছি ছাপান্ন হাজার আর কলকাতার বাড়ীটা বিক্রী করে দুলাখ। আমার টাকার অভাব নেই।

নীহারকণা বলে—একথা আমার শুনিয়ে তোমার লাভ? তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আর তোমার টাকাতোও আমার ক্ষোভ নেই।

সম্পর্ক যে নেই তা আমি জানি নীহারকণা। তোমার কাছে আমি মৃত। তুমি ভিত্তোসাঁ নও—বিধবা মহিলা মাত্র। হাজিগড়ের চাকরী তো খতম হয়ে গেছে। তোমার ছেলের এখানে চাকরী পাওয়াটা না হয় ধরলুম কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু কলকাতার ভাল চাকরীটা ছেড়ে হাজিগড়ে তোমার চাকরী নেওয়াটা নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয়। অনেকদিন ধরে সুযোগ খুঁজিছিলে। আমার ওপর গোয়েন্দাগিরির নেশা তুমি ছাড়তে পারনি, তাই না?

নীহারকণা বলে—তুমি একথা ভুলে যাচ্ছ যে আমি যখন গেছি হাজিগড়ে চাকরী নিয়ে, তুমি তার আগে ওখান থেকে রিটার্নার করে চলে গেছ। সঙ্গে নিয়ে গেছ সুছন্দাকে। তোমার লজ্জা করল না?

দিব্যেন্দু বলে—তোমার যদি লজ্জা বলে কোন পদার্থ না থাকে, তবে আমি পুরুষমানুষ আমার থাকবে কেমন করে। এখন বোধহয় ভুলে গেছ মাণিকতলার তারক ঘটককে। ছেলেকে যখন ফুলে ভর্তি করেছিলে তখন তার নামটা জয়ন্ত রাহা না রেখে জয়ন্ত ঘটক রাখলে সব দিক দিয়ে ভাল হত।

—তুমি এত নীচে নেমে গেছ। এমন নোংরা কথা বলতে পারছ কোন্ সাহসে? এখন হাতে মোটা টাকা রয়েছে তাই গরম দেখাচ্ছ। সুছন্দাকে তুমি খুন করেছ। তার আগে যদিও অনেকদিনের ঘটনা—রামদুলাল সরকার স্ট্রীটের লতিকা সাধুকেও খুন করেছিলে। এমন ভাবে আস্তে আস্তে আর্সেনিক দিয়ে—যা তোমাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখেছিল। তুমি অস্বীকার করতে পার?

দিব্যেন্দু বলে—তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।

নীহারকণা রাগে ফুলতে থাকে। বলে—প্রমাণ না থাকলে বলি না। সব প্রমাণ আমার হাতে। নিশ্চয়ই জান খুনের মামলা তামাদি হয় না।

দিব্যেন্দু ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরায় একটা। বলে—মামলাই হল না, তার আবার তামাদি। তা তুমি সারাজীবন গোয়েন্দাগিরি করে কি পেলো?

—এখনও পাইনি। তোমার শাস্তি হলে আমার পাওনা সম্পূর্ণ হবে। তুমি অনেকভাবে আমার জ্বালিয়েছ। দুর্নাম দিয়ে, মামলা মকদ্দমা করে হয়রান করেছ নানানভাবে। শেষে ডিভোর্স করে তোমার যোলকলা পূর্ণ হয়েছে। তোমার কি লাভ হল বলতে পার? সুহৃদ্যাকে নিয়ে কেলেঙ্কারী, তারপর তাকে শেষ করলে। সুনন্দা এখন কোথায়, আর তোমার সেই ছেলে?

দিব্যেন্দু বলে—সে খোঁজে তোমার দরকার নেই। শোন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। তুমি আর চাকরী করবে কিনা জানিনা। তোমার ছেলে যখন ভাল রোজগার করছে তখন তোমার কিছু না করলেও চলবে। তোমাকে আমি একলাখ টাকা দিচ্ছি। তোমার যথেষ্ট ব্যয়স হয়েছে, কাশী বৃন্দাবন যেখানে খুশী থাক গিয়ে। মোট কথা এখানে এই এই জাহানাবাদে বা হাজিগড়ে তুমি কোনদিন আসতে পাবে না।

নীহারকণা বলে—প্রধান সাক্ষীকে সরিয়ে দিতে চাও? না, তোমার প্রলোভনে আমি রাজী নই। সুনন্দা কোথায়? তাকেও কি শেষ করেছ?

—বলব না। তবে আমার প্রস্তাবে রাজী হলেই ভাল করতে।

—রাজী তো নই বললাম। এবার কি করবে?

—অন্য রাস্তা দেখতে হবে।

—আমায় খুন করবে?

—আমি পেশাদার খুনী নই নীহারকণা। সে যাক তারক ঘটক ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা না গেলে বোধহয় তাকেই বিয়ে করতে, তাই না?

—তারক ঘটকের সঙ্গে আমার কোন খারাপ সম্পর্ক ছিল না। সে ছিল একসময়ে তোমার বাড়ীর ভাড়াটে। তোমার নানান অত্যাচারে আমি যখন বিরত আর অতিষ্ঠ সে তখন সত্যিকারের বন্ধুর মত অনেক সাহায্য করেছিল। সেটাই তোমার গায়ের জ্বালা।

দিব্যেন্দু সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। বলে—মানুষ তার চোখদুটো দিয়ে সব কিছু দেখতে পায়, শুধু নিজেকে ছাড়া। তাই যা বলে গেলে সব শুলে গেলুম।

নীহারকণা বলে—আমি বলি তুমিই বরং দূরে কোথাও চলে যাও। এই জীবনসাম্রাজ্যে জেলে ঢুকবে, সেখান থেকে

বেরোবার আগে তোমার মৃত্যু ঘটে যাবে জেলের মধ্যে। সেটা কি তোমার সুখকর মনে হয়?

দিব্যেন্দু রেগে ওঠে। বলে—তুমি আমার ভয় দেখাতে চাও। আমি দিব্যেন্দু রাহা, জীবনে যখন যা চেয়েছি তা পেয়েছি। কাউকে কোনদিন ভয় করে চলিনি, কোথাও পরাজয় বরণ করিনি—একমাত্র সুনন্দা ছাড়া। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

নীহারকণা বলে—সুনন্দা কোথায় আছে বললে না তো?

দিব্যেন্দু দরজার কাছে এগিয়ে যায়। একটু থামে। মুখ না ফিরিয়ে বলে—একমাস আগেও দেবাদুর্নে ছিল। এখন কোথায় জানি না। শুনছি তার কঠিন ব্যাধি হয়েছে।

—ছেলেটা? তোমার অপকর্মের সাক্ষী?

—জানি না।

(৬)

ঘরে মণিরাম পাণ্ডে, নন্দকিশোর বাবু আর চন্দ্রা। সুনন্দার বিষয়েই আলোচনা চলছিল। চন্দ্রা একটা চিঠি পেয়েছে সুনন্দার—কদিন হল। তাতে সে লিখেছে যে ছেলেকে নিয়ে হাজিগড় আসছে। তার শরীর খুব খারাপ, তাই সকলের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। তাছাড়া ছেলেটারও একটা ব্যবস্থা দরকার।

প্রেসিডেন্ট মণিরামবাবু বললেন—সুনন্দার শরীর এত কি খারাপ বুঝলাম না। ছেলেটার ব্যবস্থা একটা কিছু করতে চায়। সে কি ছেলের জন্যে কোন অসুবিধেতে পড়েছে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নন্দকিশোরবাবু। চন্দ্রা তোমার কি মনে হয়?

চন্দ্রা বলে—চিঠিটা থেকে সেরকম কিছু পরিস্কার হবি পাচ্ছি না।

নন্দকিশোর বলেন—আমার মনে হয় কোথাও চাকরী পেয়েছে কিন্তু ছেলের দেখাশোনা নিয়ে সমস্যা পড়েছে।

মণিরাম বাবু বলেন—নাঃ, আমরা কেউই কিছু ঠিক যে কি তা আন্দাজ করতে পারছি না। তবে চাকরী করতে হলে অন্য কোথাও যাবার দরকারটা কি। এখানে যে অনাথ শিশুদের জন্যে আশ্রম খুলতে চলেছি তার সুপারিনটেন্ডেন্ট করে দোব সুনন্দাকে। ছেলে নিয়ে হাজিগড়েই থাকবে।

নন্দকিশোর বাবু বলেন—ছেলে সঙ্গে থাকায় যদি কিছু কথা ওঠে? এমনি তো গুজবের অন্ত নেই।

—দুনিয়ান দেখলাম অনেক নন্দবাবু। লোকের কথায় আমি অন্ততঃ কান দিই না, আপনি জানেন। বাইরে মিউনিসিপ্যালিটি আর স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু বাড়ীতে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ। একমাত্র ছেলে—সেও থাকে ভূপালে ছেলে বউ নিয়ে। দুই-তিন বছর বাদে বাদে দিন-কয়েকের জন্যে সাক্ষী দিতে আসে। আমার স্ত্রী তো বাতে পঙ্গু হয়ে সর্বদা শূন্যে বসে থাকেন। রোগের যাতনায় সদাই বিরক্ত। আমার তো মেয়ে নেই তাই সুনন্দা যদি তার ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে থাকে তবে তো আমি বেঁচে যাই। ওদিকে আশ্রমটাও দেখাশোনা করল। আমি আর কতদিন বাঁচব কিছু শেষ দিনগুলোতে আর অতবড় বাড়ীটায় একা থাকতে হয় না।

চন্দ্রা বলে—একটা কথা বলব স্যার যদি কিছু মনে না করেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বল। আমি কিছু মনে করব না। এটা স্কুল কর্মিটির মিটিং নয় চন্দ্রা।

চন্দ্রা বলে—আপনাকে তো আমরা সেকালের নীতি-বাগিশ লোক বলেই জানি। আপনি এমন আধুনিক মন পেলেন কেমন করে?

মণিরাম বাবু দন্তহীন মুখে হেসে উঠলেন সশব্দে। চন্দ্রার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন—বেটীর কিছু নজর এড়ায় না দেখছি।

নন্দকিশোর বাবু বলেন—কথাটা আমার মনেও এসেছিল কিন্তু সাহস পাইনি জিজ্ঞেস করতে।

—আসলে কি জানেন নন্দবাবু, মনটা যদি সংস্কার মুক্ত থাকে তবে ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাটা আস্তে থাকে। এক্ষেত্রে যদি সুহৃদ্য হত তবে আশ্রয় বা চাকরী দেওয়া তো দূরের কথা—আমি নাম উচ্চারণ করতে ইচ্ছুক নই।

বাইরে গাড়ী দাঁড়ানোর আওয়াজ শোনা গেল। মণিরাম বাবু বললেন—নন্দবাবু আপনার বাড়ীর সামনে টাঙ্গা থামার শব্দ পেলাম। দেখুন আপনার মেয়ে এসেছে বোধহয়।

—বিমলার তো পরকের সময় আসবার কথা। চন্দ্রা জানলা দিয়ে দেখতে কে এল।

চন্দ্রা জানলার কাছে এগিয়ে যায়। তখনই মুখ ফিরিয়ে বলে—সুনন্দাদি এসেছে।

ছুটে বাইরে বেরিয়ে যায় চন্দ্রা।

খানিক পরে আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে সুনন্দা শীর্ণ জীর্ণ দেহ নিয়ে। মণিরাম বাবু ও নন্দকিশোর বাবুকে প্রণাম করে। তারপর এলো চন্দ্রা—একটি ফুটফুটো ছেলের হাত ধরে। নন্দকিশোর বাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন—ইস, তোমার কি চেহারা হয়েছে সুনন্দা। চন্দ্রা—গাড়োয়ান কে বল জিনিসপত্র ভেতরে দিয়ে যেতে।

চন্দ্রা বলে—জিনিসপত্র গাড়ী থেকে নামানো হবে না।

মণিরামবাবু বলেন—কেন, কেন?

চন্দ্রা হেসে বলে—একটু আগেই তো আপনি বললেন যে সুনন্দাদি আপনার বাড়ীতে থাকবেন। এর মধ্যে ভুলে গেলেন?

মণিরামবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। বলেন—তোমারই জিৎ চন্দ্রা। তবে গাড়োয়ান আবার ভাগবে না তো?

চন্দ্রা হেসে বলে—আমাদের ভগলু সাউর গাড়ী, চিন্তার কিছু নেই।

আচ্ছা সুনন্দাদি, তোমার শরীর খারাপ লিখেছিলে কিন্তু এত যে খারাপ ভাবতে পারিনি। কি হয়েছে তোমার?

সুনন্দা চৌকির একাধারে বসল। বলে—এবার চলে যাবার সময় হয়েছে। দিন সব গোনাগুনাতি হয়ে আছে। হাজিগড়কে যদি আর দেখতে না পাই তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। ছেলেটাকে কিছু খেতে দে—অনেকখন খায়নি।

নন্দকিশোরবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ীর অন্দরে চলে যান।

মণিরামবাবু এবার উঠে দাঁড়ান। বলে আমি বাড়ী যাচ্ছি চন্দ্রা। সুনন্দা তুমি খানিক বিশ্রাম নিয়ে আমার ওখানে এসো চন্দ্রার সঙ্গে। আমি আগেই যাই, গিছীকে আবার খবরটা দিতে হবে তো। তিনি তো বিশ্বাসই করবেন না যে তুমি হাজিগড়ে এসেছ—তারওপর আমার বাড়ীতে থাকবে। আমি চলি, চন্দ্রার কাছে সব জেনে নিও।

মণিরামবাবু চলে যান। চন্দ্রা সুনন্দার দিকে তাকিয়ে

ধাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—অসুখটা কি? চিকিৎসা পত্তর কিছু করিয়েছ?

সুনন্দা আস্তে আস্তে বলে—অসুখটা ক্যানসার। কথা বলতে কষ্ট হয়। কিছুদিন পাটনাতে ছিলাম বিমলার ওখানে। ওর স্বামীর এক ডাক্তার বন্ধু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করালেন। নানান রকম পরীক্ষা। তারপর বললেন যে দীর্ঘ চিকিৎসা চাই এবং অবিলম্বে তা আরম্ভ করতে হবে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। সব চেয়ে ভাল হয় কলকাতায় গেলে।

চন্দ্রা বলে—তারপর?

—তারপর আর নেই। বুঝতে পারলাম চিকিৎসা করালেও কিছু হবে না। গোনাগুনাতি দিনগুলো নিয়ে আমি হাজিগড়ে থাকতে চাই।

চন্দ্রা বলে—সুনন্দাদি তুমি হতাশ হচ্ছ কেন? ঠিকমত চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই সেরে যাবে। তোমার ভাল হয়ে ওঠার জন্যে আমরা সবাই চেষ্টা করব। তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাব, সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা করাবো। তোমায় আমরা কিছুতেই মরতে দোব না।

—মরতে কি আমারই ইচ্ছে করছে? তোদের ছেড়ে, হাজিগড় ছেড়ে এতদিন কি করে যে ছিলাম। ঐ ছেলে হয়েছে আমার পায়ের বোড়ি।

চন্দ্রা বলে—নন্দাদি তোমার ছেলে ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে। একেবারে সুহৃদ্যদির মুখ বসানো।

—হ্যাঁ, আর দিদির গায়ের গোলাপী রংটাও পেয়েছে। আমার মত কালো কুচ্ছন্ন নয়। ওকে নিয়েই আমার এখন ভাবনা। কার কাছে যে রেষে যাই। কে দেখবে ওকে এই চিন্তা নিয়ে মরব কেমন করে?

চন্দ্রা বলে—তোমার ছেলের ভার আমি নিলাম। এখন ওসব কথা থাক। চল ভেতরে যাই, তোমার কিছু খাওয়া দরকার।

—আমি তো খেতে পারি না, কষ্ট হয়—গলায় লাগে।

—একটু দুধ তো খেতে পারবে। চল ভেতরে যাই।

—না থাক, কিছু ভাল লাগছে না। তুই অন্য কথা বল।

চন্দ্রা বলে—জানো সুনন্দাদি, তুমি স্কুল কম্পাউণ্ডে যে আমগাছটা পুতেছিলে এবার তাতে অঙ্কুর আম ফলেছিল। সেই যে তুমি একবার জানতে চেয়েছিলে।

সুনন্দা ম্লান হেসে বলে—পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলি না কাঁচা অবস্থায় সব শেষ করেছিস?

চন্দ্রা হেসে বলে—গরমের ছুটির পর মেয়েরাই সব শেষ করল, আমি খেয়ে দেখিনি। গোটা কতক নিয়ে তোমার জন্যে আচার করে রেখেছি। ভেবেছিলুম যদি কখনো দেখা হয় তবে দুজনে বসে গল্প করতে করতে খাব। আনব? এই ছুটে যাব আর আসব। তুমি থাকবে?

—আমি তো খেতে পারবো না, কষ্ট হবে—গলা জ্বালা করবে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।

নন্দাকিশোরবাবু সুনন্দার ছেলেকে নিয়ে ঘরে এলেন। হাতে একটা থালায় কিছু মিষ্টি আর একটা গেলাসে দুধ। সুনন্দার সামনে চৌকিতে রেখে বলেন—খাও।

সুনন্দা বলে আপনি নিজে হাতে এসব কেন আনলেন? চন্দ্রা তো আনতে পারতো, আর না হয় আমি যেভাম ভেতরে।

নন্দাকিশোর বাবু বলেন—আমার বিমলা হলে এমন কথা বলত না। সুনন্দা কেঁদে ফেলে। বলে আমায় মাপ করবেন। আমার মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলে ফেলি।

ঠিক আছে তুমি খেয়ে নাও। চন্দ্রা, টাঙ্গাওয়া আছে তো?

চন্দ্রা বলে—প্রেসিডেন্ট তো ঐ টাঙ্গায় গেলেন সুনন্দাদির মালপত্র সমেত। গাড়ী ফেরবার সময় হয়েছে।

সুনন্দা বলে—আমি প্রেসিডেন্টের বাড়ী থাকব, তা হয়না। চন্দ্রা তোর ওখানে বরং—

নন্দাকিশোর বাবু বলেন—তুমি এখন স্কুলের কেউ নও, কাজেই এখানে প্রেসিডেন্ট কথাটা অবাস্তব। তোমার জন্যে মণিরামবাবু আশা করে আছেন। না গেলে ভীষণ দুঃখ পাবেন। মানুষটাকে তো জান, দীর্ঘদিন দেখেছ তাঁকে। তাঁর মেহমততার তুলনা নেই। তুমি আপত্তি কোরো না। টাঙ্গা আসার শব্দ শোনা গেল।

চন্দ্রা ছেলেটার হাত ধরে সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলে চল সুনন্দাদি গাড়ী এসে গেছে।

—হ্যাঁ, যাই।

নন্দাকিশোর বাবুকে প্রণাম করে বাইরে গিয়ে সুনন্দা গাড়ীতে ওঠে ওদের সঙ্গে। গাড়ী ছেড়ে দেয়।

নন্দাকিশোর বাবু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখলেন ওদের চলে যাওয়া। তারপর মনে হল চশমার কাঁচটা মোছা দরকার এখন।

কলকাতা ষ্টীল

(পূর্বানুবর্তি)

অমিয়া ভট্টাচার্য

(১২)

সোসাল ওয়ার্কের জন্য এবার পুষ্পিতাদেবী পুরস্কার পেলেন। সেই উপলক্ষ্যে কালীঘাটের বাড়ীতে বিশেষ উৎসব। পুষ্পিতাদেবীর অনারে পাটি দিচ্ছেন ডাঃ যামিনীকান্ত লাহিড়ী। এই উৎসবে স্বতন্ত্রভাবে হাত মিলিয়েছে বেশ কয়েকটি সমিতি ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এই সম্মিলিত অনুষ্ঠানে অকাতরে বায় করছেন ডাঃ যামিনীকান্ত। যদিও ডাঃ যামিনীকান্ত আর পুষ্পিতাদেবীকে বাইরে থেকে মনে হয় অতিবাস্ত ও সদা হাস্যময়, তবু এঁদের আর একটা দিক যে একেবারে শূন্য তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। দুজনেই দুদিকে কাজে ডুবে থাকেন। একমাত্র রাতে ডিনার টেবিলে ছাড়া কখনো ওদের দেখাও হয় না। যেদিন কারো বাইরে কল বা মিটিং থাকে সেদিন তাও হয় না। আবার প্রতিদিন সকালে প্রথানুযায়ী শূভেচ্ছা বিনিময় দিয়ে দিনের সূরু হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুজনেরই সব দিক পূর্ণ ছিল, হয়ত একটু অতি মাত্রায়। কোন নাটকীয় ব্যাপার ঘটিলে কখনো কোন প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কোন ছেদ নেই। কালক্রমে হয়ত দুজনে দুদিকে ঝুঁকতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। বোধ হয় তাঁরা উভয়েই মনের দিক থেকে পরিপূর্ণ। কালের হাওয়ায় ভেসে যান নি। তাই কোন অশান্তি এঁদের স্পর্শ করেনি। বরং উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। আজ পুষ্পিতাদেবী সার্থকতার কেন্দ্র বিন্দুতে পৌঁছলেন। উভয়েরই মনে হল এই পুরস্কারই তাঁদের সন্তান।

দীর্ঘ দিন ধরে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পুষ্পিতাদেবী সোসাল ওয়ার্ক করে চলেছেন। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সংগ্রহ তাঁর প্রচুর। কাঁথা সংগ্রহ করেছেন অনেক। এর মধ্যে কয়েকটিতে আছে খাঁটি শিল্পকলার নিদর্শন। পোড়ামাটির পুতুল, ঘোড়া ও নানা আকারের খেলনা যোগাড় করেছেন। কাঠের কড়ি-বরগা, দরজার খিলান এ সবও আছে।

মাদুর, পাটি, খেজুর পাতা, হোগলা, ঘোড়া-হাতীর দাঁত, বাঘের নখ, চামড়া, হরিণের শিং, চামড়া-ছোট ছোট টুকরো আয়না অথবা কাঁচ দিয়ে তৈরী ফ্রেম, গালা, কড়ি, ঝিনুক সবেরই কাজ আছে। তারপর কাগজের মণ্ড ও নানা রকমের ছাপ যা দিয়ে কাপড়ে ছাপ তোলা চলে। মাটির ও কাঠের তৈরী নক্সা, বা সন্দেশের ছাঁচ। তাঁর বাড়ীর একটা অংশ এসব জিনিষে অনেকদিন থেকেই পূর্ণ।

পুষ্পিতাদেবী ভারতের সব রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে এসব সংগ্রহ করেছেন। অসংখ্য বন্য গাছের ফল-ফুল ও পাতা এনেছেন, যা দিয়ে চমৎকার স্থায়ী শুকনো ফুলের ডেকোরেশন হয়। তিনি নিজে সেই ডেকোরেশন শিখেছেন এখন অনেকে শেখাচ্ছেন। চামড়ার কাজ, পুঁতির কাজ, তারের কাজ তাঁর মহিলা সমিতিতে মেয়েদের শেখান হয়। যা শিখে মেয়েরা নিজে উপার্জন করতে পারে। মোটকথা পুষ্পিতাদেবী এত বেশী নিজেকে কাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন যে এই সব সমিতিগুলির মধ্যে তাঁর প্রাণ স্পন্দন বাজে।

তবুও পরিবারের প্রতিটি কাজে তাঁর স্পর্শ থাকে। এক এক সময় মনে হয় কি করে এত সংগঠন মূলক কাজ সম্ভব হল। চন্দ্রমাদেবীর সঙ্গে প্রতিটি কাজে পুষ্পিতার অবদান অনস্বীকার্য। অনন্যা ও অনসূয়া আর্কিটর সঙ্গে কত কাজ শিখেছে। চন্দ্রমার ওপর বাড়ীর দায়িত্ব প্রতিপালনের ভার বেশী থেকেছে। আবার বাড়ীতে যখন কোন সভা-সমিতি হয়েছে তখন তার নেতৃত্ব চন্দ্রমাই করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুষ্পিতা ঘরে বাইরে সর্বত্রই সহায়তা পেয়েছেন। কোনদিন তাঁকে সংগঠন মূলক কাজে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। নিঃসন্তান যামিনীকান্ত ও পুষ্পিতার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবার জন্য ভবানীকান্তর সহায়তা ও প্রয়াস আছে অপারিসীম। কালীঘাটের বাড়ীতে কিছুদিন ধরেই স্বতন্ত্রভাবে আনন্দের বার্তা পাওয়া যাচ্ছে।

বাড়ীতে পাটি। মারিয়া ভারী খুসী। পাটিটা দুরকম। প্রথম দিন কিছু সজ্জাস্ত ও উচ্চপদস্থ পুরুষ ও মহিলাদের

ডিনারে ডাকা হয়েছে। এদের মধ্যে বন্ধু বান্ধব আর আত্মীয় স্বজনও আছেন। পার্টি এ বাড়ীতে নতুন নয়, প্রায়ই হয়। এটা পুষ্পিতাদেবীর অনারের পার্টি। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ জন হবে। দিল্লী থেকে অশ্বিণ আর অনন্যা এসেছে তিন দিনের জন্য। যামিনীর কাজ আছে, আসতে পারেনি। তবে সে নিজেই ফুরসুত করে একবার আসবে জানিয়েছে। খবরটা বিজ্ঞান আর অনন্যাকে ওয়ারে জানান হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওদের উত্তর এসে গেছে। অনসূয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তবে ওদের দেশে আসতে দেরী আছে। অনন্যা আর অনসূয়ার কাছে আর্কিটর স্থান মায়ের চেয়ে কম নয়। কারণ আর্কিটর সঙ্গেই ওরা নানা যায়গায় ঘুরেছে। অনেক সোস্যাল ওয়ার্ক করে প্রশংসাপত্রও পেয়েছে।

এ পার্টিতে কোন গান বাজনা বা সভা সমিতি নেই। এটা শুধু ডিনার পার্টি। মারিয়া অনেক রকম ন্যাপবিনের ফুল করেছে। একএক টেবিলে একএক রকম সেট ও সেই রং মিলিয়ে ডেকোরেশন। হলটা চমৎকার করে সাজিয়েছে। ওয়াল থেকে ফ্লোর পর্যন্ত চকচক করছে। পরদাগুলির গায় ট্যাসেল ঝুলছে যাতে হাওয়ায় না গড়ে। আজ আর মারিয়া পাশের বাড়ীর ঠাকুমাকে দেখে চোখ কোচকাল না। কারণ ভারতীদেবী আর সহসা এই পার্টির প্রধান অঙ্গ। ভারতীর আজই নেমতন্ন। সহসাও বাড়ীরই মেয়ে। সহসার বিশ্লেণ্ড এসে গেল। ওকেও এই উপলক্ষ্যে আইবুড়ো ভাত খাইয়ে দাও, পুষ্পিতা বললেন।

কাল সভা সমিতির সেক্রেটারী ও প্রতিষ্ঠানের মেম্বারদের পার্টি। কালকের সব দায়িত্বই ভারতীর। কারণ ভারতীদেবী পুষ্পিতার মহিলা সমিতির সেক্রেটারী।

এই পুরস্কার প্রাপ্তির স্বীকৃতিতে যামিনীকান্ত ও পুষ্পিতা স্থির করেছেন তাঁদের বসন্তবাড়ীর ওপর তলায় একটা মিউজিয়াম ও নীচের তলায় একটা অবৈতনিক স্কুল করবেন। বাড়ীটা বেশ বড়। ওপরের একটা অংশ মিউজিয়াম ও অপর অংশে তাঁরা বাস করবেন। মাঝখানে যাতায়াতের জন্য একটা দরজা থাকবে। অসুবিধে একটু হলেও জীবনের শেষের দিকে সব সংগ্রহ জনহিতকর কাছে দান করে দেবেন।

কালীঘাটের বাড়ীর যামিনীকান্তের অংশে বিরাট পরিবর্তন হবে। এক তলায় গ্যারেজ ও সিঁড়ির দিকে একটা বড় ঘর ছাড়া সম্পূর্ণ অংশে মেয়েদের অবৈতনিক স্কুল হবে। প্রারম্ভিক ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত। ওপর তলায় নিজেদের অংশ-বাদে পুষ্পিতার নিজস্ব মিউজিয়াম। তিন তলার কোন পরিবর্তন হবে না। এজন্য বাড়ীটাতে বেশ অদলবদল হবে। স্কুলের জন্য একটা গেট হবে। ঐদিক দিয়েই মিউজিয়ামের জন্য দোতলার সিঁড়ি হবে।

এ কাজে মনস্থির করার আগে চন্দ্রমা-পুষ্পিতা-ভবানীকান্ত-যামিনীকান্ত অনেক চিন্তা করেছেন। অবশেষে তাঁরা সবাই একমত হয়েছেন। বাড়ীতে পরিবর্তন হলেও নিজেদের প্রাইভেসিতে যাতে কোন অসুবিধে বা বিঘ্ন না ঘটে সেটা দেখে শুনাই করেছেন। এই দানপত্রের ট্রাস্ট থাকবেন কয়েকজন অবসর প্রাপ্ত বিচারক।

আসল কথা পুষ্পিতা ও যামিনীকান্তের কাজই বিশ্রাম। ভাস্করের কোন অবসর নেই। তাঁরা দুজনেই এখন বুঝতে পাচ্ছেন বয়স আরো বাড়বে তখন শরীর অবসন্ন হবে সুতরাং এখনই সব ব্যবস্থা করা উচিত। এ পথেই কাজে উৎসাহ আর ইচ্ছা তাঁদের পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দীর্ঘদিনের নিরলস কাজের মধ্যে আজ সেই স্বীকৃতি পুষ্পিতাদেবীকে এনে দিয়েছে। নিজেকে তাঁর চরিতার্থ মনে হচ্ছে। সেই সম্মানের অংশ গ্রহণ করে যামিনীকান্ত পরিতৃপ্ত। পরিতৃপ্ত সমস্ত পরিবারটাই। ভবানীকান্ত চন্দ্রমাও পরিতৃপ্ত কারণ সকলের একাগ্র সাধনা না থাকলে এ সম্ভব হত না।

(১৩)

মহীয়ান ইঁওয়ায় পোস্টেড হয়েছে। ওর হেড কোয়ার্টার বোম্বে। ওদের কাঁকুড়গাছির বাড়ীতে স্থানাভাব। এজন্য মহীয়ান জয়িতাদের বাড়ীতেই উঠেছে। শৈলর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। সবাই খুশী। এ বাড়ীতে এক মাত্র ডালি ছাড়া সবাইর উপার্জন ভাল। শেষমেশ শৈলও ভাল স্যালারিতে পোস্টেড হয়েছে। সুতরাং বাড়ীতে কেনাকাটার ধুম পড়েছে। মহীয়ান বিয়ের জন্য অনেক জিনিষ বাইরে থেকে এনেছে। সব জিনিষ যে যার বেছে

নিয়চ্ছে। এর মধ্যে থেকে বিয়েতে কে কি দেবে তাও ঠিক করেছে। কসমেটিকস সব বাইরের। ঘড়ি-টেপেরেকডার-ক্যামেরা-ছাতা ক্রকারিজ-মিস্ত্রি এসব ত আছেই। এক একজন এক একটা দেবে। উলেনস রাস্কেটস-বেডসীট সব বাইরের। ডাইরা সবাই মিলে শৈলকে সুট দেবে। জুতোও এনেছে বাইরে থেকে। সহসার ফ্যান্সি চটী ও একজোড়া টপহিল। শৈলর ভাল সু। বাড়ীতে হাসাহাসির ধুম চলছে। শ্রমণ আর তিথিও এসে দেখে গেছে। যে মাসীমা কোনকালে আসবার সময় পান না তিনিও কবার এলেন।

মেয়েদের বাড়ী থেকে ফানিচার দেবে। যে রকম দিনকাল তাতে অত পরিশ্রম করার ক্ষমতা এখন কারো নেই। একদিনেই আশীর্বাদ, গায় হলুদ আর বিয়েটা দিয়ে দাও, সবাই বলছে। আগের দিনটাতে কজন আত্মীয় স্বজন আসবে, স্ত্রী আচার ইত্যাদি যা প্রয়োজন ওঁরাই করাবেন। আত্মীয় বলতে আঁচতার মা আছেন। উনি সখা সব চালিয়ে নেবেন। আর পাশের বাড়ীর মাসীমা আছেন নিজের লোকের মত। এর সঙ্গে বড়বোঁ আঁচতা, মেজ বোঁ ডালি। এই ত পাঁচ জন হয়ে গেল।

ক্যাটারারস এর হাতে বিয়ের দিনের ভার দেয়া হলেও, একজন ঠাকুরকে দুদিন আগেই আসতে হবে। ছাদে ঢালা রান্নার ব্যবস্থা এই কদিনের। পাড়ার মধ্যে তিথি শ্রমণ আর মাসীমা মেসমশাইর দুতিন দিনের নেমতন্ন। ওঁরা বাড়ীর লোকের মতই। মেসমশাইর খাবারটা পাঠিয়ে দেয়া হবে। এদিকে শৈলর বিয়ের আয়োজনে মাসীমা খুব খুসী। কতবার আসছেন—কত রকম সেকাল একালের কথা তুলে গল্প করছেন। কাল বিয়ে। সকালে ঠাকুর এসে ছাদের ওপর রান্নার যোগাড় করছে। ডালির হাতেই সব, তাই ডালির ছোটোছুটীই বেশী। চিক্কা এর ওর সকলের কোলেই ঘুরছে।

আজ আত্মীয় স্বজন আর নিজেদের খাওয়া, তাই বাজার সেই অনুযায়ী এসেছে। মাছটা বেশ বড়। মাংসও আছে। কি কি পদ হবে মাছ দিয়ে, ঠাকুর জানতে চাইল। কড়াতে তেল গরম হাচ্ছিল। ঠাকুর অসাবধানে নামাতে গিয়ে তেল উছলে বেশ খানিকটা

ডালির পায় পড়ে গেল। ভয়ঙ্কর জ্বালায় ডালি আর্তনাদ করে উঠল। খানিকটা দূরে পিপলী বসে মসলা বাটীছিল। ও মাগো, বৌদিকে মেরে ফেললো গো, বলে সঙ্গে সঙ্গে সে তারদ্বরে চিংকার করে উঠল। আর বাড়ী সুদ্ধ সবাই কি হল, কি হল, বলে যে যেখানে ছিল ছাদে উঠে দেখে এই কাণ্ড! ডালি ছাদের ওপর কাটা পাঁতার মত যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পিপলী চিংকার করে কাঁদছে। হতভম্ব হয়ে ঠাকুররা এ ওকে দোষ দিচ্ছে। ডালির পায়ের চামড়া পুড়ে একদম সাদা দেখা যাচ্ছে। রইল সব পড়ে। পুলক ভৎক্ষণাৎ ট্যান্সি এনে ডালিকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। চিক্কাকে আঁপতা কোলে নিল।

সারা বাড়ী একেবারে থমথমে। কাল বিয়ে। মাসীমা এসেছিলেন বরণ কুলো সাজাতে। তিনি আঁপতার মার কানে কানে বললেন, আঁদখ্যোতা! আমাদের অন্তর কত হয়েছে। ডালির মা বাবা উদভ্রান্ত। আঁপতার এখন অনেক দায়িত্ব। ও বুদ্ধি করে ওঁদের নিজের ঘরে নিয়ে বসিয়ে সামাল দিল। ডালির মা বাবাকে কি প্রবোধ দেয়া যায়।

এদিকে মাসীমার কাণ্ড দেখে অবাক হতে হয়। যার জন্য তাঁর এ বাড়ীতে দুদিন নেমতন্ন, এত যে তাঁর স্নেহের পাত্রী ডালি, তিনি সে সব ভুলে আঁপতার মার কান ভাঙাতে বসলেন। আঁপতার মাও কম যান কিসে! দুজনে ফুস্ফুস-গুজ্গুজ্ আর হাসাহাসি। মহীয়ান জয়িতা সবাই ছুটো ছুটি করতে লাগল। সকলের ভালবাসার শৈল কিছু খুব ঘুষড়ে পড়ল।

ঘণ্টা খানেক বাদে পা ড্রেস করে পুলক ডালিকে বাড়ী নিয়ে এল। ডালিকে ইনজেকশন দিয়েছে। আজকের দিনটা হরিবে বিষাদ হল।

ডালিরা ফেরা মাঠে কিছু মাসীমা আর আঁপতার মা সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। আহারে, উঁহুরে করতে লাগলেন। এমন মেয়ে হয় না, বলতে গেলে সংসারটা ধরে রেখেছে। মুখপোড়া ঠাকুরগুলো, তোরা দেখতেও পাস না, চোখের মাথা খেয়েছে, কানা। বলেই আবার এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন ঠাকুরগুলি শুনতে পেল কিনা! আঁপতা ওর মায়ের স্বভাব জানে তাই কাজের বাড়ীতে আর

কথা বাড়াল না। চিহ্ন। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজকর্ম ঠিকই চলতে লাগল। আনন্দের ফোয়ারাটাই যেন শুকিয়ে গেল। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ ফিস ফাস করতে লাগল, দেখো কুটুম বাড়ীতে যেন খবরটা না যায়। তারা আবার কি ভাববে। শুবকাজে শতক বাধা।

(১৪)

আজ সহসার বিয়ে। মধ্যমগ্রাম থেকে কাল ভারতীর মামা ও মামী এসেছেন। এ বিয়েতে দেনা পাওনা কিছু নেই। ভারতী বহুকাল ধরেই মেয়ের জন্য কিছু কিছু গয়না করে রেখেছিলেন। তাঁর নিজেরও যা ছিল তা তিনি ব্যবহার করেন না। সব না হলেও তার থেকেও কিছু দেবেন। শৈলেশ্বরের জন্যও আংটি বোতাম করিয়েছেন। ঘড়ি এখান থেকেই কিনেছেন। ভারতীর বাড়ীতে খাটবার লোকের অভাব। এজন্য মামা চিরঞ্জীব বাবু সব ব্যবস্থা ক্যাটারারকে দিয়েছেন। তারা বাইরে থেকে এনে বাড়ীতে সাপ্লাই দেবে। কাপড় চোপড় বিছানা-পতুর সব জুড়ার দিয়ে করানো হয়েছে। ফাগিচার সহসার পছন্দমত হয়েছে।

মাত্র দুদিন আগে শেষ বাজারটা করতে সহসাকে নিয়ে ভারতী বেরিয়েছিলেন। সুবল বাড়ীতেই ছিল। অনেক লোকের যাতায়াত আছে, সে সব দেখা শোনা। মামা এসে সহসার দূর সম্পর্কের কাকাকে খবর পাঠিয়েছেন, সে হয়ত

আসবে। অথচ আজ না বেরলেই নয়। ফিরবার পথে শেয়ালদা ফ্লাই ওভারের ওপর দিয়ে গুদের আসতে হল।

কর্তাদিন এদিক দিয়ে আসা হয়নি। ভারতীর অবাধ চোখে যেন অজানা নবীন এক শেয়ালদা ঝলসে উঠল। হঠাৎ তার মনটা এক মুহূর্তে অনেক বছর পৌঁছিয়ে গেল। কোথায় গেল সেই শেয়ালদা যেখান থেকে কত যন্ত্রণায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেই পচা-গল। নোংরা অব্যাহত পরিবেশ। তারি মধ্য দিয়ে গা বাঁচিয়ে স্টেশনে যাতায়াত করেছিল। কোথায় গেল সেই দিনগুলি! আজ যে নবীন শেয়ালদা সর্বাস্থে প্রাণিক সাজারি করে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে, তারপাশে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সেদিনের সেই সুখদুঃখে মেশানো দিনগুলি। যুদ্ধের জন্য চারপাশে তখন ব্যাফেল ওয়ালা। তারপর উদ্ধারের আশ্রয় স্থান। কাদা পচা দুর্গন্ধ ছড়ান সেই পুরানো শেয়ালদা।

যে চলে গেল তাকে আর দেখা যাবে না। আজ শেয়ালদা সর্বাব্যুতীর্ণ কেতাল সাজান। এক মনোরম নয়নানন্দকর ফ্লাইওভার-উড়ালপুল। দেখতে দেখতে চারপাশের ঘরবাড়ী নতুন সাজে সেজেছে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। মনটা সত্যি প্রশান্ত হয় সুন্দর জিনিষ দেখলে। পুরোন সেদিন পুরোন স্টেশনের সঙ্গে হুইসল বাজিয়ে কোন অজানার পথে পাড়ি দিয়ে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

শেষ

বল মা কেন?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ঘটক

আমরা কেন গরীব মাগো
পেটে নেইকো ভাত,
শীতের রাতে নেইকো মা লেপ
কাঁপি সারারাত।
তপু গদাই মধু যে মা
আমার সাথেই পড়ে,
রোজই আমার কানটা ধরে
একই প্রণাম করে,

ঝি-এর ছেলে জ্বলে কেন—
ছেঁড়া বসন গায়,
এ পরে কি জ্বলে আসা—
নিত্য শোভা পায়?
বল মা তুই সত্যি করে
মোরা কি করেছি পাপ,
ঝি-এর ছেলে গরীব বলে
মোদের এত অভিশাপ?

কে আসে-কে যায়

শ্রীকান্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রপঞ্চময় বিশ্বসংসার এক রঙ্গমঞ্চ বিশেষ। অগণিত জীব জলস্রোতের মত এখানে আসছে এবং অভিনয় শেষে চলে যাচ্ছে। কোথা থেকে আসছে ও কোথায় চলে যাচ্ছে—তা কেউ জানে না। এই বিরামহীন যাওয়া আসার উদ্দেশ্যই বা কি? এর পিছনে যদি কোন যন্তুকৌশল থাকে, তবে সে যান্ত্রিক অধীক্ষকই বা কে? পাস্তাভ্য দার্শনিক W. H. Wilcox বলেছেন—

I know not whence I come,

I know not whither I go,

But the fact stands clear

That I am here in this world

of pleasure and woe.

এই বিশ্ব সুখ দুঃখের হিন্দোল স্বরূপ, বাহ্য সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের তাত্ত্ব লীলায় দোদুল্যমান। উক্ত লীলা কবে থেকে চলে আসছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে—তার আদ্যন্তের যথার্থ নির্ধারণ করা দুবৃহৎ। এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির তাড়নায় সকলেই ভয়াভিভূত। আবার কেহই জানে না, তাকে কখন চলে যেতে হবে। এইটুকু তার জ্ঞান আছে—এই মুহূর্তে সে স্বস্থানে অবস্থান করছে, পরমুহূর্তে তার কি হবে সে জানে না। জীবন্ত দেহের স্থায়ী পদপত্রাঙ্কিত জলবিন্দু সদৃশ। কারণ জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ার কোন কালাকাল না থাকায় উক্ত দেহ যে কোন মুহূর্তে মূর্তে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

মৃত্যু এক চরম বিভীষিকা। নিত্য সন্নিহিতো মৃত্যুঃ—মৃত্যু নিত্য নিকটবর্তী, অবশ্যস্বাবী। মৃত্যু সর্বগ্রাসী। ধন, জন, যৌবন সবই নিমেষে কালগ্রাসে পতিত হয়। হরতি নিমেষাং কালঃ সর্বম্ (শঙ্করাচার্য)। কবি ও দার্শনিক মৃত্যুকে মহাজীবনের অচিরস্থায়ী বিরাম বলে সান্ত্বনা লাভ করেন—There is no death, what seems is but transition (Meredith), সকলেই এই কালের কবল থেকে রক্ষা পেতে চায়। মানুষের ধর্ম, কর্ম, সবকিছুই এই মহাকালকে অতিক্রম করার জন্য।

দুটি দেহ—একটি জীবন্ত, অপরটি মৃত। মৃতদেহে পচনক্রিয়ার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়, কিন্তু জীবন্ত দেহে উহার সম্পূর্ণ

বিপরীত অর্থাৎ পচনশীল নয়। এইরূপ বৈপরীত্যের কারণ কি? কারণ অপ্রত্যক্ষ, কার্য প্রত্যক্ষ। আবার প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্যস্বাবী। তাহলে স্পষ্টতঃ ইহাই সমীচীন যে একটি অদৃশ্য বস্তু দেহে বর্তমান থাকা কালীন উহা জীবন্ত, উক্ত বস্তুর অবর্তমানে দেহ মৃত।

প্রাচীন মহর্ষিগণ কঠোর তপস্চর্যার দ্বারা জন্ম-মৃত্যু রহস্যের স্বারোদঘাটন করতঃ সমগ্রবিশ্ববাসীকে জানিয়ে-ছিলেন—

‘নাম্নং হস্তি ন হন্যতে’

আম্মা কাহাকেও মারেন না, নিজেও মরেন না। আত্মা সর্ববাপী ও পূর্ণ। পূর্ণের গতি নেই, যাতায়াত করবার স্থানই বা কোথায়? তবে কে যায়, কে আসে? মরণে দেহ ত পড়িয়া থাকে। আত্মা ত পূর্ণ, তাঁহার যাওয়া আসা নেই। তবে কে যাওয়া আসা করে?

সাংখ্যাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলেন—এই দেহমধ্যে একটি সূক্ষ্মশরীর আছে, তাহাই যাওয়া আসা করে। এই সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গশরীর বলা হয়। ছায়া যেমন কোন মূর্তি ব্যতীত থাকতে পারে না, তেমনি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর কোনও আশ্রয় ব্যতীত থাকতে পারে না। এই সূক্ষ্মশরীরে কর্মের সংস্কার বর্তমান থাকে এবং সূক্ষ্মশরীরে ঐ সংস্কার কর্মের প্রেরণা দেয়। কর্মের ভোগ শেষ হলে আবার নূতন সংস্কার ঐ সূক্ষ্মশরীরে লিপ্ত হয়। মরণের পরও ঐ সংস্কারগুলি উহাতে লিপ্ত থাকে।

সূক্ষ্মশরীর অপ্রতিহত ও অবিপ্রান্ত, উহা যথাতথ্য বিচরণ করতে পারে। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগেই সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি। প্রথমে সূক্ষ্মশরীর, পরে আবরণরূপ স্কুল শরীরের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যেমন বৃক্ষের বীজ বৃক্ষের পূর্বে জন্মায়, তেমনি স্কুলশরীরের পূর্বে সূক্ষ্মশরীরের জন্ম হয়ে থাকে। সূক্ষ্মশরীর ভাবময়, শক্তিময় এবং নিরূপভোগ্য। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য এবং তাদের বিপরীত অধর্ম, অজ্ঞান প্রভৃতি সূক্ষ্মশরীরে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। গন্ধ যেমন পুষ্পকে আশ্রয় করে থাকে, ভাব ও শক্তি সেইরূপ সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করে থাকে। স্কুলশরীরের বিশ্রাম আছে, সূক্ষ্মশরীরের বিশ্রাম নেই। স্বপ্ন সূক্ষ্মশরীরের

কাজ। নিদ্রাকালে স্থূলশরীর বিগ্রাম করে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরের বিগ্রাম নেই; সূক্ষ্মশরীর স্বপ্নাদি ব্যাপারে ক্রিয়াশীল থাকে। সৃষ্টিকালে প্রত্যেক আত্মার জন্য (সাংখ্যে আত্ম বহু) এক একটি সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়েছিল, প্রলয় বা মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐসকল সূক্ষ্মশরীর বর্তমান থাকবে এবং বার বার উহাতে ষট্‌কৌশিক দেহ উৎপন্ন হবে। স্বক, রক্ত মাংস, মায়, অস্থি ও মজ্জা—এই ছয়টি কোষ আত্মার আবরণ, সেইজন্য এই ষট্‌কোষ বিশিষ্ট স্থূলদেহকে ষট্‌কৌশিক বলে।

মরণকালে প্রাণ সংস্কারযুক্ত সূক্ষ্মশরীরকে আকর্ষণ করতে থাকে। তারপর প্রাণ নিজস্থান নাভি পরিচ্যাগ করে গলদেশে যখন উপস্থিত হয়, তখনই কণ্ঠস্থান দৃষ্ট হয়। এই স্থান থেকে প্রাণ চিত্তকে আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত প্রাণাশ্রিত হয়ে যায়। তখন মরণোন্মুখ মানুষ চৈতন্য হারিয়ে ফেলে ও জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তারপর প্রাণ চৈতন্য-অধিষ্ঠিত সূক্ষ্মশরীর সহযোগে বহির্গত হয়ে গেলে-স্থূলশরীর পড়ে থাকে।

মরণযন্ত্রণা সর্বাপেক্ষা উৎকট যন্ত্রণা। উৎকট রোগে রোগীর সংস্কার বা জ্ঞান থাকে না, রোগের যন্ত্রণায় সব ভুলিয়া যায়। এখন তাহার সূক্ষ্মশরীরগত সংস্কার তাহাকে

এক নতুন ভাবনায় উদ্ভুদ্ধ করে। সেই সময় তাহাকে ভাবনাময় দেহ বলে। ভাবনাময় দেহকে আতিবাহিক দেহও বলা হয়। ইহা স্বপ্নকালীন শরীর তুল্য। যতদিন না স্থূলশরীর উৎপন্ন হয়, ততদিন আতিবাহিক ভাবদেহে জীব অর্থাৎ জীবাত্মা সুখদুঃখ ভোগ করতে থাকে—সে ভোগ স্বপ্নভোগের ন্যায় অস্পষ্ট।

‘চক্রপ্রমিবৎ ধৃত শরীরঃ’ (ষড়্‌ধ্যায়ী সাংখ্য)। কুন্তকরের চক্রের ভ্রমণ বা বেগ এক সংস্কার বলে কিছুক্ষণ থাকে এবং ভ্রমণ শেষ হলে বেগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। সেইরূপ একই সংস্কারবশে জীব জন্মায় এবং জীবের ভোগ শেষ হলেই সংস্কারটি চলে যায়। কর্মফল অর্থাৎ সুখদুঃখ ভোগ করবার জন্য সকলেই এই সংসারে আসছে এবং ভোগান্তে এই সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।

যিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করেছেন—সেই অলক্ষ্য, অদৃশ্য, নির্বিশেষ দেবের কি বিচিত্র লীলা-কৌশল। তিনি সূক্ষ্ম, স্থূল ও আতিবাহিক দেহে গূঢ়ভাবে অবস্থান করে আছেন। এসোদেব সর্বভূতেষু সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাগ্না (কঠ উপনিষদ্) অর্থাৎ এই পরমেশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরে গূঢ়ভাবে আছেন।

জঙ্গম

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথার ওপরে পাক খেয়ে ঘুরছে বাজ
স্থলে অসংখ্য সপ্তকে মতলববাজ,
জলে ধড়িবাজ ঘড়িয়াল,
অক্টোপাস্-হাঙ্গরের পাল।
আশ্চর্য্য। তবু ঠিক আমি বেঁচে আছি,
ময়ূরের মত প্যাখম বিছিয়ে নাঁচি,
ডালে-ডালে উড়িয়ে দিই ফুলের নিশান,
মধুপের প্রেমের আশায়
জমিয়ে রাখি হৃদয়ের মধু,
খোলা পত্র লিখি বিচিত্র বর্ণের ভাষায়,
বাজাই গন্ধের বিষণ।
আমায় ভয় দেশায় চাপ চাপ অন্ধকার,
জীবন বায়ুতে মিশছে জলন্ত অঙ্গার;

আমার সমস্ত পরিবেশে
প্রচ্ছন্ন বেশে
ঘুরছে সে
রাখালিয়া বাঁশীটা থামাতে,
তার কাল-যবনিকা নামাতে।

এ ছুস্কার ভ' আজকের নয়,
শুনোছি জীবনের প্রথম দিন থেকে
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ প্রতিকূলময়।
যদি
সময় হয় বহুতা নদী,—
তার স্রোত বয়ে
আমিও জঙ্গম,
দেখবই সে সাগর সঙ্গম।

স্বদেশ ও সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি

ডাঃ যাদবচন্দ্র দাস

সাম্প্রতিক দুনিয়ায় রাজ্যার্থনীতিক সংস্কৃতির পাশাপাশি সংস্কৃতিও সংস্কৃতির ঘূর্ণ্যবর্তে টালমাটাল। উন্নত, অবোন্নত বা অনুন্নত সব দেশেই কমবেশী আলোকপ্রাপ্ত জনসমষ্টি আজ এই দুরারোগ্য 'সামাজিক' অন্ধকারের আগ্রাসনে ব্যতিব্যস্ত। সভ্যতা-বিধ্বংসী এই ব্যাঘাট খুবই সংক্রামক। সংস্কৃতি দীর্ঘ বিশ্ব-ধনবাদ, সমাজবাদী শ্রেণীসংগ্রামে বীতশ্রদ্ধ লক্ষ্যদ্রষ্ট ক্ষমতাকৈবল্যবাদী রাজনীতি এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-স্বার্থে যন্ত্রাণিত আমলাতন্ত্র—এই তিনটিই একক বা যৌথভাবে মুখ্যত একালের অপসংস্কৃতি-নামক রাজরোগের মূলাধার। এর বিশ্বস্ত সহায়ক জনজীবনের সঙ্গে সাযুজ্যহীন অপরি-কম্পিত বন্ধা শিক্ষানীতি; প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অসম বিকাশ ও তার এলোপাথাড়ি প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ; এবং গণবিক্ষ্রম উচ্চ মণ্ডাসীন গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গের সংকীর্ণ কৃষ্টি পরি-কল্পনা। এর সংক্রমণের উদ্দীপক হল মুনাসাশিকারে অনলস কূটকৌশল বিস্তার, ব্যাপক শোষণ ও বণ্টন। এর পরিবাহীশক্তি 'মুক্ত-দুনিয়াবাদের' ছদ্মনামে অব্যর্থ বহুজাতিক ও জাতীয় একচেটিয়া উৎপাদন ও বাণিজ্যনীতি—তথা বিশ্বশোষণের বন্ধাহীন প্রতিযোগিতা। এর ধ্রুবলক্ষ্য সাহায্যকারী দেশ ও জাতির নৈতিক মেরুভঙ্গ, সভ্যতা প্রতি-রোধী যুবশক্তির চরিত্র হনন এবং পরিণামে খাতক দেশকে আপাদমস্তক পরনির্ভর করে তুলে। শেষটায় তার স্বাধীনতা হরণ। তবে সংস্কৃতির নামে এই বিশ্ব-হিতৈষিতার মুখো-পরা বিষাক্তিয়ারও মোক্ষম প্রতিষেধক আছে; তা হলো গণমুখী সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী অভিব্যক্তি।

সংস্কৃতির উদ্ভব ও গতি-প্রকৃতির কথাটা মাথায় রেখেই অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করা চাই। চলমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর (Structure) মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ এবং উৎপন্ন সম্পদের বিলি-বন্টনকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মানবগুলির যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে—

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উৎপন্ন হয় এবং দক্ষিণায়নের তিরোধানের সঙ্গে তারাও চলে যায়। দক্ষিণায়নগামী শরতের সঙ্গে অম্মের এতটা ঘনিষ্ঠতা যে বৈদিক ঋষিরা ঋষা নামেই শরতের নামকরণ

সেই মানবিক সম্পর্কের নিবিড়তার নিরিখেই উপরি-কাঠাম (super structure) হিসাবে উদ্ভব হয় সংস্কৃতির। মানব মেলার আবেগ, ভাবৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যবোধের সমবায়ের পার-স্পরিক সম্পর্কে স্থিতি-স্থাপক অনুরূপ ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিরস্থায়ী করে রাখার সৃজনশীল প্রবণতাই সংস্কৃতির আসল বিনিয়াদ।

সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠালাভের পথেও প্রাথমিক প্রস্তাবনা (Thesis), বিরোধী ভাবনার সংঘাত (Anti-Thesis) এবং পরিণামে এই দু'য়ের গ্রাহ্য সারাংশের সমন্বয়ে (Synthesis) সার্থক ও গতিশীল সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরী হয়। রূপান্তরের প্রসঙ্গে (Transmission) বিশেষ বিশেষ যুগের সমাজ-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু সংস্কৃতির রূপান্তর হয় প্রায়শঃ তার প্রীতিবদ্ধিতে। অপসংস্কৃতি আসে সংস্কৃতির রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে (Transition)। সন্ধিকাল থেকে পিছুটান (Transitional Back-push) কাটিয়ে নতুনতর গতিবেগ সঞ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কালের বিশেষ অপসংস্কৃতিরও মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে। তবু যতকাল ঐ আপদের লেশমাত্র বর্তমান থাকে, তার খেসারত কিছু সামাজিক মানবকে দিতেই হয়। আস্কারা দিলে গুণাগার গুণতে হয় বেশী; রুষে দাঁড়ালে ক্ষতি তো নয়ই, বরং লাভের অন্ধ সুদে-আসলে পাওয়া যায় আশাতীত পরিমাণে; আপাত-বিস্মৃত সংস্কৃতির বহু সম্পদ পূর্ণোদ্যমে নব মূল্যায়ণে বলীয়ান হয়ে পুনর্জাগরিত হয়, ঐতিহ্যের সামর্থ্যে সংগ্রামী চিন্তা-চৈতন্যও হয়ে ওঠে দুর্জয় ও অঘটন-ঘটন-পটীয়ায়।

ভারতের ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলিম রাজতন্ত্রী পরিবারগুলো তাদের কদাচার ও কুৎসিত প্রাসাদ রাজনীতির বিষ ছড়িয়ে প্রজাশোষণের অব্যর্থ অধিকার বজায় রাখতেই মত্ত ছিল। কিন্তু সেদিনের শিখ, মারাঠা, বাংলা ও দক্ষিণাত্যের নবজাগ্রত যুবশক্তির ক্রমাগত প্রতিরোধে দ্রষ্টা

করেছেন। স্বধার প্রধান অর্থ পিতৃউদ্ভিষ্ট অম্ম—তা দক্ষিণ দিকেই করতে হয়। তাই দক্ষিণায়ন প্রাণধারণের কাল বলে অম্মপতি বা পালক হিসেবেও পিতৃকাল বলে চিহ্নিত হয়েছে।

চারী দেশীয় শাসককুলের অপপ্রয়াস ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই অসংগঠিত ভারতীয় Anti-Thesis-এর ফয়দা লুটে নিল সংগঠিত ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী; তাদের হাতিয়ারও ছিল সৈদিনের প্রেক্ষাপটে মোক্ষম; অবক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের বক্ষ্যানীতির পাশে নবাগত ধনতন্ত্রের ফলপ্রসূতা ছিল বিস্তর প্রতিশ্রুতিময়। ধনিক-বণিকদের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিঁড়ি বেয়ে শাসনক্ষমতার তথ্য-তথ্যে-তথ্যে কান্নেম হলো ইংরেজ। বিদেশী বৈনিকের ‘মানদণ্ডের’ ‘রাজদণ্ডে’ বুপায়ণে ভারত-শোষণ পদ্ধতির বুপায়ণ হলো বটে, কিন্তু তার ব্যাপকতা বেড়েই চলল—তার সঙ্গে যোগ দিল দেশীয় সুযোগ শিকারী ইজারাদার-পত্তনীদার-বেনে-মুৎসুন্দির দল। দেশী-বিদেশী বিন্ধুশিকারীরা প্রতীচায়ে নবোদ্ভব মেতে উঠল; প্রাচীন-পন্থীরা বহিরঙ্গে রক্ষণশীলতার আলখাঙ্গা জড়িয়ে, আর নব্যেরা প্রকাশ্যে পাশ্চাত্য ভোগাচারের জাতীয়-করণে তৎপর হয়ে উঠল। নব্যশাসক ইংরেজ ভারতের সচেতন সভ্যসমাজের সেই পদস্থলনকে অভিনিমিত্ত করেছিল।

কিন্তু কৃষ্টিবিপ্লবের মহানামক ও মানবতার সাধনার সিদ্ধ পারিকৃৎ মহাপ্রভুর বাংলা তথা ভারতের যুবশক্তি আবার সেই অনাচারের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইংরেজ রাজতন্ত্রের শতবর্ষপূর্তিতে সিপাহী-অভ্যুত্থান আঘাত হানল বিদেশী বৈনিক রাজশক্তিকে—কিন্তু বার্থ হল সৈদিনের নেতৃত্বের লক্ষ্যপ্রকৃতি। কারণ ক্ষমতা-উচ্ছিন্ন সামন্তবাদী নেতাদের লক্ষ্যটাই ছিল নির্ভেজাল রাজনৈতিক—যার সঙ্গে দেশের গণসংযোগ ছিল ক্ষীণতম।

এর পরেই যুরোপীয় শিম্পবিপ্লব থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের সংগঠিত আন্দোলন সুরু হলো পূর্বভারতে—রক্ষণশীল ‘বুড়ো শালিক’দের আবহু-ঢাকা ভণ্ডামি ও বে-আবহু পাশ্চাত্য বেলোন্ডামি অনুকরণের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যর্থতায় অভিজ্ঞতা-লব্ধ যুবসমাজের মধ্যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গঠনতাত্ত্বিক চেতনা ক্রমাগত দানা বেঁধে উঠল। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিকামনার সমন্বয়ের মধ্যেই ছিল উনবিংশ শতকের ভারতীয় যুব-জাগরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সদর্থক পদক্ষেপ। একেও আঘাত হানার অপচেষ্টা করেছিল সৈদিনের বিদেশী শাসক ও দেশীয় সুযোগ-সন্ধানীরা। নব্য-

শিক্ষানুরাগী ‘ইয়ংবেঙ্গল’ গোষ্ঠীর একাংশকে অপসংস্কৃতির বাহন করে তুলতে তৎপর হয়েছিল তারা। কিন্তু সৈদিনের জাতীয় জাগরণ ও মুক্তিপন্থা এত জোরদার ছিল যে ইয়ংবেঙ্গলের কিস্তিদংশের বিপ্রান্তি সর্বস্তরের জাতীয় সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। বরং জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনায় ‘ইয়ং’দের নেতিবাচক আন্দোলনও সদর্থক ও স্বাভাবিক গঠনমূলক কার্যক্রমে পরিণত হয়। এর আগে-পরেও সংস্কৃতি-পূজারী মানুষ অনুরূপ ক্ষেত্রে কখনই নীরব থাকেনি। একালেও তাই ঘটেছে, এবং তার প্রতিরোধে একালেও জমানা-বদলকামী যুবশক্তি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এটা বাস্তবিকই শুভ লক্ষণ।

আমরা লক্ষ্য করছি, একালের ‘অপসংস্কৃতি’র জোয়ারকে গা-সহাভাবে জাতীয় সংস্কৃতির আম-দরবারে সম্মানের শিরোপা দেবার টাল-বাহানায় স্বনামধন্য কতিপয় বুদ্ধিজীবীও মাথা বিকিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা বড় পরিভ্রাণের বিষয়। তাঁদের কেউ কেউ শব্দাত্মক শিক্ষামূলক ব্যাখ্যায় খোদ ‘সংস্কৃতি’ ও ‘কৃষ্টি’র বাণীমূর্তির বিবর্তন, অর্থপরিবর্তনের ধারা ও অর্থের ভারবাহিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণে যতটা তৎপর, ‘অপ’ত্বের মালিন্য লঘুকরণে যতটা ব্যস্ত, অপকৃষ্টির অপকীর্তি বা অপকৌশল নিরসন সম্বন্ধে কিন্তু ততোধিক অনুচ্চার। অন্যেরা ধরি-মাছ-না-ছুই-পানি গোছের সপ্রশংস মস্তব্যো বৈদ্যের কাণ্ডা উড়িয়ে সমস্যার পাশ কাটাচ্ছেন; বিশ্বখেতাবী সংস্কৃতি-বাণীশ দু-একজন বিশেষজ্ঞ তো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকেই ব্যঙ্গবিদূষ করে তাঁদের হাল-জমানার কৃষ্টি-মনস্কতার বৈজ্ঞানিক উড়িয়ে, আন্তর্জাতিক মানপদে রঙের ওপর রঙ চড়িয়ে জাতীয় কর্তব্য খালাস করেছেন। এঁরা সবাই যে একালের ধৃতরাষ্ট্রের দরবারের কানে-তুলো চোখে-তুলি-পরা ‘বীর’ অমাত্যের দল সে বিষয়ে মাজিত-মেহনতী মানুষের কোন সংশয় থাকে উচিত নয়। ভাবী-কালের ইতিহাস নিশ্চয়ই এঁদের নেপথ্য-স্বরূপ উদঘাটন করবে।

যাই হোক, আমার সীমিত জ্ঞানে ‘অপসংস্কৃতি’র একটা ব্যাখ্যা রাখছি; আশা করি অপাত্তেয় হবে না। লক্ষ্য করা যাচ্ছে ‘সুস্থ’ ও ‘অসুস্থ’ এই দুটি বিপরীতার্থক বিশেষণ জুড়ে অনেকে সংস্কৃতিকে ‘সুস্থ সংস্কৃতি’ ও ‘অপসংস্কৃতিকে

‘অসুস্থ সংস্কৃতি’ বলতে চাইছেন। এটা মূলত ইংরেজী Sub-Culture-এর সমার্থক হিসাবেই আমাদের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এভাবে একটা ‘অ-পদস্থ’ বিষয়কে অনর্থক ‘পদস্থ’ করে তোলা অসমীচীন। কারণ, অপসংস্কৃতি স্বভাবে ও স্বরূপে আদৌ সংস্কৃতি পদবাচ্য নয়; ওটি সংস্কৃতি-বিনাশী একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। মনোবিজ্ঞানী ম্যাগডুগালের মতে মানুষের মধ্যে যে চৌদ্দটি প্রধান প্রবৃত্তি (Instinct) আছে,—তার অন্যতম নির্মাণপ্রবৃত্তি (Construction)। সংস্কৃতি এই নির্মাণ প্রবৃত্তিরই ফসল। আর অপসংস্কৃতি হল ঘৃণা (Disgust) ও পলায়ন (Flight) প্রবৃত্তির উপজাত ধ্বংস বা বিনাশ প্রকোন্ডের (Emotion of Destruction) ফলশ্রুতি। এই মনোবিজ্ঞানী বিশ্লেষণের মধ্যেই অপসংস্কৃতির আক্রমণে জর্জরিত সাধারণ মাজিত মানুষের মনোভাবগত অর্থের সমর্থন মেলে। কাজেই অপসংস্কৃতিকে সংস্কৃতির চৌহদ্দিতে অনধিকার প্রবর্তিত ধ্বংস-রোগ বা দূষণ (Polution)-রোগের বীজাণু ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। সংস্কৃতিজগতের পক্ষে এটি একটি সংক্রামক বিধ্বংসক বিশেষ। মনস্তাত্ত্বিক অর্থসূত্র বজায় রাখতে হলে, অপ (ক্ষুদ্র, অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট) যে সংস্কৃতি (সম্যক কৃতি বা সৃষ্টি)—অব্যয়ীভাব, প্রাদি তৎপুরুষ বা কর্মধারয় সমাস অনুযায়ী এর অর্থনির্দেশ চলে না। বরং ‘সংস্কৃতির পক্ষে অপ’ (অপঘাতক, অপমানক বা অপনায়ক) যে বা যাহা—তাই অপসংস্কৃতি—এই বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন করলেই পূর্বোক্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এর অর্থসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। কাজেই অপসংস্কৃতি নামক একটি অবচ্ছন্ন ব্যাপার সংস্কৃতি পরিবারের সভ্যতালিকাভুক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই সংস্কৃতির সুস্থতা-অসুস্থতার প্রসঙ্গই এক্ষেত্রে অবাস্তব। সংস্কৃতির চার দেয়ালের মধ্যে অসুস্থতার অনুপ্রবেশ চিরকালই নিবিচ্ছিন্ন। অতএব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য

অগ্রণীয় যে সংস্কৃতি সভ্য মানব-সমাজের পরিশুদ্ধ ভাবানুভূতি, সুরূচি ও শীলতার মহত্তম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত শাগিত নির্মাণ প্রবৃত্তির এক অনবদ্য সৃষ্টি। এর পটভূমিতে (Canvas) থাকে বিশেষ বিশেষ যুগের সামাজিক সম্পদ-উৎপাদন-সূত্রে বহুমুখী মানবিক সম্পর্কের চেতনা, দেনা-পাওনার দ্বন্দ্ব সন্ধি-বিগ্রহ ও বাঁচার সংগ্রামের মৌনমুখর দ্ব্যন্থক ইতিহাস। তাই সংস্কৃতির সঙ্গে ঐতিহ্যের (Tradition) অবিচ্ছেদ্য এক সুগভীর সম্পর্ক। পক্ষান্তরে কোন কালেরই অপসংস্কৃতির সঙ্গে ঐতিহ্যের কোন যোগসূত্র থাকে না। ঐতিহ্যের আরক চিহ্নগুলো অপসংস্কৃতির আঘাতে ষাটকভাবে ধ্বংস করা চলে, কিন্তু অসুস্থ করা চলে না, বা সমাজ-মানস থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলা যায় না। ঐতিহ্য স্থাপনের সহায়ক সংস্কৃতিও বহুত নদীর মতো অসংখ্য উপস্রোতে ক্ষীত বধিত ও বেগবতী হয়, অজস্র শাখা-স্রোতে বহুধা ব্যাপ্ত হয়, আবার অপসংস্কৃতির জঞ্জাল-শৈবালে সাময়িক গতিবুদ্ধি হলে মহাপ্রাবনের সম্ভাবনাই স্বরাধিত হয়। প্রাবন-অন্তে দেখা যায়—জঞ্জাল ভেসে গেছে, কিংবা নিষ্কিপ্ত হয়েছে নিষ্কল বিন্দুটির উপকূলে, আর কৃষ্টি নদী বয়ে চলেছে তার প্রসারিত পূর্বধাতে কিংবা নবোদ্ভূত আর এক প্রসরমান খাতে—যা নতুনতর জমানার জীবনসংগ্রামের কলধ্বনিতে মুখর। ক্রান্তদর্শী মহাকবি মাইকেলের ভাষায় এই গতিবেগ কখনই অবরুদ্ধ থাকার নয়—

“পর্বত-গৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী সিকুর উদ্দেশে

কর হেন সাধ্য যে সে-রোষে তার গতি।”

[সৌজন্যে : ক্রান্তি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, নৈহাটা/কল্যাণী]

ভারতীয় সংস্কৃতি

স্বামী অশ্বৈতানন্দ

...সংস্কৃতি হচ্ছে দীর্ঘকালীন সাধনা ও অনুশীলন-লব্ধ মানবীয় চরিত্রের একটি বিশিষ্ট পরিণতি। সংস্কৃতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি, পরিবার বা জাতির উৎপত্তি বা আবির্ভাব তাই কদাপি আকস্মিকভাবে হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা ও সাধনা। সংস্কৃতি উভয়বিধ—ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। আর এই উভয়বিধ সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থিতি স্থান ও কালের আনুকূল্য প্রভৃতি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবও নিতান্ত কম নয়।

পণ্ডিতগণের মতে ভৌতিক সংস্কৃতির আদিম উৎস হচ্ছে সুপ্রাচীন গ্রীসদেশ এবং অধ্যাত্ম সংস্কৃতির জন্মভূমি হচ্ছে আমাদের এই ভারতবর্ষ। চতুর্দিকে সমুদ্র পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্রদ্বীপ গ্রীসদেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি সে দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এরূপ যে তা তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে করে তুলেছিল কঠোর জীবন-সংগ্রামের সন্মুখীন যার ফলে তারা হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসিক, বীরমুখী ও দেহসর্বস্ব জড়বাদী। ঐ দেশে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস প্রমুখ কতিপয় খ্যাতনামা দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটলেও তাঁদের চিন্তাধারা সেদেশের জনগণের সেই বীরমুখী চিন্তাধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং গ্রীসের সেই ভৌতিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে সমসাময়িক আসীরিয়া, মিশর, ব্যাবিলোনীয়া এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসীবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

পঞ্চাশতাব্দের ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উত্তরে দিগন্তস্পর্শী নগাধিরাজ হিমালয়, পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে যোজন-বিস্তৃত নীলাকুশাশী, অভ্যন্তরভাগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, কাবেরী ও গোদাবরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী; ষড়ঋতুর নিত্যনির্মিত পরিভ্রমা প্রভৃতি প্রাকৃতিক লীলা-

বৈচিত্র্য সুপ্রাচীনকাল হতেই এই উপমহাদেশের অধিবাসীদের মনকে করে তোলে সম্ভাব্যাপন্ন, অন্তর্মুখী এবং চরম ও পরম সত্যের অনুসন্ধান উন্মুখ ও তৎপর। তাই প্রাচীনকাল হতেই ভারতভূমি 'ধর্মভূমি' ও পুণ্যভূমি নামে আখ্যাত এবং এদেশের সংস্কৃতিও তাই অধ্যাত্মমুখী—এই অধ্যাত্মমুখী সংস্কৃতিই সু-চিরকাল হতে জগতের প্রান্তে প্রান্তে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানব সমাজকে যুগে যুগে রক্ষা করে আসছে সমূহ ধ্বংস ও বিনাশের করাল কবল হতে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা কিছু জড়ধর্মী তাই বিনাশশীল এবং যা চেতনধর্মী তা অবিনাশী। এই কারণে ভারতেরতর দেশসমূহের জাগতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কালের নির্মমহস্তে আজ যখন নিশিচ্ছ বিলুপ্ত, তখন অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় সংস্কৃতি বহুবিধ পরিবর্তন, বিবর্তন ও ঘাত-প্রতিঘাতের সন্মুখীন হলেও অদ্যাপি জাগ্রত, জীবন্ত। এই জীবন্ত সংস্কৃতির ক্রোড়ে আজও আবির্ভূত হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, প্রণবানন্দের মত মহান যুগপুরুষ। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে এইসকল যুগমানব-গণের আবির্ভাব সত্ত্বেও আজ ভারতের বুকে দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রবল প্লাবন। কেননা, বিজাতীয় আদর্শে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত একশ্রেণীর স্বয়ম্ভু রাষ্ট্রনেতা আমাদের সেই সংস্কৃতির ধারাকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার জন্য আজ বন্ধপরিচর। এই যুগ-সঙ্কটকালে তাই যারা প্রকৃত সংস্কৃতি-প্রেমী ও স্বধর্মনিষ্ঠ তাঁদের কর্তব্য—এই বিজাতীয় ভাবাদর্শের দ্বারা হতে পরিমুক্ত করে আমাদের জাতীয়জীবনকে পুনরায় ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের অভিমুখী করে তোলা।*

*ভারত সেবারাম সঙ্ঘের স্বামী অশ্বৈতানন্দ মহারাজ ৫৪.৭০ তারিখে শ্রীতপন বসুকে এক পত্রে সংস্কৃতি সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য করেন। শ্রীবন্দ্য সৌজন্যে পত্রের কিংবদন্ত প্রকাশিত হল।

সম্পাদক : শ্রীচুর্গাশঙ্কর মহালানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপনিবহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাব কর কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিটারেচর, ৫২/৩, বিপনিবহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীকণিষ্ঠভূষণ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

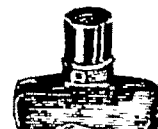
প্রতিষ্ঠা - মহাভূক্ত শ্রীমতিলাল
১৯৩৮

জনপ্রিয়তায় গৌরবমণ্ডিত

কে.হোডের প্রসাধনী



মহাভূক্তরাজ
আম্রবেদীয় সুবাসিত
কেশ তেল
কনক ট্যালক
কনক সেন্ট



সঙ্কগুরু শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিরাছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজ, সঙ্কগুরু মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনার উজ্জল এই গীতাভাষ্য নূতন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বছর মধ্যে সঙ্কগুরু মতিলালের জীবনভিত্তিক জীলা-বাদী শারীরিক সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, শোণ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত।

মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর সুচিন্তিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিখিল ভারতশাস্ত্রের নির্ধণ স্বরূপ সুবহু ভূমিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মূত্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

সূচীপত্র ভাদ্র ১৩১১

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল	১১৯
সাধন কণা	সংকলন	সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল	১২০
স্বর্ণায়ী নির্মলা দেবী	সম্পাদকীয়	শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ	১২১
সময় যেন	কবিতা	গোরাই ধর্মপাল	১২২
বৈষ্ণব সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব	প্রবন্ধ	শ্রীসুধীর কুমার বসু	১২৩
তানসেনের বিবাহ	প্রবন্ধ	ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার	১২৬
অশেষা	কবিতা	গোতমকুমার মণ্ডল	১২৯
ভবেশবাবুর ভাবনা	গল্প	সন্তোষ মিত্র	১৩০
শ্রীঅরবিন্দ	কবিতা	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ	১৩২
শুভগ্রহ ও পাপ গ্রহ	জ্যোতিষী	নীলিমা সরকার	১৩৩
কল্যাণ	কবিতা	ধুব মাহাতো	১৩৫
গোলাপের একদিন	গল্প	পীযুষকান্তি চন্দ্র	১৩৬
কাছে পিঠে	ভ্রমণ	শ্রীসত্যেন দেবমল্লিক	১৩৯
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	সংবর্ধনা	...	১৪১
আমাদের নির্মলাদি	স্মৃতিচারণ	মমতা দাস	১৪২
সংঘ সংবাদ	আশ্রমী		১৪৩

প্রবর্তকের নিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি বাংলা মাসের ৯/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পর সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একস্থানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আকুশপাশ্বক রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই, সম্পাদকের নহে।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

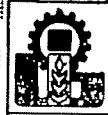
যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মীধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য গড়ে তোলার দ্রুত

ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুন্ডার্জি রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

লরেন্স অফিস : ৭ রোড লস ফোর্স, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

চেয়ারম্যান : জে এন বিহার

Progressive/UB-18-80





বর্ষ ৬৯তম : ৫ম সংখ্যা : ভাদ্র ১৩৯১ : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

জীবনের আলো

তুমি কিছুতেই সম্ব-ধর্ম দেশ ও জাতির পুরোভাগে ধরিতে পারিবে না—যদি ইহার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অবগাহিত না হও। তবে থাকা নয়—বস্তুতঃ তবে ডুবিয়া যাইতে হইবে। আজ আর ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ অভিব্যক্তির দিকে তাকাইয়া থাকিলে কোন মতে রক্ষা পাইবে না, সমস্তমানির সাফল্যে তোমার জীবন ঢালিয়া যাইতে হইবে। স্বার্থকতা তোমার নয়, সার্থকতা ভাগবত-তত্ত্বের। তুমি এই তত্ত্বময় হও। তুমিই তত্ত্ব—তত্ত্বই তুমি—এই অখণ্ড অনুভূতির উপরই সমস্ত প্রকাশ পায়। ইহা যখন সিদ্ধ হইবে, তখনই তোমায় আশ্রয় করিয়া শ্রেয়ঃ যাহা, তাহা রূপ লইতে বাধ্য হইবে। কোন কারণ দেখাইয়া কথা বলার আর কাহারও অবকাশ থাকিবে না।

কথা বলিতে হইবে কেন? যাহা হইবে, তাহা কি মানুষের চক্ষে পড়িবে না? জগতের দৃষ্টিটা একেবারে উপেক্ষা করার বস্তু নয়, জগৎ কোনদিন সং ও সত্যকে উপেক্ষা করে নাই। সহজে সে কিছু গ্রহণ করে না, সত্যের তাই অগ্নিপরীক্ষা আছে। কিন্তু কতখানি গৌরব সে দান করে বস্তুকে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়।

তোমরা হও। কথা বন্ধ কর—কেবল হও। বাস কর নূতন চেতনায়। সৃষ্টির বীর্ষ সত্য—কখনও কেহ উহা চাপা দিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না।*

—সত্যগুরু শ্রীমতিলাল

সাধন কণা

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

পূর্ণযোগের জন্য চাই পূর্ণত্বের অনুসরণ। পূর্ণত্ব ভগবান, তাই ভগবানে আত্মসমর্পণ, পূর্ণযোগের একমাত্র অনুষ্ঠান। আত্মসমর্পণ কেমন করিয়া করিতে হয়, এ প্রশ্ন তাহার জ্ঞানে না, যাহার বস্তু-নির্দেশ হইয়াছে। বস্তু, তত্ত্ব, ইচ্ছা, ভগবান, একেরই নামান্তর মাত্র।

* * *

আত্মসমর্পণ যোগে তপস্যা নাই, কৃচ্ছ্রতা নাই, আসন প্রণাম নাই, অথচ সবই আছে। কিন্তু তাহা সাধকের করিতে হয় না, প্রয়োজন হইলে, ভগবান নিজেই করেন। আত্মসমর্পণের দীক্ষা সম্পূর্ণ হইলে জীব দ্রষ্টা, কর্তা হন ভগবান। ইচ্ছাবস্তুই সাধক হইয়া অন্তর্ধামীর আসন গ্রহণ করেন; কাজেই জীব ধীরে ধীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ চেষ্টাহীন স্থির অবস্থাই এই যোগের প্রকৃত অবস্থা। ইহার অন্যথা হইলে বুঝিতে হইবে দীক্ষা ঠিক মত হয় নাই।

* * *

আত্মসমর্পণের দীক্ষা, লোকাচার-প্রবর্তিত কোন অনুষ্ঠান নহে। ইহার কোন আয়োজন নাই। শব্দ-মন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা হইল কি না মনও জ্ঞানিতে পারে না। কোথায় কে দীক্ষা দিল তাহাও বুঝা যায় না। কিন্তু যোগের পরিণতির সঙ্গে বস্তুর আবির্ভাব হয়। তখন ঈশ্বর-বস্তু প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আর এই বস্তু আস্রা নহে, রক্ষা নহে, স্বয়ং ভগবান, পঙ্ক্তিতে গড়া রস-ঘন শৃঙ্গার মূর্তি। আত্মসমর্পণযোগী এই জন্য লয় চাহে না, সমাধি চাহে না, সার্থি, সারূপ্য, এমন কি সমুজ্জ্বল লাভও উদাসীন। সে চায় বিশুদ্ধ ভক্তি, যাহা দিয়া সে তাহার সবখানি ভরাইয়া তুলিবে রসাম্বাদের অশেষ তৃপ্তিতে।

আত্মসমর্পণ যোগে শোণিত বিন্দুটি পর্বস্ত তৃষিত

চাতকের মত রসমাধুর্যে ভরিয়া থাকিতে উন্মাদ হইয়া উঠে। তাই সে সর্বদা সর্বভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানের ভজনা করে। ইহাতে সে সিদ্ধ হয়, তৃপ্তি পায়, অমরত্ব লাভ করে।

* * *

যে যোগে শুধু জ্ঞান-বিকাশের দ্বারা ঈশ্বরানুভূতি হয়, তাহা আত্মসমর্পণযোগ নহে। জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। জীবনের অনেক কিছু বর্জন না করিলে ইহা ঘটে না। এতরূপ যোগ-সমাধিতে সাধকের আত্ম-দর্শন হয়, কিন্তু দেহীর সকল অংশ ইহাতে বিকশিত হয় না। বরং এই প্রকার সাধনায় অনেক অংশই বর্জন করিতে হয়। এমন কি ভক্তিযোগও আত্মসমর্পণযোগ নহে। ভক্তিতে হৃদয়ের বিকাশ হয়। প্রেম, বিহবলতা, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি আনন্দের ঘোরে ভক্ত উন্মাদ হইয়া থাকে। আত্মসমর্পণযোগে জীবের সর্বদ্বন্দ্ব অমৃতময় হয়, কিছু ত্যাগ করিবার থাকে না, পূর্ণভোগের আনন্দে সর্বদ্বন্দ্ব পুষ্ট ও সুস্থ হয়। বসন্তের আবির্ভাবে তবুলতা যেমন শ্রীসম্পন্ন হয়, আত্মসমর্পণযোগের প্রভাবে সাধক দিব্যকান্তি ও মাধুরী মণ্ডিত হয়। এই ঐশ্বর্য ভগবানের ঐশ্বর্য, ভগবন্ময় হওয়ার ফলে, সাধকের আধারে ভগবানই অবতরণ করেন।

* * *

আত্মসমর্পণযোগীর নিজের প্রয়োজন থাকে না। এইজন্য অহঙ্কার আমূল উৎপাটিত হয়। ভগবানের প্রয়োজনেই তাহার সব কিছুর প্রয়োজন। ভগবানের ইচ্ছা-পূরণের জন্যই যে তাহার জীবন, এই হেতু মুক্তি, মোক্ষ, অগ্নিমাди ঐশ্বর্য সে তুচ্ছ মনে করে। কামনা থাকিতে পূর্ণযোগের দীক্ষা হয় না। সেখানে এই যোগের স্ফূর্তি নাই।

+ *

স্বর্গীয়া নির্মলা দেবী

সেবারতে সমর্পিতা ছিলে তুমি গুরুর ইচ্ছায়

শেষ বিন্দু রক্ত তুমি দিয়ে গেলে নীরব নিষ্ঠায়।

সম্ভবগুরু শ্রীমতীলালের কাছে নির্মলা দেবী এসেছিলেন ১৯২১ সালে। এসেছিলেন সেবার তরী বেয়ে গহনগহনে; সেবার তরী বেয়েই তিনি বৈভরণী পাড়ি দিলেন সুদক্ষ কাণ্ডারীর মত—নির্ভীক। “দেখি নাই কড় দেখি নাই/এমন ভরণী বাওয়া।” অতুলনীয় ছিলেন তিনি। জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েও এমনটি উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছিলেন যাকে তাঁর সামনে এনে দাঁড় করাতে পারা যায়। তিনি ছিলেন যেন অনন্যা। শিষ্যের গুরু সেবার গৌরবময় কাহিনী বিবল নহে। কিন্তু, সে একটি মানুষী তনুতে বিগ্রহাধিত উপাস্যের পূজা। শিষ্যের তিনি ইষ্ট, কল্যাণ-কম্পতরু। এ পূজা স্বাভাবিক, নিরর্থক নয়। নির্মলা দেবীর সেবা ছিল নির্বিচার, গুরুর পরিমণ্ডলে যারা এসেছেন সকলের জন্যই তাঁর সেবার ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। সম্ভবগুর মহাপ্রয়াণের পরও তিনি দীর্ঘ ২৫ বৎসর সে সেবা অক্ষুর রেখেছিলেন জীবনের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে। নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম। মুক্তি মোক্ষের কোন কামনার অবসর ছিল না তাঁর চিন্তায়, কর্মের ফলশ্রুতির অন্তরালে। সেবাই যেন ছিল তাঁর স্বর্ধর্ম।

হৃদয়স্তের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ স্বাসকষ্ট দেখা দেয় আগে থেকেই; সে কষ্ট তিনি স্বীকার করে নিতে চাননি। হয়ত পরিণত বয়সের ধর্ম, তিনি মনে করতেন। কর্মে তাঁর বিরতি ছিল না। দেব সেবা, অর্তিার্থ সেবা, পীড়িতের সেবা—এ সবের ভিতর দিয়ে তিনি নিঃস্বার্থে নিঃশেষ করে দিয়ে চলেছিলেন। নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিতা ছিলেন। ধীরে ধীরে ব্যাধি কালরূপে দেখা দিতে লাগল। কষ্টের অবধি ছিল না। শয্যা নিতে বাধ্য হলেন মৃত্যুর কয়েকটি দিন মাত্র আগে। হৃদয়স্তটি শুষ্ক হয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়েছেন ডাক্তার। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে জানতে চেয়েছেন যারা তাঁর সেবা-নির্ভর তাদের কথা। কাল শেষ পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, নিঃশব্দে সহ্য করছেন সব। ওই সেপ্টেম্বর রাত ৭টার আবার ডাক্তার এলেন। অবস্থা আরো গুরুতর, অভিমত দিলেন; হাসপাতালে নিয়ে

যেতে হবে, অক্সিজেন দরকার। নির্মলা দেবী শান্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন, ‘না, হাসপাতালে নয়, গ্যাস আমি নেব না।’ ডাক্তার হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন, বজ্রেন, আমার ওষুধ তো খাচ্ছেন না। মৃত্যু অবধারিত, গুরুর ভবিষ্যৎবাণী তিনি জানতেন; বিশ্বাস করতেন ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর দেহাবসান। সে বয়স এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে। আহার প্রায় ত্যাগ হয়ে গেছে, দুর্বলতায় দেহ অবসন্ন।

রাতি গভীর হয়ে এল, বৃহস্পতিবার ওই সেপ্টেম্বর, শুক্লা একাদশী। রাতি তৃতীয় ঘাম শেষ হয়ে চতুর্থ ঘামের সন্ধিক্ষণ এসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ রোগশয্যা থেকে একটু যেন অক্ষুট আওয়াজ শোনা গেল। একটি গুরুভাগিনী নিকটেই বারান্দায় শুলেছিলেন, দ্রুত উঠে গেলেন। নির্মলা দেবীর দেহ নিম্পন্দ, প্রাণহীন। ঘড়িতে তখন ৩টা ১৪ মিঃ। এমনি সময়ে প্রত্যহই তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। আজও তার ব্যতিক্রম হল না, জীর্ণ দেহবাসীটি ত্যাগ করে আতি-বাহিক দেহ নিয়ে নির্মলা দেবী চিরবিদায় নিলেন—কোন লোক-লোকান্তরের পথে?

শাস্ত্রে প্রয়াণকালে দেবযান ও পিতৃযান—জগতের এই মার্গ দুটিকে চিরন্তন মার্গ বলে উল্লেখ আছে। নিষ্কাম কর্মের উপাসকগণ দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন হয় না, তারা মুক্তপুরুষ। পিতৃ-যান মার্গে গতি লাভ হলে চন্দ্রলোকে গমন। সেখানে স্ব স্ব কর্মের পুণ্যফল ভোগান্তে তাঁরা মর্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। কর্মফল অভিজারীরা মুক্তির অধিকারী নহেন; সেই সাধকগণের পিতৃযান মার্গে গতিলাভ হয়। নির্মলা দেবী পুণ্যশীলা মহীয়সী নারী ছিলেন—নিষ্কাম। তিনি নিঃসন্দেহে আনন্দলোকে শ্রীগুরুর সাযুজ্য লাভ করেছেন। তাঁর দেহান্তর ঘটেছে একটি মহাক্ষণে। এটি একটি মহাশুদ্ধিক্ষণ। ক্ষণ অঘটনঘটনপটীয়াসী মহাশক্তি। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর ‘অখণ্ড মহাযোগ’ গ্রন্থে বলেছেন, ক্ষণের গুপ্তরহস্য পৃথিবীতে এখনো অস্পষ্ট উদঘাটিত হয়েছে। ক্ষণ বস্তুটি যে কি তা বোঝাবার ভাষা নেই। কারণ ইহা আদি সৃষ্টির পূর্বেও ছিল, মহাপ্রলয়েও থাকবে। জগদতিরিক্ত

বস্তু জাগতিক মানুষের বোধগম্য নহে। ক্ষণ রয়েছে সকল সৃষ্টির প্রেরণার মূলে। প্রলয়েরও দ্যৌতক এই ক্ষণ। নির্মলা দেবীর মহাপ্রয়াণ ব্রাহ্মক্ষেত্রে, ইহা অতিশয় শুভ ইঙ্গিত বহন করে।

তার জন্ম ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে। তিনি এসেছিলেন সদ্য স্বামীপুত্রবিয়োগ-বিধুরা, বাল্য বিধবার বেশে, ১৮ বৎসর বয়সে। সংঘের নানা সেবামূলক কর্মের ভেতর দিয়ে, তাঁর চারিত্রিক উন্মেষের সুযোগ আসে। তারপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সংঘজননীর ভিরোভাবের অনতিকাল পরে তাঁর উপরে ন্যস্ত হয় শ্রীমতিজালের সেবার দায়িত্ব—সর্বময় পরি-চর্যার গুরুভার। এই দায়িত্ব তিনি বহন করে গেছেন অতুল্য নির্ভা ও যোগ্যতার সঙ্গে। পেয়েছেন গুরুর অফুরন্ত আশীর্বাদ।

প্রায় ৫০ বৎসর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অজস্র ঘটনাবলীর

ভিতর দিয়ে আমি তাঁকে জ্ঞানবার সুযোগ পেয়েছি। সংঘ-গুরু ১৯৪২ সালে পূর্ণ একটি বৎসরের জন্য তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে, প্রবাসবাসে নানা স্থানে কাটিয়েছিলেন অজ্ঞাতবাসের মতই যোগাযোগ ছিন্ন করে, নির্জনে। আমি ছিলাম তাঁর ব্যবস্থার দায়িত্বে তাঁর সহগামী। নির্মলা দেবী ছিলেন আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের প্রাণ। সেই একটি বৎসর যে সেবা তিনি দিয়েছিলেন প্রাণের দেবতাকে খুশিতে ভরিয়ে দিয়ে, তা আমি অনুভব করেছি। তার বর্ণনা নেই। আমি তাঁকে জেনেছি এমন করেই দিনের পর দিন বহু ঘটনার সংস্পর্শে এসে। তিনি চলে গেছেন জ্ঞান-রাজ্যের আলোকিত পথে যেখানে আবহমান কাল শূর্যপক্ষ ও উত্তরায়ণ বিরাজিত। রেখে গেছেন পশ্চাতে আমাদের অস্তরে ও বাহিরে চারিদিকে বিরাট একটি অপূরণীয় শূন্যতা।

—দুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

সময় যেন

গৌরী ধর্মপাল

ছুটোছুটি ব্যস্ত ভিড়ের গা বাঁচিয়ে সহর থেকে দূরে
হিম ছায়া রোদ্দুরে
বাগান পুকুর নির্জনতায় ঘেরা এ-আশ্রমে
সময় যেন থেমে।

ঘাস বিছিয়ে মাঠের মাদুর পড়েই থাকে থির
সারাটা দিন সারাটা রাস্তির
আমলকি-ডাল পাতা কাঁপায় তির্ তির্ তির্ তির্
মন্দিরেতে ষষ্ঠী বাজে, ধীরে আকাশ রাঙে
সময় থেমে...থেমেই থাকে, সময় থাকে থেমে।

চোখে-আকাশ পুকুরখানি জল টলমল করে
মৃদু হাওয়া দোলায় পাতা কলাগাছের সারে
ধূপসুবাসী ঠাণ্ডা ঘরে নিভুতে মন জমে
সময় থাকে থেমে...সময়...সময় থাকে থেমে।

মান সজনে কাঁঠাল বকুল—একটু বনশুলী
তাল-সুপুঁরি ঘাড়নড়ানড়, কলের চাতাল, গলি
কলকে টগর শিউলি থলোপদ জবা ফোটে
মা-পৃথিবীর বুক-হোঁয়াতে
পুকুর-পাড়ে গাছ-ছায়াতে

দিনটা শামুক-হাঁটে

ঘড়ির কাঁটা ঠুক ঠুক ঠুক এগোয় জিরোয় ঘামে
সারা দিনে গুটি গুটি সূর্য পেরোয় আকাশ কোন ক্রমে
চাঁদ-তারারা ব্যস্ততা নেই দিগন্ত-মই বেয়ে বেয়ে

আস্তে আস্তে নামে

সময় যেন থেমেই থাকে—সময় থাকে থেমে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব

শ্রীমুখীকুমার বসু

রবীন্দ্রনাথের মত বিশাল বারিধিতে ষট্ ডুবিয়ে কত তীর্থকজন যে তীর্থ সলিল ভ'রে নিয়ে চলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সেই জলাশয়ে কেউ বলছেন তাঁকে দার্শনিক, কেউ বলছেন সাম্যবাদী, কেউ বলছেন বৈদিক ভারতের ঋষি, আবার কেউ বা বলছেন মিষ্টিক। কত জনে কত কথাই না বলছেন—আর কবিতো নিজেই বলেছেন, 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অব্রূপ রতন আশা করি।' সেই অব্রূপ রতনের আকরে বৈষ্ণবীয় দর্শনের সমন্বয়বাদ, কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে সে বিষয়েই এই আলোচনা। বাইরের কোন মনগড়া যুক্তি তত্ত্ব খাড়া না ক'রে, তাঁরই রচনার মধ্য দিয়েই অর্থাৎ তথ্য দ্বারাই বক্তব্য উপস্থাপিত করার চেষ্টা করবো—অর্থাৎ গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা হবে। অবশ্য অঙ্কের হস্তি দর্শনবৎ ঘটনা রোধ করা যাবে না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব—বিষয়টি একটি বিরাট ক্যানভাস এবং সে আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়। সেই কারণে তার পরিসরকে সীমিত করে আমার বক্তব্য কাব্যালোচনার সীমাবদ্ধ রেখেছি।

যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ছোদ্দ বছর তখন থেকেই মন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ ক'রে। ঐ পদাবলীর, ব্রজবুলি ভাষা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোঁতুহল ছিল। তাঁর ফলে রবীন্দ্রনাথের “ভানুসিংহের পদাবলী” গাঁধবার প্রয়াস ও ক্রমে তাহার প্রকাশ। অর্থাৎ কৈশোরের এই বৈষ্ণব তবুচ্ছায়ার আগ্রহ, তাঁর জীবনে স্নিগ্ধতা, রম্যতার ছায়া দান করেছিলো।

এবার সুরু করা যাক তাঁর প্রথম জীবনের লেখা কাব্য-গ্রন্থ “কড়ি ও কোমল” থেকে ‘মধুরায়’ কবিতা যেখানে কবি বলছেন ‘বিকচ-বকুল ফুল, দেখে যে হতেছে ভুল,/ কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়। / এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,/ওই কি নুপুরধ্বনি বনপথে শূনা যায় / একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,/সো-ভরি সে মুখ শশী পরাগ মিজল্ সই / বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই / একবার রাখে রাখে ডাক বাঁশ মনোসাথে / আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।

‘বাঁশ’ কবিতায় কবির সঙ্গে আমরাও শুনতে পাচ্ছি :

‘ওগো শোনো কে বাজায়/বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশরি তানে মিশে যায় / অধর ছুঁয়ে বাঁশখানি চুরি করে হাসি-খানি/ব'ধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায় / ওগো শোনো কে বাজায়/কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশরি মাঝে গুঞ্জরে,/বকুলগুঞ্জি আকুল হলে বাঁশরি গানে মুঞ্জরে/যমুনারি কলতান কানে আসে কাঁদে প্রাণ/আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়/ওগো শোনো কে বাজায় ॥

‘বিরহ’ কবিতায় একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

‘ওই ব'শি-ধর তার আসে বারবার/সেই শুধু কেন আসে না।/এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে/কৈদে মরে শুধু বাসনা/... আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা/প্রভাতে চরণে ঝরিব/ওগো আছে সুশীতল জল/দেখে তারে আমি মরিব।

‘দেহের মিলন’ কবিতায় পাই :

‘প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে/প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন/হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে/মুঁচি পড়িতে চায় তব দেহ’ পরে / আমার এ দেহ মন চির রায়ি দিন / তোমার সর্বঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

‘পূর্ণ মিলন’ কবিতায় : ‘নিশিদিন ক'াদি সখি মিলনের তরে/যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন/লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে/লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।’

‘সোনার তরী’ গ্রন্থ থেকে ‘বৈষ্ণব’ কবিতা যার আরম্ভের কয়েকটি চরণ : ‘শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান/পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান/অভিসার, প্রেম-লীলা, বিরহ মিলন/বৃন্দাবন গাথা, এই প্রণয় স্বপন/প্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কুলে/চারি চক্ষু চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে/তপ্ত প্রেম তৃষা ? এ গীত উৎসব মাঝে/শুধু তিনি আর ভক্ত নিজ'নে বিরাজে/ সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি/কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি/রেখেছিলে মগ্ন করি এত প্রেম কথা/রাধিকার চিত্ত দীন তীব্র ব্যাকুলতা / এই প্রেম গীত হার মিলন মেলায়/ কেহ দেয় তাঁরে কেহ ব'ধুর গলায়/দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই প্রিয়জনে/প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই, তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা/দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা / যার ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে/অনামি মেহের হাসি হাসিছেন বসে।

‘ব্যর্থ যৌবন’ কবিতায়—

‘আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে/এসেছি/বাহি বৃথা মনো-আশা এত ভালোবাসা/বেসেছি শেষে নিশি শেষে বদন মলিন/ক্রান্ত চরণ মন উদাসীন/ফিরিয়া চলেছি কোন সুখ হীন/ভবনে।

“কথা” কাব্যগ্রন্থের কবিতা ‘স্পর্শমণি’—সেত সকলেরি পড়া, সকলেরি জানা। নদী তীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে জপিছেন নাম/হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে করিল প্রণাম / শুধালেন সনাতন কি হেতু আগমন...তখন সেই বিপ্র বলেন, বড়ই দুখী দারিদ্র্য কারণে শিবের সাধনা করে স্বপ্নাদেশ পাই/যাও যমুনার তীর সনাতন গোস্বামী ধরো দুটি পায়/তীরে পিতা বলি মেনো/তীরি হাতে আছে জেনো ধনের উপায়...সনাতন গোস্বামী ত বিস্মিত, বলেন, অর্থ ধন দৌলত যা ছিল সব ত্যাগ করে এসেছি...সহসা বিস্মৃতি ছুটে সাধু ফুকারিয়া উঠে ‘ঠিক বটে ঠিক একদিন নদী তটে কুড়িয়ে পেয়েছি বটে পরশ মানিক/যদি কভু লাগে কাজে / সেই ভেবে ওইখানে পু’তেছি বাসুতে...এই কথা-শুনে সেই ব্রাহ্মণ শশবাস্ত হয়ে বালি খোঁড়াখুঁড়ি করে পরশ-মণি পেয়ে নিজের হাতে কোমরে জোহার মাদুলীতে ঠেকাতে লোহা সোনা হয়ে গেল ; ব্রাহ্মণ ত আনন্দে হতচকিত—তার পর চেতনা ফিরে পেয়ে, ছুটে গেল তাঁর পায়ে, বলে ‘যে ধনে ছইয়া ধনী মণিরে মানোনা মণি তাহারি ঋনিক / মাগি আমি নত শিরে/এত বলি নদী নীরে ফেলিল মানিক।

“কাহিনী” কাব্যগ্রন্থের ‘দীনদান’ কবিতাটির কথা স্মরণ করুন—যেখানে রাজভৃত্য রাজাকে নিবেদন করছে—মহারাজ আপনার বিপুল স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে যে দেবালয় তৈরী করে দিয়েছেন, যেখানে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দেবতার পূজার সঙ্গে আপনার জয়গান করা হয়, সেখানে দেবতাকে গান না শুনিয়ে, সেই মন্দিরে আশ্রয় না নিয়ে, পথে গাছের তলায় সাধু শ্রেষ্ঠ নরোত্তম নাম সংকীর্তন করছেন আর দলে দলে ভক্ত এসে তাতে যোগ দান করছে। রাজা শুনে ক্ষোভ ভরে ঠাকুর নরোত্তমের কাছে গিয়ে দেখেন দরিদ্রগলিত ধারায় নাম সংকীর্তন হচ্ছে, পথে আর দাঁড়াবার স্থান নেই এত লোকারণ্য—ওধারে শূন্য মন্দিরে নিঃসঙ্গ দেবতা ; তিনি নরোত্তম ঠাকুরকে অনুরোধ জানালেন—এমন সুন্দর দেবালয় বিশালক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে যার প্রতিষ্ঠা, সেখানে আপনি আশ্রয়

না নিয়ে, সেইখানে দেবতাকে নাম গান না শুনিয়ে এই পথের ধলায় কেন অবস্থান করছেন। প্রত্যুত্তরে নরোত্তম দীন ভাবে জানালেন, ওখানে রাজার দণ্ড মূর্তি বিরাজ করছে, দয়ালের নয় : ‘যে বৎসর বহিঁদাহে দীন বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন, অমবজ্জহীন দাঁড়াইল ঘারে তব ফিরে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়/ সে বৎসর রচি ওই স্বর্ণ দৃপ্ত ঘর / দেবতারে সমর্পিলে, সে দিন কহিলা ভগবান / রাখি গৃহহীন নিজ প্রজাগণে, সে আমারে গৃহ করে দান/পথ প্রান্তে তরুতলে দীন সাথে আমার আশ্রয়।

কবি তাঁর পিতৃদেবকে উৎসর্গীকৃত কাব্যগ্রন্থ ‘নৈবেদ্য’ যার সবকটি কবিতাই পরমকে নিবেদিত এবং এই কারণেই নৈবেদ্য নামের সার্থকতা। বৈষ্ণবজনোচিত দীনতা এই কাব্যগ্রন্থের প্রাণ। এর থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজন কোথা ?

“গীতাঞ্জলি” গ্রন্থ সম্বন্ধেও বলতে হয় ঐ একই কথা। বৈষ্ণবীয় ভাবধারায়, ভক্তিরসাম্পন্ন দাসানুদাসের আত্মনিবেদন। প্রথমে প্রথমটির কথা উল্লেখ করতে হয়। ‘আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার/চরণ ধূলার তলে সকল অহঙ্কার হে আমার/ডুবাবো চোখের জলে।

এটি শুধু যে বৈষ্ণবজনের আকুলতা তা নয়, এটি সমগ্র ভারতবাসীর কথা তথা শূভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্ব মানবতার অন্তর প্রার্থনা। গীতাঞ্জলি থেকে বেছে নিয়ে বলবার পথ নেই, কারণ সামগ্রিকভাবে সবকটিই আত্মনিবেদন—নিজেকে সমর্পণ। যেমন : কত অজানারে জানাইলে তুমি, বিপদে মোরে রক্ষা করো, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতম হে, তুমি নব নব রূপে এসো, জগৎ জুড়ে উদার সুরে, অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, ধনে জনে আছি জড়িয়ে ছায়ে, আমার মিলন লাগি তুমি, এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, আসন তলে মাটির পরে, রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি, আকাশ তলে উঠলো ফুটে আলোর শতদল, কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ, জীবন যখন শূকায় বায় কবুণা ধারায় এসো, বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী, ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, আমার মাঝে অসীম তুমি, একটি নমস্কারে প্রভু, বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার, এই করেছে ভালো নিষ্ঠুর/এই করেছে ভালো এমনি করে হৃদয়ে মোর তীর দহন ছাজো/আমার এ ধপ না পোড়োনা গাছ সিন্ধু

নাহি ঢালে/আমার এ দীপ না জ্বালালে/দেয় না কিছুই
আলো। গীতাজলি থেকে এতগুলি উল্লেখের হেতু, যেখানে
আত্মনিবেদনের প্রাধান্য, সেখানে সব বাঁধনের বাধা শিথিল
হয়ে যায়। বৈষ্ণবীয় ধর্মতত্ত্বের মূল কথা দীনাতদীনের
মত, কাঙালের মত, আত্মসমর্পণ। ঐক্যত্বের প্রকাশ নয়।
চাই অধীনতা—নিজেকে বিলিয়ে দেবার আকৃতি। চাই
আঁত। সেই হৃদয় আরতির সন্ধান পাশ্চাত্য জগৎ পেয়েছিল,
তাঁর এই গীতাজলীর মধ্যে—তাই স্বীকৃতিও আসতে দেবী
হয় নি। বিশ্বসাহিত্যের স্বীকৃতিরূপে নোবেলের সম্মানে
রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা ভূষিত করেছিলেন—বৈষ্ণবীয় ভাবের জয়
হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হতে সাগরের বাজুকগার মত
সংগৃহীত যা এতক্ষণ উল্লেখ করা হল তার সবকটিতেই
বৈষ্ণবজনোচিত আঁতির যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। বৈষ্ণব
সাধু, গোস্বামী, মহাজন সম্পর্কীয় কয়েকটি রচনার এবার
উল্লেখ করছি।

“পুনশ্চ” কাব্যগ্রন্থের ‘শুচি’ কবিতায়, রায় রামানন্দ্যের
শিষ্যরা গুরুকে খুঁজতে খুঁজতে এসে অন্তর পঙ্খীতে তাঁকে
প্রেম বিলাতে দেখে ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, এ কি করলেন
প্রভু! রামানন্দ্য বলেন, আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে
হারিয়েছিলাম/আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।

‘প্রেমের সোনা’ কবিতার কথায়; যেখানে রবিদাস চামার
রামানন্দ্যকে দেখে প্রণাম জানায়। রামানন্দ্য শূন্যে
‘বন্ধু কে তুমি’? উত্তর পেলেন, “আমি শূন্যে। খুলো,
প্রভু তুমি আকাশের মেঘ, ঝরে যদি তোমার প্রেমের
ধারা/গান গেলে উঠবে বোবা খুলো—রামানন্দ্য নিলেন তাকে
বুকে। চিতোরের রাণী ঝালি তাঁর নাম, ঐ রবিদাস
চামারের কাছে হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন। ‘স্নান সমাপন’
কবিতায় গুরু রামানন্দ্য গঙ্গার জলে নেমেও স্নান সমাপন
করতে পারছেন না, বিরস বদনে উঠে চলেছেন—শিষ্য
শূন্য ‘কোথা যাও প্রভু ওদিকেত নেই ভদ্র পাড়া, রাম
রাম—ভাজন মুচির ঘর। ভাজন দেখতে পেয়ে লুটিয়ে
পড়ে প্রণাম করলে ছোঁয়াচ বাঁচিলে—গুরু তাকে বুকে নিলেন
তুলে; ভাজন বাস্তু হয়ে বলে, কী করলেন প্রভু/অধমের
ঘরে মলিনের গ্রানি লাগলো পুণ্যদেহে।’ রামানন্দ্য বলেন,

স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে/তাই যিনি সবাইকে
দেন ধৌত করে/তাঁর সঙ্গে মনের মিল হলো না/এতক্ষণে
তোমার দেহে আমার দেহে/বইলো যে বিশ্বপাবন ধারা।

‘রঙেরাজনী’ কবিতায় দিঘিজুরী পণ্ডিত শঙ্করলালের
পাগরিতে দেবতার উদ্দেশে একটি শ্লোকের একটি চরণ
লেখা আছে ‘তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে’ শ্লোকের
অপর একটি চরণ পূরণ করে দিতে রঙেরাজীর কন্যা আমিনা
অগোচরে লিখে দিলে, ‘পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের
মাঝে।’

বাঁগত উদ্ধৃতিগুলির সম্পূর্ণ কবিতার আত্মদানে মন
যেসব ভাবে উদ্বেল হয়ে ওঠে তা হচ্ছে সবাইকে আপন
করা। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়া, সে যে
কি জিনিস—যিনি পেয়েছেন তিনি বুঝেছেন—তিনি-ই
রসিক জন। আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ রচনা শেষ
করাছি।

ঐ “পুনশ্চ” কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘মুষ্টি’ কবিতার একটু
উল্লেখ করছি। একতারা বাজিয়ে কীর্তনী প্রাসাদের বাইরে
গান শোনাচ্ছে—

‘ঠাকুর! তোমায় কে বসাল কঠিন সোনার সিংহাসনে/
তমাল কুঞ্জে বনের পথে শ্যামল ঘাসের কামা এলেম শূনে/
ধূলোয় তারা ছিল যে কান পেতে/পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে
আঁকা, এই ছিল প্রত্যাশা/প্রাণের ঠাকুর এরা কি পাথর
গোঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে/তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে
ধূলোয় তোমার পরশ আমার পরশ/মিলবে বলে/ঘুচবে তোমার
নির্বাসনের ব্যথা ছাড়া পাবে হৃদয় মাঝে।

এই যে কবির রচনায় নিজেকে দেবতার চরণে সমর্পিত
ভাব, প্রসঙ্গ, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, আকুলতা, অন্তর-আঁত
সহযোগে মাধুর্য আত্মদান করা, সেইত পাঠকের চিত্তকে
বিনম্র বিনীতিতে মগ্নিত করে, হৃদয়কে দ্রবীভূত করে—এই ত
বৈষ্ণব দর্শনের গ্রেম ধর্ম। সকলকে কোল দিতে তাই সব-
খানে ছুটে যান—তাই দেশে দেশে ঘর খুঁজে পান।
নিখিলকে আপনার হৃদয় মধ্যে পেতে, তথা সমগ্র ভারতের
মধ্যে বিশ্বকে দেখতে—বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ স্থাপিত হলো—
বিশ্বভারতী; সেই চিন্তাধারায় মিলনের আর একটি সংস্থার
নামকরণ হলো ‘মহাজাতি সদন’।

গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মমতের পরিচয়ে শ্রীচৈতন্যদেব, প্রেম-বিহ্বল ভক্তিরসের প্রবাহে, ঈশ্বর-সাধনার যে স্বরূপ তাঁর জীবন দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন, তাতে দেবতা মানুষের আপনজন হয়ে ধরা দিয়েছেন এবং মানুষের মধ্যে দেবতা প্রকট হয়ে উঠেছেন এবং সেই ভাব যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে কাব্যে ও সঙ্গীতে বিস্তার লাভ করেছে সেইটি বলার জন্যই এই আলোচনা।

অভিধানিক অর্থে বৈষ্ণব তিনি যিনি বিষ্ণুভক্ত। যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শূনা যায় তিনিই বৈষ্ণব। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে—“যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম / তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান। তাহলে প্রকারান্তরে বলতে পারা

পারা যায়, যাঁকে দেখলে হৃদয়ে প্রীতি জাগে, চিত্ত প্রজ্জ্বলিত হয়, যাঁহাতে সকলে আকৃষ্ট হয় তিনি সেই পুরুষ প্রধান।

বৈষ্ণব দর্শনের সেব্য-সেবকভাব মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের আলোচিত রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব মতের মূল অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, তাই তাঁরা মায়্যবাদ সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন জগৎ নশ্বর কিন্তু মিথ্যা নয়। আর রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ‘তাই তোমার আনন্দ আমার’ পর/তুমি তাই এসেছ নিচে/আমায় নইলে ঘিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ’ত যে মিছে।

তানসেনের বিবাহ

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

তানসেনের বিবাহ নিয়ে নানা গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন আকবর বাদশাহ নাকি বিবাহ দিয়েছিলেন। এ ধারণা অলীক। ছেলেবেলাতে তানসেন খুবই দুরন্ত ছিলেন। কর্তব্য কাজ করতেন না। পিতার আজ্ঞানুসারে সঙ্গীত চর্চা করতেন না। শুধু মাঠে গরু চরাতেন। পিতা মুকুম্ভরাম পাণ্ডে ছেলেকে শুধু ভৎসনা করতেন কিন্তু ষেঁষ অবলম্বন করে ছেলেকে সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন নি। মুকুম্ভরাম দুঃখ পেতেন।

মুকুম্ভরামের সন্তান হয়েই মরে যেত। তাই তিনি গিয়েছিলেন হজরৎ গউস নামে এক মুসলমান সিদ্ধ পীরের কাছে। তাঁর কাছ থেকে মুকুম্ভরাম এনেছিলেন গুধু, কবচ এবং সবচেয়ে বড়ো সিকাপুরুষের আশীর্বাদ। এহেন মহাত্মার আশীর্বাদে যে সন্তান জন্মাল সে হল কিনা কুপুত্র। একদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে ছেলেকে বললেন, ‘তুমি রাখালদের মতো গরু চরাওগে যাও।’ পিতার ক্ষোভে অভিমান হলো তনুয়ার (পরবর্তী তানসেন)। তিনি ধীরে ধীরে পৈত্রিক ভবন থেকে বের হয়ে বন জঙ্গল, গিরি উপত্যকা নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এর ফলে তাঁর অন্তরের অনাহত সঙ্গীত প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বনিত, মুখরিত হয়ে উঠলো। এক অভূতপূর্ব আনন্দ পেলে তিনি। প্রকৃতির উন্মুক্ত বুকে থেকে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠলো। নদীর কলতান, পাতার মর্মর ধ্বনি, পাখীর গান, পশুদের ডাক, মানুষের নানারকম ভাষা তাঁকে আবিষ্ট করে ফেললো। বিচিত্রতার মধ্যে তিনি এক ঐশী শক্তির বিকাশ অনুভব করতে পারলেন। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করে তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। তিনি গেয়ে উঠলেন—

‘প্যারে তুঁহি ব্রহ্ম, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি রুদ্র, তুঁহি শক্তি...
তুঁহি শোরা। তুঁহি জল, তুঁহি ধল, তুঁহি পবন, তুঁহি
আকাশ...। তুঁহি রোয়ত, তুঁহি হসত, তুঁহি উঠত, বৈঠত,
চলত, তুঁহি চুরা ॥ তানসেনকে প্রভু—একই অনেক হোয়,
জগমে হজুরা ॥’

প্রকৃতির মধ্যে তিনি আদি নাদ বা প্রণব ধ্বনি শুনতে পেয়ে নাদব্রহ্মের অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন। বেদ পড়েন নি, অথচ তাঁর মধ্যে বেদজ্ঞান জন্মেছিল। বলতেন, ‘আদনাদ অনহদ ভয়ো তাতে উপাজ্যো বেদ ॥

ঈশ্বর তাঁর কাছে প্রকৃতই প্রিয়তম হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিশ্বপ্রেমে মগ্ন হয়ে গেলেন। যে তানসেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্য পিতৃব্যাক্য অবহেলা করেছিলেন সেই সঙ্গীত এখন সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে রইলো। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে জীব-জন্তুর স্বর নকল করবার এক বিশেষ ক্ষমতা তাঁর জন্মেছিল। বারাণসীর কাছাকাছি এক বনে তানসেন গরু চরাচ্ছেন, সেই সময় সঙ্গীতসাধক ও যোগী হরিদাস স্বামী বৃন্দাবন থেকে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে বারাণসীর দিকে যাচ্ছেন। বালক তানসেন এঁদের দেখলেন। বালসুলভ চপলতা জাগলো তাঁর মনে। তিনি লুকিয়ে থেকে বাঘের ডাক ডেকে উঠলেন। শাদৃশ্যের শূনে হরিদাস স্বামী ভাবলেন, এই সামান্য বন তাও আবার বারাণসীর মতো জনপদের কাছে, এখানে এ জন্তু আসবে কি করে? তিনি শিষ্যদের খোঁজ করতে বললেন। শিষ্যরা চারদিকে খুঁজে বালক তানসেনকে ধরে নিয়ে গেলেন। হরিদাস স্বামী দেখেই বুঝতে পারলেন এ বালক অতি প্রতিভা সম্পন্ন, তবে ভাবগুলি এখনও সূক্ষ্মভাবে রয়েছে। তিনি কথাবার্তা বলে পরিচয় জানলেন। তারপর তানসেনকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসীর উপকণ্ঠে মুকুন্দরাম পাণ্ডের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার ছেলেকে আমি সঙ্গীত বিদ্যা শেখাব তুমি অনুমতি দিলে আমি একে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবো'। মুকুন্দরাম সানন্দে রাজী হলেন।

কয়েকবছর বৃন্দাবনে নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত বিদ্যা শেখেন তানসেন। তানসেন তখন নবযৌবনে পদার্পণ করেছেন। একদিন শুনলেন পিতা গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে দেখার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি। গুরু হরিদাস স্বামীর অনুমতি নিয়ে গৃহের দিকে যাত্রা করলেন। গিয়ে দেখলেন পিতা মুমূর্ষুপ্রায়। অস্পৃশ্যের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলো। মৃত্যুর আগে তিনি তানসেনকে বলে গেলেন, 'বেটা তুমি গোয়ালিয়রের মুসলমান সিন্ধুপুরুষ হজরৎ মুহম্মদ গওস তোমার পিতৃতুল্য। তুমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবে ও তাঁর উপদেশ যত্ন করে শুনবে।'

পিতৃবিরহে তানসেন কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি বৃদ্ধা জননীকে সঙ্গে নিয়ে আবার বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হলেন। পথে যেতে যেতে পতিবিধূরা বৃদ্ধা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। এতে তানসেন আরো শোকাহত হলেন।

পিতৃমাতৃহীন অনাথ তানসেন এই দারুণ বিপদে পড়ে উদাসীনের মতো ঘুরতে ঘুরতে একসময় বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। হরিদাস স্বামী তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। অভ্যাপদেশ দিয়ে শোকগ্রস্ত তানসেনের চিন্তে খানিকটা শান্তি আনতে পারলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই গোয়ালিয়রে যাবার জন্যে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। পিতার অন্তিম ইচ্ছা বার বার তাঁর মনে উদিত হতে লাগলো। স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি গোয়ালিয়রে রওনা হলেন। সেখানে গিয়েই তিনি হজরৎ মুহম্মদ গওসের সন্ধান করতে লাগলেন। সাক্ষতের সঙ্গে সঙ্গে গওস তানসেনকে পিতৃস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তিনি বললেন, 'বেটা, তোমাকে তোমার বিষয়ের উত্তরাধিকার নিতে হবে। সাদী করা দরকার। আর আমার কথামতো তোমাকে চলতে হবে।'

তানসেন স্বীকার করলেন। বৃদ্ধ গওসের সঙ্গে কিছুদিন বাস করলেন। ওখানেই তিনি গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা রাজা মানের বিধবা পত্নী রাণী মৃগনয়নার গানের সুখ্যাতির কথা শুনলেন লোকমুখে। রাণীর গান শোনার ইচ্ছের কথা দু'একজনের কাছে প্রকাশও করলেন। কোন ক্রমে এ সংবাদ রাণীর কাছে পৌঁছাল। রাণী অনুমতি দিলেন। তানসেন প্রাসাদে গিয়ে রাণীর গান শোনের, রাণীকে নিজের গান শোনান আবার কখনো বা রাণীর শিষ্যদের গান শোনের। এইভাবে যাতায়াত করতে করতে তানসেন তাঁর অন্তরে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। সঙ্গীতের রাজ্যে বাস করে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করলেন।

সঙ্গীতের জন্য তানসেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রিয় হয়ে উঠলেন। জন্ম লগ্নেই তো মুসলমান পীর হজরৎ মুহম্মদ গওসের আশীর্বাদ রয়েছে। কাজেই দুটি সম্প্রদায়ের প্রভাব তাঁর জীবনে এসে পড়েছিল। তাঁর রচিত সঙ্গীতেও তা বর্তমান। যেমনি রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করেছেন, তেমনি আকবর বাদশাহও। গানে রামচন্দ্রজীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'অচল রাজ্য করো কোট বরষ লোঁ চিরজীব রহো রাজাধিরাজ 'রামচন্দ্র।' আবার আকবর বাদশাহকেও বলেন, 'অচল রাজ্য করো লাখ বরষ লোঁ কায়ম রহো মহম্মদশাহ আকবরশাহ।'

এখানে ‘চিরঞ্জীব রহো’ ও ‘কায়ম রহো’ এই দুটি বিভিন্ন শব্দ চম্পন লক্ষ্য করার। তাঁর একটি গানে তিনি প্রিয়তম ঈশ্বরকে বলেছেন ‘তুঁহি পুরাণ তুঁহি কুরাণ’।

বলেছেন ‘তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ তুঁহি হাদীশ তুঁহি কুরাণ।’

প্রবাদ আছে তানসেন একসময় যেখানে বাস করতেন সেখানে একটি ছোট নদী ছিল। নদীর ওপারে ঝিলমিলা-নন্দ নামে মহাদেবের মন্দির ছিল। রোজদিন নদী পার হয়ে তিনি দুধ নিয়ে মহাদেবের পূজা করতে যেতেন। একদিন বৃষ্টিতে নদী ভরপুর। অন্যদিন তিনি পাশে করে দুধ নিয়ে যেতেন। সেদিন নিরুপায় হয়ে মুখের মধ্যে দুধটুকু নিয়ে সাঁতার দিয়ে ওপারে গেলেন পূজার জন্যে। তখন নারিক দৈববাণী হয়েছিল। ফলে তানসেন মুসলমান হলেন।

যাই হোক গোয়ালিয়রে রাণী মৃগনয়নার কাছে তানসেন প্রায়ই যেতেন। রাণীর একটি শিষ্যার প্রতি তানসেনের মন আটকে গেল। আশ্চর্য সেই শিষ্যার পিতাও ছিলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ। তাঁর পূর্ব নাম ছিল প্রেমকুমারী। পরে যখন তার পিতা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হলেন তখন লোকে তাঁকে হোসেনী ব্রাহ্মণী বলতো। তানসেন এই হোসেনী ব্রাহ্মণীর প্রতি আকৃষ্টা হলেন। প্রেমকুমারী শূণ্ড অতিশয় সুন্দরী ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত সুগায়িকাও। তানসেন তাঁর সৌন্দর্যে ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

বলাবাহুল্য প্রেমকুমারীরও তেমন অবস্থা। প্রেমকুমারী রাণী মৃগনয়নার শিষ্যা কাজেই শিষ্যা রাণীর কাছে নিজের প্রণয়ের কথা বলতে পারেন না। আবার তানসেনও রাণীকে বলতে পারছেন না। কিন্তু বেশীদিন তাঁদের এই প্রেমের কাহিনী চাপা থাকলো না। রাণী শুনলেন সব। দেখলেন দুজনের প্রেম স্বাভাবিক, তারপরে দুজনেই সঙ্গীতজ্ঞ। রাণী মৃগনয়না দুজনের বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু একটি বাধা প্রবল হয়ে দাঁড়ালো। প্রেমকুমারী এখন মুসলমান। তাহলে তানসেনের বিবাহ মুসলমান শাস্ত্র মতেই হতে হবে। তাই রাণী গোয়ালিয়রের সিদ্ধপুরুষ মুহম্মদ গওসের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

গওস তানসেনকে খুবই ভালবাসতেন। তিনিও বললেন, হোসেনী এখন তো আর হিন্দু নয়, যদি তানসেন তাঁকে বিবাহ করতে চান তো তানসেনকে মুসলমান শাস্ত্র মতে করতে হবে। প্রেমের জন্যে তানসেন ধর্মের সংস্কার বিসর্জন দিলেন।

গোয়ালিয়রে বিবাহ হলো। তখন তানসেনের বয়স বছর বাইশ। এই বিবাহে তানসেনের সঙ্গীত জীবন আরো পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেল।

যে সঙ্গীতজ্ঞ মহারাণী মৃগনয়নার যত্নে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল তারজন্যে তানসেন বরাবর কৃতজ্ঞ ছিলেন। কোন কোন গানে তাঁকে তারার মধ্যে ‘তারকা’ বলেছেন, ‘চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী তারামধ্য তারকা’। আবার কোন গানে বলেছেন ‘চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী হংসগমনী চলিহে পূজন মহাদেব।’

সঙ্গীতের পথ দিয়ে যোগযুক্ত হয়ে তানসেন প্রসন্নতা লাভ করেছিলেন। তার মনে নিরানন্দ ছিল না। যোগীদের সংসারে আমোদ প্রমোদের মধ্যে সতত আত্মার দিকে দৃষ্টি স্থির থাকে। তাঁরা আত্মদৃষ্টি অভ্যাস করেন, কারণ তাঁরা জানেন আত্মা হলো আনন্দরূপ। যোগের সঙ্গে এই আনন্দোচ্ছাস তানসেন তাঁর একটি গানে প্রকাশ করেছেন—‘গুণী গন্ধর্ব কিশোর গায়ে নারদ মুনি বীণা বাজিয়ে অমঙ্গল হোতে দূর দুখ ধন্দ কন্দ। শূভ ঘড়ি শূভদিন শূভ পল শূভ মহরত শূভ চন্দ্র শূভ নক্ষত্র চকত বৈঠে সখ্যা অমৃত যোগ তানসেন মন ভেও আনন্দ।’ অর্থাৎ গুণী গন্ধর্ব কিশোরেরা গাইছে, নারদমুনি বীণা বাজাচ্ছেন, অমঙ্গল দুঃখ, ধন্দ সব দূরে চলে যাচ্ছে। শূভ সময়, শূভ দিন, শূভ পল, শূভ মূহূর্ত, শূভ চন্দ্র, শূভ নক্ষত্র—এমন শূভ সময়ে আসনে উপবিষ্ট হয়ে অমৃত যোগ সাধনে তানসেনের মনে আনন্দ বিরাজ করছে। আত্মার যোগ সাধনে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে তানসেন পরমাত্মাকে ‘আনন্দমণি সুখ নিধান’ বলেছেন। তানসেনের শিবের নাম ছিল ‘ঝিলমিলানন্দ’।

এই আনন্দের বিন্দুতে জীবাত্মার সন্তোষ হয়—এর অন্যতম কারণ নাদ। নাদের ধাতুর সঙ্গে আনন্দের ধাতুর বিশেষ সম্পর্ক আছে। উপনিষদে যেমনি তেমন সঙ্গীত

শাস্ত্রেও নাদবিম্বকে আত্মা ও তাঁকে পরমাত্মার প্রতীক বলি
বর্ণনা করা হয়েছে। আনন্দে নাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।
তানসেন এই নাদের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।
তাই তিনি বিশেষভাবে নাদসাধন করতেন। অগ্নিকুণ্ডের
পাশে বসে অগ্নি ও বায়ুর সংযুক্ত ধ্বনি শুনে সেই অনুসারে
নাদসাধন করতেন। ‘ন’ কারের অর্থ প্রাণ আর ‘দ’
কারের অর্থ অনল। প্রাণাগ্নি সংযোগের ফলে নাদ সৃষ্টি।
সঙ্গীতবিদ মতঙ্গ মুনি বলেছেন, ‘ন নাদেন বিনা গীতং ন
নাদেন বিনা স্বরঃ। ন নাদেন বিনা নৃত্যং তস্মাদাদাস্বরকং
জগৎ ॥’ সঙ্গীত শাস্ত্র মতে নাদের ‘ন’ কার নামক
প্রাণবায়ু ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত আত্মা প্রেরিত চিস্তের দ্বারা দেহজ
বহিঃ আহত হলে সেই বহিঃ দ্বারা পুণরায় তা প্রেরিত হয়।

নাদাভ্যাসের ফলে তানসেন সঙ্গীতে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন
ও যোগী হয়ে উঠেছিলেন। এই নাদের প্রাণাগ্নি প্রভাবেই
সম্ভবতঃ যোগী তানসেন রাজসভায় দীপক রাগ গেয়ে
দীপসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। শব্দবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁরা
অবহিত আছেন, তাঁরা তানসেনের এই ঘটনাকে আজগুবি
বলবেন না।

যোগবিজ্ঞান বুঝতে হলে যোগী হতে হয়। যোগীদের
শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। যেমন তানসেন হয়েছিলেন
হরিদাস স্বামী শিষ্য। যোগ সাধনায় যে শক্তি লাভ করা
যায় তা যোগী না হলে বোঝানো যায় না। যোগসাধনের
সঙ্গে সঙ্গে তানসেন সঙ্গীতেও যোগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন
‘জাগে যোগী ভোগী রোগী কাঁহা জাগে।’

অবেশা

গৌতমকুমার মণ্ডল

একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো ;
আমি ঘ্রাণ নিতে নিতে ফিরি—
ফিরি ফিরি ফিরি—
সবুজ মাটির বুকে লেখা কথকথা
বাদামী পোকাকার সন্ধানী বিচরণ
আর আবছা মৌনতায় ;
মেঠো গানের হাওয়ায় দোলা সুর,
আঁকড়ে ধরে আমার মন।

আধুনিক পৃথিবীর পথ ছেড়ে
নতুনকে পেছনে ফেলে
ঘ্রাণ নিয়ে ফিরি আমার আপনজন
শ্যামলিমা পঙ্কজীর পথে পথে।
উঠোনের মাচা থেকে হাওয়ায় ঝুলে পড়া
কচি লাউডগ থেকে খুঁজেছি প্রাণের কোমলতা
অবসরে, কখনও স্তব্ধতায়।

আতপ্ত মাটির পায়ে শিউলির মতো খুশি জাগানো
ছন্দোবদ্ধ ফুটন্ত মুড়ির তালে তালে ;
চিরস্তন প্রিয়তা নিয়ে এতদিনে—
মনে হোল এইটুকু থাক্।

হে সভ্যতা ! তোমাকে প্রণাম
আমাদের ভুলিয়েনা চোখ ধাঁধানো
হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে।
এমনই অসংখ্য ভাবনার মাঝে
আবার ফিরি আমি ঘ্রাণ নিতে নিতে
পথে হাঁটা কুকুরের মতো।

হে কালের সন্ধিক্ষণের উজ্জ্বল ইতিহাস !
দোহাই তোমার
জ্ঞানে বিজ্ঞানে আর চেতনার উজ্জ্বলদীপ্তিতে
সাজিয়ে আমাদের ক্ষতি নেই ;
তবু শূণ্য মনে রাখতে দাও—
কিছু মমতাসিক্ত মাঠের আলোর আমার ছোট্ট কুঁড়িটি।

ভবেশবাবুর ভাবনা

সন্তোষ মিত্র

দেখতো কাপড়টা কেমন? পছন্দ হয়? আজ তোমার জন্য কি এনেছি—বলতো? এই দেখ। বড়-বাজারের সেরা চেনাচুর। খাবে?

খেয়েই দেখ না?

কি ব্যাপার?

তুমি তিন তলার ঐ পূব-দক্ষিণ খোলা ঘরে থাকবে—এখন থেকে। কেমন?

কি হল?

কথা বলছ না কেন?

আমি চাই তুমি একটু হাস। চটপট-চলা ফেরা কর।

কেমন? পারবে না সেই আগের মত ছোটোছুটি করতে?

আচ্ছা, আমাদের অফিস থেকে L. T. C. দিচ্ছে। চল। হয় কুণ্ডু স্পেশালে নয় আমরা নেজেরাই ব্যবস্থা করে দক্ষিণ ভারত ঘুরে আসি। যাবে?

কি ব্যাপার? কথা বল। কই? চুপ করে রইলে কেন?

ভবেশবাবুর এত কথার উত্তরে কল্যাণীদেবী পাশ ফিরে ভবেশবাবুর দিকে একবার তাকালেন। রোগ জ্বর জ্বর চোখে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, “তুমি অফিস থেকে এলে। একটু বস। বিশ্রাম কর। সুমি তোমার চা করে দেবে।”

কল্যাণীর কথা শুনে ভবেশবাবু ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। সমস্ত উৎসাহ নিমেষে উবে গেল।

আমারই ভুল হয়েছে। আগে তোমার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কেমন আছ আজ?

—বাতের ব্যাথাটা একটু বেড়েছে। সাম্নেই অমাবস্যা না? তার উপর পেট খারাপ। কল্যাণীর কাতোরোক্তি।

—পেট খারাপ? ভবেশবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। আমি বন্ধুদের পল্লান পড়ে বড়বাজারের সেরা চেনাচুর নিয়ে এলাম তোমার জন্য। আর তোমার পেট খারাপ?

মিহিরবাবু এখনও ঠাট্টা করেন—তোমার বোঁ দুএকদিন ভাত না খেয়ে থাকতে পারে—যদি তুই ঠুঁকে তেলে ভাজা, চেনাচুর, পটেটো চিপস্ দিয়ে বসিয়ে রাখিস।

এত কথার উত্তরে কল্যাণীদেবী শুধু একবার ‘উঃ’ করে পাশ ফিরে শুলেন।

মেয়ে সুমি এতক্ষণ রান্নাঘরে রান্না-মাসির সঙ্গে কাজ করছিল। বাবা মায়ের কথার মধ্যে ও প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। এখন বড় হয়েছে। মায়ের কাজগুলি এক এক করে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সকালে উঠে বাবাকে বিছানায় চা দেয়। এটা ভবেশবাবুর বহুদিনের অভ্যাস। তারপর স্নান খাওয়ার সময় তেল গামছা থেকে ভাত বেড়ে কাছে কাছে ঘোরানুরি করে। কখন বাবার কোন জিনিষটা দরকার হয়। তারপর অফিসে রওনা হওয়ার সময় ঘড়ি চশমা কলম জামা কাপড় তো সব আছেই, বাবার প্রিয় ডায়েরীটাও হাতের কাছে গুছিয়ে দেয়। আগে এসমস্তই দিদি নমিতাই করত। মা তখন সুস্থ। মাই দিদির একটা একটা করে শিথিয়ে ছিলেন। তারপর দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে যাওয়ার পর সুমি একে একে সব করছে। ঠিকমত পারে না। তবু প্রয়োজনে পড়ে এবং মায়ের বিছানা থেকে নির্দেশ পেয়ে পেয়ে সব কাজগুলি এখন নিখুঁতভাবে করে যাচ্ছে।

এতে ভবেশবাবুর স্বাস্থ্য হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সান্ত্বনা নেই। আরামের-ঘাট্টিতে নেই কোথাও, কিন্তু আনন্দ? সে কোথায়?

কিন্তু এই কল্যাণীকে যখন ভবেশবাবু প্রথম ঘোঁবনে বিয়ে করে ভাড়াবাড়ীতে উঠেন, তখন না ছিল ভাল ঘর, না বিছানাপত্র। নিজের চাকরীতেও তখন এত পদোন্নতি হয় নি। কিন্তু সেই মাটির দাওয়া ভাড়াবাড়ীতে ভবেশবাবু যেন বেশী সুখী ছিলেন। ছিলেন এক বিশেষ আনন্দে।

তখনকার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে ভবেশবাবুর। প্রায়ই অফিসে যাওয়ার সময় কল্যাণী হয় শূণ্যরী কুচি না হয় হরিতকী খণ্ড হাতে দিয়ে বলত,—আজ কি আনবে?

আজ আর কিছু আনা হবে না। মাসের শেষ, বোঝ তো। সংসার চালিয়ে মাসের শেষদিকে অফিসে টিফিন খাওয়ার পরস্যা থাকে না সব দিন।

—সে কি? তুমি না খেয়ে থাক? তারপর কাদ

কাঁদ গলায় কল্যাণী বসেছিল, আমরা তো কোনদিন বল নি।

—বললে তুমি কি ব্যবস্থা করবে? শুধু শুধু মনে কষ্ট পাবে।

—কষ্টটা তো পাব। সেটা থেকে তুমি আমাকে সরিয়ে রাখবে কেন? তুমি আমাকে এখনও পর পর মনে কর। শেষের দিকে কল্যাণীর গলাটা ধরে আসে।

—কি হল? অফিসে রওনা হওয়ার সময় তুমি আর কাল্মাকাটি কর না। আমার সারা দিনটাই মাটি হবে।

—তবে এবার থেকে বল তোমার সব সমস্যার কথা আমায় বলবে। কিছই গোপন রাখবে না?

—আচ্ছা। আচ্ছা। ঠিক আছে। তাই হবে। আজ থেকে তুমি আমার ম্যানেজার। তোমায় না জানিয়ে আমি আর কিছই করব না, বলে সস্তর পা চালিয়ে রওনা হলেন অফিসে।

এখনও বেশ মনে আছে—সেইদিন অফিসের বন্ধুদের কাছে ধার করে দুটি মাংসের কাটলেট এনেছিলেন এবং অনেক কথা কাটাকাটি করে কল্যাণী ও ভবেশবাবু কাটলেট দুটি খেয়েছিলেন অনেক রায়ে।

সেদিনের সে সুখ আজ কোথায়? ভবেশবাবু ভাবেন তখন টাকাপয়সা ছিল না। কতদিন মনে মনে ভেবেছেন—কল্যাণীকে ভাল একটা কাপড় কিনে দেবেন। লাল রঙের উপর কল্যাণীর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। সময় হলে এবং সুযোগ পেলে কল্যাণীকে লাল রং-এর একটা সিল্কের সাড়ি উপহার দেবেন। আর ভালমন্দ যা খেতে চায় খাওয়াবেন। ভালভাবে রাখবেন। ভাল ভাল যন্ত্রগায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু ও এক্ষণে না চায় ভালমন্দ পরতে। না চায় ভালমন্দ খেতে। কত সখ করে তিনি ও ছেলেরা মিলে দোতালার উপর ঘর করেছেন একটা। পূর্ব-দক্ষিণ খোলা। কিন্তু যে একপাও চলতে পারে না সে কি আর সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতালার তিনতলা করবে?

প্রথম সংসার জীবনে একটা বাসাবাড়ীতে তিন চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে কি গাদাগাদি করে শোয়া বসা।

তখন কল্যাণী প্রায়ই বলত—আমাদের যদি কোনদিন বাড়ী হয়—তাতে থাকবে পূর্ব-দক্ষিণ খোলা একটা ঘর। তার পাশে একটা ঠাকুরঘর করতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দান সেরে ঠাকুর পূজা দিয়ে তোমার বিছানায় চা দেব।

হায়, আজ প্রায় সব হল। কিন্তু কল্যাণী কোথায়? ও তো অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন বিছানা নিয়েছে। বড় ছেলের বউ অবশ্য সংসার সামলাচ্ছে। কিন্তু এ সংসারে গিন্নি-বামি হয়ে যার ঘোরাঘুরি করার কথা সে আজ বিছানায়।

তাহলে কি হল? এত পরিশ্রম করে পড়াশুনা করে, অফিসে একটা একটা করে সব পরীক্ষায় পাশ করে, বড় হয়েছেন। মাহিনা বেড়েছে। ছেলে দুটি ব্যবসা করে উন্নতি করছে। বাড়ী হল, বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। শীঘ্রই ছোট মেয়ের বিয়ে দেবেন। ভরা ভরতি সংসার। এখন সব আছে কিন্তু কল্যাণীর ভোগ করার ক্ষমতা চলে গেছে। আর সর্বোপরি কল্যাণীকে দিতে খুতে পারার ক্ষমতা যখন পেলেন ভবেশবাবু, তখন কল্যাণীর পক্ষে তা গ্রহণ করার সামর্থ নেই।

ভবেশবাবু চিন্তিত। বিষয়। 'কিছুটা নিজের ভাগ্যের উপর ক্ষুব্ধ।

আন্তে আন্তে চেয়ারটাকে সামনে সরিয়ে কল্যাণীর খাটের কাছে এনে প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে গলা নীচু করে বললেন—একবার দেখনা কাপড়ের রঙ।

—কই দেখি? কল্যাণী দেবী পাশ ফিরে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিলেন। তারপর শূয়ে শুয়েই প্যাকেটটা খুলে বললেন, বাঃ বেশ সুন্দর তো। কত পড়ল?

—যাই পড়ুক তুমি এটা পরবে।

—আচ্ছা গো আচ্ছা। বল না কত দাম লাগল?

—বেশী না। তুমি লাল রং পছন্দ কর তাই লাল সিল্কের সাড়ী আনতে আজ বড়বাজারে গিয়েছিলাম। আর সেখান থেকেই তো চেনাচুর এনেছি। কিন্তু তোমার যে পেট খারাপ। কি হবে?

—কি আবার হবে। তুমি বড় ছেলেমানুষ।

কিছুই বোঝ না। এখন কি আমার ঐ চেনাচুর, লাল টুকটকে সিম্বের শাড়ী পরার বয়স আছে? না বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমানুষের মত কুট কুট করে চেনাচুর খাব? সুমিকে ডাক। বোমাকে ডাক একবার। ডাক না?

—ওদের কেন? ভবেশ বাবুর বিস্ময় সূচক জিজ্ঞাসা।

—তুমি ডাক না। লক্ষ্মী টি।

অনেকদিন তার লক্ষ্মীটি—কথার মধ্যে পুরানো সেই সুর শুনতে পেলেন ভবেশ বাবু। ছোর করে দরজার দিকে মুখ বাড়িয়ে ‘সুমি’ বলে ডাকতেই ছোট মেয়ে সুমি ঘরে এল। মেয়ের দিকে মুখ তুলে কল্যাণী দেবী বললেন—তোর বো-দিকে ডাকতো মা।

কোন প্রশ্ন না করেই সুমি দোতলায় উঠে গেল। এবং কিছুক্ষণ পর বড় বোদিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। হঠাৎ শোনে বাবা বলছেন—না না এটা হয় না।

ওদের দু জনের হঠাৎ উপস্থিতিতে দুজনে কথা থামিয়ে চুপ হয়ে গেলেন।

কল্যাণী দেবী পাশ ফিরে উঠে বসলেন বিছানায়। তারপর বড় ছেলের বোয়ের দিকে কাপড়ের প্যাকেটটা বাড়িয়ে বললেন, তোমার স্বশুর তোমার জন্য কেমন সুন্দর সাড়ী এনেছেন দেখ। বোমা, ওটা পরে একবার এ ঘরে এস তো। পাশ থেকে চেনাচুরের প্যাকেটটা নিয়ে সুমির দিকে বাড়িয়ে বললেন, এটা নিয়ে যা। তোরা খা য়ে। আর তোরা বাবাকে চা দে।

—কোথাকার চেনাচুর বাবা? সুমির সকৌতুক প্রশ্ন।

—বড় বাজারের ঘি এ ভাজা চেনাচুর।

—ও কি ভাল। মা তুমি কিছু খাও।

—না না। আজ আমার পেট খারাপ। তোরা বোমা সবাই মিলে খা। ওতেই আমার খাওয়া হবে।

মেয়ে বোমা বেরিয়ে গেল হৈ চৈ করতে করতে। ভবেশ বাবু ভাবলেন এই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হল।

কল্যাণীর তখন চোখের কোণে জল। ভবেশ বাবুর দিকে তাকিয়ে আশ্তে আশ্তে বললেন—ছোটর ঘর হবে ঐ তিনতলায়। জ্ঞান, আমি অনেক দিন ভেবে রেখেছি। আর ছুটো ছুটি করতে পারি না। দোতলা তিনতলা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু ওরা ভাল ঘরে প্রিয় পোষাকে ভালমন্দ খাবার খেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলে আমাদেরই তো ভোগ করা হল। এতেই তো আমাদের আনন্দ, তাই না?

ভবেশ বাবু গভীর চিন্তা থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। আশ্তে আশ্তে কল্যাণীর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, ভোগ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবে করতে হয়। আজ তোমাকে দেখেই বুঝলাম।

এমন সময় বড় বোমা নতুন শাড়ী পরে ঘরে ঢুকেই শাশুড়ি কে নমস্কার করে স্বশুরকে নমস্কার করতে প্রস্তুত হতেই ভবেশ বাবু দেখলেন, কল্যাণী যেন নতুন সাড়ী দেখে মিট মিট করে হাসছে। তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে বোমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সুখী হও। শান্তিতে থাকো।

বিছানার দিকে আবার একবার তাকিয়ে দেখেন কল্যাণীর রোগপাণ্ডুর চোখে মুখে কেমন এক ম্লান সৌন্দর্য বিরাজ করছে। সে যেন এক্ষণে নতুনভাবে নতুন করে ভবেশবাবুর উপহার উপভোগ করছে। ভবেশবাবু ভাবলেন, ভোগের রকমফের হয়। বয়সে ভোগের রং পাষ্টায়।

শ্রীঅরবিন্দ

৩শরদিন্দুনারায়ণ বোষ

লৌহহার ভেঙে গেল, দৃষ্টি সম্মুখে,
উদিল স্বাধীন সূর্য, ঘুচিল আঁধার;
তবু আজও অহীনশ অশান্তির বৃকে
মানবাত্মা নীরবেই করে হাহাকার।

হে যোগি, মহান নেতা, ধ্যানমগ্ন ঋষি
অনন্ত আত্মার হিতে মেল আঁধার তব,
ভারতের ভাগ্যাকাশে জাগো সন্ধ্যাসী
অমোঘ বাণীর স্পর্শে জাগৃত এ-ভব।

নবযুগ-প্রস্টা তুমি—জগতের গুরু
শান্তিময় পৃথিবীর—চির-বন্দনীয়,
অধ্যাত্ম জীবনালোকে যাত্রাপথ শুরু
যোগ-দর্শন তব হোক স্মরণীয়।

হে ঋষি, সচ্চিদানন্দ, জাগো আজি জাগো
জন্ম নিক শত সূর্য মানুষের মাঝে—
আত্মাকে বুঝুক তারা—এই বর মাগো,
পরমাত্মা বিকশিত হোক সর্ব কাঙ্গে ॥*

* তপন বসু ও নমিতা বসুর সৌজন্যে

শুভগ্রহ হিসাবে সাধারণভাবে ধরা হয়—বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র এবং অশ্বীণ চন্দ্র।

পাপগ্রহ বলতে বুঝি রবি, মঙ্গল, রাহু, শনি, হার্সেল নিপচান, প্রুটো এবং ক্ষীণ চন্দ্র। অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী থেকে শ্রুত্যাষ্টমী পর্যন্ত ক্ষীয়মান চন্দ্র।

পরশর অবশ্য বলে গেছেন কলিযুগে পাপগ্রহের প্রভাব ষোল আনা কিন্তু, শুভগ্রহের ফল চার আনার বেশী পাওয়া যাবে না। এখন, তা যাই হোকনা কেন, পাপগ্রহ বা শুভ গ্রহের ফল এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। অর্থাৎ একই গ্রহের ফল কারো কাছে অমৃত তুল্য, কারো কাছে বিষ তুল্য। সব কিছুই জন্মকালে গ্রহ সংস্থান এবং স্থান, কাল ও পাত্রের উপরে নির্ভর করে। সে যাই হোক। পাপ গ্রহ সকল যখন স্বক্ষেত্রী, অথবা উচ্চস্থ অথবা স্ব-নক্ষত্রস্থ তখন কি ফল সাধারণ ভাবে পাওয়া যায় দেখা যাক।

১. রবি যখন স্বস্থ থাকেন—অর্থাৎ সিংহে অথবা মেঘে কিম্বা তার নিজ নক্ষত্র উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া এবং কৃত্তিকায় থাকেন তখন সাধারণের ভিতরে নিয়ম, শৃঙ্খলা থাকে। পুলিশমহল বেশ সচেতন থাকেন। এককথায় চুরি, ডাকাতি, শাসনের শিথিলতা কম থাকে। কিন্তু নীচস্থ রবির ফল ঠিক এর বিপরীত। ব্যবসায়িক ব্যাপারে এটুকু বলা যায় যে, সে মাসে তত্ত্বের চৌর্য বৃত্তি ধরা মুশ্কিল। কোনো স্বর্ণকার যদি সোনায়ে খাদ বেশী মিশিয়ে দেন, তাও প্রকাশিত হবে না। যদিও গ্রহরাজ রবি প্রকাশকারক। তিনি ধ্বংসারিং সর্ব পাপঘ্ন। অসুখ বিসৃখের ব্যাপারেও চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় করতে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়।

শনি মহারাজ কঠোর তপস্বী; নিষ্ঠাপরায়ণ, বনচারী, সূর্যপুত্র তিনি। তাঁর কারকতা প্রকাশ পায়—নিয়ম নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, একটানা কাজ ইত্যাদির মধ্যে। তিনি ভূতাকুল, পশুসমূহ, কাঠ, পাষাণ, অঙ্গার প্রভৃতির কারক। শনি যখন রাশিচক্রে উচ্চস্থ যেমন তুলায় শনি, তখন দেশে বা সমাজে বিশেষ কতকগুলি ব্যাপারে নীতি, নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। বিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলা দমিত হবে। ভূত, কর্মচারী অথবা যারা চাকুরীরত তারা তাদের কর্ম নিষ্ঠার

পুরস্কার পাবেন। কিন্তু প্রাপ্যের সঠিক আশা করবেন না। শনি মহারাজের 'মটো' হল : পুরোদস্তুর কাজ করে তবেই তার মূল্য প্রাপ্তি। ষোল আনা কাজ কর, ষোল আনা দাম নাও। ফাঁকির কোনো কারবার তাঁর কাছে চলে না। কিন্তু নীচস্থ হ'লে শনি কি ধরনের ফলদাতা?

'কর্কটে' শনি—সাধারণভাবেই পঙ্গু, প্রতিবন্ধকতার কারক কর্কটে শনির অবস্থান বিচিত্র ফল দেয়। কেন না। কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র। এবং চন্দ্র emotion বা ভাবের কারক। জ্যোতিষী মাগেই জানেন, অপর গ্রহের ভাবে ভাবিত হওয়ার অসামান্য ক্ষমতা আছে চন্দ্রের। বিশেষত কর্কটে যোগতারা 'পুষ্যা' নক্ষত্র শনিরই নক্ষত্র। এই সময়ে লোহ প্রভৃতি ব্যবসয়ে অচলায়তনের সৃষ্টি হবে। লোকেরা সুযুক্তি, বিচার এ সবার পরিবর্তে ভাবাবেগ দ্বারাই চালিত হবেন। মূল্যমান হবে আকাশচুম্বী। ফাঁকি দিয়ে অথবা কালো বাজারে টাকা রোজগার করতে চাইবে অনেকেই। কর্মচারীরা চাকুরীক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পেলেও অসন্তুষ্ট থাকবেন। স্থবিরতা, পঙ্গুতা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা কঠিন রোগের প্রবণতা সমাজে আসবে। এই জন্যই জন্মকালে কোন জাতকের জাতচক্রে কর্কটে শনি থাকলে কোন ন' কোনভাবে পঙ্গু আসতে পারে। অবশ্যই এটা সাধারণভাবে বলছি। সম্পূর্ণভাবে কোন জাতচক্রে বিচার না করে ফল বলা চলে না। বারিক দুটি জলরাশি বৃশ্চিক এবং মীন রাশিতেও শনি থাকা-কালীন এই একই ফল বিচার বা prediction মোটা-মুটি প্রযোজ্য। এর মধ্যে শনির তিনটি নক্ষত্র পুষ্যা, অনু-রাধা এবং উত্তরভাদ্রপদ, এই তিনটিতে সমাজে এবং রাষ্ট্র-নীতিতে কড়াকাড়ি এবং ধরাবাঁধা অত্যন্ত বেশী হয়। শনি নিয়ামক। নিয়ম নিষ্ঠার প্রতীক। এই জন্যই এ ব্যাপারটা হয়। এরকম সময়ে শনি যে সব বস্তুর কারক সে সব ব্যবসা অত্যন্ত মন্দা চলবে। Export বন্ধ থাকার সামিল হ'বে। অর্থাৎ জলরাশির বিশেষত্ব যতটা সম্ভব ক্ষম করবার চেষ্টা করবেন শনি মহারাজ। এই প্রসঙ্গে একটা বিচিত্র ব্যাপার মনে হ'ল। লক্ষ্য করে দেখবেন চন্দ্রের নক্ষত্রে অর্থাৎ রৌহিনী, হস্তা এবং শ্রবণা এই তিনটি

নক্ষত্রে যখন শনির আগমন ঘটে তখন অতিবৃষ্টি অর্থাৎ বন্যা কিস্মাখরা এবং অনাবৃষ্টি হ'বেই। শেষেরটারই সম্ভাবনা বেশী। এরসঙ্গে রৌপ্য ধাতু যা কিনা চন্দ্রের কারক—তার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। যাক সে কথা।

জল রাশিতে শনি থাকাকালীন কঠিন এবং তরলের ঘাত প্রতিঘাত (action and reaction) অত্যন্ত বেশী লক্ষণীয়। এই সংঘর্ষ সবচেয়ে বেশী বোঝা যায় কর্কট রাশিতে যা কিনা চন্দ্রের ক্ষেত্র। কারণ আগেই বলেছি অন্য দুটি জলরাশি—বৃশ্চিক এবং মীন, তাদের অধিপতি যথাক্রমে মঙ্গল এবং বৃহস্পতি। মঙ্গল পরতন্ত্র গ্রহ হ'লেও, এবং শনির সঙ্গে স্বভাবগত সৌসাদৃশ্য থাকলেও, তার স্বকীয়তা কোন সময়েই সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয় না। বৃহস্পতির তো নয়ই।

এবারে অগ্নি রাশির কথা বল আসা বাক্য। মেষ, সিংহ এবং ধনু—এই তিনটি রাশিকে বলা হয় অগ্নি রাশি। এদের মধ্যে 'মেঘ' এবং 'সিংহ' এই দুটি রাশির অধিপতি মঙ্গল এবং রবি। জ্যোতিষ মতে যাদের বলা হয় পাপগ্রহ। খুব আশ্চর্য লাগে, তাই না? মঙ্গল তো নামেই স্বপ্রকাশ। তিনি মঙ্গলকারক। আর রবি? তিনি তো গ্রহরাজ। স্বাস্থ্যারিং সর্ব পাপঘ্ন তিনি। তবে এ'রা-পাপগ্রহ হ'ন কি করে?

এই anomaly র উত্তর দেয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন। কোনো জ্যোতিষী যদি এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেন, তিনি স্বাগতম। তবে, একটা কথা মনে হয় এই যে, এই সব তথাকথিত পাপগ্রহের দশকাল বড়ই কঠিন। অশুভ হ'লে তো কথা নাই, শুভ হ'লেও কিছুটা তাপ শুভফলের সঙ্গে সঙ্গেও অধিকাংশ জাতকেই পেতে হয়।

যাই হোক কথা হচ্ছিল—অগ্নিরাশিতে শনির অবস্থানের ফলাফল কি হ'তে পারে। তাই সাধারণ ভাবে দেখা যাক। মেষ রাশিতে শনি নীচস্থ। যদিও ওর মধ্যে ২০ ডিগ্রী থেকে ২৩°২০ পর্যন্ত নবাংশ, ফলে শনি উচ্চস্থ থাকেন। অর্থাৎ নবাংশে ওই ৩ ডিগ্রী ২০ কলা-র অংশটুকুতে শনি তুলান্ন অবস্থানকালীন ফলদান করেন। তবে মোটামুটি এটুকু বলা যায় যে, মেঘে শনির অবস্থান কালে লোহ, অঙ্গার ইত্যাদি 'কারক' দ্রব্যের দাম আবার আকাশচুম্বী। কিন্তু, প্রভেদ এই যে, দাম বাড়লেও সেই মূল্য black market এর

মূল্যমান। জলরাশিতে শনি যখন থাকেন, তখন এই সব বস্তুর দাম বাড়লেও তা white price; কিন্তু এক্ষেত্রে দামটা হ'ল black-price অর্থাৎ জলরাশিতে শনির স্বাভাবিক গুণ কিছুটা থাকলেও অগ্নি রাশিতে তা থাকে না। নিম্নম শৃঙ্খলার বন্ধন ছাড়িয়ে বিপরীত অরাজকতা এবং লোভের প্রকাশ দেখা দেয়। ভৃত্যদের সুখ থাকে না। যুবসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং চরিত্রগত শাস্তি কঠিন নিষ্পৃহতার পরিবর্তে সমাজে দেখা দেয় চণ্ডল লালসা, অসন্তোষ এবং আশংকা।

সিংহ এবং ধনুরাশিতে শনি থাকলেও সেই একই ফল। তবে ধনু রাশিতে কিছুটা স্বপ্ন ফল এজন্যেই যে 'ধনু'র অধিপতি বৃহস্পতি শনির সমগ্রহ এবং শুভগ্রহ। পাপগ্রহ যদি অন্য পাপগ্রহের ক্ষেত্রে স্থিত হয়, তাহলে সে ফলের প্রচণ্ডতা সহজেই অনুমেয়।

অগ্নিতে কাঠ অথবা অঙ্গার দিলে তার প্রজ্জ্বলিত রূপ আরো প্রবল আকার ধারণ করে। আবার লোহা আগুনে পুড়িয়ে গুণগণে না হলে তাকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া যায় না। ঠিক তেমনিই অগ্নি রাশিতে শনি যিনি সাধারণ ভাবে তীর, তীক্ষ্ণ অথচ শীতল—তিনি তাঁর লুকোনো প্রবল দাহিকাশক্তির সবটুকু ব্যয়িত করেন (হয়তো অনিচ্ছায়) ফল যা হয় তা বিধবংসী। সমাজে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, মানসিক অবস্থায় একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শুভাশুভ সর্বক্ষেত্রেই আছে। এর ফল হয় শুভাশুভ দুই-ই; ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজ মানসে। অগ্নি রাশিতে তিনটি নক্ষত্র। সিংহ রাশিতে মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী। তিনটিই যোগতারা। সেইজন্য আলাদা করে উল্লেখ করলাম।

সিংহ—	মঘা,	পূর্বফাল্গুনী,	উত্তর ফাল্গুনী
মেঘ—	অশ্বিনী,	ভরনী,	কৃন্তিকা
ধনু—	মূলা	পূর্বষাঢ়া,	উত্তরষাঢ়া

তবে এর মধ্যে দ্রষ্টব্য এই যে উত্তরফাল্গুনী আদি শেষের নক্ষত্র তিনটির দশ ডিগ্রীই পড়ে যাচ্ছে পৃথ্বী রাশিতে।

মঘা ইত্যাদি তিনটি নক্ষত্রের অধিপতি কেতু। অতি গোপন ও রহস্যময় ইনি। ধরা যাক কাঠ আগুনে দেওয়া হয়েছে। 'ধূমাং পর্বতো বহিমান্'। কেতুর নক্ষত্রে শনির

সংগিত সারবান শক্তিতে দহন সবে শুরু হয়েছে। অম্প অম্প আগুন ধরেছে এবং তৎসহ প্রচুর ধূমলেখা। তারপরে আসছে শূক্রে নক্ষত্র; পূর্বফাল্গুনী, ভরনী, পূর্বাষাঢ়া। শূক্রে নক্ষত্রে জলতে জলতে যেন কিছুটা থমকে যাওয়া। অর্থাৎ সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং ব্যবসায়িক black profit কিছুটা স্তিমিত হওয়া। কিন্তু, তা' শুধু ক্ষণিকের জন্য। তারপরেই গ্রহরাজ রবির নক্ষত্রে এসে পূর্ণবেগে জলে ওঠেন শনি। এ শুধু মোটা হিসেব টুকু দিলাম। সূক্ষ্ম বিচার করতে গেলে নবাংশ বা সপ্তবিংশাংশ চক্র না কসলে সবটুকু বোঝা যাবে না।

জল রাশির বিভাগটিও এই রকমই। (নাক্ষত্রিক বিভাগ)

কর্কট	পূর্বসূ	পুষ্যা	অশ্লেষা
মীন	পূর্ব ভাদ্রপদ	উত্তর ভাদ্রপদ	রেবতী
বৃশ্চিক	বিশাখা	অনুরাধা	জ্যেষ্ঠা

লক্ষণীয়—বৃহস্পতির নক্ষত্রের প্রথম তিনটি চরণ-অর্থাৎ দশ অংশ বা ডিগ্রী কিন্তু পড়ে যাচ্ছে বায়ু রাশিতে।

নদীস্রোতে বা প্রবহমান জলরাশিতে লোহা লব্ধর দিয়ে যেখানে সেখানে বাঁধ দিলে অথবা বৃহৎ কাঠের গুঁড়ি ফলে দিলে কি হয়? যেখানে স্রোত অত্যন্ত বেশী, সেখানে বাঁধ ভেঙে যায়, কাঠের গুঁড়ি ভেসে চলে যায়। ষোড়শকলা

চন্দ্র নিয়ে বৃহস্পতি তাই শনির বাধা প্রতিহত করতে পারেন, উভয়গ্রহেরই স্বকীয়তা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু, শনির স্বকীয়তা সবচেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হয় অগ্নিরাশিতে। যেখানে স্রোতের বেগ মন্দীভূত, সেখানে বাধা সরানো যায় না। ফলশ্রুতি—বাধাপ্রাপ্ত স্থানে বিপুল, ক্রটিম জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি। ফল যা হয় তা আগেই কিছুটা বলেছি। বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা। অন্য অর্থে মানসিক ভার এবং চাপ, স্নায়ুর উপরে অত্যধিক অত্যাচার, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ এবং সমাজে এবং ব্যবহারিক সর্ব ক্ষেত্রে একটি অচলায়তন সৃষ্টি।

দৈহিকক্ষেত্রে—গ্রহি রসের স্বাভাবিক ক্ষরণ ব্যাহত হয়। দেহের রস বা রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। অবাস্তবীয় cell-এর সৃষ্টি হয়। যার চরম প্রকাশ cancer নামক রোগের মধ্যে, আজো যার কোনও ফলপ্রসূ চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি।

মানসিক চাপ সৃষ্টি হবার জন্য এবং স্বাধীন চিন্তার পথে বাধা সৃষ্টি হওয়াতে নানা ধরনের রোগ বিশেষত জড়তা, পঙ্কুত্ব এবং পাগলামীর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। Chronic বাধা, বেদনার সৃষ্টিও এই সব থেকেই। এক কথায় বলতে গেলে দেহমনের সহজ, স্বাভাবিক ভাব ক্ষুণ্ণ হয়।

কল্যাণ

ধ্রুব মাহাতো

সমুদ্র গভীর থেকে তুলে এনে জল
ঘাসের সবুজ থেকে তরতাজা রঙ
প্রকৃষ্ট নিষ্ঠার আছ এখন বরণ
হওয়া যায় আপাততঃ কিছুটা নির্মল।

অনন্ত আকাশ থেকে নীল উদারতা
মরুভূমি থেকে শিলে কঠোর সংযম
নির্জন ঝরণার বুকে রাশির বিহীনতা
কারো বা দুঃখের চেয়ে হতে পারে কম।

অশান ভূমিতে খুঁজে শোকের শাবুনা
নাট্যমণ্ডে কোলাহল আনন্দ উদ্বেগ
মর্গের মৃত শিশু কখনো জানতো না
মৃত্যুর অপর নাম ঘুমন্ত আবেগ।

সমুদ্র আকাশ নদী ঝরণা অশান
মৃতের কল্যাণে সদা থাকে বিদ্যমান।

গোলাপের একদিন

পীযুষকান্তি চন্দ্র

অসংলগ্ন বিকালের আকাশ থেকে টুপ করে ঝরে যাওয়ার আগে সূর্যটা জ্বাফরাণী রং-এর আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে কলোনীর গায়ে। গোলাপের মনটাও ছটফট করতে থাকে গুমোট ঘরের বারান্দায়। প্রত্যেক দিন এই সময়টার জন্য সে অপেক্ষা করে থাকে। একঘেষেই কাটানোর ছোট পরিসরের এই সময়টাই গোলাপের জীবনে হাল্কাহালির গন্ধ এনে দেয়।

রোজকার মতো আজও বেরিয়ে পড়ে সে। নালা, গিল, কলোনীর হাজারো রিক্ততাকে পায়ে পায়ে দূরে সরিয়ে নেমে পড়ে রেললাইনের পার্শ্বের নির্জন মাঠে। মাঠে মাঠে তখন প্রজাপতিদের বনবাসর। ঘাসের নীচে ফড়িংএর নাচ। উড়াল পাখীর ডানায় বিকালের ছায়া। মাঠের শেষে সেই নির্ধারিত ক্যালভার্ট। গোলাপ আর গোলাপের মতো শিবশঙ্কর, রবি, গৌতম, অনল প্রভৃতির রোজ যেখানে এসে বসে। গোলাপ এসে পৌঁছায় নির্ধারিত জায়গায়। না, এখনও আর কেউ হাজির হয়নি। শুধু দুটো কাক পরম নিবিড়তায় ক্যালভার্টের নীচ থেকে কি যেন খুঁটে খেতে থাকে।

আস্তে আস্তে বিকালের আলো কমে আসতে থাকে। দূরের শিরীষ গাছের হলুদ ফুল এক দুই করে ঝরে পড়তে থাকে ইতিউতি। ক্যালভার্টে একা এসে বসে গোলাপ। দূরের রেললাইন দিয়ে উদাসীন শব্দের ঢেউ তুলে মালগাড়ী চলে যায়। আকাশে টুকরো টুকরো ছবির প্রতিভাস উড়ে বেড়ায় ইঞ্জিনের ধোঁয়ায়। সময়ের পায়ে পা দিয়ে আরো কিছু সময় পার হয়ে যায়। গোলাপ বোঝে আজ আর কেউ আসবে না। না আসুক। একটা দিন সে একা বসে থাকবে। মনের ভীড় থেকে বার করে আনবে স্মৃতিগুলোকে। বেকারজীবনের প্রেমসী স্মৃতি। হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়ায় গৌতম।

—তোর হাতে সাইকেল কেন? গোলাপ বলে।

—ছোট বোনটার তিনদিন জ্বর নামছে না। বাবা চারটে টাকা দিয়ে নিবারণ কবিরাজকে ডাকতে পাঠিয়েছে। চল না গোলাপ। একা ভালো লাগছে না। ওই মাঠটা পেরিয়ে সীতু কর্মকারের লাগোয়া বাড়ীটাই কবিরাজের। যাবো আর

আসবো। ততক্ষণে অন্যরা হয়তো ক্যালভার্টে এসে পৌঁছে যেতে পারে।

পাশাপাশি চলতে থাকে দুজনে কারও মুখে কোন কথা নেই। জীবনের ভারে দুজনকেই ভীষণ ক্লান্ত মনে হয়। আকাশে আলোর ভাব আরো ফিকে হয়ে এসেছে। দক্ষিণ থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগে। এরকম হাওয়া গায়ে লাগলে গোলাপের মনটা কেমন হয়ে উঠে। মনে হয় এমন কিছু তার মনের সামনে হাজির হবে, যা এ জন্মের রাস্তা দিয়ে ওকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। এমন অনেকদিন গেছে গোলাপ একা ফাঁকা মাঠে চোখ বুজে প্রতীক্ষা করেছে। দক্ষিণে হাওয়ার প্রাণবন্ত শরীর ভুবে যেতে যেতে তোলপাড় হয়েছে চিন্তা। তারপর ফিরে এসেছে কলোনীর ছোট ডেরায় দাদার সংসারে।

—গৌতম, তোর বোনকে ভালো ডাক্তার দেখা। নিবারণ কবিরাজ কিছু করতে পারবে না।

—আমিও বুঝি। চারটাকায় কোন ডাক্তার আসবে বল। এই চারটে টাকা যোগাড় দিতেই বাবার তিনদিন সময় গেছে।

গোলাপের বুকটা শক্ত হয়ে আসে। বলে, আমরা কেমন হয়ে যাচ্ছি যেন? বয়স বাড়ছে। চাকরী নেই। চেনাশোনা পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে ক্রমশঃ।

গৌতম কোন উত্তর দেয় না। মাঠ ভেঙ্গে ওরা বাঁধের রাস্তায় এসে পড়ে। নিবারণ কবিরাজের বাড়ী যাওয়ার দরকার হয় না। লঠন হাতে নিয়ে কবিরাজ খুঁট থেকে গরু খুলিছিলো। গৌতমকে দেখে বলে, “কি হে ছোকরা, কোথায়-যাও?”

—কাকা, আপনার কাছেই এসেছিলাম। বোনটার তিনদিন জ্বর। বাবা পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

কবিরাজ গরুর দড়িটা হাতে শক্তভাবে ধরে বলে, “বাবাকে বলিস, কাল যাবো।”

—কাকা আজকেই চলুন। বোনটা কিছু খাচ্ছে না।

—না, রে, আজ কিছুতেই সম্ভব নয়। কালকেই হাত থেকে নতুন বন্দ সাতশো টাকা দিয়ে কিনেছি। ঘরবার না চেনালে অসুবিধা আছে।

অগত্যা গৌতম ফিরতে থাকে। সঙ্গে গোলাপ। গোলাপের গাটা রি'রি করতে থাকে। আড়চোখে গৌতমের দিকে তাকায়। অঙ্ককারে ওর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারে না। উত্তেজিতভাবে বলে, “দেখলি, একটা মানুষের দাম থেকে একটা বলদের দাম কত বেশী। তোর অসুস্থ বোনের জীবনের কোন দামই নেই নিবারণ কবিরাজের কাছে। সমস্ত হৃদয় জুরে নিবারণের বলদ চিন্তা। গৌতম কোন উত্তর দেয় না। উত্তর দেবার আছেই বা কি? রাস্তা ছেড়ে আবার মাঠে নামে। চাঁদের আলো এখন বেশ স্পষ্টভাবে নেমে এসেছে। আশে পাশের ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বড় বড় গাছগুলো আলোয় ডালপালা নামিয়ে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে।

—গৌতম তোকে একটা কথা অনেকদিন বলবো বলে ভাবছি। গোলাপ বলে।

—কি বল?

—অনিতার খবর কিরে? তুই কি আজকাল ওর বাড়ীতে যাস না?

কিছুক্ষণ নির্বাক সময়ের স্রোত বয়ে যায় দুজনের মাঝখানে। তারপর গৌতম বলে, “ঠিক বলেছিস। আর উপায় নেই, তাই যাই না। কিন্তু তোর হঠাৎ অনিতার কথা মনে পড়লো?”

—না, মানে সেদিন বাজার থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ কুণ্ডলের ওষুধের দোকানের সামনে অনিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ও অবশ্য আমার দেখেনি। অনেকদিন পর ওকে দেখলাম। চেনাই যায় না। বড় রোগা হয়ে গেছে। চোখে চশমাও দেখলাম।

মনের নিবিড়ে গোলাপের কথাগুলো শুনতে থাকে গৌতম। অনিতাকে নিয়ে কেউ কোনদিন আলোচনা করে না, এরকম একটা অভিমানে ওর মনে নিষ্ঠুরভাবে জেগে থাকতো। আজ গোলাপের মুখে অনিতার কথা শুনে বুকের ভেতর রক্ত টপ্ টপ্ করে পড়তে থাকে। যন্ত্রণার ভেতর থেকে গৌতম বলে, “অনিতাকে আর কোনদিন আগের অবস্থায় দেখতে পাবি না গোলাপ। ওর দাদা সুলাল বিয়ে করে আলাদা হয়ে গিয়েছে। কোনরকমে একটা মাস্টারি যোগাড় করে অনিতা সংসার চালায়। ওর মাও বছর দুই আগে মারা গেছে।”

গোপাল উদাসীন থেকে আরও উদাসীন হয়ে পড়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কোথায় ঈশ্বর থাকেন জানতে ইচ্ছে করে। বিরাট আকাশের চেয়ে নিজের বুকটাকে বেশী ভরী বলে মনে হয়।

—গৌতম, তুইতো অনিতাকে ভালোবাসিস। তাহলে ওখানে যাওয়া বন্ধ করলি কেন? সেদিন রবি আমার বলছিলো.....

হাসে গৌতম। মুখটা দেখা না গেলেও অঙ্ককারে গোপাল বুঝতে পারে হাসিটা ওর কান্নারই নামাস্তর। বলে, “তুইতো জানিস না, অনিতার বাবার ক্যান্সার। বছর খানেক ধরেই পড়ে আছে। এ সময় আমার যাওয়ার খুবই দরকার। প্রথম দু একবার গেছিলাম। জানি, কিছুই করা যাবে না। গেলে কিছু ফলমূল অন্ততঃ নিয়ে যাওয়া উচিত। অথচ টাকা কোথায় পাবো। তাই লজ্জায় যেতে পারি না।”

আবার চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে সেই ক্যালভার্ট। ওদের পরম আশ্রয়স্থল! গোলাপের চোখের সামনে ভেসে আসতে থাকে ফেলে আসা স্মৃতি। প্রতিবছর ওরা পিকনিক করতে যেতো চৌধুরীবাড়ীর তালপুকুরের ধারে। অনিতা, সুলাল, গৌতম, শিবু আরও কত উচ্ছল ছেলে। কি ডানপিটে ছিলো অনিতা। একা হাতে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতো। মনে আছে একবার অনিতার দাদা সুলাল সীতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিলো। অসহায় অনিতার আঁত চীৎকারে গৌতম জলে ঝাঁপিয়ে তুলে এনেছিলো সুলালকে। কি উচ্ছলভাবেই না দিনগুলো কেটেছে। না ছিলো জীবনের ভার, না চিন্তা। আর আজ সময়ের কালকেতু ওদের সবকিছু বিবর্ণ করে দিয়েছে। কারোই চাকরী নেই। অনিতাও জীবনযুদ্ধের ক্রান্ত সৈনিক। আত্মসর্বস্ব সুলাল নিজে নিজের সুখের জন্য পাঁচিয়ে বেঁচেছে।

হঠাৎ মাঠের মাঝখানে গৌতমের হাতটা চেপে ধরে গোলাপ। বলে, “গৌতম তোকে আজ অনিতার কাছে যেতেই হবে। সময়ের ষড়যন্ত্রে ফুরিয়ে গেলে চলবে না। নিবারণ কবিরাজকে দেওয়ার চারটাকা দিয়ে কিছু ফলমূল কিনে এখনি যা। রাত বিশেষ হয়নি। আমি তোর বাড়ীতে বলে দেবো।”

গৌতমের মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেছে। গোলাপ আজ অনিতার মর্যাদা দিয়েছে। ও নিশ্চয়ই যাবে যন্ত্রণার

বিন্দুতে এক হয়ে দাঁড়ানোইতো ভালোবাসা। ও উঠে পড়ে সাইকেলে। পূর্বদিকের একফালি রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে। অনিতার কাছে না যাওয়ার একটা দুঃসহ লজ্জা ওকে মাথা তুলতে দিচ্ছিলো না। আজ ফিরে পেয়েছে দুঃসহ সাহস। আন্তে আন্তে গোলাপের চোখের বাইরে চলে যায় সে।

গোলাপ ফিরে আসতে থাকে একা। ক্যালভার্টের প্রায় কাছেই এসে পড়েছে। কাকে যেন বসে থাকতে দেখে ওখানে। কাছে আসতেই দেখে পরেশ।

—গোলাপদা আপনি কোথায় ছিলেন? আজ আর কেউ এখানে আসবে না। ওরা আমায় পাঠিয়েছে, আপনাকে জীবন সরকারের বাড়ীতে এখুনি যেতে বলেছে। এক নিম্মাসে কথাগুলো বলে পরেশ চলে যায়।

অগত্যা গোলাপ দেবী না করে জীবনবাবুর বাসার দিকে যেতে থাকে। মাঠ পার হয়েই ঢুকে পড়ে কলোনীতে। টাদের আলো এখানে নামতে ভুলে যায়। জীবনবাবুর বাড়ী এই কলোনীতে সবাই চেনে। দোতলা বাড়ী। অকৃতদার, উনি একাই থাকেন। এসেই গোলাপ দেখে সবাই এখানে হাজির। কোমরে গামছা বাঁধা। ওকে দেখেই শিব বলে, “গোলাপ এসে গেছিস। ভালো হয়েছে। জীবনবাবু হঠাৎ স্কোকে মারা গেছেন। ওনার এক ভাগ্নে এসে পৌঁচেছে। সে এখানে নতুন। শবদাহের সব দায়িত্ব আমাদের। কৃতস্তত্বরূপ সাতশো টাকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।”

শ্মশানে ওরা যখন পৌঁছালো তখন প্রায় মধ্যরাত। গোলাপ এর আগে কখনও শ্মশানে আসেনি। আজই প্রথম দেখলো কি করে মানুষের ভালোবাসার দেহ পবিত্র আগনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। দূর থেকে একটানা শিয়ালের ডাক ভেসে আসতে থাকে। গোলাপ বাঁধানো ছাতিম গাছের তলায় বসে ভাবে আর দেখে, দেখে আর ভাবে। একটা

অজানা ঘোরের ভেতর দিয়ে সময় পার হতে থাকে। চিত্ত আগুন আন্তে আন্তে নিভে। জীবন থেকে মৃত্যুতে উত্তর জীবনবাবুর শেষ হয়।

চিতার উপরে জল ঢেলে ধীরগতিতে ওরা চক্রে বাইরে বেরিয়ে আসে। শিবশঙ্করের পকেটে সাতশো টাকা রাত প্রায় শেষ। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসতে থাকে এটাই কি তবে ব্রাহ্মমূর্তি? হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শিবশঙ্কর বলে, চানটান সেরে আবার এক জামগায় আমরা হাজির হবো। মড়া পোড়ানোর টাকায় জম্পেশ করে খাওয়া দাওয়া ফাঁতি করা যাবে।

সবাই শিবশঙ্করের কথায় সম্মতি জানায়। গোলাপবে নিরন্তর দেখে ওরা জিজ্ঞেস করে, “গোলাপ তুই বি বলিস?”

—না, দীর্ঘলয়ের একটা শব্দ গোলাপের কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে আসে।

—কেন?

—তোরা বুঝতে পারছিস না নিষ্ঠুর সময় আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চায়। তাই কি সহজে আমরা অনিতাকে ভুলে গেছি। তোরা কেউই জ্ঞানিস না ওর বাবার ক্যান্সার। শুধু শেষের প্রতীক্ষা একা অনিতা মুখ বুজে লড়ে চলেছে। গৌতম কাল রাত থেকে ওখানে আছে। চল, আমরা এখান থেকে সোজা যাবো অনিতার কাছে। আমাদের প্রথম রোজগারের টাকা তুলে দিয়ে আসবো অনিতার বৃদ্ধ অসুস্থ বাবার হাতে। জ্ঞানি ওই সামান্য টাকা কিছুই নয়। তবু একদিনের জন্য হোলো অনিতা বুঝুক আমরা কেউই সময়ের হাতে বিপন্ন নাই সবাই একজামগায় দাঁড়িয়ে আছি।

সবাই চুপ করে শোনে। তারপর এক এক করে চলতে থাকে ভোরের ঘাস মাড়িয়ে। পূর্বের আবছা সোনালি আলো ওদের ঘর্মাক্ত কপালে টলমল করতে থাকে।

“কাছে পিঠে”—এই পর্যায়ে প্রথম লেখা প্রবর্তকের গত শারদীয়া সংখ্যায় সুরু করেছিলাম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম-সম্পর্কে। ওটাই বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী মহাকুমা শহর। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলেছি সীমান্ত পেরিয়ে চাকুলিয়া, ঘাটশিলা, টাটানগর, গালুডি ইত্যাদি বিহারের অন্তর্গত নিকটবর্তী কয়েকটি স্বাস্থ্যকর দর্শনীয় স্থান। এছাড়া আরও আছে যেমন, চক্রধরপুর, হিরনি জলপ্রপাতের কোল-যে-যা হেন্সাডি উপত্যকা, পালামৌ, তোপচাটি, চাইবাসা।

দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে উড়িষ্যায় অল্প খরচে পুজোর পাঁচ-সাত দিনের ছুটি কাটিয়ে আসতে চান তারও বহু জায়গা আছে, নাইবা গেলেন পুরী, গোপালপুর, কোণারক অথবা বিহারের মধুপুর, গিরিডি ও দেওঘর। কিন্তু সে আলোচনা বারাস্তরে করা যাবে, উপস্থিত কাঁথ-জুনপুট-দীঘার কথা বলে মেদিনীপুর জেলার বিষয় শেষ করা যাক। যদিও এই জেলাতেই নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আরও বহু উল্লেখযোগ্য স্থান আছে।

মেদিনীপুর, ঘাটাল, এগরা, বেলদা, ঝাড়গ্রাম—এরা শহরের ছদ্মবেশ ধরার চেষ্টা করলেও, পরিচ্ছন্নতা বা নগর পরিবেশের চিহ্ন এখনও বিশেষ দেখা যায় না। দেবরা ও গোপীবল্লভপুরে সাঁওতাল-অসাঁওতালদের মধ্যে বিষেষের ভাব ছাড়া নকশালপঙ্খীদের উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপের যে চিহ্ন ও প্রভাব আছে তা জেলার অন্যত্র পড়েনি। এখানে যে কোন গ্রামে গেলে মনে হবে ৫০ বছর আগেও তার চেহারা একই ছিল। জেলার মানুষ বেশ নম্র, সাদালাপী ও অতিথি বৎসল। বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন এগোয়নি, তবে প্রেসের কাজকে জীবিকা হিসাবে অনেকেই নিয়েছে। তাই দেখা যায় কলকাতার প্রেসে অনেকেই মেদিনীপুরের লোক।

জেলার প্রধান শস্য ধান, কিন্তু তাও চাষের উন্নত উপায় নেওয়া হয়েছে খুব কম জায়গায়। জলসেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যৎসামান্য। ছেলেবেলায় দেখেছি কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই বন্যাগ্রাণের মিছিল বেরুতো খোল করতাল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে। এখনও প্রায় জায়গাই বন্যায় ভেসে যায়, তবে সেই মিছিল আর বেরোয় না।

শিম্পাগুল বলতে খজাপুর ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। হলদিয়া সবেমাত্র টিমেতালে গড়ে উঠছে। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও সুপরিচ্ছন্নত ভাবে করা হয় না কাজুবাদামের চাষ—যাথেকে এমনকি ধান, নাইজিরিয়াও যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। উপকূলে গেলে দেখা যাবে সারাদিনের সংগ্রহ নিয়ে জেলেরা সন্ধ্যায় ফিরছে ঝড়, বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক অন্যান্য দুর্যোগ মাথায় করে। সঙ্গে বা আনছে তাকে মাছ না বলে সামুদ্রিক জন্তুই বলা চলে। যেমন হাঙর, বড় আকৃতির শঙ্কর। হঠাৎ কখনও বা চিংড়ি, সারাদিন, ইলিশ ধরা পড়ে।

ভরসমেখলা সমুদ্র, ছোটখাটো পাহাড়ী এলাকা ও নিবিড় অরণ্যানী এবং বিচিত্র মানুষের সংমিশ্রণ ভ্রমণ পিয়ালী মানুষের মনকে প্রকৃতিপ্রেমী করেছে। কলকাতার অতি নিকটে পাহাড় অরণ্যের কথায় ঝাড়গ্রাম সম্পর্কে আগেই বলেছি। শহুরে ডায়মণ্ডহারবারকে বাদ দিলে দীঘার সমুদ্র সৈকত টুরিস্টস্পট হিসাবে আদর্শ। দুসহ গরমে দিন-দুপুরে দমকা হাওয়ায় কালবৈশাখীর রূপ যে মনকে উদাসী করে, বর্ষায় সমুদ্রের ঘোলাজলে উপস্থাপিত ঘূর্ণি আর এলোমেলো বাতাস আবার তাকেই করে ঘরমুখী। শীতের রৌদ্রস্নাত স্নিগ্ধ আবহাওয়া দীঘার বৈশিষ্ট্য ও আরামদায়ক।

দীঘা যাওয়ার পথ এখন অনেক। আগে ছিল খজাপুর রেলস্টেশন থেকে বাসে ঘণ্টা দুইয়ের (১১৬ কিঃ মিঃ) পথ। গাড়ীপথে দীঘা, কলকাতা থেকে মাত্র ২৪০ কিঃ মিঃ, নরঘাট ব্রীজ হওয়ায় এর দূরত্ব আরও কমেছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন ও বেসরকারী বহু বাসও ঐ পথে কলকাতা থেকে দীঘা যাতায়াত করে। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পাঁশকুড়া-হলদিয়া শাখায় প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তমলুক থেকে দীঘা পর্যন্ত ৮৭.৫ কিঃ মিঃ বড়গেজ রেললাইন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। দীঘার সমুদ্রতীরবর্তী অতি আধুনিক রেলস্টেশনেরও শিলাম্যাস হয়ে গিয়েছে।

পুরী যেমন পুরানো হয় না, কী গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীতে—দীঘারও তেমনি তুলনা হয় না। দীঘার সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত

শাস্ত জলে স্নান অতি নিরাপদ। বেলাভূমি সমুদ্রের প্রায় দু'মাইল ভেতরে গিয়েছে। অনেক দূর পর্যন্ত অম্প জলে হেঁটে যাওয়া যায়। সমুদ্রবেলা অত্যন্ত শক্ত, এমন কি প্লেন নামতে পারে। ভাটার সময় সকাল বিকাল বহু প্রায়াক্ষ বীচ ধরে উভয় দিকে প্রায় মাইল পাঁচেক গাড়ীতে বা হেঁটে বেড়ায়। তাদের দেখে পাঁপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকা লাজুকলতা লাল-কাঁকড়া ছোটোছোট করে নিজেদের গর্তে ঢোকার জন্য। সমুদ্রের পাড়ে একটানা ঝাউবন যদিও ভেসেছে বা ভাসছে, তবুও যা আছে-তাই যথেষ্ট। সমুদ্রের চেহারা ঘণ্টার ঘণ্টার রূপ নেয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে, নিজের ডেরার বাইরে এসে যখনই তাকাবেন তখনই মনে হবে নতুন সমুদ্র। অদূরে সারবন্দী জেলেডিঙ্গি।

দীঘায় অম্প খরচে থাকা-খাওয়ার জায়গা অনেক আছে। যাদের পয়সা আছে তাদের জন্য লাকসারি টুর্নিষ্ট লজ বা সৈকতাবাস। অন্যদের জন্য আছে চাঁপ ক্যানাটনে ডর্মিটারির খুপরি ঘর, তাছাড়া একঘরা-দু'ঘরা বাড়ি বা পেয়িংগেষ্ট হিসাবে থাকার ব্যবস্থা। বেসরকারী হস্টেল বা হালিডে হোমের সংখ্যাও অনেক। সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে খরচ অবশ্য এখন অনেক বেড়েছে।

দীঘা থেকে মাইল পাঁচেকের পথ চন্দ্রনেশ্বরের জাগ্রত মন্দির। এটা যদিও প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার সীমানায় তবুও বাঙ্গালী পূজার্থীর ভীড়ই বেশী। সাইকেল-রিক্সায় যাতায়াত চলে। পূজার সময় ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর কাছে মন্দির স্থান উৎসব প্রাক্কণের রূপ নেয়।

দীঘার আগেই যদি সমুদ্র দেখতে চান তবে নেমে পড়ুন মহকুমা শহর কাঁথিতে—বহু পুরানো ও বাঁকফু জনপদ। কোর্ট-কাছারি, কলেজ, জেলখানা আছে। ঝাড়গ্রামের মত এখানেও কাজুবাদামের গাছ হয়। তাঁতের কাপড়ের জন্য সুনাম আছে। কাঁথির বাজারে নেমে হোটেলের খাওয়া দাওয়া সেরে অম্প বিশ্রামের পর জুনপুটের পথ ধরুন। মাইল আটেক দূরত্ব, ভাড়াও অম্প। জুনপুটের সমুদ্রের জল দামাল হাওয়া না থাকলে অতি শান্ত। সারিবদ্ধ মেছো-নৌকা দিনরাত সমুদ্রে ভেসে চলেছে। উপকূলেও নৌকার সারি। জাল ছড়ানো ইতস্তত। তাঁরে জেলেদের মাছধরার জীবনযাত্রা একটা

উপভোগ্য বিষয় আত্মোত্তর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত। দূর থেকে বাতাসে আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। কাজুরিনা-ঝাউ-এর বীথি অপূর্ণ সজ্জায় সাজানো। দীঘার চেয়ে অনেক সুন্দর জুনপুট এবং বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নির্জন সমুদ্রবেলা। দীর্ঘ ও বিস্তৃত উপকূল ভূমি। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ফিশারি বিভাগের কোল পর্যন্ত এসে যায়। তটরেখার সমান্তরাল মশ্ত চড়া মাইল দুয়েক দূরে জেগে ওঠা গুল সমুদ্র থেকে জুনপুটকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ফলে জুনপুটের সমুদ্র অত নিস্তরঙ্গ ও গৈরিক। চড়ার ওপারে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমুদ্রের নীলজল এবং শোনা যাবে ভীষণ গর্জন।

কাঁথি থেকে রসুলপুরের মোহনা খুব বেশী দূর নয়। নামটা শুনে আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে বিষ্ণুমচন্দ্রের “কপালকুণ্ডলার” কথা। এখানে নবকুমারদের নৌকা দিকনিরূপণ করতে না পেরে ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। অবশেষে তিনি “সূর্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক নিরূপিত করিলেন।” সমুদ্রে যে উপকূল দেখিতে ছিলেন সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিমতট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তন্মধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ সৈকত ভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে রসুলপুরের নদী নামধারণ করিয়াছে।”

কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হবার (১৮৬৬) পর শতবর্ষেরও অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু ঐ নদী এখনও রসুলপুরের নাম ধারণ করে আছে। কপালকুণ্ডলার জন্মস্থান কাঁথি থেকে মাইল দশেকের দূরত্ব। এখন কালো অঙ্গুর সাপের মত পাঁচের রাস্তা হয়েছে। নদীর ওপারে হিজলী। এই হিজলী খজাপুরের হিজলী নয়—এর এক প্রান্ত সরু হয়ে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। রসুলপুরের মোহনা ছেড়ে দক্ষিণমুখী কাঁচা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলে পেটুয়াঘাট। এখান থেকে গঙ্গাসাগর বেশী দূর নয়, নৌকায় যেতে দু' থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগে। সম্ভবত এখানেই পেটুয়াঘাটের কাছাকাছি কোনো জায়গায় নবকুমার তার সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

জন্মদিনে

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলাসবাদপত্র জগতের অন্যতম পুরোধাব্যক্তি হ'ল শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। গত ৩১শে জুলাই '৮৪ তিনি আশি বছর পূর্ণ করে ৮১ বছরে পদার্পণ করেছেন। এই শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই জনপ্রিয় সাংবাদিককে সংবর্ধনা জানানো হয়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্ভবতঃ একমাত্র সম্পাদক যিনি সাংবাদিকের বন্ধুর পথে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে কর্মজীবনে সক্রিয় থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বাংলা সাংবাদপত্র জগতে তাঁর অনন্য অবদান অনস্বীকার্য। কবি হিসাবে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হলেও সাংবাদিকতাকেই তিনি রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন

বহু। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারও পেয়েছেন। বিশ্বশান্তি আন্দোলনেরও তিনি একজন কর্মকর্তা।

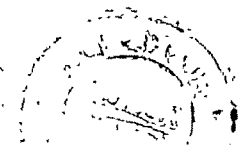
'প্রবর্তকে'র সঙ্গে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যোগাযোগ বহু দিনের। 'প্রবর্তকে'র বহু, অনুষ্ঠানে কলকাতা এবং চম্পদনগরে তিনি সাগ্রহে যোগদান করেছেন, আমাদের কাজে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর অশীতি বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাই আমরা কৃতার্থ চিন্তে তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানাই। তিনি নিরাপদ সুস্থ দেহে, শতবর্ষে পদার্পণ করুন, ভগবানের কাছে এই আন্তরিক কামনা জানাই।

কপালকুণ্ডলা তিনশ বছর আগের কোন কাহিনী হবে। বর্ষিকম্ভর তাঁর কাহিনীর সূরুতে বলেছেন, "প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানী যাত্রী নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাভর্তন করিতেছিল।" সেই নৌকার যাত্রী ছিল নবকুমার। নবকুমারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেই বালিগাড়ীর দেশ দরিয়াপুরের পরিবর্তন খুবই কম দেখা যায়।

বর্ষিকম্ভর লিখেছেন, "রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত অবাধে কল্লেক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্থপ শ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে এই বালুকাস্থপ শ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী বলা

যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিগাড়ি বলে। সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোনো চিহ্ন ছিল না।" এখনো তেমন চিহ্ন নাই।

সব বালির এক রঙ, সব স্থূপেরই এক চেহারা। এখানে পথ হারানো তাই খুব সহজ এবং হয়তো বিপদেও পড়তে হতে পারে তখন "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ" বলে কেউ সতর্ক করে দেবে না। এখান থেকে জনপদ পাঁচ মাইল দূরে। সেই সুউচ্চ বালুস্থূপের দুই ধারে অনিবিড় বন। কিছুটা অগ্রসর হবার পর প্রাচীর বেষ্টিত একটি সুরক্ষিত বাতিঘর। দরিয়াপুরের লাইটহাউস।



আমাদের নিম্নলিখিত

মমতা দাস

আজ নির্মলাদি আমাদের মধ্যে আর স্থল দেহে নেই। এটা সত্য কথা, তবে সুস্মদেহে তিনি আমাদের কাছেই আছেন ও থাকবেন। তাঁকে যতটুকু জেনেছি বা বুঝেছি তাতে তিনি সন্তোষিত আনন্দে থাকতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে আমি একটু অতীতের কথা বলি ফিরে যাই।

প্রাক্তন গ্রাম মন্ত্রী শ্রীনিবাসনাথ কুণ্ড মহাশয়ের সঙ্গে আমি সর্বপ্রথম চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে এসেছিলাম। প্রথমেই প্রবর্তক নারী মন্দিরে সন্তোষের তৃতীয় সভাপতি ও অরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার কাছে এক জ্যোতিষ্য পুস্তক বুঝেই দর্শন দিয়েছিলেন। তিনি আমায় আদেশ করলেন, ‘আশ্রমে গিয়ে ভগবানকে (সন্তোষগুরুকে) প্রণাম করে এস।’ আমি আশ্রমে গিয়ে সন্তোষগুরুকে প্রণাম করলাম। তিনি নির্মলাদিকে ডেকে বললেন, ‘নির্মলা, এদিকে এস, চশমা দাও।’ নির্মলাদিকে আমি সেই প্রথম দেখলাম। তিনি ‘ভগবানকে’ চশমা পরিয়ে দিলেন। সন্তোষগুরু আমায় শুধু দুটি কথাই বললেন ‘তুই বড় ঢাঙ্গা। আমায় ভালবাসবি তো?’ এই বলে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। সে কি অনুভূতি তা আজ ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারব না। নির্মলাদি ফোরণ কাটলেন ‘ভালবাসা যেন পায়নি, কাঙ্গালের মত করছে। ওর আপনাকে ভালবাসতে বয়েই গেছে।’ সেদিনের সেই কথাগুলো ছিল যেন মা তার শিশুকে যেমন করে শাসন করেন ঠিক তেমনি। সেই ঘটনা আমি আজও ভুলতে পারিনি। আন্তরিক ভালবাসা না থাকলে কেউ এমনি করে বলতে পারে না। তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভগবানের কাছে যেতাম, নির্মলাদিকেও দেখে আসতাম। ধীরে ধীরে তাকে জানতে ও চিনতে শুরু করলাম। বুঝলাম ‘ভগবানের’ সাথে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন।

নির্মলাদিকে একবার আমি সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম সে ঘটনাটা না লিখলে তার সম্বন্ধে লেখাটা হয়ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একবার পা ভেঙ্গে নির্মলাদি

Medical College Hospital এ ভর্তি হয়েছিলেন। কিছুদিন সেখানে থাকবার পর, পায় প্লাস্টার সমেত নারী মন্দিরে বিশ্রামের জন্য আনা হয়েছিল। তখন তাঁর সেবার ভার আমি পেয়ে নিজেই ধন্য মনে করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যিনি এতকাল ‘শ্রীভগবান’কে সেবা করে এসেছেন তাকে আজ সেবা করলে সেটা ভগবানকে সেবা করাই হবে।

আমি দেখতাম প্রতিদিন রাত ৩টার উনি উঠতেন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে উপাসনা করতেন। চা খেতেন। আমার রাত ৩টার উঠার অভ্যাস ছিল না। তাই তিনি আমাকে ডেকে তুলতেন। কিন্তু এ জন্য কোনরকম কটুক্তি তো শুনছি নি। বরং নিরুপায় হয়ে ডাকতেন বলে দুঃখ প্রকাশ করতেন।

আমার গুরুদেব (ও অরুণ দা) বলতেন, ‘জান মমতা, আমি নির্মলার চোখে ভগবানকেই দেখতে পাই।’ আমিও সেই ভাবেই নির্মলাদিকে সেবা করেছি। তাঁকে কখনও কাউকে ফরমাস করতে বা কান্নার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে শুনিনি। সকলকেই আদর আপ্যায়ন করতেন, ভালবাসতেন। ছোট বড় সকলেই তাঁর কাছে সমান ছিল।

দেহরাক্ষার কিছুদিন পূর্বেও তিনি একটু অসুস্থ হয়ে ছিলেন। আমি আশ্রমে গিয়ে তাঁর পরিচর্যা বন্ধাদি পরিষ্কার করে দিতাম; কিন্তু দেখেছি তিনি অন্যের কাছ থেকে সেবা নেওয়া পছন্দ করতেন না। যতক্ষণ প্রাণটা আছে নিজের কাজ নিজেই করে যেতে পারলে যেন কত খুশী খুশী ভাব। তাঁর জীবন যাত্রাও ছিল সহজ, সরল। তিনি খুব বড় পরিবারের কন্যা ও বধু ছিলেন কিন্তু চিরদিন তিনি গৃহত্যাগীর সম্মানসূচী জীবন যাপন করে গেলেন। তাঁর ত্যাগ ও সেবার আদর্শটিকে আমরা যেন নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করে চলতে পারি, এই কামনা জানিয়েই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞা জানাই।

আশ্রম সংবাদ

(আশ্রমী)

পরলোকে নির্মলা দেবী :

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীসংঘগুরুদেবের একনিষ্ঠ সেবিকা, সঙ্ঘের প্রবীণ-অন্তরঙ্গ-সভ্যা গভর্নিংবাডির এবং প্রবর্তক ট্রাস্টের অন্যতম সদস্যা নির্মলা দেবী গত ১৯শে ভাদ্র ১৩৯১ (৫ই সেপ্টেম্বর-৮৪) বুধবার মধ্যরাতে সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ইষ্টপদে লীন হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর।

পরদিন বৃহস্পতিবার প্রবর্তক আশ্রম থেকে তাঁর মরদেহ সুসজ্জিত শবাধারে বহন করে সঙ্ঘের শ্রীমন্দির, সেবানিকেতন, সংঘ মন্দির, বিদ্যালয়সমূহ পরিক্রমা করা হয়। সর্বত্রই তাঁর শবাধারে সকলে সপ্রশ্রদ্ধ পুষ্পমালা অর্পণ করেন। সংঘের পক্ষ থেকে সংঘগুরুদেব ও সংঘজননীর শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজারী, শ্রীগুরুর পরম ভক্ত, সংঘের অন্তরঙ্গ সভ্য শ্রীশশী-ভূষণ দাস মুখার্গি প্রদান করেন। বোড়াইচণ্ডীতলার মহা-শ্মশানেই তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।

সঙ্ঘের বিধানানুযায়ী বিশুদ্ধ-প্রাণা নির্মল-স্বভাব নির্মলা দেবীর পুণ্য স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ‘দশাহ’ পালন করা হয়। সঙ্ঘের সকল সভ্য-সভ্যা প্রতিদিন উপাসনাস্তে ৫ মিনিট কাল নীরবে তাঁকে স্মরণ করেন, নিরামিষ আহার ও সংযম-ব্রত পালন করেন। মুখার্গি প্রদান কারী হবিষ্য গ্রহণ করেন।

৩১ শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর) রবিবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় আশ্রমের মাতৃমন্দিরে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞালি নিবেদন ও তিলতর্পণ করা হয়। প্রথমে সংঘ কন্যাগণ কর্তৃক সময়োচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত “সম্মুখে শান্তি পারাবার” আবেগ ভরা কণ্ঠে গীত হওয়ার পর প্রবর্তক কলেজ অব কালচারের ছাত্রগণ কঠোপনিষদ পাঠ করেন। অতঃপর অনেকেই সপ্রশ্রদ্ধ তাঁর বিশুদ্ধ স্বভাব, নিকাম ও নিঃস্বার্থ সেবা এবং সকলের প্রতি স্নেহ মমতা প্রভৃতির স্মৃতি চারণা করেন।

শ্রীসুধাংশু দাস বলেন. দিনে একবার টিফন খেতে আমার মধ্য দিয়েই নির্মলাদির অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের স্পর্শ তাঁকে অভিভূত করেছে। একদিন না এলেই কত যে ভাবতেন

বলার নয়। তাঁর এই স্নেহের আকর্ষণেই শত কাজ ফেলেও একবার আসতে হত তাঁর কাছে।

শ্রীধামিনীকান্ত দাস বলেন—নির্মলাদি সংঘগুরুদেবের সর্বক্ষণের সেবিকা ছিলেন। তার ফলে তিনি গুরুদেবের সাহচর্য পেয়েছেন সর্বাধিক। শ্রীগুরুর সেবা ও সাহচর্যের ফলে অন্তর তাঁর পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তারই প্রকাশ তাঁর সকলের প্রতি সমভাবে সেবা ও যত্নের।

শ্রীপ্রসাদ দত্ত বলেন—নির্মলাদির জীবনের এইটিই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কেউ এলেই প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করা খেয়েছে কিনা, বা চা খাবে কিনা।

ডাঃ মধুসূদন দত্ত নির্মলা দেবীর নিকাম ও নিঃস্বার্থ সেবা-পরায়ণতার স্মৃতিচারণ করে বলেন, অনন্য নিষ্ঠাসহকারে শ্রীশ্রীসংঘগুরুদেবের সেবার ফলশ্রুতি স্বরূপেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল সংঘের সকলের প্রতিই দরদ ভরা স্নেহ মমতা, যেটাই সংঘের আদর্শ ও লক্ষ্য।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী (সংঘ-সভাপতি) ও নির্মলা দেবী প্রায় সম-বয়সী। প্রায় একই সালে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে অনেকের সঙ্গে তাঁরা দুজনেও সংঘে যোগদান করেন। (সামান্য একটু বয়স ও সালের ইতর বিশেষ হতে পারে) সংঘগুরুদেবকে কেন্দ্র করে সংঘের গতিপথে এমন বহু ঘটনা ঘটে গেছে, যা অনেকের জানা আবার অজানাও থেকে গেছে অনেক। প্রায় সকল ঘটনার সঙ্গেই নির্মলাদেবী জড়িত। কারণ তিনি সর্বক্ষণই ছায়ার মত সংঘগুরুদেবের সঙ্গে থেকেছেন। সেই রকম কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিগতাত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞালি অর্পণ করেন।

শ্রীমতী মমতা দাস সপ্রশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে প্রার্থনা করেন, নির্মলাদির সেবাপরায়ণতার এক কণাও যদি জীবনে বৃষ্টিপাত করতে পারা যায় তাহলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। শ্রীমতী রেণুকা ঘোষ বলেন—নির্মলাদির বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর। কালেই তিনি গেছেন। বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। প্রকৃতির ধর্মানুযায়ী একে একে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়াছিল, ক্রমে উত্থান-শক্তি পর্বন্ত রহিত হয়ে গেল। অনুক্ষণ সঙ্গে থেকে এই ক্রমপরিণতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেও

মনে মনে আকুল হয়ে ভগবানকে ডেকেছি আর বলেছি, ভগবান। এই তালটা সামলে দাও। আরও অন্ততঃ বছর খানেক রাখ। সংঘের বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্মলাদির শুধুমাত্র অস্তিত্বের (বঁচে থাকার) দামও অনেক। একদিকে ভগবানকে যেমন ডেকেছি অন্যদিকে ডাক্তার বৈদ্য হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, সেবাপ্রশুধা সবই চুটিহীন যাতে হয় সের্বিকও তেমনি সজাগ থেকেছি। কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হল না। ভগবান আমার আকৃতি কাণে নিলেন না। কেন নিলেন না? না, আদর্শেরও একটা মোহ আছে, সেই মোহে মানুষের সত্য দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমারও তাই হয়েছিল। আমি দেখেও দেখতে চাইনি, মনে হলেও, মনস্তে ভাবতে দিইনি নির্মলাদি চলে যাবেন বলে। কিন্তু যা অনিবার্য তা' রোধ হবার নয়। সেই অনিবার্য সত্যের চরণে প্রণতি জানিয়ে বঁলি—

অগ্রে নয় সুপথ্য রায়ে অম্মান

বিদ্বানি দেব বসুনামি বিদ্বান্।

যুয়োধ্যাক্ষুহুরাণো মেনো

ভূমিষ্ঠাং তে নম উষ্টিং বিধেম ॥

অতঃপর সমাগত সকলেই সশ্রদ্ধায় মাতৃকুণ্ডে তিল তর্পণ করেন।

বেলা ৯। ঘটিকায় মন্দির গর্ভেই পণ্ডিত অনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থের পোরোহিত্যে শ্রীশশীভূষণ দাস আনুষ্ঠানিক ভাবে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

রায়ে সঙ্ঘস্থ সকলকে এবং অনুরাগী সুহৃৎজনকে জল-যোগে আপ্যায়িত করা হয়।

প্রবর্তক কলেজ অফ কালচার :

সংঘগুরু শ্রীমতিলাল তথা প্রবর্তক সংঘের আদর্শে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার আলোকে জীবন ও জ্ঞান গঠনের জন্য প্রবর্তক কলেজ অফ কালচার যে পূর্বতন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, ১৫ই আগস্ট ১৯৮৪ নবপর্ষদ ৬ষ্ঠ শিক্ষা বর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে

প্রাতঃকালে সাংস্কৃতিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য সমাগত বিদ্যার্থী-বৃন্দ গঙ্গায় স্নান করে এক ভাবগভীর পরিবেশে গঙ্গার তীরবর্তী আশ্রমস্থ ঐতিহ্যবাহী শিবলিঙ্গের পাদদেশে, বিশ্ববৃক্ষ মূলে, সংঘগুরু ও সংঘ মাতৃকার প্রতিকৃতির অগ্রভাগে, উপস্থিত সুধী ও কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে বিদ্যার্থী হোমের মাধ্যমে দশ মাস গুরুগৃহে আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান আচার্য শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়।

অতঃপর বিকাল ৪ ঘটিকায় প্রবর্তক সাংস্কৃতিক মহা বিদ্যালয়ে এই উপলক্ষে পাঠ্যক্রম উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ চিত্তরঞ্জন বর্ষিষ্ঠ মহাশয়। বৈদিক মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। স্বাগত ভাষণে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীসন্দীপকুমার রায় বাসুদেব সমাজের প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে সারগর্ভ কথায় নবাগত ছাত্রদের অভিনন্দন জানান। মহা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীধার্মিনীকান্ত দাস 'কেন আমরা এরূপে শিক্ষা দেব'—সে সম্পর্কে পরিস্কার বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ চিত্তরঞ্জন বর্ষিষ্ঠ বলেন, “বেদ উপনিষদের মধ্যে আছে ভারতীয় জীবনাদর্শ। আজকের যুব সমাজের মধ্যে এই মূল্যবোধের বড় অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা তাই মানুষকে শাস্তি দিতে পারছে না। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমতিলাল প্রভৃতি মনিষীপণ মানব সত্ত্বার পূর্ণতা বিকাশ তথা আত্মিক উন্মেষের জন্য যে ভারতীয়-বাদের প্রচার করেছিলেন—প্রবর্তক সংঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক কলেজ অফ কালচার সেই শিক্ষা-ই দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিক এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। তবেই হবে এ শিক্ষার পূর্ণতা।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবেদক : সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শ্রীজগদীশ্বর মহলানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীবি কর কল্টক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীকবিতম্বর রায় কল্টক মাসিক।



স্বাধীনতা : আশ্বিন ১৩৯১

১৬১ ৪৪/
২২/৭/১৬

জনপ্রিয়তায় গৌরবমণ্ডিত

কে.হোডের
প্রসাধনী



মহাভারত
আয়ুর্বেদীয় সুবাসিত
কেশ তেল
কনক ট্যাল্ক
কনক সেন্ট



THE ULTIMATE IN METAL PACKAGING

With best Compliments of :

Gram : CANCELOSE

Phone : 26-7494/1976

CANS & CLOSURES PRIVATE LIMITED

17, RADHABAZAR STREET (3rd Floor)

CALCUTTA-700001

Manufacturers of Pilferproof and Roll-on
Closures of Distinction

Works : NH2 BYPASS, Vill--BANGIHATI

P.S. SERAMPORE, Dist. HOOGHLY,

WEST BENGAL

With Compliments from



NATIONAL TOBACCO COMPANY

A Divn. of Duncans Agro Industries Ltd.

1 & 2, OLD COURT HOUSE CORNER

CALCUTTA - 700 001

With best Compliments from:



BORBHETA ESTATE PRIVATE LIMITED

62, BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD,

CALCUTTA-700019

47-7811/12



MAKERS OF QUALITY TEA

সূচীপত্র, আশ্বিন ১৩৯১

লেখক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সম্ভগুরু শ্রীমতিলাল	মহাপূজার বোধন	১৪৫
স্বামী প্রত্যগাখ্যানন্দ সরস্বতী	শ্রীদুর্গাতিনাশিনী	১৪৬
	প্রবন্ধ	
শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	দুর্গাতিহারিণী দেবী দুর্গা	১৪৭
সংকলন : প্রবর্তক ১৩৩৯	শারদীয়া উৎসবের তাৎপর্য	১৪৯
শ্রীমদকুমার সেন	সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার	১৫১
ডঃ সুভাষ সরকার	শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু	১৫৩
ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার	আলোর ধারা (সাধকের স্থিতিচারণ)	১৫৫
অমৃতকুমার	অষ্টবলয়া কুণ্ডলিনী মহাশক্তি	১৫৯



অনেকদিনের প্রিয়
আর প্রতিদিনই পাচ্ছে ততুত ততুত বন্ধু!

হালুকা,
দাগ পড়েনা,
পুষ্টি জোগায়...
প্রতিদিন

মোলায়েম,
আর্থাহীন,
সুগন্ধময়...
প্রতিদিন

কেমো-কার্পিন কেশ তৈল

বহুরের পর বহুর দে'জ এর তৈরী একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন



রতন দাশগুপ্ত	উৎসব মুখর বাংলাদেশ ও তার শিল্প ভাবনা	১৬৯
শ্রীকল্যাণকুমার সামন্ত	অজানা পাহাড়ী জঙ্গলে (প্রমণ)	১৭৫
দীপংকর বিশ্বাস	অন্তরালে	১৮৮
শ্রীবিষ্ণুনাথ রায়	মহানগরী কলকাতার ঐতিহাসিক পরিচিতি	১৮৯
বর্ণজিৎকুমার সেন	বিগত অর্ধশতাব্দী : বাংলার সামাজিকচিত্র	১৯৬
	গল্প	
বাজীরাও সেন	আটপোরে	১৭১
কর্ণ চক্রবর্তী	বুড়োদা	১৭৩
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	নীচুতলার মানুষ (ভাবানুবাদ)	১৭৮
দীপেন রাহা	প্রসাদ	১৮৩
রিত্তা মুখোপাধ্যায়	পাথরের কামা	১৮৪
দীপালি সিংহ রায়	স্বাধীনচেতা	১৮৬
	কবিতা	
নীলিমা সরকার	নিবেদন	১৫০
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	স্বপ্নময়ী শরণ	১৬১

Space Donated by :

K. KUMAR CHARITABLE TRUST
CALCUTTA

আরাধনা গুপ্ত	হাওয়া আর আনন্দ	১৬১
সাধনকুমার রক্ষিত	এখনো কলকাতায়	১৬১
হাসিনাশি দেবী	চলার পথ	১৬২
শ্যামাদাস দে	মৎস্য কাব্য	১৬২
শ্রীসুধীর গুপ্ত	শূন্যচারী মেঘ	১৬৩
শ্রীঅমর কর	কমলি	১৬৩
সবিতা মুখোপাধ্যায়	ছড়াগান	১৬৪
ইলা সিংহ	হাতছানিতে ডাকে	১৬৪
ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ শীল	নতুন বছর	১৬৪
মুকুল বাগচী	কথাতো আমরা আছে	১৬৫
দীপ্তোপল রায়	নাচ, গান, অভিনয়ের সেই পাখী	১৬৫
শান্তশীল দাশ	আলোঁ আঁধার	১৬৫
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	মা আমরা ক্ষমা কোরো	১৬৬
দীপাধিতা সেন	আমাকে উত্তীর্ণ করো	১৬৬

With Compliments from :

M/s. MANASH RANJON KHAN

TIMBER MERCHANTS

Contractors, Cabinet Makers & General Order Suppliers

167/A, BEPIN BEHARI GANGULY STREET,

CALCUTTA-700 012

Phone : 35-0752

শ্রীসুধীর কুমার বসু	পরীরা জ্যোৎস্নায় আসে	৯৬৬
শ্রীননীগোপাল রায়	জীবন-সায়াহে	১৬৭
অধ্যাপক উমাপদ নাথ	এসো হে বৃদ্ধ	১৬৭
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	১৬৭
নিবারণ চক্রবর্তী	বুপেয়া কামাও ধরম কি লিয়ে	১৬৮
শ্রীতারামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্ঞান না-জ্ঞান	১৬৮
বিজয়লী বিশ্বাস	সমর্পণ	১৬৮
শ্রীতীর্থমরবরণ চক্রবর্তী	প্রার্থনা	১৬৮
বিশেষ নিবন্ধ		
মানিক বসু	মাসিমা চলে গেলেন (স্মৃতি তর্পণ)	২০৬
(প্রতিবেদক)	তরুণ বৈজ্ঞানিক ডঃ অশোককুমার গিরি	২০৭
রাবি কর	শেষের পাতা	২০৮

With Best Compliments from :



SUPREME TRANSPORT CORPORATION

4, BLACK BURN LANE,

CALCUTTA-700012

Phone : 27-5143, 26-2870

With Best Compliments from :

CHEMICO

Pharmaceutical Drugs, Chemicals & Vitamins

2-A, GRANT LANE, CALCUTTA-700012

Phone : 26-9187 & 26-2153

**Branch : 26, TAVAWALA BUILDING,
147, LOHAR CHAWL, 2nd floor,
BOMBAY-400002**

Phone : Office : 317261

With Best Compliments of :

Tel. Regd. Office : 41-2314
Factory : 41-1712

DIAMOND BOX & CO.

Regd. Office : **13/B, HINDUSTHAN ROAD
CALCUTTA-700 019**

Factory : **31/1, N. C. Chowdhury Road
Calcutta-700 041**

All types of Corrugated Boxes, Paper and Board Boxes.

With the best Compliments from :

DURGAPUR PAINTS

Factory : DURGAPUR—713212

Dist. BURDWAN

Phone : 5816

City Office : APSARA BUILDINGS, D-1, 1st Floor,
67, PARK STREET, CALCUTTA-16

With Best Compliments From :

THE NATIONAL INSULATED CABLE COMPANY OF INDIA LIMITED

'NICO HOUSE', Hare Street, Calcutta-700 001

Telex : 021-2658 (NICC IN)

Gram : "MEGOHM", Calcutta

Phone : 23 5102 (6 Lines)

Works : Shamnagar, E. Rly.
(West Bengal)

Manufacturers of Electric Wires & Cables

Branches—All Over India.

Space donated by:—

ARPAN ENG. & TRADING CO.

ENGINEERS : FOUNDERS : MERCHANTS

Specialists in:

Ferrous & Non-Ferrous Castings, High
Tensile, Stainless, High Carbon, Bolt &
Nut, Studs Etc.

20, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1.

Gram : 'ARENTOOP' Calcutta, Phone: 22-8579

মহাপূজার বোধন

বন্দিতাজি, যুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ।

রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দিবো জহি ॥

কোটি কণ্ঠে এই প্রার্থনার ধ্বনি আজ কেন মহাভারতের আকাশ বাতাস আর মুখরিত করে না? কণ্ঠ কেন স্তব্ধ, চক্ষু কেন দীপ্তিহীন, বক্ষে ধমনীর আঘাত কেন নিষ্পন্দ? চাহিবার স্পর্শ কে তোমাদের চূর্ণ করিয়া দিল, কে তোমাদের স্বর্ণকান্তি ধূলিমলিন করিল, জয়ের ধ্বজা কেন তোমাদের মাটির বুকে খসিয়া পড়িল রে! যশোমলিন বন্দীজীবনের দুঃসহ যজ্ঞগাভার বুকে বহিয়া ঘন ঘন মরণশ্বাস, বেদনার শিহরণে কণ্টকিত কল্বেবর, রোমকূপে রক্তবিন্দুর ধারা—আত্মহার্য জাতি। পূজার মণ্ডপে মঙ্গল ঘট স্থাপন করিয়া আজ আর কণ্ঠে প্রার্থনা জাগে না—দেহি সৌভাগ্যমার্গোগ্যং দেহি দেবি পরম সুখম্। রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দিবো জহি...

গর্বে জীবনের বীর্ষ, অহংকারে যে মেরুদণ্ড, আজ আমাদের স্বাস্থ্য নাই, সৌভাগ্য নাই, রূপ নাই, যশঃ নাই, আছে শুধু গর্বহীন নীবীর্ষ জীবনের দায়। সিংহগ্রীব বীরেন্দ্রকেশোরী মাতৃব্রতী বঙ্গবাসী। অহংকার উদ্ধুদ্ধ করিয়া একবার নিজ নিজ অন্তরের মণিকোঠায় সন্দর্শন কর—পীতাম্বরং কণকভূষণমালাশোভাম্ দেবীং ভজ্যামি ধৃতমুদগরং বৈরিজিহ্বাম্ ॥ আর উচ্চকণ্ঠে উন্নত বক্ষ প্রসারিত করিয়া চিৎকার করিয়া বল—অহং রুদ্রেভির্ভস্মভিঃচরাম্যহম্ আদিত্যৈরুত্ত বিশ্বদেবৈঃ। আমি অমর শত্রুহস্তা—আমি তুষ্টি, আমি রাষ্ট্রী—আমি শ্রেষ্ঠা।

পূজার এই মন্ত্র ভারতের জীবনযন্ত্রে যে নিত্য ধ্বনি তুলিত, এই শক্তি থাকের ঝংকারে যে ভারতের আকাশ বাতাস নিত্য মুখরিত হইত, এই জীবন-বেদের উদ্‌গান যে ভারতের ঋষির কণ্ঠে প্রতি গ্রহরে গ্রহরে মুছনা তুলিত—ভারতের বীণা আজ কেন মুচ্ছিত, কেন তার ছিন্ন তার, কেন সে অনাদৃত, কেন উপেক্ষায় ধূলি-ধূসরিত? ওগো ভারতের বাণীমূর্তি, ওগো ব্রহ্মগায়ত্রী অগ্নিমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী! ওঠ, জাগো,—আজ পূজার বোধন দিনে অন্তরে অন্তরে তোমার প্রতিষ্ঠা চাই। তাই আজ যুক্তকরে তোমায় নমস্কার করি—নমো দেবো মহাদেবৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রাকৃতৈ ভদ্রায়ৈ নিয়ত প্রণতাস্মতাম্। (সংকলিত)

শ্রীদুর্গা দুর্গতিনাশিনী

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

দুর্গাদুর্গেতিনামগ্রহণকুশলতচ্ছন্দসা নাদসিংহ—
মাদাবুদ্ধীপয় জ্বং বিষম মহিষভীবারণায় প্রকামম্ ।
প্রাণস্পন্দ প্রবাহে ভবতি সুষমতা বৈখ্য গাঙ্গীর্যমূলং
বিশ্বাত্যেয়ং গজেন্দ্রং চরণযুগধরং পূজনং কীদৃশং তে ॥

(ধৃতপদকমলং)

পৌনঃপুণ্যেন নাম ছাদয়বিলয়তো নাদবিন্দুক্রমেণ
লঙ্কাদৌ নাদসিংহং গণপতিবদনান্নদ্রৈচৈতন্যমিচ্ছ ।
স্কন্দাত্মজ্য বাণীং ভবতু চ কমলা ভাবমস্মদ্রাদাত্রী
দেবীপূজাকৃতৌ শ্বে পরমপরিচয়স্বথিকাস্ত্রপ্রহাসাং ॥

হে সাধক !

অস্তরে বাহিরে, বিষমমহিষাসুরভয়ভীত,
আর্তকণ্ঠে, ডাকিবে না তুমি, 'দুর্গা দুর্গা', ব'লে, করি করযুগল উদ্ভত ।
ক্লৈব্যভয়ে, রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হ'তে বাহিরায় কৈ 'জয় দুর্গা' সিংহনাদ,
নিশাচর, শৃগালের মতো, থেকে থেকে শুধু কামান্নরে ভাঙ্গ অবসাদ ।

'জয় জয়' শব্দনাদ ধ্বনিয়া মানস কুহরে, আগে তারে আপনায়

বীর্ষাদীক্ষা দাও,

সুর ছন্দে দীক্ষা পেলে, তব কণ্ঠে-নেয়া নামে হবে নাদসিংহ আবাহন ॥

স্থির জেনো, আপনার প্রাণস্পন্দে অসাড়া, বিষমতা নাই নিবারিলে ।

সিংহ পৃষ্ঠ বিনা, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা অভয়পদ, কছু নাহি মিলে ॥

তাই বলি, অগ্রে গুরু মুখে শোন, কলা-নাদ-বিন্দুক্রমে, নাম আর

বীজ ব্যাহরণ ।

বিন্দু হ'তে সিংহ নাদে সমুদিত স্বরে নামবীজ কলার বিতান ॥

পুনঃ সব বর্ণকলা হরি আপনায়, নাদ লবে বিন্দুবাসিনী চরণে বিরাম ।

আপনার ক্লৈব্যমুক্ত প্রয়াস তোমার, তাঁরি পায়, প্রপত্তিতে লুটাবে পরাণ ॥

হে কুমার স্কন্দ ! মম মন্ত্রে করিলে সমুদার অনঘ কোমারী শক্তিবলে ।

হে গণেশ ! ওঙ্কারের শুক্লমূর্তি ! তুমি নিজ ভর্গে চৈতন্য আনিলে ॥

লক্ষ্মী বাণী ! তোমরা ছন্দে মন্ত্রে যন্ত্রে দিলে শ্রীছন্দ খ্যাতি পরিসীমা ।

তবু মাগো ! তব নিজ মুখে হাসিছটা বিনা, সন্তানের নিজ আত্মখ্যাতি

নয়তো পরমা ॥

দুর্গতিহারিণী দেবী দুর্গা

শ্রীকান্তি চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। দেবী দুর্গার আবির্ভাব, মহিষাসুরের উৎপত্তি, মহিষাসুরের সহিত দেবীর প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং দেবী কর্তৃক মহিষাসুরের নিধন—এই ঘটনাগুলির সমষ্টিতে দেবী-মাহাত্ম্য বলা হয়ে থাকে। মহিষাসুর হস্তীই দেবী দুর্গা, দেবী দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল মহিষাসুরের নিধনের জন্য। মহিষাসুরের উদ্ভব, তৎকর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকার, ভীত চণ্ড দেবভাগ্যের মর্মে অবস্থান, দেবীর অভ্যাদয়, দেবীর সহিত মহিষাসুরের উগ্র সমর ও নিধন—এই বিষয়গুলি দেবীভাগবতে ও বামন পুরাণে বিশদভাবে সূচিচিত হয়েছে।

কোনও এক সময়ে দেবীষি নারদ পুলকিত ঋষি সমীপে উপস্থিত হয়ে মহিষাসুরের জন্মবৃত্তান্ত ও দেবী কাত্যায়নীর সম্যক পরিচয় জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। জিজ্ঞাসু নারদকে ঋষি বললেন—দেবী কাত্যায়নীই দেবী দুর্গা নামে অভিহিত। পুরাকালে মহাপরাক্রমশালী দুই সহোদর দৈত্য ছিল—একজনের নাম করন্ড ও অপরজনের রন্ড। তারা পৃথিবীহীন হওঁয় দানবদেবতা মালবট যক্ষের আরাধনায় প্রবৃত্ত হল পুত্রলাভের জন্য। করন্ড এক জলাশয়ের মধ্যে আর রন্ড পর্ণাগির মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় উক্ত দানবদেবতার সাধনায় লিপ্ত হল। দ্রাক্ষস্রের কঠোর আরাধনায় দেবরাজ ইন্দ্র ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি কুমীরের রূপ ধারণ করে করন্ডের দুই পা আকর্ষণ করে পাতালে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ সংহার করলেন।

ভাতৃহত্যার দুঃখসংবাদ শুনে দ্রাক্ষস্রর রন্ড ক্রোধোন্মত্ত হয়ে নিজ মস্তক ছেদন করে অগ্নিতে অর্পণ করতে উদ্যত হওঁয় স্বয়ং অগ্নিদেব তাকে নিবৃত্ত করে বললেন—আত্মহনন মহাপাপ, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ইহাতে রন্ড এই প্রার্থনা জানাল যেন তার দ্বৈলকাষিজয়ী, বায়ুর মত, কামরূপী, কৃতান্তবিদ পুত্রলাভ হয়। রন্ডের প্রার্থনা অনুমোদন করে অগ্নিদেব বললেন, যে জীতে সে মনঃসংযোগ করবে, সেই তার মনোবাসনা পূর্ণ করবে। তদনন্তর রন্ড দানবদেবতা মালবট যক্ষকে প্রণাম করতে গেল। সেখানে অপূর্ব ভাবাবেশা, রূপমোহনসম্পন্ন, অনীলবর্ণা এক মহিষ-ভাবিনী কামপরায়াণা হয়ে তড়িৎ-

গতিতে রন্ডের নিকট উপস্থিত হল এবং সে উক্ত মহিষীর প্রতি চিত্ত অর্পণ করল। এই মহিষীর গর্ভে রন্ডের ঔরসে কামরূপী ষেতবর্ণ মহিষপুত্রের জন্ম হল। কালক্রমে এই মহিষপুত্র পরাক্রমশালী হয়ে মহিষাসুর নামে পরিচিত হল। অন্যান্য দৈত্যেরা পরাজয় স্বীকার করে মহিষাসুরকেই অসুরাধিপতি বলে মেনে নিল। তারপর মহিষাসুর দেবতাদের উপর প্রবল অত্যাচার সুরু করল, স্বর্গলোক থেকে দেবতাদের বিতাড়নের জন্য।

পরাজিত দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করে শিব ও বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে বললেন—মহিষাসুর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে আমরা মানুষের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করছি। আমরা আপনাদের শরণাপন্ন। মহিষাসুরের বিনাশের উপায় বিশেষভাবে চিন্তা করুন। দেবগণের মুখে একথা শুনে মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। অনন্তর ক্রোধাক্রান্ত বিষ্ণু, মহাদেব ও ব্রহ্মার মুখ থেকে মহাতেজ নিগত হল এবং অন্যান্য দেবগণের শরীর থেকে সুমহৎ তেজ নিগত হয়ে একত্র মিলিত হল।

ততোহনুদ কোপাদ্ মধুসূদনস্য

সশংকরস্যাপি পিতামহস্য।

তঐধব শক্রাদিষু দৈবতেষু

মহদ্ হি তেজো বদনাদ্ বিনিসৃতম্ ॥

(বামন পুরাণ ১৮।৬)

সমস্ত দেবতার তেজ পুঞ্জীভূত হ'য়ে বিশাল পর্বতের আকার ধারণ করে মহাঋষি কাত্যায়নের আগ্রমে প্রবিষ্ট হল। মহাঋষি কাত্যায়নের শরীর থেকেও অচিন্ত্যপূর্ব তেজোরশ্মি নিগত হয়ে দেবতাদের তেজকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ঋষির তেজে আবৃত হয়ে দেবতাদের তেজ সহস্র সূর্যের শোভা ধারণ করল এবং দেবগণের দেহ হতে উৎপন্ন ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত অনুপম তেজঃপুঞ্জ থেকে কাত্যায়নী দেবী জন্মগ্রহণ করলেন। ইনি চণ্ডলনেত্রা ও যোগাবিশুদ্ধদেহা এবং মহিষাসুরহস্তী দেবী দুর্গা নামে পরিচিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরিশিষ্টাংশে স্থিত বৈকৃতিক রহস্যে “মহাকালী”, “মহালক্ষ্মী” ও “মহাসরস্বতীর” স্বরূপ বর্ণিত

আছে। মহাকালী শ্রীশ্রীচণ্ডীর তামসী মূর্তি। ইনি মহামায়া নামে অভিহিতা। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার দিব্যবাসনে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হয়। ভগবান বিষ্ণু অনন্তনাগকে বিস্তৃত করে যখন যোগনিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন মধু ও কৈটভ নামে দুজন অসুর বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উৎপন্ন হয়ে বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর জাগরণের জন্য বিষ্ণুর নয়ন আশ্রিতা অতুলনীয় তামসীশক্তি বিষেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহারকারিনী ভগবতী যোগনিদ্রার শুব করতে আরম্ভ করলেন—

ঔং স্বাহা ঔং স্বাহা ঔং হি বষট্কার স্বরাষ্ট্রিকা।

সুধা স্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাদ্রাষ্ট্রিকা স্থিতা ॥

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্য যানুচ্যার্যা বিশেষতঃ।

স্বমেব সা ঔং সাবিধী ঔং লৌবি জননী পরা ॥

ব্রহ্মা কর্তৃক স্তূতা হয়ে তামসী মহাকালী বিষ্ণুর নেত্র ত্যাগ করলে নিদ্রোচ্ছিত বিষ্ণু মধু-কৈটভকে নিধন করে ব্রহ্মাকে রক্ষা করেন।

মহালক্ষ্মী শ্রীশ্রীচণ্ডীর রাজসী মূর্তি। সকল দেবতার তেজঃসত্ত্বতা এই মহালক্ষ্মী দেবী। মহিষাসুর-পীড়িত সকল দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র ও ভূষণাদির দ্বারা দেবীকে সজ্জিত করেন। দেবীর অঙ্গজ্যোতিতে চিত্রভূবন অলৌকিক, পদভরে পৃথিবী অবনত, ধনুকের টঙ্কারে সপ্তলোক ক্ষোভিত হল। তিনি সহস্র হস্তে দশদিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করতে লাগলেন মহিষাসুরকে সংহার করার জন্য। মহিষাসুরকে বধ করার জন্যই মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছিল। “সর্বলোকাণাং স দেবানাং প্রভূর্ভবেৎ”। এই সর্বদেবময়ী

মহালক্ষ্মীকে পূজা করলে পূজক সকল লোকের ও দেবগণের উপর প্রভুত্ব লাভ করে থাকেন।

মহাসরস্বতী শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাত্ত্বিকী মূর্তি। এই স্বভূগুণময়ী দেবী গোরীদেহ হ’তে সমুদ্ভূতা হয়েছিলেন। অসুর দ্রাতৃরয় শুষ্ট ও নিশুষ্টকে বধ করার জন্য উক্ত দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। “এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞস্বং প্রযচ্ছতি”। শুষ্ট-নিশুষ্ট-বিনাশিনীকে ভক্তিপূর্বক পূজা করলে তিনি সর্বজ্ঞস্ব দান করেন।

তারিণী সুন্দরী কালী দুর্গা চ ভৈরবী তথা।

ভুবনেশ্বরী মহালক্ষ্মী স্তামাং দুর্গেতি নাম বৈ ॥

—তারিণী, সুন্দরী, কালী, দুর্গা ও ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী মহালক্ষ্মী—এসব মূর্তির নাম দুর্গা। দুর্গানাম-ই মহামন্ত্র। জগতে যত প্রকার উত্তম মন্ত্র আছে সে সব মন্ত্রেরও উত্তম মন্ত্র “দুর্গা”। তাই শিব বলছেন :—

বিষ্ণু নাম সহস্রেভ্যো হাধিকং পরমেশ্বর।

দুর্গানাম জপাৎ পাপাৎ সর্বং যাতি তৎক্ষণাৎ।

বেদেযাগম তন্ত্রেষু পুরাণেষু সুনিশ্চিতম্ ॥ (জামল)

—সহস্র বিষ্ণু নাম অপেক্ষা একটি দুর্গা নাম অধিক— চতুর্বেদবিদগণের এই অভিমত। বেদ আগম-তন্ত্রপুরাণ সমূহে মন্দরভাবে নির্ণীত হয়েছে যে, দুর্গানাম জপ করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। নিখিল ভূত দুর্গা, চতুর্দশ ভূবন দুর্গা, জগতের নারীমাত্রই দুর্গা, সমস্ত নর দুর্গা, পশুসমুদয় দুর্গা, যা কিছু দৃশ্যজাত সবই দুর্গা—দুর্গাস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নেই। তাই দেবী দুর্গার চরণে প্রণাম জানিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়—

সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগত।

অতোহহং বিশ্বরূপাং স্বাং নমামি পরমেশ্বরীম ॥

যাহা আমাদের অতীত, তাহা মৃত, যাহা অনাগত তাহাই আমাদের দেবায়ুঃ। তুমি অনাগতের অভিমুখে যাত্রা কর, পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইও না। মরণের আবর্তে কোটি কোটি লোক মুমূর্ষু—এক মুঠো মানুষ্য দুর্জয় সাহস লইয়া আগাইয়া চলুক। এই বীর অভিযান সফল হউক।

—স্বধগুরু শ্রীমতিজাল

শারদীয়া উৎসবের তাৎপর্য

(প্রবর্তক : ১৩৩৩—আশ্বিন হইতে সংকলিত)

শারদীয়া উৎসবের পুরাতনকে নূতনভাবে প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিই বুঝিয়াছিলেন এই প্রতীক উপাসনার অর্থ কি? তাই তিনি বলিয়াছিলেন ‘এই মা যা হইবেন’। তিনি এই প্রতীকে ভবিষ্যৎ ভারতমাতাকে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন—দিগ্ভূজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রু, বিমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে ভাগ্যবৃণিনী, বামে বিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলবৃণী কাঁড়কেয়, কার্ণাসিকিবৃণী গণেশ। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বগুণসম্পন্ন ভারত-মাতার ভবিষ্যৎমূর্তি। কেহ বঙ্কিমের এই ব্যাখ্যাকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি হিন্দু জাতীয়তা প্রবুদ্ধ করিবার জন্য এই প্রকার কিস্তৃত অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী ছিলেন বলিয়া তাহার উপর সমালোচনা হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু দুর্গোৎসবের প্রতীকের নূতন ব্যাখ্যা আর কেহ দেন নাই।

যাঁহারা পুরাতনের নাম লোপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা তাহার নূতন যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য। আমাদের জগতকে নূতনভাবে নিরীক্ষণ করা আশু কর্তব্য। নূতন ব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রচলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই জন্য এই জাতীয়-উৎসবরূপ দুর্গোৎসবের নূতন ব্যাখ্যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাহার মধ্যে নূতন ভাব (ideology) দেখিতে হইবে ও তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

আজ ভারত হৃতসর্বস্বা, নগ্না, পরপদলিতা, ভারতের ধনরাজী অপর দ্বারা শোষিত ও লুণ্ঠিত হইতেছে। ভারতবাসী তাহার শ্রী তেজ ও বুদ্ধিবৃত্তি হারাইয়াছে। আজ তাহার নিজ গৃহে ঘনু বিরাজ করিতেছে। তাই আজ ভারতের সর্ব ঐশ্বর্যসম্পন্ন সর্বশক্তির সমবায় সমন্বিত প্রতীক হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সর্বশক্তির সমবয়ে সৃষ্ট, হইবে, ইহা আমাদের উদ্ভবরূপে বোধগম্য করা প্রয়োজন। কেবল বিদ্যায় দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে না, কেবল ধনের প্রাধান্যেও তাহা হইবে না, আর একমাত্র শক্তির চর্চায়ও হইবে না। গণ-শ্রেণীর কার্যের সহিত সর্বগুণের সমবায় প্রয়োজন। ইহাই দুর্গাপ্রতিমা প্রত্যক্ষভাবে symbol দ্বারা আমাদের দেখাইতেছে।

আজ আমাদের সমাজে প্রাচীনকালের প্রচলিত ব্যবস্থা নাই। এককালে সমাজে imperium in imperio ছিল এবং প্রত্যেক imperium (ভারতের সমাজে এই অর্থে আমরা প্রাচীন শ্রেণী ও বর্তমানে তাহার স্থলাধিকারী জাতি বুঝিব)-এর মধ্যে সামাজিক সাম্যতা বিরাজ করিত। আজ তৎপরিবর্তে কেবল বংশগত জাতি ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ স্থান লাভ করিয়াছে। আজ সমাজে ধনের মাহাত্ম্য ও ধনী-তন্ত্রের আধিপত্য বিরাজ করিতেছে। ইহা দ্বারা সমাজে বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। এক সময়ে এই বাঙালীরই সামাজিক চিত্রাঙ্কণের সময় কবিকঙ্কণ বলিয়াছিলেন, ‘টাকা হইলেই কি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়?’ সেই বাঙালীরই আজ ধন মানবের গুণ পরিমাপের মাপ কাঠি হইয়াছে। এই বৈষম্য যে ভবিষ্যৎ ভারতের পথনির্দেশক নহে, তাহা এই প্রতীক মূর্তি স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিতেছে। ভারতীয় সমাজের বেশীর ভাগ লোক গণ-শ্রেণীভুক্ত। তাহারাই সমাজের শরীর। তাহারা ব্যতীত সমাজ জীবিত থাকিতে পারে না। সেই জন্যই গণ-নায়ক ‘গণেশ’ এর পূজা হিন্দু করে। এই গণ-নায়কই ‘সর্বসিদ্ধিদাতা’। কারণ গণ-শ্রেণী ব্যতীত সমাজের কর্মের সিদ্ধি কে করিবে? আজ যাহারা ধন প্রাধান্যে গাঁবিত হইয়া আড়ম্বরের সহিত পূজা করিয়া ‘ধনং দেহি, যশো দেহি’ বলিয়া দুর্গা প্রতিমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তাহারা এই প্রতীকোপাসনার আসল অর্থ আদৌ বোধগম্য করেন না। ভারতে যে কর্মই কর, অগ্রে গণবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। সর্বাগ্রে গণপতির পূজার ইহাই অর্থ। গণবৃন্দ সন্তুষ্ট হইলে, শক্তি আসিবে। সেই জন্যই গণেশের পার্শ্বে শক্তির পরিচায়ক কাঁড়কের অবস্থিতি। গণবৃন্দের সংহত কার্যের দ্বারা ইহা শক্তি উৎপন্ন হয়, এই প্রতীক তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এবং গণবৃন্দ ও তাহাদের সংহত শক্তির পশ্চাতে শ্রী ও বিদ্যা দণ্ডায়মান। কারণ সমাজের বেশীর ভাগ লোক (masses) একত্রিত হইয়া (collectivism) যে শক্তি সঞ্চার করিবে (political, social economic powers) তাহার দ্বারা সমাজ উন্নীত হইবে, এবং সেই অবস্থায় আসিলে বিদ্যা ও শ্রীর আবির্ভাব হইবে, তাহার অগ্রে নয়। দুর্গা প্রতিমার চারিদিকের প্রতিমাগুলি সমাজ-শক্তির

সামঞ্জস্য (adjustment of the social forces ও সাম্যতার (social equality) পরিচালক। যতদিন সমাজের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সমানভাবে পরিষ্কৃত না হয়, ততদিন সমাজ অঙ্গও রোগশূন্য হইবে না। ভারতীয় সমাজ তাহার শক্তিকে সমভাবে পরিচালিত (equal distribution) করিলে জন্মভূমির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। দুর্গাপ্রতিমারূপ প্রতীক তাহাই ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে।

আজ ভারতীয় সমাজের ভাঙ্গা গড়ার দিনে আমাদের 'বহুজন হিতায় চ' আদর্শ হওয়া কর্তব্য। সমাজ মুষ্টিমেয় ধনীর দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। জগতের সমস্ত সম্পদভোগী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি হইতে পারে না। জন-সাধারণই সেই সম্পদের ভোগী। সাধারণকে জগতের সুখ সম্পদের অধিকারী করিতে হইবে (equalitarianism)। গণসমূহকে লুণ্ঠিত ও শোষিত (exploit) করিয়া মুষ্টিমেয় ধনীশ্রেণীকে উত্তোলিত করিলে ভারতের মুক্তিও হইবে না এবং সাধারণের মঙ্গলও হইবে না।

যাঁহারা পুরাতনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, অথবা যাঁহারা ইম্পেরোপীয় ভাবে বা অনুষ্ঠান চাই না বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা বিদেশকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যাঁহারা পুরাতন আদর্শবাদী তাঁহারা অতীতে সমাজের অবস্থা ও গঠন কি প্রকারের ছিল তাহার অনুসন্ধান

করুন। আর যাঁহারা বিদেশের ভাবের আধিপত্য চাই না বলেন, তাঁহারা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখুন, বিদেশীয় ভাব ও অবস্থা কি করিয়া তাঁহারা সমাজে শনৈঃ শনৈঃ আনয়ন করিতেছেন।

আর্থনীতিক শ্রেণীবিভাগ দেশে ধনীতন্ত্রের শাসন, সমাজে মানবের বৈষম্য প্রভৃতি হইতেছে ইম্পেরোপীয় অনুষ্ঠান। আর ইম্পেরোপীয় গণসমূহ ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেছে। ইম্পেরোপের সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তথাকার গণসমূহ নতুন ব্যবস্থা চাহিতেছে। আর আমরা সেই পুঁতিগন্ধময় দ্রব্যকে আদর করিয়া গ্রহণ করিতেছি। অথচ মুখে বলিতেছি, চাই 'স্বদেশী ব্যবস্থা' ও 'সনাতন প্রথা'।

শারদীয়া উৎসবের দুর্গাপ্রতিমা বলিতেছে, আমাদের মুক্তির পথ ওদিকে নয়। সর্বাপ্রাণে গণসমূহকে উত্তোলিত কর, তাহা হইলে শক্তি আসিবে, সর্ব ঐশ্বর্য আসিবে। ভবিষ্যতের মুক্ত-ভারত-মাতার কল্পিত প্রতীকে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি। তাই বলি, যাঁহারা দেশের উন্নতি চাহেন, তাঁহারা অতীতের সমাজ লইয়া আর ব্যাপৃত না থাকিয়া নতনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, নতনাদর্শ গ্রহণ করুন। পুরাতন যদি অবর্জনীয়ই হয়, তাহা হইলে নতন যুগোপযোগী নতন ব্যাখ্যা দিয়া সাধারণকে মুক্তির আদর্শ-দিকে অগ্রসর করান।

নিবেদন

নীলিমা সরকার

পাগল করে দে মা আমায়
রাখিস্না আর এমন করে।
ডংকা মেরে চল্বে এবার
'কালী' 'কালী' জপের জোরে।

কখনো তোর এলো চুলে,
মস্ত-প্রলয় ঘনিষে আসে
আঁত ভুবন কাঁদে তখন,
অন্ধ কারায়, ভয়ে দ্রাসে।

কখনো তোর বুপের ছটায়
শ্যামল ধরা আপন ভোলা।
টুকুরো সুখের ঝুড়ি ভরে'
শূন্য হৃদয় ভরিয়ে তোলা।

কামা হাসির ঢেউয়ের দোলায়
দোলাস্নে আর এমন করে।
কালী নামে পাগল হয়ে,
রইব দুটি চরণ ধরে ॥

সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার

শ্রীমনকুমার সেন

সমৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্ট এই যুগের অস্তঃসারশূন্যতাকে যেমনভাবে সপ্রমাণ করছে, আর কোন কিছুই বোধ করি তা করে নি। 'এই যুগ' মানে শিল্প-বিপ্লবোত্তর যুগ—গতি যার পরিচয়টি, মতি যার অস্থির। বিজ্ঞান যার অবলম্বন, নির্বাসিত-আত্মজ্ঞান যে-বৈজ্ঞানিক যাত্রাকে বা প্রগতিকে করেছে সমূহ বিপদজনক। যে মানুষের অভাবনীয় প্রতিভার বিক্ষোভ মূলত মানুষেরই কল্যাণভাবনার প্রেরণায় নিত্য নব আবিষ্কারে যেন বিধাতার সৃষ্টিকেই চ্যালেঞ্জ করছে, তার নিজের পায়ের তলা থেকেই কিস্তি মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে। সর্বাধুনিক পারমাণবিক একটি ক্ষেপণাঙ্কই বিশ্বের এক তৃতীয়াংশকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট—এই ভয়ংকর পরিস্থিতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে যে বাস্তব সত্যটি উদ্ঘাটিত করছে তাহল এই, আত্মজ্ঞানের ডানায় না চেপে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ছয়ের বদলে সর্বগ্রাসী পরাজয়ের কলঙ্কই মানুষের সভ্যতার মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে।

সত্য বটে আজ এ নিয়ম এই মারণযন্ত্র-নাটকের কুশীলবরাও মুখ বুজে নেই,—পারম্পরিক ভীতি বা আতঙ্কের জন্যই গুটিকয় 'সুপার-পাওয়ার' বা অতি-বলশালী (পারমাণবিক নিধন ক্ষমতার অধিকারী) রাষ্ট্র পরস্পরের মুখোমুখি হয়েও বিশ্বের জঘন্যতম নিষ্ঠুরতার বোতাম টিপছে না। বিশ্বের সেইসব দেশেও আজ শাস্তির শক্তি বা যুদ্ধবিরোধী জনমত প্রবল—বিলম্বিত বিপর্যয়ের সেটিই বড় কারণ। কিন্তু ওখানে বা এখানে—অর্থাৎ শিল্পোন্নত ভূখণ্ডে কিংবা আপ্যোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোতেও এই পারমাণবিক মারণযন্ত্রের অর্থনৈতিক উৎসটি সম্পর্কে চেতনা সামান্য। গুরুতর অসম-সমাজ বা অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে অগ্নু-পরমাণুর যুদ্ধ প্রভৃতিকে সম্ভব করে তুলেছে, সে সম্পর্কে জঙ্গী বা শাস্তিবাদী কোন রাষ্ট্রেই প্রতিবাদের ভাষা আজও অত্যন্ত স্বপোচ্চার, অস্পষ্টাংক্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিচের মানুষের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। তার ফলে, বৃটেন আমেরিকা ফ্রান্স প্রভৃতির পারমাণবিক বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার মত অর্থনৈতিক পুনর্বিব্যাসের আন্দোলন আজও অনুপস্থিত। শুধু অনুপস্থিত

নয়, লক্ষ লক্ষ শাস্তিবাদী মানুষও ডাক পড়লে তাদের নিজেদের ক্রমবর্ধিত ভোগসুখ বা সমৃদ্ধির স্বপ্নকে কঠোরভাবে কাটছাঁট করে যুদ্ধবিরোধিতায় কতদূর টিকে থাকবেন তা-ও জোর করে বলা যায় না।

অতৃপ্ত ক্ষুধার অর্থনীতি আজ মানুষকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই ক্ষুধা থেকে কারোর মুক্তি নেই; কাতর সকলেই—যার নেই সে তো বটেই যার আছে সে-ও। এমনতর সীমাহীন বৈবয়িক প্রলোভনের মধ্যে কার্যত আমরা পরস্পরের মধ্যেই যুদ্ধ করে চলেছি, আসল যুদ্ধ তার জোর আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগে বাড়িয়ে চলেছে। পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি এতই ব্যয়সাধ্য যে, সাদা-মাঠা চোখে সেই অশ্বকটা গুণতেও সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একথা আজ জ্বলের মত পরিষ্কার, মরণের জন্য অর্থ এরূপ জ্বলের মত খরচ করলে প্রত্যেকটি জীবনের জন্য সত্যসত্যি সামান্য পানীয় জলটুকুর বন্দোবস্ত করাও কুবের দেশের পক্ষেও সম্ভব নয়। যেমন খোদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই দারিদ্র্য এবং দারিদ্রের জনক যে বেকারী তার তাপমাত্রা উদ্বেগজনকরূপে বেড়ে চলেছে, যার একমাত্র কারণ দেশের বিপুল সম্পদের বহুলাংশকে এই পারমাণবিক গবেষণা ও দুক্কোদ্যমের সংগঠনে ও সংরক্ষণে নিয়োজিত করা। এই কারণকে না হাটাতে পারলে মোটের ওপর আবিষ্কৃত ধনসম্পত্তি বা সমৃদ্ধির পাশাপাশি মর্মান্তিক দারিদ্র, অবনত জীবনযাত্রার সহাবস্থান অনিবার্য।

গান্ধীজীর সেই নিত্যস্মরণীয় উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—'The Earth provides enough to satisfy everyman's need, but not for everyman's greed'—'পৃথিবীর বুকে যে সম্পদ রয়েছে, প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট, লোভ মেটানোর পক্ষে নয়।' লোভাতুর মানুষের লোভকে মানুষ নিজেই যদি সংযত না করে, তাতে সম্ভবত মাত্রা না টেনে দেয়, তাহলে লোভের আগুনে সে জ্বলতেই থাকবে, অন্যদিকে তার নিতান্ত প্রয়োজনের বা ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থও ধ্বংসের প্রস্তুতিতে ব্যয়িত হতে থাকবে।

তথাকথিত সমৃদ্ধি এবং স্বার্থবিহীন ন্যায় বিচারের স্বল্প অনিবার্যভাবেই ব্যক্তি-মানুষের আত্মাকে এবং সমাজের স্বাভাবিক সুস্থতা ও সংহতিকে কুড়ে কুড়ে ধাবে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজ এই পরিস্থিতির অতি অসহায় শিকার। অসহায়তা কিন্তু এই কারণে নয় যে, অনায়াস সম্পদশালী, সে দরিদ্র; আসল কারণ হল লোভাতুর সে নিজে ও। সে যুদ্ধ চায়না কিন্তু সে নিজেও ক্রমবর্ধিত আরামের জন্য লালসায়িত। তার এই লালসা পূর্ণ করার মত সম্পদ ধরণীর বুকেই নেই। অতএব, পারমাণবিক যুদ্ধের গোটা সংগঠনকে নাকচ করে দিলেও সমাজের অসমতা দূর করা যাবে না, যাবে না 'যাদের আছে' এবং 'যাদের নেই' তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই যে 'আরো চাই' মৃত্যুনাশ সত্তত ক্রিয়াশীল রয়েছে, তাকে খর্ব করা এবং পরিশেষে নিঃশেষ করা। অর্থাৎ বৈশ্বিক সমৃদ্ধির দিগন্তটাকেই সীমিত করতে হবে—আর ন্যায় বিচারকে করতে হবে সমৃদ্ধির প্রথম শর্ত।

—কী করে?

এখানেও অবশ্যাব্যবস্থাপেই, গান্ধীমানস ও গান্ধীজীবনকে আশ্রয় করে কথা বলতে হয়। এত বড় জীবনাচার্য ও সমাজবিজ্ঞানী ছাড়া এই প্রশ্নের সদুত্তরে ও ব্যবহারিক সমাধানে আর কারো আমরা সাক্ষী মানতে পারি?

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যখন তাঁর মন্ত্রিপরিষদসহ বহু দুষ্টর সমস্যায় যৎপরোনাস্তি বিব্রত, তখন তার ভারাক্রান্ত মানসিকতা লক্ষ্য করে গান্ধীজি তাঁকে একদিন বলেছিলেন—'আমি তোমাদের একটি মাদুলী দিচ্ছি, যখনই সংশয়ে পড়বে বা অহংবোধ প্রবল হবে, এই পরীক্ষাটি করে দেখো: তোমার-দেখা সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে অসহায় মানুষটির মুখ মনে কোরো, এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা কোরো 'যে-কাজের কথা তুমি ভাবছো তাতে তার কোন কাজ হবে কিনা। তাতে তার কোন লাভ হবে কি? তার জীবন ও তার ভাগ্যের ওপর সে কি তাতে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে? অন্যকথায় দেশের যে লক্ষলক্ষ মানুষ দেখে এবং মনে উপবাসী তাদের স্বরাজ কি তোমার এই পথে আসবে?—তাহলেই দেখবে তোমার সংশয় দূর হয়েছে এবং তোমার অহংকারও গলে

গেছে।' ব্যস্তির ও জাতির জীবনদর্শনে, সঠিক যাত্রাপথে, নিশ্চিত 'ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠায়' এর চেয়ে নির্ভুল মাদুলী বা আত্মপরীক্ষা আর কী হতে পারে? অহোরাত্র এই কবচ ধারণ করলে আমরা আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সামিল করতে পারি। নেতৃত্বেরও এটিই প্রথম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কোন আপোষের অবকাশ নেই। কবিগুরুর অন্তরতম কবিতার নৈবেদ্য পৌছেছে যে 'সবার পিছে সবার নীচে'র মানুষের দরজায়, তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দিতে পারলে সমৃদ্ধির পাশাপাশি অবিচারের মারাত্মক স্বল্প, আকাশস্পর্শী প্রাসাদের পাশাপাশি দুঃসহ দরিদ্র, প্রাচুর্যে তথা যদৃচ্ছ অপচয়ে উচ্ছল জীবনের পাশাপাশি রাজপথে ইতর ও অবহেলিত প্রাণীর মত মানুষের মৃত্যু কোনমতেই ঠেকানো যাবে না।

আমরাও আজ আমাদের দেশে এই বিচার-সংকটের মধ্য দিয়ে চলছি। তিনদশকের বেশী সময়ে স্বাধীন ভারত মোট যে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছে তা বিশ্বের ইতিহাসে লিখে রাখার মত। আবার তার পাশাপাশি আজও দেশের প্রতি শতে প্রায় ৫০ জনের [সরকারী হিসাবেই ৪৮ শতাংশ] অতি দরিদ্র জীবন। যে-জীবন দারিদ্রসীমারও নীচে। অর্থাৎ 'যাদের ভাগ্যে একবেলাও পেট ভরে আহার জোটে না। গান্ধীজীর দেওয়া মাদুলীকে সর্বমান্য ও রাষ্ট্রীয় নীতির প্রথম শর্ত না করা পর্যন্ত প্রশংসনীয় সমৃদ্ধির পাশাপাশি মর্মান্তিক ও লজ্জাকর দারিদ্র্যের এই বিসদৃশ পরিস্থিতি চলবেই। কিন্তু আরও গভীরে গিয়ে 'মনের ক্ষুধা' মেটানোর ইঙ্গিতটিকেই বেশী জোর দিয়ে সামনে রাখা আবশ্যিক। অর্থাৎ অন্তরঙ্গের স্বাধিকার বহিরঙ্গের সমৃদ্ধির ওপরে স্থান দিতে হবে।

জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণের বোতামটিকে ঐখানে স্থাপন করতে পারলে তবেই সীমিত সম্পদ নিয়ে সমাজ এবং ব্যক্তি সুখী হবে, শান্তিতে থাকবে। ব্যস্তির আর্থিক বা আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা অসীম, এই মহান দেশের এক-একটি মানুষ যে আশ্চর্য শক্তিতে বিশ্বসভাকে কাঁপিয়েছে, তাবিয়েছে, তার কণ্ঠা ভুলে গেলে প্রচুর সমৃদ্ধির মধ্যেও দারিদ্র্য আমাদের কণাঘাত করবেই এবং অন্তরে অন্তরে মানুষ

শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু

ডঃ সুভাষ সরকার

সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদিও ‘অশিক্ষিত’ সাধারণ বা গ্রাম্য মানুষের মধ্যে সামাজিক বোধ ও সচেতনতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং বহুক্ষেত্রে ‘শিক্ষিত’ সহরাষ্ট্রের ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অসামাজিক স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় মেলে, প্রকৃত পক্ষে সেটা মানসিক উৎকর্ষ বা প্রকৃত শিক্ষার প্রভাব কিম্বা অভাবকেই সূচিত করে।

প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীতে বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যদিও শিক্ষার অবলম্বন প্রধানতঃ সুলিখিত গ্রন্থরাজি। অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতি বা অভিজ্ঞান যুগ যুগ ধরে প্রকাশিত পুস্তকের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। রেণেসাস বা নবজাগরণের মূলে পণ্ডিতদের মহামূল্য গ্রন্থসংগ্রহের অবদানের কথা পাশ্চাত্য দেশে বহুকাল স্বীকৃত। কিন্তু পৃথিবীতে বিদ্যা বা তার অনুশীলন যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যক্তিমমানসের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা নিছক একটা কন্ঠসাধা বা ব্যয়বহুল সংস্কারের মধ্যেই সীমিত থেকেছে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না সুযোগ্য শিক্ষক বা ব্যক্তিবসম্পন্ন শিক্ষাগুরু বা শিক্ষাদাতার সাহচর্যে সেই জ্ঞান অনুভূত বা উপলব্ধ হচ্ছে, বিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটলেও তা প্রকৃত শিক্ষা বা জীবনচর্যায় উন্নীত হতে পারছে না। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা বা শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্র-শিক্ষকের আন্তরিক যোগ বা মানবিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য আমাদের প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছিল। উপমন্যুর কাহিনীর মধ্যে আচার্যের সান্নিধ্য, ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও দীক্ষার প্রভাবে ব্রহ্মচর্যের মূল অবলম্বনরূপে স্বীকার করা হয়েছিলো। এই শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর মানসিকতা, সংবেদনশীলতা ও অনুভূতির গভীরতা ও প্রসারের মধ্যে একটি সাবলীল

সত্য সত্যই দরিদ্র থেকে যাবে। অস্বাভাব আজ যাতনা প্রকট, অন্তরের দীনতার সংকট ততোধিক প্রবল। ‘মানুষ’ই তো সকল কল্যাণকর্মের যন্ত্র, সেই যন্ত্র আজ ভয়াবহ ক্ষয়রোগে গোটা সমাজকে জীবন্ত করে ফেলেছে। ‘মানুষ’ই শুধু মানুষকে ন্যায়বিচার দিতে পারে। সমৃদ্ধ

ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুরণের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো, যা সর্বকালে হওয়া উচিত। যে শিক্ষা মানুষকে সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা প্রদান করে না, গভীর সচেতনতা ও সামাজিকবোধে অনুপ্রাণিত করে, না, তা কখনই যথার্থ শিক্ষা হতে পারে না—হতে পারে নিছক একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার বৃপান্তর মাত্র।

ইউনিভার্সিটি গ্র্যাডুয়েট কমিশনের আনুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য-শিক্ষা-দপ্তরের অনুশাসনে যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে, তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ থাকলেও তা সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা বা ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে কতটা সহায়ক হয়েছে বা তার সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, আমরা পৃথিবীতে বিদ্যার পরীক্ষাকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে রেখেছি। পঠন পাঠনের মধ্যে বা তার আনুসঙ্গিক কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টির সুযোগ বা সামাজিক চেতনাবোধের উন্মেষের জন্য পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক তথা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের মধ্যে আদর্শবাদের অনুশীলনকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন সার্থক প্রচেষ্টাকে কোথাও গুরুত্ব দিইনা আমরা। সবটাই রয়েছে যেন কাগজে কলমে। বরং বেশ কিছু শিক্ষক বা শিক্ষাবিদদের আচারে ব্যবহারে একটা পোষাকীভাবের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করা যায়। এর মূলে রয়েছে ব্যক্তিসর্বস্ব চিন্তাধারা তথা কার্যবলী। শিক্ষকের অস্তিত্ব যে ছাত্রদের উত্তরণের মধ্যে নিহিত এবং ছাত্রদের সার্বিক মঙ্গল, ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুরণ ও মানসিক উন্নতি যে শিক্ষকের সাহচর্য, স্নেহ ও ভালবাসার উদ্ভাপ ভিন্ন সম্ভব নয়, এ উপলব্ধিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় লোপ পেতে

এবং ন্যায় বিচারের দ্বন্দ্বের উত্তরও ঐখানেই। বলার প্রয়োজন করে না শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই অন্তর্মুখী ‘মানুষ’ গড়ার কারখানা গড়ে তুলতে হবে। অপূরণীয় ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

চলেছে। এর জন্য অনেকে রাজনীতিকে দায়ী করেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা-ভিন্ন কোন প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র কাঙ্ক্ষ করতে পারে না। কাজেই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অস্তিত্বকে নিমূল করার মধ্যে আর যাই থাক বাস্তববোধের অভাবকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

আসল কথা, রাজনৈতিক চেতনা নয়, ব্যক্তি-স্বার্থ-চিন্তা-প্রণোদিত অহিতকর ও অসামাজিক চিন্তা ও কর্মপন্থাই যত অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা কখনই বৃহত্তর সমাজের অমঙ্গলসূচক কর্মকাণ্ডের দিকে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে না। আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও নানা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিকে কেন্দ্র করে অসামাজিক ও ধ্বংসাত্মক যে কার্যক্রমকে আমরা লক্ষ্য করি, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা নয়, ব্যক্তি-স্বার্থ-চিন্তাই প্রকট হয়ে ওঠে। এটা এক ধরনের দুর্নীতি প্রসূত চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

একথা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে, এই দুর্নীতি বা অসামাজিক চিন্তা শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। তার ফলে, শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব বা নৈতিক বল ছাত্রদের প্রভাবান্বিত করতে পারছে না। ছাত্ররাও পরীক্ষা-যন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে স্বাভাবিক হারিয়ে, আদর্শবাদ হতে বিচ্যুত হয়ে এক ধরনের ছাঁচে-গড়া শিল্পসামগ্রীর মতো বাজারে উপচে পড়ছে।

বহুক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যুবসমাজকে মানবিক মূল্যবোধে দীক্ষিত না করে ধৃত সুযোগসন্ধানীতে পরিণত করেছে। বহু শিক্ষকের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা ও উন্নত মানসিকতার উপস্থিতি হেতু ঔদার্য ও আদর্শবাদের পরিবর্তে এক ধরনের সুচতুর কলাকৌশলকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভাবটা এই, যে যত শিক্ষিত হবে, ততো ধৃত হ'তে হবে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আজ সত্তার মুখোশের অন্তরালে ধৃত ও সুযোগসন্ধানীর অসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নানা ক্ষেত্রে সঙ্গোপনে কাজ করে চলেছে। এর প্রভাব পড়ছে ছাত্রদের উপর—প্রভাব পড়ছে সমাজের মানুষের উপর। শিক্ষাক্ষেত্রে এ দুর্নীতি সামাজিক চেতনা ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করতে চলেছে। কোনদেশের সমাজ যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও উৎকর্ষ ভিন্ন অগ্রগতি লাভ করতে পারে না, এ সাধারণ সত্যটুকুও আজ আমরা ভুলতে বসেছি। যত পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা করে চলেছি শিক্ষার উন্নতি কল্পে তার অধিকাংশই সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুরণের জন্য নয়, তথাকথিত মেথার বিকাশ ও স্বীকৃতির জন্য, কিম্বা শিক্ষাবিদদের নতুন নতুন ধারণার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। শিক্ষাক্ষেত্রে এহেন মানসিক দুর্নীতি কি করে সামাজিক মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই সাধারণের মনে জাগতে পারে। কিন্তু এর সমাধান কোথায়? আরো নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে, না মানবিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে?

“সম্মুখে চলারও আছে বিপদ। অতীতের আশ্রয়ে প্রাচীন ভারত যেমন সম্মোহিত; ভবিষ্যতের যাত্রী যে, তার পক্ষেও সম্মোহনে পড়ার খুবই সম্ভাবনা। যারা সম্মোহিত, তাদের প্রাণে একটা চেতনার সাড়া দেখা যায়, সে চেতনা মাংস ফুঁড়িয়া ঔষধ দেওয়ার প্রভাবের মতই। সে জীবনে ভারতের নবীনতা ফুটিয়া উঠবে না। সম্মোহিত জীবন পর-ধর্মেরই জয় দিবে। স্ব-ধর্মে নিধন শ্রেয় করার কয়েকটা লোকও যদি আজ সম্পূর্ণ নতুন অনাগতের জন্য প্রাণ দান করে, ভারত তবেই সিদ্ধ হইবে।”

—সম্ভবগুরু শ্রীমতিজাল।

আলোর ধারা

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

‘চারদিক থেকে বরফের ফুল ভেসে আসছে। এক হিমালী প্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি এই প্রপাতের মুখে একবার পড়লে ফুৎকারে উড়ে যাবে আমার মরদেহ। অথচ তার জন্যে কত মায়ী। আর আমাদের মন। তার হৃদিস পাওয়া শক্ত। তার মধ্যে কতো যে খোপ তা বলে বোঝানো যায় না। যে মন উজাড় করে দিয়ে থাকি মায়ের চরণ-তলে, আবার সেই মনই কামনায় মদির হয়ে ওঠে। লালসার পাক যেন থিক্ থিক্ করছে মনের মধ্যে। হাজার গঙ্গাজল ছিটোলেও রেহাই নেই। আর আছে অহংকার—না সে অহংকার বলছি না, এ সম্পূর্ণ স্থূল অহংকার। বুপের, বিদ্যার আর সবচেয়ে বেশী হলো টাকার গুমোর। বাইরে এমনভাবে কথা বলছি, যেন আমি এ সব আমার আছে সত্যি, কিন্তু কোন আঁচ লাগে নি মনে। আসলে এ ভাব অনেক কষ্টে এবং খুব কম লোকের হয়। অধিকাংশই চমৎকার অভিনয় করে যায়। আসলে নিজের মনটাকে ভাল করে খুলে দেখতে আমরা ভয় পাই।’

উত্তরকাশীতে এক নিভৃত আশ্রমে বসে কথা বলছিলাম ডক্টর ব্যানার্জীর সঙ্গে। উনি পণ্ডকেরদার পরিক্রমা করে এসেছেন উত্তরকাশীতে। আমারও সখ পাহাড়ের। তাই ডক্টর ব্যানার্জীর সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায়। অবশ্য উনি বলেন, কোন ঘটনা আকস্মিক নয়, সব পূর্ব পরিকল্পিত।

আমি বললাম, ‘কর্ম দিয়ে কি কর্মক্ষয় হতে পারে না? তাহলে কর্মযোগ কথাটা এসেছে কেন আর কামনাই বা যাবে না কেন?’

উনি বললেন, ‘দেখ কর্ম দিয়ে কর্ম ক্ষয় হয় না, যদি সে কর্মের মূলে জ্ঞান না থাকে। কিন্তু জ্ঞান ফোটে কার? অশান্ত, অসমাহিত থাকলে তে জ্ঞান ফুটবে না। তাই অভ্যাসও দরকার আবার বৈরাগ্যেরও প্রয়োজন। কর্মের মধ্যে বিরাগ থাকা চাই। কর্মকে এড়ানোর জন্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা চাই। আর চাই অভ্যাস যোগ। বৈরাগ্য দিয়ে চিন্তকে বিষয়স্পর্শ থেকে বিবিক্ত রাখা—যাতে সব ধ্বংস হয়ে গেলেও চিন্তে এতটুকু দাগ না লাগে। কিন্তু দেখ কর্মবিপাকে আদর্শের সৌন্দর্য মলিন হয়। অন্তরের

পাঙ্কিল ভাবগুলি শুধু প্রকট হয়ে ওঠে না, তারাই যেন জোরদার হয়ে পড়ে।’

আমি প্রশ্ন করি, ‘আচ্ছা আপনি যে বললেন মনের কথা, মন আর চিন্ত কি এক?’

উনি উত্তর দিলেন, ‘প্রশ্নটা ভালো। মন আর চিন্ত এক নয়। চিন্তের উপরে মন জলের উপরে শোলার মত ভাসে। চিন্ত চঞ্চল, তার সঙ্গে সঙ্গে মনও চঞ্চল হয়।’

আবার বলি, ‘পণ্ডকেরদার পরিক্রমায় ধারার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?’

অনেকক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন তিনি। বললেন, ‘ও সব অনেক গুহ্য কথা। জিজ্ঞেস করতে নেই। আচ্ছা অন্য কথা শোন।’

চোখ বন্ধ করে আছেন উনি। মাঝে মাঝে চোখের পাতা কাঁপছে, ঠোঁট কাঁপছে। বলতে লাগলেন এক বিচিত্র কাহিনী। আমি শুধু নির্বাক এবং অনধিকারী শ্রোতা মাত্র।

* * * *

অনেকদিন আগেকার কথা। কেদারে যাবার জন্যে মোটর বাস বা গাড়ী কোন কিছুই ছিল না। যা কিছু ভরসা সব দুটি পায়ের পরে। এ দিকে গুরুদেবের নির্দেশ যেতে হবে। অথচ তখন যেতে মন চাইছে না। মাঝে মাঝে আশানে যাই আর লোকচক্ষুর অগোচরে কিছু ক্রিয়া করি। এতে আনন্দ পাচ্ছি আবার খানিকটা গর্বও আসছে কারণ বুঝতে পারছি আমার মধ্যে কিছু শক্তি সঞ্চার হয়েছে অথবা গুরুদেবের কথা অনুসারে নিজের সুপ্ত শক্তিকে খানিকটা জাগাতে পেরেছি। এই বোধটিই আমার না হলে ভাল হতো। অনেক ধাক্কা খেয়েছি, ভবুও যেন তার শেষ নেই। এ যেন রক্তবীজ। একটা যায় তো নতুন ফেঁকড়ি গজায়।

কলকাতার বাইরে এক আশানে গেছি ভাদ্রের অমাবস্যা। স্থান ও সময় গুরুদেব বলে দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলাম। এবারে দেখলাম স্থানটি বেশ পরিষ্কার। ভাল লাগলো।

যাবতীয় দ্রব্য যা আমি সংগ্রহ করে এনেছি মাটিতে রেখে জল আনতে গেলাম। তারপর স্থানটিকে বসার উপযুক্ত করে তুললাম। ভাবছি গুরুদেব এখনও এলেন না



কেন। যাই হোক নির্দিষ্ট সময়ে মন্ত্র জপে বসে গেলাম। বুঝতে পারছি ক্রমেই মন স্থির হয়ে আসছে। হঠাৎ ধ্যান ভেঙে গেল একটা মধুর কণ্ঠ শব্দে। তাকিয়ে দেখি চারদিক যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর সেই উজ্জ্বলতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন অপূর্ব রূপশালিনী এক নারী। একবার ভাবছি উনি কি আমার ইষ্ট দেবী! কিন্তু তখনই মনে হলো এত সহজে দর্শন পেলাম জগজ্ঞাননীর! দেখি উনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে।

বললেন, 'তোমার জপ আমাকে তৃপ্ত করেছে। তুমি কি চাও বলো?' একথা শোনা মাত্র আমার দেহে যেন শত শত ভোল্টের কারেন্ট চুকলো। বললেন, 'তুমি আসন ছেড়ে উঠে এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমার মনের কণ্ঠ পূর করে দেব।' এবারে আমার মন দোদুল্যমান হলো। গুরুদেব বারে বারে বলে দিয়েছিলেন, কোন অবস্থাতেই রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসন ছাড়বে না। সেই সতর্কবাণী যেন ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে এই বরদাতার সামনে। সেই নারীমূর্তি বারে বারে ডাকছেন আর আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না। চকিতের মধ্যে মনে পড়লো উত্তরকাশী থেকে আসার পথে সেই অমোঘ বাণী 'সংস্কার আছে যে, ওতেই যে ডুবে যাম।' মনকে আবার চাপা করতে চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আপনি, যদি দেবী হন, তাহলে আমার সামনে আসুন আমি অর্ঘ্য দেই। তারপরে আসন ত্যাগ করবো।'।

সেই মুহূর্তে দেখলাম উনি কুটীলা হয়ে উঠলেন। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। আরক্ত নমনে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমার বাক্য যে না শোনে তাকে আমি শাস্তি দেই।' বুঝতে অসুবিধে হলো না ইনি জগদম্মা নন। তাহলে কে ইনি? এই চিন্তা আমাকে ব্যাকুল করে তুললো দেখলাম সেই নারী হাতের মধ্যে কি যেন নিয়ে মন্ত্র পড়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। লক্ষ্মনের সামান্য আলো নিভে গেল। আর অসম্ভব গর্জন। অনেকটা মেঘের গর্জনের মতো। কিন্তু ভয় পেলাম একটা বীভৎস সরীসৃপকে দেখে। এই শ্রেণীর জীবদের আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। আর ভয়ও যে না করি তাও নয়। দুটি বিরাট সরীসৃপ ফণা তুলে আছে আমার আসনের হাত তিনেক দূরে। মনে হলো

দুটি ক্ষুধার্ত জীবের জিভ লক লক করছে ছোবল দেবার জন্যে।

ইচ্ছামাত্র ভুলে গিয়ে শুধু 'মা' বলে কেঁদে উঠলাম। চেতনা হারাবার আগে শুনতে পেলাম 'কুন ভয় নাই বাবা'। মনে হলো ভৈরববাবার কণ্ঠস্বর। কিন্তু দেখলাম দুটি জীব উদ্যত হয়ে আছে। আবার চীৎকার করে উঠলাম, 'মা, মা' বলে। একটা অষ্টহাসি শুনতে পাচ্ছি সেই মহিলার।

আর চেতনা নেই। চেতনা ফিরলো গুরুদেবের হাতের স্পর্শে। বললেন, 'কি, এত ভয় পাও কেন, বলো ত? মায়ের নামে যদি শক্তি আনতে না পারো, তাহলে কাজ করবে কি ক'রে? কোথায় কি দেখে চোঁচিয়ে উঠে ভিররি খেলে।'।

এবারে ভৈরববাবা মুখ খুললেন, 'তুমি অমুন করে বকো নি গো। বুঝাই বলো। বাবা তৌ ত আসন ছাড়া উঠে নি। উঠলি কি সর্বোনাশ হতো সেটা ভাববার কথা নয়?'।

আমি বললাম, 'আমি যা দেখেছি তাহলে সব সত্যি?'

ভৈরববাবা বললেন, 'তু ঠিক দেখেচিস বাবা। ও তো মোয় নয়, ডান বটে। তুকে ছিঁড়ে ফেলত গো।'।

আমি আরো ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে গেলাম।

গুরুদেব বললেন, 'একেই ভীতু, তারপর বাবা তুমি ও সব কথা বলছো কেন। দেখছ না কেমন সিঁটিয়ে আছে। অথচ শ্মশানে তাত্তিক ক্রিয়া করার লোভ পুরোপুরি আছে। এই মনোবল নিয়ে এসব কাজে হাত দেওয়া অন্যায্য কি না বলো?'

ভৈরববাবা বললেন, 'সত্য কথা বলবু নাই কেনে উ জানুক। ভয় তো হবেই। তা লড়তে হবেক নাই। মায়ের রাজ্যে কতো অনাচ্ছিন্তি আছে তা পরখ করবে নাই।'।

শুনলাম ডাকিনী বিদ্যায় পারদর্শিনী ঐ মহিলা এমনি ভাবে তরুণ সাধকদের আকর্ষণ করে থাকে। শক্তি আছে ওর। কিন্তু বড়ো নিম্নমার্গী। ওইতেই আটকে রয়েছে আর উঠতে পারে নি।

গুরুদেব বললেন, 'চল দেখবে সাপ দুটোর কি অবস্থা। দূরে গিয়ে দেখলাম সাপদুটি সেই মহিলাকে সর্বাস্থে জড়িয়ে আছে। আর সেই মহিলার চেহারা ক্রমেই কদর্ব হয়ে যাচ্ছে। গুরুদেব আর ভৈরববাবাকে দেখেই হাত জোড় করলো। কথা বলার ক্ষমতা নেই। দুটি সাপ পাকে

পাকে জড়িয়ে ফণা তুলে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিক।

ভৈরববাবা বললেন, 'কি গ, পাপের শাস্তিটো দেখছ লাই। তুমরা ম্যঙ্গ মনিষ মায়ের পারা। তুমার তো কুণ্ডলী জাগা আছে। তবে মায়ের চরণ প্রার্থনা না করে ই কাম করো ক্যান?'

গুরুদেব বললেন, 'একে বেঁধে রেখে কি লাভ। ওর তো মন বদলাবে না। এখন মরে গেলেও আবার ঐ সংস্কার নিয়েই জন্মাবে। পরের জন্মে আরো ভয়ঙ্করী হয়ে উঠতে পারে।

তারপর মহিলাকে বললেন, 'তুমি এই ছেলেটির কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে বলো ত? এমন পশুর মতো মনো-বৃত্তি কেন তোমার। দেখলে ও তোমাকে চায় না, তবুও ছলা কলা দেখিয়ে বশীভূত করতে চেষ্টা করলে। তারপর যখন ভয় পেলে তখন তুমি আরো ভয় দেখাতে লাগলে। ও তো মরেও যেতে পারতো। মায়ের পবিত্র নাম নিয়ে ধ্যান করছে আর তুমি তার মধ্যে এসে ওকে নষ্ট করতে চাইলে। তোমার এই কি শিক্ষা? তোমার গুরুকে বলো তো?'

মহিলা তখনো উত্তর দেয় না দেখে গুরুদেব ও ভৈরব-বাবা দুজনেই জোর ধমক দিলেন।

মহিলাটি তার গুরুর নাম বললো। শুনাই ভৈরববাবা বললেন, 'উ তো মোর শিষ্য বটে। উ তো এমনধারা নয়। মু ডাকবু উকে।' এবারে ভয় পেয়ে গেল মহিলাটি। মুহূর্তের মধ্যে বিকট চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। গুরুদেব তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বললেন, 'তুমি মায়ের পূজায় বসার আগে মায়ের দক্ষিণে যোগিনীর পূজা করেছিলে তো। তার উদ্দেশ্যে বলিও দিয়েছ। ও এই শ্মশানের কাছেই নিরাসা জায়গাতে থাকে। ও ভাবলো তুমি ওর সহজ শিকার। এক সময় ও সত্যিই ভাল কাজ করতো। আচ্ছা ও প্রথমে কি ভাবে এসেছিল বলো ত?'

বললাম। উনি বললেন, 'ও উলঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু কোন অবস্থাতে বস্ত্র খসে পড়ে তা জানে না।'

ডাকিনী শক্তি প্রকৃতির অন্ধ শক্তি নয়। ওরা হচ্ছে সেই সব গুণ যেগুলি থাকার জন্যে প্রকৃতির বুকে অনবরত জন্ম মৃত্যু ঘটে চলেছে। সাধকরা আগে ডাকিনী যোগিনীদের ভুঁষ্ট করেন। তাঁরা ভুঁষ্ট হয়ে সাধককে সিন্ধি লাভ করার শক্তি দান করেন। এ এক পদ্ধতি আছে। কিন্তু তার

জন্যে প্রয়োজন নিঃশব্দ হওয়া, নিষ্পন্দ হওয়া এবং সবশেষে অস্পন্দ হওয়া। অস্পন্দ হলো মহাশূন্যতার প্রতীক। এ হলো দর্পণ। এরই উপর সমগ্র সৃষ্টি প্রতিফলিত হচ্ছে। সুন্দর, কুৎসিৎ, ভালো, মন্দ সব। যে সাধক অস্পন্দ সে সাধনার পথে অগ্রসর হবার অধিকারী। আর এই যে মহিলাকে দেখছ ও ভয়পাতে গেছে ওই ওর গুরু এলো বলে।'

'ভৈরববাবা যেন ঐ মহিলার গুরুকে তুলে নিয়ে এলেন শূন্য থেকে?' বললাম আমি।

গুরুদেব মুচকি হেসে বললেন, 'তোমার কামা শুনো যদি সাড়ে ন'শ মাইল দূর থেকে অভয়বাণী শোনাতে পারেন আর এ তো মাত্র পঁচিশ ছারিশ মাইল।'

মহিলার গুরুকে সব বলেছেন ভৈরববাবা। গুরুর চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে আর সেই আগুনের জ্বালায় পুড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে ডাকিনী-বিদ্যার মহিলা। শেষটুকু আর বলার প্রয়োজন নেই।

আমরা তিনজন আবার সেই আসনের কাছে এলাম। গুরুদেব সামনে বসে আছেন, ভৈরববাবা আমার ডান দিকে। বললেন, 'রাতের প্রায় তৃতীয় প্রহর। ধ্যান করো, আমরা আছি।' শুনতে পেলাম কে যেন বলছেন, 'সহস্রদল কমলের নীচে যে চন্দ্রমণ্ডল আছে তাকে চিন্তা কর। শুনলাম ব্রহ্মরক্ত মধ্যে ষোড়শ কলাযুক্ত যে পীষুভানু আছেন তিনিই হংস বা পরমাত্মা। সেই নিরঞ্জন পরমাত্মার ধ্যান করতে হবে।' কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পদ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য ও একাগ্রতা এই যোলটি কলা।

ধ্যান ঠিক মতো হচ্ছে না। আগেকার ঘটনাগুলি একের পর এক ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে। হঠাৎ বোধ করি ভৈরববাবা আমার কপাল স্পর্শ করলেন। দুই ভুরুর মাঝখানটা যেন মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠলো। পর-মুহূর্তেই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে ভেসে চললাম যেন। সাদা নীলাভ জ্যোৎস্না, ছায়া নেই, মালিন্য নেই। সেই আলোয় একটা মাত্র নীলাভে নক্ষত্র যেন জ্বলছে চোখ বন্ধ কিন্তু অনুভব করতে পারছি ঐ নীলাভ স্বেত পিণ্ডটি ক্রমাগত নিকটবর্তী হয়ে আমার কপালে যেন ঢুকে গেল। দেখতে পেলাম আমার চারপাশটা সাদা হয়ে গেল। আর আমারই পাশে

আমারই মতো একজন মানুষ গদ্যাসনে বসে আছে। ওমা, এ যে আমিই! রং বদলাতে লাগলো আমার সেই প্রতিচ্ছবিটির। তারপর আর কিছু বুঝতে পাচ্ছিলাম না। একটা বিবট আলোর গহ্বর যেন গ্রাস করে ফেললো আমাকে।

তারপর দৃশ্যপট বদলে গেল। দেখলাম আমার সামনে চিতা জ্বলছে। সেই চিতায় আমার দেহটা পুড়ে যাচ্ছে। আমার প্রিয়জনরা পুড়ছে। চিতার আগুনে স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম এক নারী-মূর্তি। ক্রমে সেই মুখ যেন অপূর্ব লাবণ্যভরা হলো। ক্রমেই চিত্রপট বদলে যাচ্ছে। লাস্যময়ী নারী, অপাবৃত্তা নারী যোগিনী, তপস্বিনী আসছেন। এরপর মুখ বীভৎস হয়ে উঠলো। তার বিকৃত বদন ক্রমেই বিকটাকার হুগে যেন আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত আর সামজাতে পারলাম না। ভৈরববাবা ধরে ফেললেন। গুরুদেব অনুযোগের স্বরে বললেন, ‘তখনই তোমাকে বলেছিলাম ও পারবে না। এই নিরোধ-সমাধির সাধনায় পার হতে হলে ওকে যেতে হবে প্রথমে তুঙ্গনাথে। পঞ্চকেদার পরিত্রমার সংখ্যা শেষ হয় নি। তাই ও ভয়ঙ্করকে সুন্দর বলতে পারে না। আসলে ওর ইন্দ্রিয়জ্ঞ বোধ তো রয়েছে।’

আমি মাথা নীচু করে আছি। ভৈরববাবা অভয় দিয়ে বললেন ‘হবেক গ বাবা। তুঙ্গনাথেই যাও। জয় বাবা ভোলানাথ।’

বাধ করি শ্মশান জাত বৈরাগ্য আমার চিত্তে চেপে বসেছিল। হরিদ্বার থেকে যাত্রা শুরু হলো। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ। কেন এলাম এখানে জানি না। এ কি পলায়নী বৃত্তি, না প্রকৃত মানুষ হবার বাসনা। পালন, অথবা গুরু আস্তা বুঝতে পারলাম না। শুধু এইটে বুঝতে পেরেছিলাম আমাকে যেতে হবেই।

গুপ্তকাশী ছাড়িয়ে এসে প্রায়ই দেখা যায় পেছনে নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় নীল এক উঁচু পাহাড়। মনে হয় কোন বৃদ্ধ যেন শীতের ভয়ে মাথায় সাদা চাদর জড়িয়ে আছেন। এমনিভাবে বরফ ঘিরে আছে পাহাড়ের চূড়ায়।

অল্প পথ গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই-এর পথ। সরু পথ। চারদিকে গহন বন আর বড় বড় গাছ। শান্ত

নির্জন পরিবেশ। পাখীদের কলরব কানে আসে। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে যেতেই গাছের ঘন সারির পর্দা চলে গিয়ে চোখে পড়ে জলরাশি। পাহাড়ের কাঁধের উপর এসে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রচণ্ড বাঁক। মোড় ঘুরতেই বানিয়াকুণ্ড। বানিয়াকুণ্ড থেকে সোজা পথ চোপতা। তা প্রায় মাইল খানেক। এখান থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে তুঙ্গনাথের চূড়ায়। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথের শেষ চড়াই প্রায় তিন হাজার ফুট। অনেক সময় লাগলো। কিন্তু সময় কেটে গেল কিভাবে টের পেলাম না। পথের সৌন্দর্য অপরিমিত। গাছপালার ভিতর দিয়ে দেখা যায় সারি সারি বরফের চূড়া—কেদার, বদরীর শিখর। দূর থেকে মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি মহাকাশের গায়ে। গাছের রাজ্য শেষ হয়। তখন শুধু ঘাস আর ফুলের মেলা। মাঝে মাঝে চঞ্চল মেয়ের মতো ঝরনাধারা। উপরের দিকে তাকাই—নীল আকাশ। দূরে তুবারের শিখর মালা। মনে হয় যেন রক্তার বাহন হাঁসের সারি উড়ে চলেছে রক্তলোকের দিকে। আধমাইল লম্বা আর প্রায় ৮০০/৮৫০ গজ চওড়া হৃদ কোথাও দেখেছি কি—এই দুর্গম পাহাড়ের বুকে। না দেখে থাকলে তুঙ্গনাথের পথে যাও। আট হাজার ফিট উপরে এই হৃদ। মন্দির আরো উপরে। তুঙ্গনাথের উচ্চতা ১৩০০০ ফিট।

মন্দিরের আগেই পড়ছে করণা। অস্তুত সুন্দর নাম তার—আকাশগঙ্গা। সত্যিই আকাশ থেকে যেন গঙ্গাধারা নেমে আসছে। বিপদটা ঘটলো ওখানেই। এতক্ষণ কবি হয়ে দেখছিলাম এবার বাস্তবে হাঁচট খেলাম। এক বয়স্ক মহিলা এক জীর্ণ শীর্ণ মানুষকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। ঝরনার কাছে এসে হঠাৎ পা-হড়কে গেল সে। শীর্ণ মানুষটি জলের স্রোতে ভসে যাচ্ছে। আর মহিলাটিব সে কি করুণ আওঁনাদ। আমার কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ার আগেই মনস্তির কবে নিয়েছিলাম। দেখলাম একটা বড় পাথরের সঙ্গে আটকে আছে ওর দেহটি। কোন বিবেচনা না করে আমি ছুটে গেলাম তাকে বাঁচাতে। এই বর্ণনা দিয়ে কোন লাভ নেই। তবে তাকে তুলে আনলাম বটে কিন্তু আমার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত। আব নড়তে পারলাম [শেষাংশ—২০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অষ্টবলয়া কুণ্ডলিনী মহাশক্তি

অমৃত কুমার

তন্ত্রের ভাষা সহজ কিন্তু তত্ত্ব অতি গহন। তন্ত্রের রহস্য বেদের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তন্ত্রকে বেদের রহস্যবিদ্যার নির্দেশগ্রন্থ বলা চলে। কোলযোগীরা পঞ্চ-ম-কার তন্ত্রে পঞ্চবলয়া কুণ্ডলিনীর ব্রহ্মগতি সরল করার জন্য আশ্রয় সাধনা করেন। তেমনি অষোর পক্ষী যোগীরা সপ্ত-ম-কার গ্রহণ করে সপ্তবাক্য অতিক্রম করে অষ্টম বাগ্‌রূপা কোলিনী মহাশক্তির সিদ্ধিলাভ করতে সচেষ্ট হন। এই কোলিনী বাগ্‌শক্তিকেই বলে অষ্টবলয়া কুণ্ডলিনী। ইনি জীবের তিন প্রকার দেহের অষ্টাঙ্গের মধ্যে পরিব্যাপ্তা থাকেন। এই মহাশক্তি হলেন অষ্টতারূপা কামতারা বা কামাখ্যা। তন্ত্রের উচ্চতম সিদ্ধগণ ছাড়া অষ্টবলয়া কুণ্ডলিনীতত্ত্ব খুব কম সাধকই জানেন। অধিকাংশ সাধক সাক্ষীত্ববলয়া কুণ্ডলিনী শক্তির সাড়া পেয়ে তাকে পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চেন্দ্রিয়রূপে আশ্বাদন করে পঞ্চবলয়া কুণ্ডলিনীর অনুশীলন করেন। কপাল বিদ্যা এই পঞ্চবলয়া থেকে আরম্ভ ও পঞ্চমে বা আনন্দরূপ ব্যোমরক্ষা থেকে এর 'উর্ধ্ব'তন সাধনের ও অন্তিম অনুভূতির উদ্দেশ্য।

তারা মায়ের জটায় পাঁচটি কপাল মুকুট আকারে রয়েছে। এর তাৎপর্য হলো পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বোধকেন্দ্র মস্তিষ্কের মধ্যে আছে। মহাযোগিনীর সহস্রজাল কেশরাশি যখন যোগযুক্ত হয়ে জটায় পরিণত হয় তখন এই পাঁচটি চেতনাকেন্দ্র ওপশুষ্ট হয়ে কপালে পরিণত হয়। এ'রা তখন পঞ্চপ্রোতে বৃপান্তরিত হয়ে নিজের সাবেক শূন্যরূপে বা অব্যক্ত চেতনারূপে বিরাজ করেন।

তারা মা অক্ষোভ্যা ভৈরবী। অক্ষোভ্যের স্থান আরও তিন বলয় উপরে। অক্ষোভ্য লাভ করতে হলে অষ্টাঙ্গার মধ্যে অষ্টবলয়া দেদীপ্যমানা শক্তির লীলা দর্শন করতে হবে। তাই এই অবস্থার কুণ্ডলিনীর নাম একাক্ষক, একাক্ষকেশা বা একজটী।

ঋক্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি সূক্ত এখানে উদ্ধৃত করবো—'ওঁ অগ্নির্বে দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ। তদন্তরেণ সর্বা অন্য দেবতাঃ। অগ্নাবৈষ্ণবং পুরোডাশং দীক্ষণীয়মেবাদশ কপালম্। সর্বাভ্য এবৈনং তদ্বৈবতাভ্যঃ অনন্তরায়ং বপসি।

অগ্নির্বে সর্বা দেবতাঃ। বিষ্ণু সর্বা দেবতাঃ। ...কৈনয়োঃ কল্পিঃ? কা বিভক্তিরিতি। অষ্টাকপাল আগ্নেঃ। অষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী। গায়ত্রমগ্নেচ্ছন্দঃ। ত্রিকপালো। বৈষ্ণবঃ। গ্রিহীর্দং বিষ্ণুর্বাভ্রমত।'

আগে আমরা বৈদিক সূত্রগুলির আক্ষরিক অর্থ দেখি। পরে তন্ত্রের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য দেখবো। অগ্নি হলেন দেবতাদের মধ্যে প্রথম। বিষ্ণু হলেন কনিষ্ঠ। এই দুজনের মধ্যভাগে অন্যান্য সব দেবতারা রয়েছেন। যজ্ঞমানরা (যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানকারী) এগারোটি কপালে অগ্নির জন্য ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুরোডাশ নিবেদন করেন। পুরোডাশ হলো মাষ ও আদ্র'ক যুক্ত পিঠে। এইভাবে উৎসর্গ করলে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়।

অগ্নির জন্য থাকে আটটি কপাল, কারণ গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা। গায়ত্রীই হলেন অগ্নির্মূর্তি বুদ্ধদেবের ছন্দ। বিষ্ণুর বলি তিনটি কপালে দেওয়া হয়। কারণ বিষ্ণু তিনটি পদক্ষেপে যাবতীয় সৃষ্টিকে আবৃত করে রেখেছিলেন। এখানে যে গৃহ্য কথা আছে তাহলো গায়ত্রী ত্রিপদা। তাহলে দেখা গেল অগ্নি এবং বিষ্ণু উভয়েই এক--কারণ উভয়েরই একই গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নি হলেন মোক্ষক্লিয়ার আদিভূত আশ্রয়। ঋগ্বেদের আরম্ভ ও শেষ অগ্নির উপাসনাতেই বেদবিদ্যার প্রথম সূত্র বুদ্ধে এবং শেষ সূত্র বিষ্ণু বা পরমশিবের প্রতিষ্ঠিত। 'হরি' শব্দটি পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দ্যোতক আবার সংস্কৃত অভিধানে এটি শিবেরও পর্যায়। শাস্ত্রে আছে যজ্ঞাগ্নিরূপে যিনি প্রজ্জ্বলিত হন তিনি বিষ্ণু বা শিবরূপ অবলম্বন করে দীপ্যমান হয়ে আমাদের ধ্যানলহরীকে প্রচোদিত করেন। আদিত্য মণ্ডলে উজ্জ্বলবর্ণ পুরুষ আছেন, তিনি সবার ধোয়। তাঁকে বিষ্ণু বা নারায়ণ বলা যায় আবার তাঁকে পরমশিব বা মহারুদ্রও বলা চলে। যজুর্বেদে বলা হয়েছে 'ওঁ নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যবৃপায় হিরণ্যপত্নে উমাপত্নেহরিকাপত্নে নমো নমঃ।' এখানে দেখতে পাচ্ছি শিবই আদিত্যের বা সূর্যের অধিদেবতা। পদ্মপুরাণে নারায়ণের ধ্যানে বলা হয়েছে 'যোগঃ সদা সর্বভূমণ্ডলমধ্যবর্তী'...ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে দুটি ধ্যানই ব্রহ্মাগায়ত্রী

মন্দের প্রতিপাদিত ধ্যেয় মূর্তি। 'বৈজয়ন্তীকোশ' গ্রন্থে 'সবিতা' শব্দকে সারথি, পিতা ও সূর্য বলা হলেও তা যে রুদ্রের পর্যায় তা বলা হয়েছে। মৈত্রাহণী উপনিষদেও গায়ত্রীমন্দের প্রতিপাদ্য দেবতাকে 'রুদ্র' বলা হয়েছে ('সংসারং') ভজ্জয়ন্তীতি ভগো বৈ রুদ্র ইতি ব্রহ্মবাদিনঃ।'

এবারে 'কপাল' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'কপাল' বা নরশীর্ষপাত্র বৈদিককালে রহস্যযজ্ঞে প্রযুক্ত হতো। তন্ত্রের রহস্যার্চনায় কপাল বা মুণ্ডপাত্র অথবা মহাপাত্র হলো দেবতার নৈবেদ্য দেবার সর্বোত্তম আধার। এই পাত্র স্থাপন করে তান্ত্রিকী যজ্ঞ করতে করতে তার ষোলসম্মত অন্তর্ধাগের ইঙ্গিত মা নিজেই সাধককে দান করেন। 'বৃহৎ যোগিনীতন্ত্রে' এই ক্রিয়াই কুণ্ডলিনীরূপে চৈতন্যশক্তিকে জাগ্রত করার অন্যতম পদ্ধতি। বীর সাধক যিনি ক্রমেই দিব্যস্তরে চলে যান তিনি মায়ের কবুগায় এর তাৎপর্য বুঝতে পারেন। চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ না করতে পারলে চামুণ্ডার নিজের রূপ ফুটবে না। চণ্ড হলো এই দেহ আর মুণ্ড বা কপাল হলো যজ্ঞকারীর নিজের মাথা। এই দুয়ের মহাসেতু হলো 'কণ্ঠ'। মা ঐ সন্ধিস্থলটি নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে ডমরু বাজাচ্ছেন। নানা শব্দ উঠছে। বৈখরীরূপা শব্দব্রহ্মময়ীর প্রকাশ হচ্ছে। ইনি যদি অন্তর্মুখী হন তাহলে কণ্ঠবিন্দু হয়। জীবতত্ত্বের মাথা ছিঁড়ে যায়। কণ্ঠ যদি না কাটা যায় তাহলে ছিন্নমস্তার আগ্রয় পাওয়া যায় না। কং মানে হলো মাথা বা চেতনা আর ঠ বা ঠং হলো চন্দ্রমণ্ডল। অর্থাৎ চেতনার আধার সর্বকামনাবীজময়ী ব্রহ্মপুরী ভেদ করে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হওয়া হলো কণ্ঠ ছেদনের রহস্য। এই হলো কপাল বা কাপালিক বিদ্যা। নরবলির তত্ত্ব হলো এটি। মহাসিদ্ধ কপিল হলেন এই মার্গের প্রতিষ্ঠাতা। 'কণ্ঠে বিন্ধিমতম্' নামক তন্ত্র কাপালিক সম্প্রদায়ের একটি গুপ্ত গ্রন্থ। তর্কোবিন্ধি হলেন এক জন মুনি। ইনি সামবেদীয় সম্প্রদায়ের এক শাখা প্রতিষ্ঠাতা কুলপতি। এটি নরচর্ম এবং নরশোণিতের সাহায্যে লেখা পুঁথি। শুরুষজুব্বেদের মধুবিদ্যার অনুশীলন ও প্রকাশ করলে মাথা ছিঁড়ে পড়ে একথা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। এই গুঢ় ইঙ্গিত এবারে বোধগম্য হলো আশা করা যায়।

অষ্টকপালিনী বিদ্যা কুণ্ডলিনীবিদ্যবত্তম।

ভগবৎপালিনী সৈকা সাক্ষ্যমূর্তিঃ পরাংপর।

মহাশক্তির অষ্টবলয়া কুণ্ডলিনীর কথা এই রহস্যোক্তিতে বলা হয়েছে। ভিতরের চিং-অগ্নি নাভিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত করে মায়ের সঙ্গে যুক্ত নাড়ী দেহাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু সত্যলোকে জগন্মাতার 'জ্যোতির্জরাম্বু'র জ্ঞানময় নাড়ী ছিন্ন হয় নি। তাকে আবিষ্কার করে জ্যোতির্ময় পদ্মকণিকায় উঠে যাবার চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে।

অগ্নিমূর্তি রুদ্রকে জাগ্রত করতে পারলে সাধক রুদ্রকবচ লাভ করেন। কুণ্ড চেতনারূপা কুণ্ডলিনীর জাগ্রত হবার স্থান কোথায়? নাভিতে। অর্থাৎ মাতৃ যোগস্থানে। তাই এই কেন্দ্র হলো প্রারম্ভিক ধ্যানযোগের চক্র। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডে এটি হলো মণিপুরচক্র। এখানে 'হুং' রূপী মহাকাল প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকেন। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে একে বলা হয় সূর্যমণ্ডল যাকে বেদে বলা হয়েছে জগতের নাভি। এখানে কুণ্ডলিনীর জ্যোতি মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত আবির্ভূত হয়ে সহস্রার পদ্মে পরমশিবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সহস্রাদিত্য স্ফুটন হন। অগ্নির অষ্ট কপাল। এ'রই বিদ্যা হলো অষ্টকপালিকী বিদ্যা। অষ্টবলয়া কুণ্ডলিনী দেহের অষ্টাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও তাঁর বিশেষ তত্ত্ব সহস্রদল-কমলে বা সহস্রারে অনুভূত হয়। এখানেই সোমের স্থান। উমা বা ওঁকাররূপী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরমশিবের জ্যোতির চিদানন্দলহরী এই কেন্দ্র থেকেই সোমধারারূপে নিঃসৃত হতে থাকে। এই সোমধারাই অগ্নিচ্ছোমের কপাল স্থিত আহুতি। কপালকুণ্ডে তরল চিন্ময় জ্যোতি বিরাজ করে—তা মায়ের আর্টটি মূর্তিতে প্রকাশিত হয়। পণ্ডভূত, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই হলো আর্টটি মূর্তি। অষ্টাঙ্গরা গায়ত্রীর ছন্দোলহরীতে মায়ের চিন্ময়ী জ্যোতির আশ্বাদন করা যায়। সহস্রারজ্যোতি অষ্টকপাল দিয়ে ঢাকা। আর্টটি কপাল একসঙ্গে থেকে ধ্যানকেন্দ্র মস্তিষ্কের আবরণ-রচনা করেছে। আর্টটি কপাল হলো—জালাটিক (ভাস্করী ভাষায় Frontal Bone), দুটি প্রাচীরাস্থ (Parietal Bone), দুটি মহাশব্দ (Temporal Bone) শৈরঃ পৃষ্ঠ [শেষাংশ ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

স্বপ্নময়ী শরৎ

ত্রিবিণয়ভূষণ দাশগুপ্ত

উদয়ের আদি হ'তে
প্রতাহের উষালোক পরে
কামনার দীপশিখা ধরে
চিত্তভুলে নিত্য অভিসার
লভি যে তোমার
তাহাতেই মুগ্ধ করো মোরে ।

সে আলোর স্বচ্ছতায়
নীলাবধের স্বর্ণঝরা মায়া—
থনে খনে শূদ্র মেঘজল
দিক হ'তে নানা দিগন্তেরে
লুকোচুরি খেলে
সম্প্রতিতে ভগ্ন ভয় ছায়া ।

শিশিরের সিক্ত করা
শ্যামাস্কৃত তৃণভূমি পথ
সিক্ত পত্র যত বনস্থলী
মুঞ্জরিত পুষ্পকুল কলি
সুরভি সম্ভারে
এনে দিল নতুন শরৎ ।

হাওয়া আর আনন্দ

স্মারাদনা গুপ্ত

ঘরের দরজা ভাঙ্গানো ছিল
নীল আলো জ্বলিছিলো
বাইরে কে যেন অরণ্য কান্না কাঁদছে ।
আশ্চর্য হিম বাতাস রাত্রির আকাশে—
মাটিতে তাপ নেই কেমন ভয় ভাব...
দমকা হাওয়া এসে ঘরের দরজার
পাঙ্গা দুটো খুলে দিল,
এক টুকরো হাসি বারে পড়ল,
যেমন কেউ জন্মেছে খবরটা শুনলে যে আনন্দ হয়
ঠিক তেমনই সে ক্ষণ ।

দৃষ্টির দুয়ার খুলে
অস্তরের দোসর লাগিয়া
ছেলে দিই মোর ধ্যানধূপ
কল্পনায় আঁকি তাঁর রূপ
অপেক্ষিত মনে
নিরন্তর রয়েছে জাগিয়া ।

অন্তর বাহির দুই
এক সূত্রে সব গাঁথে নিতে
উল্লসিত তনু আর মন
থনে খনে দেয় শিহরণ
একান্ত এ মনে,
মগ্ন রহি আত্ম সমীপতে ।

এই যে অর্পণ-ভূষা
প্রকৃতির লীলাঙ্গন লোকে
অন্তহীন অনন্তের কাজ
রচিয়াছে স্বপ্নময়ী জাল
মোর ভাবনায়
ধরা থাক আনন্দ আলোকে ।

এখনো কলকাতায়

সাধনকুমার রক্ষিত

এখনো বাহারি ফেস্টুন, মিছিলের মুঠিবদ্ধ হাত—
কমতে পারেনি একচুল মহাজনী-ভুড়ি ;
পতিতা বিবেক, তাই উধাও হাদিক অশ্রুপাত
অকাল অভিভাবকস্বৈ কুমারীরা ভাঙে রাতে চুড়ি !
ফিরোজা আকাশের বুকে প্রতিদিন চলে বলাৎকার
রাস্তাঘাটে জমে অবিস্বাসের বিচিত্র অঞ্জাল ;
হয় মস্তানের সুখস্বপ্নে জননীর দেহ ছারখার
অলক্ষ্যে থেকে হাসে জব চার্ণকের কঙ্কাল ।

চলার পথ

হাসিরাশি দেবী

বন্দরের কাল শেষ হ'ল
হে নাবিক। তবুও দাঁড়িয়ে কেন,—
তোল' তোল
নোঙর তোমার,—
হাল তুলে হাতে নাও
সেদিনের পুরানো নৌকার।
এখন' নামোনি রাত
এখনও কিছ' বেলা আছে,—
হয়তো সূর্যের আলো গড়িয়ে গড়িয়ে
এখনি আসবে নেমে
আর এক আশীর্বাদ নিয়ে
সমুখে তোমার,—তারে যেন ফিরায়ে দিলো না ;
ওঠ, তুমি দাঁড়াও আবার—
পথ খুঁজে খুঁজে চল
আর এক নতুন-যাত্রীর।

শেষ হল বন্দরের কাল
এ নদীতীরের,—তবু তুমি সরাও জঞ্জাল
সব শক্তি দিয়ে,—তারপর
ব্যর্থতার আকর্ষণ ঠেলে
নৌকাটাকে টেনে চলো,—
কখন' বা চলো দাঁড় ফেলে,
কাদা আর জল ভেঙ্গে—যার
আহ্বান জানাবে বারম্বার
কোনও এক উন্মোচিত অস্থির সাগর,—
তারই তীরে তীরে
কেউ বোঝা নিয়ে যার
কেউ বোঝা নিয়ে আসে ফিরে
মিলনের হাটে,—
সেই আজ নতুন বন্দর।

মৎস্য কাব্য

শ্রামাদাস দে

সদানন্দ — সকালেতে গোছলাম মৎস্যের বাজারে
সুখবর সুখবর শাঁখ ঢাক রাজা রে।
ভবানন্দ — কি খবর কি খবর বলনা রে সদাদা।
সদানন্দ — ইলিশ গলদা থেকে পুঁটি পাবদা
পোনা বাটা কুঁচো ল্যাটা সব একদর।
ভবানন্দ — কী মজা রে কী মজা।
ইলিশ কিনব আজ পাঁচ-সাত কে জি
ভাতে খাব ঝোলে খাব,
খাব ঝালে অমলে, আর খাব ভাজি।
সদানন্দ — খলি নিয়ে ছুটলি যে, দরটা কি শুনবি না ?
ভবানন্দ — তাইতো রে তাই তো, কে জি কত বল না ?
সদানন্দ — কে জি নয়, আজ থেকে দশ গ্রামে দর।
সোনার পরেই পারি কাগজেতে মাছের খবর।
সোনার মতই দর,
পুঙ্খো-মাসে বিয়ে-মাসে ওঠা-নামা হবে।
আজ থেকে টাকা-দর শুরু হল হবে।
ভবানন্দ — 'টাকা-দর' সেটা কি রে, বুঝিয়ে তো ক'বি রে
সদানন্দ — দশ গ্রাম একটাকা বুঝলিনা ভাবি রে ?
মাছ আর খাদ্য নয়,
আজ থেকে মাছ শুধু শূঁকবি আর দেখবি।
(আর) শূভ দিনে মাছের গমনা দিয়ে কনে সাজাবি
ভবানন্দ — তাহলে কি মাছপণে বরপণ হবে, রে ?
সদানন্দ — সেটা যদি চালু হয় মন্দ নয় তবে রে।

শূন্যচারী মেঘ

শ্রীমুখীর গুপ্ত

শূন্যচারী মেঘদের হেরিলে আগ্রহে
বুঝিবে তাহারা কেন শূন্য-লগ্ন হয়।
বর্ষণে করিতে বিশ্ব শস্য-শোভাময়
শূন্যের সংস্পর্শ লাগে ; শূন্য স্থির রহে।
শূন্য-ধন্য মারুতেরা মহানন্দে বহে
জলদাতা জলদের আপন্নত হৃদয়
করিতে বর্ষণ-সুখী। মহতেরা রয়
আহ্লাদে অনন্ত-লগ্ন ; স্থূল তা'রা নহে।

অসীমের আশীর্বাদ সর্বদা' যে লভে,
সেবা তা'র সহজাত বৃত্তি হ'য়ে ওঠে ;
বৃষ্টি-স্নাত ফুলকুল সংস্পর্শ-গোরবে
পৃথ্বীর পূর্ণতা দিতে শাখী-শিরে ফোটে।
মানবও অনন্তসেবী হয় ভবে যবে
তা'র সেবা-শাস্তি পেতে বহু জন জোটে।

বাণী

ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

জীবনের আমনায় মুখের মিছিল।
ছোট-বড়-সোজা-বাঁকা আঁধার-উজ্জল
অসংখ্য মুখে লেখা অজস্র লিখন।
কত লিপি চলে গেছে বিন্দু-অতলে
অচেনা অক্ষরগুলি শুধু ব্যঙ্গ করে।
ভাষা কত ভেসে গেছে ভুলের প্রাবনে
শব্দের সম্ভার কত লুপ্ত, জলস্রোতে।
ব্যাবেলীয় অভিশাপে অভিশপ্ত সব।
জীবনাস্তের গোদুলি-আলোয় চর্কিত
হৃদয়মুকুর অনেক আননে দীপ্ত ;
একদিকে পলাতকা ছায়া সমাবেশ,
অন্যদিকে শাস্তমূর্তি আলোকসম্ভারী।
কোলাহল বন্ধ হ'লে বিস্মরণ-শেষে
মৃত্যুহীন বাণীরূপ নিস্তর্র উদ্ভাসে।

কমলি

শ্রীঅমর কর

আমার পুরোনো দিনের বাসবী
ল কলেজের কমলি,
কমলা ঘোষ দস্তিদার,
যে রং ছড়াত একদা
রাজনীতির গরম বুলি দিয়ে
ছড়াত মনের হাহাকার,
অনেক ঘাটের অনেক হাটের
সীমানা পেরিয়ে
পারল না পৌঁছতে লক্ষ্যে।
ক্লাসরুম থেকে পালিয়ে
হারিয়ে গেল কোথায়
কোন্ নির্জনে।
দক্ষিণ মেঘের পেঙ্গুইন
যায় না উত্তরের সন্ধানে।

জীবনের অনেক অকাল হাওয়া
ফুরিয়ে গেছে বিকেল বেলায়
অনেক সকাল রয়ে গেল
সকাল বেলাতেই।
শুকতারা তাই সুখ হসে নেই
জীবন খোঁজার সন্ধানে,
অবশেষে দেখা দিল
পোষ শেষের শিশিরবরা প্রাপ্তগে।
বয়স তখন এগিয়ে গেছে
নেহাত গোপনে
স্মৃতি ভারে বসে আছি
সুর বেঁধেছি একতারে,
কমলি এখন কাজ পেয়েছে
খবর বলে বেতারে।

ছড়াগান

সবিতা মুখোপাধ্যায়

চাট্টি মুড়ি দেনা মাগো
পথে যেতে খাব—
লাঙ্গল কাঁধে-গরু নিয়ে
ধানের মাঠে যাব।
মুশল ধারে জল হয়েছে
মাঠ হয়েছে সাদা
চষে তাতে আজই আমি
ফেলবো করে কাদা।
কাদায় কাদায় গড়ে উঠবে
আমার মনের আশা
আবার আশ্বিনেতে মাঠে জাগবে
সবুজ ধানের বাসা।
অল্পানেতে সোনার ধানে
সোনার মাঠ উঠবে ভরে
ধানের আঁটি বেঁধে অ্যনব
আমি আমার ঘরে।
ঝেড়ে কুরে যত্ন করে
রাখব গোলায় ধান ভরে।
পোষ মাসে মা-লক্ষ্মীকে পাতব
নতুন ধানের ঝাঁপি করে।
পোষপার্বণ উৎসবে মোরা
মাতব সকল দেশ জুড়ে।

হাতছানিতে ডাকে

ইলা সিংহ

এই ভর দুপুরে আমারে কে হাতছানিতে ডাকে
যেখানে ঐ শালের ছায়া নিখর হয়ে থাকে ॥
কুহু কুহু ডাকছে কোকিল স্বর্ণ চাঁপার পাখি।
সেখানে কে আমায় যেন হাতছানিতে ডাকে ॥
ঠেতী হাওয়া থেকে থেকে, শালের বনে বেড়ায় হেঁকে,
ছোট্ট নদী দুকুলে তার গালচে পেতে রাখে।
সেখানে কে আমায় যেন হাতছানিতে ডাকে ॥
পলাশ-তলী গাঁ পেরিয়ে পদ্মদিবীর ধারে,
বন-শালিকের বাসা দোলে তলতা বাঁশের ঝাড়
রোদের কঁকন পিছলে পড়ে
সবুজ টিল্লার পাখি।
সেখানে কে আমায় যেন হাতছানিতে ডাকে ॥
ফুল-ছড়ানো পলাশ বনের নিঝুম নীরব ছায়ায়,
রাখাল ছেলে একলা বসে
বাঁশের বাঁশি বাজায়।
গাঁয়ের বধু ফিরছে ঘরে কলস কাঁধে ॥
উদাস এমন ঘুরে বেড়ায়
সেই গায়েরি বুকে ॥
রোদ-ঝরা এই ভর-দুপুরে ঘুরে ডাকে
ফিরে পেতে চাই গো আমি
ফেলে আসা সেই আমাকে ॥

নতুন বছর

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ শীল

আমার জীবনে বছরের শেষ আর বছরের শুরু
সে ত হবে নাক এক।
পুরাণ বছর চলে যায়
রেখে যায় না কোন মধুর স্মৃতি,
চলার পথের কোন সঞ্চার।
শুধু দিন যাপন আর প্রাণধারণের গ্রানি রেখে
যায় প্রতিদিন।

তবুও আগামী বছর হৃদয়ে জাগায় নতুন আশা।
কল্পনার জালে হয়ত পড়বে ধরা
হয়ত আসবে এমন কোন সুদূর সুখের ছবি।
এ জীবনে আশা করা নয় এক অসুস্থ ভাবনা,
শীতের হাওয়ায় যাবে না কি শোনা বসন্তের আগমনী?

কথাতো আমারো আছে

মুকুল বাগচী

কথাতো আমারো থাকে
বয়সের বিকেল বেলায়
পড়ন্ত রোদের মত ফুটন্ত রঙ
তোমাকে মানায়।

অথচ
এখনো সূর্যের ফলা বিকট করে
আমার হৃদয়
সাতরঙে সাজিয়ে অক্ষর

বেলা অ-বেলায় ডেকে ওঠে
অগুণিত মন
টেউয়ের চুড়ায় দোলে পরম প্রার্থনা
কথা থাকে
কথা আছে
বার বার ঘোষণা ক'রে
আমাকে জানায় ॥

নাচ, গান, অভিনয়ের সেই পাখী

দীপ্তোপল রায়

চোখের সামনে যতক্ষণ ঐ চেনাশোনার
পাখী ছিলো—নাচে, গানে, অভিনয়ে,—
কেমন যেন খাপছাড়া লাগত,
গানকে মনে হত—বিদ্বেষ
নাচকে মনে হত—ছবি সাজাবার ভঙ্গিমা,
আর অভিনয়, সর্বদাই মনে হত
কেমন যেন বেমিশেল কথার
প্রলেপ দেওয়া শ্মশান যাত্রীর নীরবতা।

হায়, আজইত চোখের সামনে দিলে
সে চলে গেছে, পায়ে হেটেই, সকলের
সামনে দিলে, চোখ ইসারায় জানিয়ে গেছে
আবার দেখা হবে, কবে কোথায় জানিনা।

কি অন্তত, আজ আর কোন গান নেই
নাচ নেই, অভিনয় তাও নেই
বিদ্যায় বেলায় মনে হল, এই তার প্রথম
নাচ গান অভিনয়ের অভিব্যক্তি
সাদা গোলাপে ছড়িয়ে গেছে
গোলাপ গন্ধে—গোলাপী কিছু রং।

আলো-অঁধার

শান্তশীল দাশ

উৎসবের কত আলো-জ্বলে,
তবুও তো ঘোচে না অঁধার ;
এর ঘরে গুর ঘরে দেখি
রয়েছে-যে কত অন্ধকার।

সে অঁধার ঘোচাবে কে ? কই,
কোথায় সে আলো-ধরা হাত ?
নিজেকেই নিয়ে খুশি সব,
অন্য দিকে নেই দৃকপাত।

অঁধার ঘরের পাশ দিলে
আলো নিয়ে চলে কত জন,
কারা কাঁদে সেই ঘরে বসে,
কোথা কান শোনার মতন।

যে হাসে সে হাসবেই, আর
যে কাঁদে সে কাঁদবেই শুধু ;
কারো ঘর ভরবে আলোকে
নির্জনে কারো ঘর ধু ধু।

মা আমার ক্ষমা কোরো

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

এখনও কার্টেনি কালো-রাত
দুর্ভিক্ষের দীর্ঘশ্বাসে বিষাক্ত হয়েছে মুক্তবায়ু
এখনও কিছু শব্দ লুপ্তে নেয় নিষ্পাপ শিশুর পরমায়ু।
বাসন্তীর বৃকের গন্ধে মিশে থাকে খুনীর নিঃশ্বাস
বাবার চোখের ঘুম কেড়ে নেয় ছদ্মবেশী ক্ষিপ্ত ছারপোকা
মিছিলের পুরোভাগে গোটা-কর অসহায় কম্পমান হাত
ছিনিয়ে আনতে চায় সত্যকাম শপথ-সূর্যকে।

এখনও কার্টেনি কালো-রাত
ভ্রাণনের অট্টহাস্যে কঁপে ওঠে সংগ্রামী চেতনার হুণ
বকের পাখার নীচে লুকোচুরি খেলা করে সূচত্বের মেঘ
শকুনের লাল-চোখে পরিমিত প্রেম খোঁজে যুবৎসু যুবতী
মায়ের এক্স-রে-প্রেটে ফুসফুসে গোল-গোল রাঙ্কুসে দাগ
হৃদপিণ্ড দিনদিন হয়ে যায় ক্ষীণ
মা আমার ক্ষমা কোরো, মাতৃহের ঋণ
ব্লাড-ব্যাঙ্ক বেচেছি রক্ত, স্ট্রিপ্টোমাইসিন
কিনে এনে গুণে গুণে ছুঁড়েছি চিতায়...

মা আমার ক্ষমা কোরো, ভোর কি হবে না কখনও?
এভাবেই অস্তহীন অক্ষম আক্রোশে
কেটে যাবে কাল আপসোসে?
শপথ সম্মুখে রেখে মা তোমার সিঁথির সিঁদুর
চিতার আগুন ছুঁয়ে করি অঙ্গীকার
আমাদেরই রক্তে-রসে, অশ্রু-ধামে, জীবনের দামে
মুছে দেবো পৃথিবীর দমবন্ধ সব অন্ধকার ॥

পরীরা জ্যোৎস্নার আসে

শ্রীমুখীরকুমার বসু

এই ত এসেছে দিন শরৎ ঋতুর
মাঠময় টুপটাপ ঝরে
হিমহিম মুক্তার নুপুর
আকাশ পরীরা সাজে তারকার ফুলে।
কিছু কিছু কেশে গোঁজে, কণ্ঠে
শোভা পায় হীরকের জ্বালাময় দ্যাতি
হিমালী কুয়াশা ঘোমটার

আমাকে উত্তীর্ণ করো

দীপাঙ্ঘিতা সেন

কবিতা! তোমায় জানাই আমার হৃদয়ের উষ্ণ আহ্বান।
তুমি এসো ধীরে অতি ধীরে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে,
আমাকে উত্তীর্ণ করো তোমার স্বপ্নীল কম্পনারাজ্যে।
পৃথিবীর গদ্যময় পরিবেশে

আজ শুধু সংঘাত, শুধু হানাহানি;
ভাই ছুরি মারছে ভাইকে,
মায়ের বুক শূন্য করে সন্তানকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পিশাচ,
নারীর মর্বাদা এখানে ভুলুঠিত।

দেশে দেশে আজ শুধু যুদ্ধ,
প্রবলের হাতে কেবলই জমে উঠছে মারণাস্ত্রের পুঞ্জি,
কবিতা! এ জগৎ থেকে তুমি আজ নির্বাসিত।

এখানে শুধু বারুদের গন্ধ,
বিষাক্ত বাতাসে আমার নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ।
এখানে তোমার মতো কেউ ভালবাসতে জানে না।

কারুর কণ্ঠে নেই আনন্দের ধ্বনি;
জীবনের গানহীন এই পরিবেশে
মৃত্যুর ফাঁদপাতা শুধু চারিদিকে।

তুমি আমাকে এই মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ করো,
সমস্ত শান্তি, সমস্ত আনন্দ যে একান্ত তোমাতেই।
গুপ্ত ঘাতকের এই তামসিক রাজ্য থেকে

তুমি আমাকে নিয়ে চলো তোমার আলোকতীর্থে—
যেখানে সংঘাত নেই, দ্বন্দ্ব নেই, বিবেচ নেই,
সেখানে সবই জীবনময়, সবই প্রাণময়।

জীবন-সায়াকে

শ্রীনীগোপাল রায়

হেরিলাম পথে পথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 'আমি'রে
উদাস পাণ্ডুর চোখে, শিখিল চরণে—
সন্ধ্যার বিবর্ণ দিকচক্রবালে আঁকা
অনুজল দিনের বিলীয়মান ছবি।
উদয়াস্ত কত দীর্ঘ পথ পরিচরমা,
হাসি কান্নার বহু চরাই উত্তরাই
তার ইতিহাস লেখা বলীয়ম মুখে
অন্তরঙ্গি রেখাকর্ণি গোখুলি আকাশে।
জীবনের ভাঙ্গাছাটে একা বসে থাক।
স্মৃতির পশরা নিয়ে পথের 'আমি'র
বেচাকেনা সব সারা, ক্ষণি হট্টগোল,
গোখুলির স্নানলোকে সূর্য নামে পাটে
বিহগ-কণ্ঠ মুখের প্রদোষের বেলা
সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা দিগন্তের গায়
চিরময় আকাশের পটে দেয় দেখা
প্রভাতের পূর্বাভাস রাত্রি পরপারে
জীবন সায়াকে 'আমি'র পেলাম দেখা
ঊষর আভাষহীন রাত্রির ছায়ায়
সঙ্গ অভিনয় নিরুন্তেজ প্রেক্ষাগরে
নাটকের যবনিকা নামিছে মছরে।

এসো হে রুদ্ধ

অধ্যাপক উমাপদ নাথ

এখানে এখন ঘোর অমানিশা, তোমার দিব্য জ্যোতি
বড় প্রয়োজন ; মানুষ আজিকে পতিত তমসা-কূপে।
ফলতঃ সমাজ পর্যদন্ত, রাষ্ট্রের মতিগতি
তাহারি অনাগ : বিবেক বিজিত, জাতির কণ্ঠ যুপে।
সেবা প্রেম ত্যাগ পলাতক সেনা, পাশব বৃত্তি জয়ী ;
সাম্রাজ্য ক্ষুধা, সতের সেবন বিরল, কেবল আছে
কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষার সেবা যা-কিছু জীবনক্ষয়ী :
এ ভীষণ ক্ষণে বেদনা যা মনে জানাই তোমার কাছে !

তীর কঠোর বহির বেশে নেমে এসো দয়া ক'রে,
জ্বালায়ে পুড়িয়ে উড়িয়ে ছড়িয়ে ভেঙে চুরে যাও দ'লে ;
নরকানন্দ করো হে বন্ধ, বিবে বিবে দাও ভ'রে
দুশ্চ জীবন, এসো হে রুদ্ধ রুদ্ধ ছড়াবে ব'লে।

করুণা নয়কো, তাপ দাও শুধু, ঢালো শুধু হলাহল।
মেরামত নয়, নতুন করিয়া যদি হে গড়িতে পারো
তবেই তোমার কান্নিক ধরো—আর যা তা কোলাহল।
নব-প্রজন্ম ঈপ্সিত যদি আমাদের তবে মারো !

জাতির স্বল্প মস্তকহীন, দেহে নেই প্রাণ লেশ :
আর দূত নয়, নিজে এসে, নাথ, দেখে যাও এই দেশ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

দ্বিলোকজননী দ্বিলোকতারিণী মা যে তুমি সংসারে;
সূর্যচন্দ্রে এ রূপ ফোটাতে তুমি ছাড়া কে মা পারে ?
দুঃলোকে-ভুলোকে তুমিই তো কাল, তুমিই তো মৌসুমী,
তুমি সবাকার শক্তি যে মাগো, নিজেরও শক্তি তুমি।

চিরকুমারী এ মাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে যারা,
প্রতিবারই এসে হয়েছে মুগ্ধ, দেখছেও মাকে তারা।
চিরকুমারীই দাঁড়িয়ে আছেন চিরনবীনার বেশে,
দিব্যদৃষ্টি যে পেয়েছে ঠিক চিনে নেয় মাকে হেসে।

ভুলপথে গেলে দোষ নেই যদি ব্যাকুলতা মনে থাকে,
ঠিকপথে এনে ঠাকুরই তুলবে যে সরল, সেই তাকে।
পথ থাকলেই ভুল থাকে, ঘড়ি কারো তো সঠিক নয়,
তারই হয় জয়, সত্যমার্গে যে নিয়েছে আশ্রয়।

রূপেয়া কামাও ধরম কি লিয়ে

নিবারণ চক্রবর্তী

রাজা কাতরান্ন যাঁড়ের গলায় ঘর্টার মালা গিনি
খুঁড়ে পড়াও রূপার মল খুনখুনালাল তোমাদের চিনি।

আমদানি রপ্তানি কাম

ললাটে ছাপ সিন্ধা-রাম নাম

লোটাভরা গঙ্গাজলে, পণ্যপুণ্য বেচাকিনি।

গো-গীতা-গঙ্গামাইকি ধরম করম লুটন চাঁদ

মহ্মী-লাট তোমাদের হাতের মোলা চাশে প্রসাদ।

(তোমরা) মানুষ বানাও ন্যাটো ভোখা,

ভেজাল মালের ভেঙ্কী ধোঁকা

হনুমানজির মন্দিরেতে পিপড়ে ধরে খাওয়ান চিনি।

আকাল খরা বান-বন্যায় যত বেশী মহামারি

শ্রীবদনে দিব্য হাসি মিল যায়গা ঠিকাদারি।

দুই নম্বর ব্যাওসা ঠাসা

বানের স্রোতে লাস ভাসা

এ রাম রাজ্যে তোমাদের বশে কাণ্ডন কামিনী।

দেশকা গণতন্ত্র ভজা ইহি বন্দবস্ত থাকসে মজা

মঠ মন্দিরে প্রণামী দান, স্বর্গে যাবার সিঁড়ি সোজা।

কহতানি এ কাম খুট

বেটা বোরবাক আহামোক

রূপেয়া কামাও ধরম কি লিয়ে, ভজ সিন্ধা-রাম রাগিনী।

সমর্পণ

বিজলী বিশ্বাস

এ বোঝা নয় তো আমার—

অহংকারে ছিলাম ডুবে যবে,

বিশ্বময় ঘুরেছি বোঝা-ব'য়ে।

এবার প্রভু তোমার বোঝা,

আবার তোমার দিলেম ফিরে,

মুক্ত আমি তোমার শরণ নিয়ে।

জানা না-জানা

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যস্যামতং তস্য মতং

মতং যস্য ন বেদ সঃ।

সবিস্ত্রাতং বিজ্ঞানতাং

বিজ্ঞাতম বিজ্ঞানতাম ॥

—কেনোপনিষদ্

অক্ষম যে কল্পনায়ও তাঁকে রূপ দিতে,

তাঁর রূপ জ্ঞানিলেও সে জ্ঞানিতে পারে।

যে বলে পেরেছে তাঁর স্বরূপ চিনিতে,

বাস্তবেতে সেই জন জানে না তাঁহারে ॥

যে বলে, বুঝিয়াছে সে মহিমা তাঁহার,

ধুব সত্য, সে জন বুঝে নি এক কথা।

যে বলে, বুঝি না তাঁর মহিমা অপার,

হয়তো বা বুঝিয়াছে সে অনন্যমনা ॥

প্রার্থনা

শ্রীতিমির বরণ চক্রবর্তী

নিষ্কলঙ্ক কর মাগো কলুষিত হৃদয়

তোমার নির্মল করস্পর্শে,

চঞ্চল চিস্ত, বুদ্ধি অহংকারাচ্ছন্ন,

অসংযত ব্যভিচারী সব প্রাণ।

অবোধ আমরা বুঝিনা ত কিছু

বারবার চলি দ্রাস্ত পথে,

দিও না মা ফেলে, আজ তুলে নাও কোলে।

সর্বগুণহীন মোরা, কত কি যে চাহিবার আছে,

তোমার করিয়া লও, কর সুসন্তান অভাজনে।

বীর্ষ দাও মা, দাও শৈশ্বর্য,

দাও বৈরাগ্য, বিবেক জ্ঞান,

তপস্যা দাও, সংযম দাও

দাও মা একতা একপ্রাণ।

পড়ে থাকি পিছে, তোমারি বিশ্বে, দাঁড়াই—

উচ্চে তুলিয়া শির!

উৎসব মুখর বাংলাদেশ ও তার শিল্পভাবনা

রতন দাশগুপ্ত

এককালে পাল পার্বণের মধ্য দিয়ে উৎসব সূচিত হোত। আজও হয় কিন্তু উৎসবের আদিম উৎস আমাদের কাছে আজ আর স্পষ্ট নয়। উৎসব মুখরতার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে আনন্দ দান করা। এই উৎসবকে ঘিরে যে কর্মচাপ্তা লক্ষ্য করা যায় তাকেই প্রীমণ্ডিত করার জন্য নানা উপচারের ব্যবস্থা করা এবং তার মধ্যে তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করা। উৎসবের রঙিন ছোঁয়াচ ছাড়া জীবনের অনায়াসেই মুহূর্তগুলিকে সফল রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। ক্ষণিক উৎসব মস্তুর মধ্যে প্রকাশ মাধুর্য বাঁচার আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে। মানুষ বাঁচতে চায় শুধু তার জৈবিক সত্তা দিয়ে নয়, তার আন্তর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে রূপ রস গন্ধের স্পর্শকাতরতার অভীপ্সা রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলার সার্থকতাই উৎসব সজ্জা। এর আরও একটি দিক আছে সেটি হোল অতীত স্মৃতি চারণের দ্বারা উৎসবকে রমণীয় করে তোলা। টিলকের ভাষায়—

The human nature is so constituted that we can not do without festivals. It is the nature of man to love festivals. If you want to keep up your spirit you should assemble once a year at least and you should concentrate your intellectual and spiritual forces upon a particular idea. The utsab was originated and calculated simply to keep up the memories of the days gone by.

এই অনুষ্ঠান মূলত ধর্মকেন্দ্রিক ঋতু উৎসব। ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে মন বৈচিত্র্যের সন্ধান তৎপরতায় উন্মুখ হয়ে ওঠে, তাই ঋতুরাজের আগমনে তাকে আমরা নন্দিত করি বিচিত্র বর্ণ সজ্জায়। এই সজ্জার পিছনে থাকে কল্পনাসৃষ্ট একটি আশির্বাদবতার প্রেরণা। কালবারিত হয়ে তা যুগ-যুগান্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় আনন্দের আগমনী বার্তা। এই বার্তার সুদূর প্রসারী কল্পনার মধ্যে থাকে আশ্ব-সচেতনার প্রয়াস, সেই সঙ্গে থাকে সকলের মঙ্গল বিধানের জন্য একটি আবেদন—আমি যেন সকলকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখতে পারি, দশ দিক যেন আমার মিত্র হয়।

মিত্র স্যাং চক্ষুসা সর্বান ভূতানি সমীক্ষে (বাজসেনেয়ি সাংহিতা), সর্ব আশা মম মিত্রং ভবতু (অথর্ববেদ)।

এই উদার সার্বভৌমিক চেতনার মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত

লাভ ক্ষতির প্রশ্ন না করে সমস্ত জীব-জগৎসহ পৃথিবী অন্তরীক্ষ, আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, ওষধি বনস্পতির মঙ্গল কামনা করা। এবং বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য মঙ্গলময়ের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করা।

দেব প্রপন্নাভিরে প্রসাদ মার্তজগতোহঁখিলস্য

প্রসাদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং কুমীশ্বরী দোষ চরাচরস্য।

(দেবী মাহাত্ম্য)

এই উৎসবগুলির শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যায় যে বৈদিক পৌরাণিক তত্ত্ব আচার ও প্রথার দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ। লৌকিক চেতনার দ্বারা এই শ্রেণীগুলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। লোকচারগুলি স্থানীয় মাহাত্ম্যের দ্বারা বিশেষভাবে অধিকৃত। পরে ধীরে ধীরে এ রূপ পালটে গিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে নিজস্ব একটি স্থান করে নেয়। তা থেকে সৃষ্টি হয় উৎসব।

গ্রামীণ সংস্কৃতি ধ্বংস হবার পরই এই সব উৎসবের তাৎপর্য আশ্রয় পেতে থাকে। যাতায়াতের সুব্যবস্থার জন্য এক স্থানের লোক অন্যদিকে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। ফলে একের সঙ্গে অন্যের ভাবগত ও কৃষ্টিগত সম্মিলন শুরু হয়। এই ভাবে গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে ওঠে। উৎসবগুলি একে অপর থেকে প্রেরণা পেয়ে নতুনভাবে প্রকাশ পায়।

এই সংশ্লেষণের দ্বারা পূর্বের সঙ্গে যে ভাবগত সংহতি ছিল তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল হয়ে যায়। ফলে উদার সর্বজনীন যে চেতনার উদ্ভব একদিন হয়েছিল তা ক্ষুদ্র হয়ে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। উৎসবের সেই মার্জালিক দিকটির সর্বজনগ্রাহ্য রূপটি আর থাকে না। তার বদলে প্রকাশ পায় ব্যবহারিক ও উপযোগবাদী (utilitarian and pragmatic view) তত্ত্ব চিন্তা।

আজ ভাবগত সংহতি থেকে বহুগত প্রেরণাই আমাদের প্রধানত প্রভাবিত করেছে বেশী করে। মার্জালিক শব্দ ঘণ্টা আজ আর উৎসব মণ্ডপে নিনাদিত হয় না। তার স্থান নিয়েছে যান্ত্রিক কলা-কৌশল সমন্বিত উচ্চ নিনাদিত বাদ্যভাণ্ড। উৎসবের বহিরঙ্গের কৃৎ কৌশল যতটা বিস্ময় উদ্বেক করে, অন্তর্নিহিত আবেগ সত্ত্বেও ততখানি আঁশ্ঠ হয় না। উৎসবের

প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূলে যে আন্তরিকতার ও নিষ্ঠার প্রয়াস ছিল, আজ তা উপলক্ষ মাত্র।

আজকের উপলক্ষটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই উৎসবের, বিহরঙ্গের বিরাট পরিবর্তনও বিরাটতর হয়েছে। উৎসব এখন প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় পর্যাবসিত হয়েছে। 'সর্বত্র একটা সাময়িক উদ্‌দানার ঝোঁক। পুরো ব্যাপারটা এখন জটিল মানসিক স্বপ্নের স্নায়বিক উত্তেজনার রূপ নিয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিকতার চাইতে উত্তেজক পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে এই পরিস্থিতির মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন চেতনার ধারাকে সহনভাবে প্রবাহিত করা।

আমাদের দেশে লোকশিল্পীরা গ্রামীণ ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক পটভূমিকায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সে দিন তা ছিল সামাজিক আনন্দ বিতরণের কেন্দ্র। কালে কালে তা বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে মিলে মিশে পরিবর্তিত হয়েছে। যাত্রা গান, কথকথা, পাঁচালী রামায়ন-গান কীর্তন, ভাটিয়ালী, শ্যামসংগীত, কবিগান ইত্যাদি আনন্দের উৎস। আজ তা প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। যা আছে তাও মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শিল্পায়নের ফলে নগর নির্ভর সভ্যতার প্রভাব গ্রামীণ শিল্প চেতনাকে বিকৃত করেছে। সহরের জীবন ধারার প্রভাব নিশ্চয়ই গ্রামীণ জীবনকে আলোড়িত করেছে। বুচি, শিক্ষা, সহবৎ সবই সহুরে রূপ নিয়েছে। ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গীর মাধুর্য অনুভব করা যাচ্ছে না।

পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালীর নিজস্ব সুর, পুরুলিয়ার ছোঁ নৃত্য এখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনা করা হয়, তখন তা প্রাণহীন কৃত্রিমতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নাটকের কথা ধরা যাক। আমাদের নাট্যশালার জন্মদাতা হলেন বিদেশীরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে একজন রুশদেশীয় এ দেশে নাট্য আন্দোলনের পথিকৃত। ২৫ নম্বর ডুমতলাতে নাট্যশালা স্থাপন করে The Disguise এবং Love is the best Doctor বাংলায় অনুবাদ করে নাটক দুটি করেন। তারপর থেকে আজকে এ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে। বাঙালীর নিজস্ব চিন্তায় তা আজ সফল হয়েছে।

যাত্রা কিন্তু থিয়েটারের অনুকৃত নয়। লোকরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে তার প্রভাব আজও অপরিণামী।

গ্রামের মানুষেরা এর মাধ্যমে সুখ দুঃখে, আশা আনন্দের যে বাণীমূর্তির রূপ-কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করতো তা আজ অস্তিত্বহীন। আজকের যাত্রার মধ্যে থিয়েটারের ও চলচ্চিত্রের প্রভাব এসেছে। কলা-কৌশলের দিক দিয়ে তা থিয়েটারের সমগোষ্ঠী। শব্দ প্রক্ষেপণে, বিষয় নির্বাচনে, আবহসংগীতে, পরিস্থিতির উপস্থাপনে যন্ত্র চালিত কলাকৌশলের প্রাধান্য প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

ছোট ছোট যাত্রাদল যারা গ্রাম-জীবনের সঙ্গে যুক্ত তা, এ যন্ত্রের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উন্নত কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ আর্থিক দিক দিয়ে ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে এই দল গুলি ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হবার পথে। গ্রামীণ যাত্রা আজ বড় যাত্রাওলাদের উপর নির্ভরশীল। যারা গ্রামের শিল্পী তাদের শিল্পসত্তার মাধ্যম কি ভাবে গ্রামজীবনকে প্রভাবিত করবে? গ্রামীণ শিল্পভাবনা কি অবলুপ্তির পথ ধরবে না? উন্নত প্রয়োগ কৌশল দ্বারা স্বল্পময় পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে তাতে দর্শকদের চিত্তবৃত্তির ক্ষুরণে কল্পনার স্থান কতটুকু? কল্পনায় যে জগৎ সৃষ্টি হয় তা চোখের সামনে দেখে সৃষ্টির উল্লাসময় উদ্‌দানার প্রেরণাই নষ্ট হচ্ছে। এতে মানুষ সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবার প্রেরণাই অনুভব করবে না। স্যার এরিক অ্যাসবে একটি প্রবন্ধে সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই সব জনসংযোগ মাধ্যমগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করে কিন্তু এতে বুদ্ধিগত যোগ নেই। These organs of mass communication inevitably appeal to the emotions rather than to the intellect. এরা যন্ত্রবৎ কাজ করে যাবে, নিজের সৃষ্টির উল্লাসময় আবর্তন না থাকলে মানুষ মেশিনে পরিণত হবে। ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে (মেন্টাল ডিসঅর্ডার) পঙ্গু হয়ে যাবে। তখন জীবন-জটিল থেকে জটিলতর (কমপ্লেক্স অফ লাইফ) হবে। যার মধ্যে জন্ম নেবে জীবনবিমুখ সংগ্রাম বিমুখ এস্কেপিষ্ট মনোভাব।

আট পোরে

বাজীরাও সেন

ভক্তকণ্ঠে বুধন গোয়ালার কামাকারিট শুরু করে দিয়েছে ভীষণ। কাদতে কাদতেই বলেছে—দু'টি পায়ে পড়ি আপনার। মুখে ছোড় দিচ্ছিল। ছেড়ে দ্যান বাবু। আমি আর একদণ্ড থাকবো না এখানে। দেশান্তরী হবো।

—তাতো হবে। কিন্তু ওটা কি ছুঁড়ে মারলে ওখানে?

—কোথায়?

—আমাদের বাগানে।

—ও কিচ্ছ না। গোড় লগি। আমাকে ছেড়ে দ্যান বাবু।

—দাঁড়াও দিচ্ছি, বলেই পেছন থেকে আরো জ্বোরে জাপটে ধ'ল্লাম তাকে। মন্টুকে বললাম—যাতো কুঁয়োতলা থেকে দাঁড়ির গোছাটা নিয়ে আয় দৌড়ে।

মন্টুও তাঁরবেগে ছুটেছে এবং প্রায় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই এনে হাজির করেছে তা। নাইলনের পাকানো মোটা দাঁড়ি। জল তোলা হয় কুঁয়ো থেকে।

তাই দিয়ে আগাগোড়া বাঁধলাম পৌঁচিয়ে পৌঁচিয়ে। পেছনের দিকে ফেরতাই গোটা দুয়েক শক্ত গিট মেরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম দুজনে—আমি আর মন্টু।

আগে দেখা দরকার বাগানে যা ছুঁড়ে মেরেছে সেটা কি?

জড়ির শেষাশেষি।

এসিতে এই পাথুরে জায়গাটায় স্বভাবতই গরম পড়ে বেশী। তার উপর আবার এবার বছর জুড়ে খরা। বৃষ্টি নেই।

সকাল ফুটতে না ফুটতেই বলসানো বাতাস। রোদ আগুন ঢালে। নিস্তেজ, বিমোহন গাছ গছালি। আধমরা স্নিগ্ধমান মাটি, মাঠ, মাঠের সীমানা ছুঁয়ে রিনরিনে আকাশ।

তামাম দুনিয়াটাই পুড়ে দিনভোর। দহন হয় জ্বলতে পুড়তে।

সেদিন আবার সঙ্গে থেকেই বাতাস বন্ধ। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না কোথাও। একেবারে নিদারুণ দমকাটা গুমোট।

বাধ্য হয়ে বাইরের উঠানে ঘুমিয়েছি। পাশে মন্টু। আমার বিহার প্রবাসী বড়দার ছেলে। এইখান থেকেই কলেজে পড়ছে।

ঘুম আসতে চেয়েও আসছে না। হিঁড়ে হিঁড়ে যাচ্ছে। তারি মশোই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি এপাশ ওপাশ করতে করতে।

কিন্তু হঠাৎ কিসের যেন চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সাম্নে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। রাস্তা পেরুলেই ছোট্ট একখানা পার্ক। ওপারে গোয়ালাদের পাড়া। গায়ে গায়ে খাটাল আর খোলির পর খোলি।

একেবারে ঠাসবুনি বস্তু।

চীৎকারটা ঐদিক থেকেই আসছে। কিছু লোকের কোলাহলের সংগে কারো যেন কান্নাও মেশানো।

ব্যাপারটা কি?

মন্টুকে ডেকে তুললাম। টট্টা হাতে নিয়ে দুজনেই এসে দাঁড়লাম রাস্তায়।

মেটে মেটে জ্যোৎস্নার আবছা আবছা চোখ চলে। তারি মশোই নজরে পড়েছে মালকোচা মারা একজন লোক কি একটা হাতে নিয়ে ছুটেতে ছুটেতে আসছে।

কাছাকাছি আসতেই টর্চ টিপলাম। জেরি গলান জ্ঞানতে চাইলাম—কে?

মুহূর্তের বিমূঢ়তা খালি। লোকটা ধমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে আবার শুরু করেছে ছুটেতে। তার আগে কি যেন একটা ছুঁড়েও মেরেছে বাগানে।

সংগে সংগে আমিও ছুটেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেছন থেকে ধরে ফেলেছি জড়িয়ে। এবং আবার টর্চের আলো জ্বালতেই রীতিমতো অবাক আমরা—আরে এ যে বুধন।

তাকে টেনে আনতে আনতে জ্ঞানতে চাইলাম—কি ফেলেন কি বাগানে?

বুধন আর কোন জবাব দিলো না।

অবশ্য এই নিয়ে বেগ পেতে হয় নি বেশী। সামান্য খুঁজেই কুড়িয়ে আনলাম জিনিষটা। গোয়ালাদেরই খরকাটা দা একখানা। বহু ব্যবহারে জীর্ণ। ভেতরের দাঁতগুলোও ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে পুরো।

কিস্তি তার উষ্টোমাথায় দগদগে রক্তের দাগ।

—সন্ধানাশ! কি করেছে কি?

বুধন তবুও নিরুত্তর। কোন কথাই বলে নি। হাজার পীড়াপীড়িতও না।

অগত্যা বাধ্য হয়ে সেই অবস্থায় টানতে টানতে তার বাড়ীতেই নিয়ে গেছি তাকে। গিয়ে দেখি খুনোখুনি ব্যাপার।

বুধনের বোঁ গোপালীর সারা শরীর আর কাপড় ভেসে যাচ্ছে রক্তে। মাথার খুলিতে কেটে বসা এপার ওপার দাঁয়ের উষ্টোমারের দাগ। অনর্গল রক্ত বেরুচ্ছে তখনও।

ইতিমধ্যে গোপালীর আত্মনাদে যারা জুটেছিল তারাও এলোমেলো বিহ্বল কোলাহলই তুলছিল খালি। কিস্তি বুধনকে দেখামাত্রই উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এবং অবস্থা চরমে উঠেছে গোপালীকে ঘিরে।

মনে হলো, শিকারীর তাঁর খাওয়া কোন বাঘিনী বুঝি বিদ্যুৎপলকে বন থেকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। দাঁতে নখে শানিত প্রতিহিংসা।

বুধনকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বে, এমন দিক্বিদিক চেতনাহীন রাগ।

কেরোসিন কুপির ভুতুড়ে লালচে আলোয় অস্ত্রত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে পরিস্থিতি।

গোপালী সমানে দাপাচ্ছে আর চৌচিয়ে খান খান করে দিচ্ছে বাতাস—মুখ পোড়া, তোকে আমি এই দাঁ দিয়েই কুচি কুচি করবো, ফাঁসিতে ঝোলাবো।

উপস্থিত সকলেও মত দিলেন, ওকে পুলিশে দেয়া উচিত। কিস্তি তার আগে গোপালীর জন্যে একজন ডাক্তার জ্বরী।

কিস্তি এত রাতে কোন ডাক্তারই আসতে চাইলো না কিছুতে।

হাসপাতালও অনেক দূর। শেষ অবধি রিটার্ড এক বুড়ো কম্পাউণ্ডারকে অনেক বলে ক'রে ডবল ফি' কবুল করে নিয়ে আসা হয়েছে কোন রকমে।

কম্পাউণ্ডার হলে কি হবে, ডাক্তারের উপরে যায়। ভদ্রলোকও বেশ যত্ন করে চিঁ দিলেন। ধুয়ে মুছে ব্যাণ্ডেজ

বাঁধলেন। একটি এন্টি-টিটেনাস দিয়ে সবশেষে ব্যাগ গুটিয়ে যাওয়ার জন্যে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন রাত আর নেই বিশেষ। অন্ধকারের রং ফিরতে শুরু করেছে পূর্বে।

আর সকলেও যাওয়ার জন্যে উদ্ভূত, ব্যস্ত। ওদের অধিকাংশই বুধনের জোড়িদার। খাটোল সাফসুফ করে গাইমোষ দুইতে হবে। বিহান হতে না হতেই হাজির হবে খন্দে।

—কিস্তি বুধনের ব্যাপারটা?

—রাতটুকু পোহাক আগে, ওদেরই ভেতরের মুরবী গোছের একজনই পরামর্শ দিয়েছে—তখন কাজ ক'ম্বো সব চুকিয়ে যাওয়া যাবে থানায়। থানায় একসাথে যাওয়া ভালো সকলের।

—কিস্তি ততক্ষণ?

—সেও এক সমস্যা।

তাও স্থির হলো আলোচনায়। ততক্ষণ পাশের ঐ কুঠুরিটার এই ভাবে রাখা হবে ওকে। যাতে না পালাতে পারে কোথাও।

তাইই রাখা হলো। বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবি দেয়া হলো গোপালীকে। সেই সংগে দাঁ-টাও। থানায় এজাহার দিতে গেলে ওটা দরকার।

তারপর সকলের সংগে আমিও ফিরলাম। তাঁর মধ্যে ওদেরই কথাবার্তায় জানলাম, জিনিষটা নিঃসন্তান এই দম্পতির একেবারে আটপোরে ব্যাপার। নিত্যাদিন অহরহ লেগেই রয়েছে।

চুলোচুলি, খামচাখামচি, চড়টা, চাপড়টা।

এমন কি ওরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও নাকি গালি পাড়ে পরস্পরকে। একে অপরকে বাপ ঠাকুন্দা তুলে।

এই নিয়ে প্রতিবেশীরাও রীতিমতো ভিত্ত ও অতিষ্ঠ।

তবে আজকের ব্যাপারটার আগের কোন নজীর নেই। একেবারে মোটিভেটেড ক্রাইম।

—মুখ, আনকালচার্ড হলে যা হয়, মস্ট বোশ উত্তেজনায় সংগেই মস্তব্য কল্লো। তারপরেও কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে নিজের মনেই যেন বজ্রো—কুকুর বেড়ালের মতো এমন ঝগড়াঝাটি করার চেয়ে—

—কি?

—সেপারেশান নিলে পারে। ডিভোর্স।

একধার আর জবাব দিলাম না। কারণ তখন ঘুমোনার জন্যেই বাস্তব ভীষণ।

ঘুম সকালে ভাঙলোও ঐ প্রতিবেশীদেরই কয়েকজন এসে। একটু বেলা হয়েছে ঠিকই তবে খানায় যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছে সব।

কিন্তু গিয়ে দেখি, ব্যাঙের বাঁধা গোপালী দিব্যি দাঁত মাজছে গুড়াকু দিয়ে। রাতের উত্তেজনার ছিঁটেফোটাও অবশিষ্ট নেই কোথাও। একেবারে শান্ত নির্বিকার। আরো অবাক পাশের ঘরের দরজাটা হাটখোলা।

—কে খুলেছে কে?

—কি করবো কি বলুন? বেশ ধীর হুসেই বল্লো গোপালী—আপনারা চলে যাওয়ার পর মুখপোড়া নাম

ধরে ধরে এমন ডাকতে লাগলো যে সহ্য করা দায়। বলে, বাবুরা নাকি দড়িটা বড় টান দিয়ে বেঁধেছে। গোপালী তু খুলে দে।

—তাহলে বুধন?

—পালায়েছে বাবু।

—পালায়েছে? কোথায়?

—যেখানে খুশী যাক। তার মুখ আর দেখতে চাই না জীবনে।

—কিন্তু ঐ দা-টা?

গোপালী স্থির দৃষ্টি রাখলো আমার দু'চোখে। তারপর আগের চেয়েও আরো ধীরে দাঁতের গোড়ায় নতুন গুড়াকু লাগাতে লাগাতে বল্লো—এমন গোলমালের মাথায় কোথায় যে ফেলেছি তা কি আর মনে আছে এখন?

গল্প

বুড়োদা

কর্ণ চক্রবর্তী

বুড়োদা সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছিল।

বুড়োদা আমাদের কারো নিজের দাদা নয়। আমাদেরই সমবয়সী। তবে কোন সময়েই আমাদের মতন চপল স্বভাবের ছিল না। সব সময়ে ওর চোখে-মুখে লেগে থাকত বুড়োদের মতন এক ধরনের নিরাসক্ত হাসি। তাই আমরা নাম দিয়েছিলাম বুড়োদা।

এই বুড়োদার একটা মস্ত বড় গুণ ছিল। লোকের দুঃখ তার মন কেঁদে উঠত। তাই সে সকলের খুব প্রিয় ছিল।

শুধু সে প্রিয় ছিল না—তার বাড়ীতে।

বিনুবোঁদার সাথে ছিল তার নিত্য অশান্তি। আর সেই অশান্তি চরমে উঠলে সে বারোয়ারীতলার সামনে পুকুরের পাড়ে বসে থাকত। ছিপে মাছ ধরত।

আজও সকালেই তাকে পুকুরের ধারে ছিপ নিয়ে বসে থাকতে দেখে আমি আর নোটন পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম।

বুড়োদার মাথার উপরে পলাশ তার লাল সান্ময়ানা বিছিয়ে দিয়েছে। সকালের রোদ টুকরো কাঁচের মত ছড়ানো। মাঠের সবুজ ঘোপঝাড়ে পুকুরের জলে।

বুড়োদার কাঁধে হাত রেখে নোটন আস্তে আস্তে বলে ওঠে—‘বুড়োদা, আজ আবার কি হল?’

ফাংনাটা নড়ে উঠতেই বুড়োদার হ্যাচকা টানে দেখা গেল ছিপের মুখে বঁড়িশিতে কেঁচো নেই।

‘এই—যাঃ! দিলি তো মাটি করে সকালটা। আজ আর মাছ উঠবে না। এ্যা কি বল্ছিলি—আজ আবার কি হ’ল? হবে আর কি? মাথা আর মুণ্ডু—’

বলতে বলতে বুড়োদা চুপ করে গেল হঠাৎ। তারপর চারদিক চেয়ে হঠাৎ ফোড়ের সুরে বলল : ‘বিনুর সেই গজগজানি। বলে কিনা—মেয়ে বড় হয়েছে—ছেলে খোঁজ। আচ্ছা তোরাই বল—মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে তা আমার কি করার আছে? বয়স হ’লে বড় হবে না?’

কথার শেষে বুড়োদার মুখে আবার সেই যেন কিছুই-
হয়-নি এমন ভাব মাখানো হাসি।

কেমন যেন একটু রাগ হচ্ছে মনের মধ্যে। বুড়োদার
উপর। তবু রাগ দেখাতে পারলাম না। আসলে যারা
নিরাসক্ত হয় তাদের মধ্যে নিরাসক্ত হবার একটা প্রবণতা
থাকে। বুড়োদা তাদেরই একজন।

হেসে বলি—‘ওঃ! এই কথা! তা সত্যিই তো পাঠ
দেখুন। মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে।’ নিজের হালকা
গলায় আমি চমকে উঠি।

‘আরে, সব শিয়ালের এক রা। বলি—পাঠ ছোটান—
সে কি চাটখানি কথা। এখানে যাও—সেখানে যাও—
তারপর দরে বনতে হবে। আমার কি জমিদারীর আশ
আছে? থাকবার মধ্যে কয়েক ঘর যজমান—তাও সব
ইদিকে-ওদিকে ছাড়িয়ে আছে। আর আছে ভিটের লাগোয়া
বিষেখানেক জমি।’

সত্যিই বুড়োদার অসহায় অবস্থা। বুড়োদা ব্রাহ্মণ
মানুষ। যজমানি তার পেশা। তা সেই যজমানেরাও কর্ম-
সূত্রে দূর-দূরান্তের বাসিন্দা। গাঁয়ে যে ক-ঘর টিকে আছে
তাদের অবস্থা বুড়োদার চেয়েও নিদারুণ।

যাহোক একটা কিছু করতে হবে। পরের দিন আমরা
ঠিক করলাম—বুড়োদার ভিটার লাগোয়া জমিটুকু বন্ধক
দিয়ে পণের টাকার জোগাড় করা যাবে। তার আগে
বুড়োদা যদি পুরানো যজমানদের কাছে যায় সাহায্যের
জন্য—

কথাগুলো বলতেই বুড়োদা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর
হতাশাব্যমনো স্বরে বলল—‘তোরা বলছিস। তাই
যাই—

গতকাল মাইনে পেয়েছিলাম। তার থেকে কিছু টাকা
বুড়োদার জন্য নিয়ে এসেছিলাম। সেই টাকা বুড়োদার
হাতে সসজ্জা গুঁজে দিলাম। অক্ষুট স্বরে বলি—‘সেই

নবদ্বীপ কালনা—আপনার যজমানদের বাড়ী—সে তো
অনেক দূরের পথ এই জামনা থেকে। ষ্টেন ভাড়া, বাস
ভাড়া—হাতখরচ লাগবে তো’—

দিন চারেক পরে।

অফিসের ছুটি ছিল।

বুড়োদার বাড়ী গেলাম।

কুকুকে তকতকে নিকোনো দাওয়া। উঠোন—এক
কোণে ঢেঁকিতে ধান ভাঙা হচ্ছে। চালে—নোতুন খড়।

তবে কি আগামী মাঘেই মেয়ের বিয়ে।

‘আরে—ঠাকুরপো যে—এসো এসো’—বৌদি পিঁড়ি
এগিয়ে দিল। ততক্ষণে বুড়োদার মুড়ি খাওয়া শেষ। জল
খাচ্ছে।

বললাম—‘বুড়োদা’—

কথাটা শেষ হ’তে না হ’তেই বুড়োদা বলে উঠলো—
‘জানিস ভাল টাকাই উঠেছিল’—

আমার সামনে মুড়ির বাটি রেখে চলে যাচ্ছিল বৌদি;
হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একরকম ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠল—
‘আসার পথে কালনায় কে-না-কে দূর সম্পর্কের খুড়ার
সাথে দেখা। বন্যাস তাদের বাড়ীঘরদোর সব ভেঙ্গে গেছে।
ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে-কেটে এসব বলতেই উনি দাতাকর্ণ
হয়ে গিয়ে সব টাকা খুড়ার হাতে তুলে দিলেন। ঝাঁটা
মারো—অমন লোকের মুখে’—

—‘বল—কাজটা ভাল করিনি? সব খুইয়ে খুড়ীমা
আর তিন-চারটে অপোগণ্ড শিশু সন্তান নিয়ে খুড়ো সংসার
পেতেছে। বিপদে-আপদে যদি আপনজনের সাহায্য না
আসতে পারলাম তা হ’লে আর মানুষ হ’লাম কেন?’

ছলছল চোখে বুড়োদার কথাগুলি কামার মত ভেঙে
ভেঙে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য।
পরক্ষণেই তার মুখে সেই চির-চেনা নিরাসক্ত ভাবটা ফিরে
এল।

অজানা পাহাড়ী জঙ্গলে

শ্রীকল্যাণকুমার সামন্ত

ভ্রমণকাহিনী বলতে সাধারণত বোঝায় কোন বিশেষ জায়গায় বেড়িয়ে আসার বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতার কাহিনী—কাহিনীর কিংবা কন্যাকুমারীর মনোরম দৃশ্যের, কেদার-বদ্রী কিংবা অমরনাথের দুর্গম পথের বর্ণনা। কিন্তু আমি এক অধ্যাত অঙ্গাত পাহাড়ী অঞ্চলে বেড়াতে যাবার উদ্ভট অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করছি, যেখানে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে কেউ গেছেন বলে আমার মনে হয় না।

সময়টা শীতকাল। পেশাগত কারণে আমি তখন কাশ্মীরায়ের কাছাকাছি ডাঙ-হিল নামে একটা পাহাড়ী অঞ্চলে ছিলাম। জায়গাটার উচ্চতা প্রায় ৬০০০ ফুট। শীতের সকালে রোদের মনোরম উষ্ণ আমেজ উপভোগ করতে করতে ধূমায়িত চায়ের গেলাস (কাপে চা খেয়ে ওখানে পোষাতো না—তাই গেলাস ভর্তি চা-ই সকলের প্রিয় ছিল) হাতে নিয়ে হঠাৎ আমার এক বন্ধুর মাথায় খেলাচাপলো, ঐ দূরে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে চল ওখান থেকে ঘুরে আসি। আমি বাধা দিয়ে বললাম, ঘুরে আসি বললেই কি ঘুরে আসা যায়। যেতে আসতে কত সময় লাগবে, আদৌ যাতায়াতের উপযুক্ত পথ আছে কিনা, খাওয়ার ব্যাপারটাও আছে। বন্ধু বিরক্ত হয়ে আমার দিকে মুখভঙ্গী করে বললো, তোমার তো সবচেয়েই হিসেব করে চলা। অত ভাবতে গেলে বাপু সব কাজ হয় না। এখনো তো বিয়েই করলি না, এতো হিসেব কেন রে বাবা। (বলাবাহুল্য, তখনো আমি সংসারি হইনি)। কাল রবিবার, খুব সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বো। সঙ্গে থাকবে কিছু পাউরুটি, মাখন, ডিমসেদ্ধ আর খাবার জল—বাস। যেমন ভাবা তেমন কাজ। পরদিন আমরা চারবন্ধু বেরিয়ে পড়লাম। না গিয়ে উপায় নেই, বলবে ব্যাটা এক নম্বর জীতু, ভয়েই গেল না। সঙ্গে যা যা প্রয়োজন একটা ব্যাগে নিয়ে নিলাম। একটা ছুরী নিতে ভুললাম না। বলা যায় না, কত কাজে লাগতে পারে।

ছোট শৈল শহর কাশ্মীরায়ের উপর দিয়েই যেতে হবে ঐ অজানা অচেনা পথে। কাজেই প্রথম পর্যায়ে কোন অসুবিধা হোলো না। সকালের আলো ফুটে গেলেও শীতের দ্রুণ বিহানার আমেজ ছেড়ে কেউই তখনো বাইরে

বের হয় নি। আমরা কিন্তু মহা উৎসাহে যেন কোন পর্বতশৃঙ্খল ভাঙতে চলেছি, এমনি মেজাজে কাশ্মীরায় শহর ছাড়িয়ে সেই অপরিচিত পথে পা বাড়লাম। প্রস্তাব উত্থাপনকারী বন্ধুটি দলনেতার ভূমিকা পালন করতে লাগলো। হাতে তার একটা লম্বা লাঠি। পথেই সংগ্রহ করে নিয়েছে। লাঠি হাতে আগে আগে চলতে লাগলো, আমাদের তাকে অনুসরণ করতে বললো। সরু পাহাড়ী পথ, কোনরকমে একজন হাঁটা যায়, পাশাপাশি চলবার কোন উপায় নেই। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর দলনেতা থমকে দাঁড়ালো। অগত্যা আমাদেরও দাঁড়াতে হোলো। সমস্যা সামনের পথ দু'ভাগে বিভক্ত। কোনদিকে যাওয়া যাবে। জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোক নেই—থাকলেও এই উদ্দেশ্যহীন যাত্রাপথের ঠিকানা সে বাতলে দেবে কি করে। এমন সময় একজন পাহাড়ী লোকের দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তাকে কি জিজ্ঞেস করা যায় তাই ভাবছি! আচমকা আমাদের দলনেতা স্থানীয় ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করলো, পানিঘাটা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস যাবার রাস্তা কোন দিকে? লোকটি হাঁ করে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে কোন কথা না বলেই চলে গেল। দলনেতা খুব বিরক্ত হোলো। বললে, কেমন লোকরে বাবা, কোন কথা না বলেই চলে গেল। আমি বললাম, তুই হঠাৎ পানিঘাটার কথা জিজ্ঞেস করলি কেন? আমরা তো পানিঘাটা যাব বলে বের হইনি। তাহলে তো কাশ্মীরায় থেকে গাড়ীতেই যেতে পারতাম। স্বভাবসিদ্ধ মুখভঙ্গী করে দলনেতা বললে, গাড়ীতেই যদি যাব তাহলে আর কাল থেকে এতো সাজগোজ কেন। গাড়ীতে গেলে কোন thrill নেই।

তাহলে এখন thrill উপভোগ কর। বিরক্ত হয়ে বললাম। একটু পরেই পাহাড়ী পথে আর এক মূর্তির উদ্ভব হোলো। দলনেতা গলা ঝাড়া দিয়ে তার কাছে পানিঘাটার পথের হাদিস চাইলো। সেও যথারীতি অবাক হয়ে পাহাড়ী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলো, 'বাবুহরো ফরেস্ট অফিসমা কাম গরখ হলো' (বাবুরা ফরেস্ট অফিসে কাজ করেন বোধ হয়)। পাহাড়ী অঞ্চলে ফরেস্ট অফিসের একটা আলাদা

মর্যাদা আছে। আমরা জানালাম তার ধারণা ঠিক। তারপর সে জানালো, আমরা ভুলপথে এসে পড়েছি। পানিঘাটা যাবার মত কোন রাস্তা এদিকে নেই। তবে জঙ্গলের পথ একটা আছে, সে পথে আমরা যেতে পারবো না। দলনেতা উৎসাহিত হয়ে বললে, জঙ্গলের রাস্তাতেই আমরা যাব। সে বার বার আমাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু দলনেতা নাছোড়বান্দা। যত দুর্গমই হোক, ঐ পথেই যাব। অগত্যা সে আমাদের জঙ্গলের রাস্তাই দেখিয়ে দিল—তবে একটা পাহাড়ী নদীও পার হতে হবে জানালো। আমরা বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। দলনেতা উৎসাহিত হয়ে আবার যাত্রা শুরু করলো—পিছু পিছু আমরাও চললাম।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর জঙ্গলের রাস্তাও হারিয়ে গেল। যেদিকে তাকাই সেদিকেই জঙ্গল। কোনদিকে বিশাল পাথর খাড়া দেওয়ালের মত রয়েছে, কোনদিকে বা খাদ। ভয়ে আমাদের মুখ শূন্য হয়ে আসিস হয়ে গেল। এখন উপায়? দলনেতা কিন্তু স্থির নেই—সে এদিক ওদিক ঘুরে পথের সন্ধান করতে লাগলো। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী দেখা গেল। পথের নিশানা বলার সময় পাহাড়ী লোকটি বলেছিল পাহাড়ী নদী পার হবার কথা। তাহলে ঐদিকেই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে যাওয়া যায়! হঠাৎ দলনেতা ইস্যরায় আমাদের ডাকলো। তার মুখ খুব গভীর। কি ব্যাপার, হাসিখুসী মানুষটার হেলো কি। আমরা কাছে গেলে সে অনতিদূরে ঘাসের জঙ্গল দেখালো—মানুষ সমান ঘাস। আমরা দেখলাম, কিন্তু দলনেতার উদ্দেশ্য কিছু বুঝলাম না। এরপর দলনেতা একটা বিরাট পাথর দেখালো যার একটা দিক ঢালু হয়ে ঘাসের জঙ্গলের দিকে নেমে গেছে। সে বললে, এই পথেই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু ঘাসের জঙ্গলে বাঘ থাকতে পারে, বাবার মুখে শুনেছি। ওর বাঁবা আবার একজন সখের শিকারী। অতএব ও যখন বলছে ঘাসের জঙ্গলে বাঘ থাকতে পারে তখন থাকতেও পারে। কিন্তু আমাদের ঘাসের জঙ্গল ছাড়া খাবার মত কোন রাস্তাই নেই। চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল।

অগত্যা হাত ধরাধরি করে আমরা চারজন পাথরের

ঢাল বেয়ে নামতে লাগলাম। কোনরকমে ছাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে নেমে পেছন ফিরে তাকিয়ে নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছি না পাথরের ঢাল বেয়ে সত্যিই আমরা এইমাত্র নামলাম। নামলে কি হবে, বাঘের ভয়। বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করছে। কোন মুহুর্তে বাঘের সামনাসামনি হব ঠিক নেই। নির্দিষ্ট কোন পথও নেই যে তাড়াতাড়ি ঘাসের জঙ্গল থেকে বের হয়ে যাব। আরও একটা মুশকিল হলো এতক্ষণ তবু জঙ্গলের ফাঁকে এদিক ওদিক কিছু দেখা যাচ্ছিল, এখন ঘাসের জঙ্গলে যেদিকে তাকাই ঘাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দলনেতা বিজ্ঞের মত এগিয়ে যেতে লাগলো, আমরা নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। কারণ মুখে কথা নেই, পাছে আমাদের সাড়াশব্দে বাঘ বেরিয়ে পড়ে। নিজের পায়ে শূকনো ঘাস মাড়িয়ে খড়মড় শব্দে নিজেই চমকে উঠছি। এমনকি আমরা নিশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেলাম।

প্রায় ৪৫ মিঃ হেঁটেছি, হঠাৎ পাহাড়ী নদীর কুলকুল শব্দ কানে এলো। তাহলে তো নদীর ধারে এসে গেছি। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। দলনেতা ধমকে উঠলো, নদীর ধারে বাঘ জল খেতে আসতে পারে। এতো উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। আবার আমাদের মুখ চুপসে গেল। বাঘের ভয় এখনো রয়েছে। নদীর শব্দ লক্ষ্য করে আমরা এগোতে লাগলাম। ঘাসের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সমতল ভূমির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম অনেকখানি। ঘাসের জঙ্গল ফিকে হতে হতে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বড় বড় পাহাড়ী পাথরের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রায় নদীর ধারে এসে গেলাম। কার্শিয়াঙ থেকেও এই নদীটা দেখা যায়—এর নাম বালাসুন।

এইবার আর এক সমস্যা, নদী পার হওয়া। দলনেতার ইঙ্গিতে নদী পার হওয়ার চেষ্টা না করে আমরা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম। আধঘণ্টা হাঁটার পর পাড় এমন বোরাড়াভাবে উঁচু হয়ে গেছে যে আর যাবার উপায় নেই। বাধ্য হয়েই এবার আমাদের নদী পার হতে হবে। পাহাড়ী নদী পার হওয়া যে কি সাংঘাতিক, তা সেদিন উপলব্ধি করলাম। প্রথমে দলনেতা হাঁটু পর্যন্ত প্যাঁট গুটিয়ে লাঠি হাতে জলে নামলো। দুই তিনহাত এগিয়ে ঘুরে এলো।

না, এভাবে হবে না। চারজন হাত ধরাধরি করে পার হতে হবে। প্রত্যেকে হাঁটু পর্যন্ত প্যাট গুটিয়ে আবার জলে নামা হলো। সবার আগে ষথারীতি দলনেতা। জলের তলায় ছোটবড় নুড়ি পাথর—পা দিলেই হড়কে যাচ্ছে, কিছুতেই পা রাখা যাচ্ছে না। তেমনি জলের তোড়—সামলানোই দায়। জলের গভীরতা বোঝাও মুশকিল। কাঁচের মত স্বচ্ছ জল, তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কিছুটা গিয়েই দলনেতা বুঝতে পারলো, হাঁটু পর্যন্ত প্যাট গুটালেই হবে না—জলের গভীরতা কিছু বেশী। অতএব আবার পাড়ে ফিরে চলো। দলনেতার নির্দেশে আমরা প্যাট খুলে ঘাড়ে ফেললাম। প্রত্যেকে শর্টস পরে হাতধরাধরি করে দলনেতার পিছ পিছ আবার জলে নামলাম। পা হড়কালেই একজন অপরজনকে টেনে ধরছে—দলনেতা লাঠি ফেলে ফেলে গভীরতা মাপছে আর জলের তোড় সামলাচ্ছে। এমনি করে আমরা ছোট পাহাড়ী নদী পার হলাম। চওড়া মাত্র ৪০।৫০ ফুট—কিন্তু তাই পার হতেই মনে হলো যেন আমরা বিরাট নদী পার হয়ে এলাম। একে পিচ্ছিল নুড়ি পাথরে পা রাখা যায় না, তার উপর আবার খরস্রোত। জলে পা না দিলে বোঝাই যাবে না এই নদী পার হওয়া কত কঠিন। এরপর যে যার প্যাট পরে ভদ্রস্থ হলাম। কারণ সামনে পাকা রাস্তা—লোক-সমাগমও দেখা যাচ্ছে কিছু দূরে।

এতোক্ষণ এ জায়গাটা জনমানবশূন্য ছিল বলে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। দু'চার মিনিট হেঁটে পাকা রাস্তায় উঠলাম। কিন্তু যেভাবে আমরা পাহাড়ী জঙ্গলের পথ ও পাহাড়ী নদী পার হলাম, তারপর এই পাকা রাস্তায় হাঁটা কেমন বেমানান মনে হতে লাগলো। বাড়ী থেকে এক অজানা অচেনা পথের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আমরা বিপদসঙ্কুল জংলা পথ ও নদী পার হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়েই পৌঁছলাম।

তারপরের ঘটনা গহনগতিক। পানিঘাটা ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জারবাবু আমাদের এমন আচমকা উপস্থিতিতে যেমনি অবাক তেমনি আনন্দিত। ঐ আত্মীয়পরিজনহীন পাহাড়ী জঙ্গলগার থাকতে থাকতে মনটা পরিচিত মানুষকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। তখন প্রায় বেলা ১২টা। ঐ অসময়ে ঐরকম অসুবিধাজনক জায়গাতেও তিনি আমাদের আপ্যায়িত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এতোক্ষণে আমাদের খেয়াল হলো যে সঙ্গে কিছু খাদ্য-দ্রব্য রয়েছে—পথের জটিল আবর্তে পড়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের মুখে সব ঘটনা শুনে রেঞ্জারবাবু তো হতবাক। বললেন, জঙ্গল থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, এটাই ভগবানের আশীর্বাদ মনে করবেন।

রাস্তা হতে কিছুক্ষণ দেরী ছিল। আমরা হাতমুখ ধুয়ে সঙ্গে আনা খাবার কফি সহযোগে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। পথদ্রমে সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম—বিগ্রামের একান্ত প্রয়োজন ছিল। রেঞ্জারবাবুর সেদিনের আতিথেয়তা ভুলবার নয়। দীর্ঘকাল জঙ্গলে থাকতে থাকতে মানুষের স্বভাবসুলভ আচরণগুলো বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রেঞ্জারবাবুর ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো। যেন কত আপনজনেরা তাঁর ঘরে গিয়েছি। খুশীর আমেজে তিনি ছটফট করে বেড়াচ্ছেন। মহা আনন্দে তাঁর ঘরে সেদিন আমরা চড়ুইভাতির আনন্দ উপভোগ করলাম।

আশ্বষের বিষয় এই যে গাড়ীতে যাবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা ফেরার সময়ও হেঁটে বাড়ী ফিরলাম। দলনেতার হুকুম গাড়ীতে চড়া চলবে না। আমরা আজ গাড়ী চড়ে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হই নি। সুখের কথা জঙ্গলের পথ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ভাল পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ৬০০০ ফুট উঁচু ডাও-হিলে আমাদের আস্তানায় ফিরলাম।

নীচুতলার মানুষ

মাইকেইল যে, পি, আর্ট সি বাসেভ্

ভাবনুবাদ : শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এক্টন মুচি দাঁড়িয়েছিল, ঘরের দরজায়। লম্বা হাত দুখানি পাশে ঝুলছে, হাতের শিরাগুলি গিঁট গিঁট হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন সময় এক ঋদের এলো, সদাগর আপিসের ফেরানী, হাত নেড়ে তর্জন করে উঠলো, “এ কী জুতো হয়েছে! বাঁ পাটি পায়ের লাগছে, ডান পাটি খসে খসে করে খুলে যাচ্ছে। একে তুমি জুতো বলবে? এ জুতো নয়!”

দু পাটি জুতো সে এক্টনের দিকে ছুড়ে দিলে। তার গলা শুনে মনে হলো সে বুঝি এক্টনকে গাল দিতে চায়।

“যখন দাম চাইবে তখন ভাল করে টাকা দোব। ...তুমি জুতো বানাও...জানোয়ার।...”

তার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো, গলায় বাঁধা লাল টাইটার মতো।

এক্টন কোন কথা না বলে শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

নীচের তলার ঘরখানি অন্ধকার, বাতাসটা ভারী, চামড়া তেল ও মোমের গন্ধে ঘরের কোণগুলো গুমোট হয়ে আছে। শুধু জীর্ণ পোষাক-পরা এক্টন ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে।

“তুমি মুচি না, একটা জানোয়ার।” বলে ঋদেরটি চলে গেল।

এক্টন তার সঙ্গে দু পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। ঋদেরটি সিঁড়ি দিয়ে উপরতলার উঠে গেল।

বাইরে তখনও আলোর আভাস আছে, কিন্তু নীচের তলার ঘরখানি অন্ধকার। জানালা দিয়ে নীলাভ একটু আলোর আভাসে দেখা যাচ্ছে, একটা প্রায় মাটিগুন্য পায়ের একটা পেরাঙ্গের কলি, শূন্যে গেছে। একজন ভাড়াটে এটা ফেলে চলে যায়, এক্টন এটি রেশ দিয়েছে। এক্টন মাঝে মাঝে কলিটার পানে তাকায়, রোদ ও হাওয়ার অভাবে কলিটা মরে যাচ্ছে।

এক্টন তার ছোট লঠনটি জালিয়ে দিল। ঋদেরটি তাকে গালি দিয়ে যাবার জন্য সে দুঃখিত নয়। এরকম ঘটনায় সে অভ্যস্ত। এসব কথা তার মনে থাকে না। অনেক ঋদেরই এইভাবে তাকে গালি দিয়ে গেছে, অনেকেই তাকে পাওনা টাকা দেয়নি। এদের মন ছোট। এরা নিষ্পেষিত। কবুগার

পায়। এরা চায় আর কাউকে গালি দিয়ে নিজেদের তার চেয়ে উঁচু দরের মানুষ বলে ভাবতে। এক্টনের উপর নির্ভরশীল কেউ থাকলে সে-ও তার উপর এমনি ব্যবহারই করতো। কিন্তু সে নিজেই এখন অপর সকলের উপর নির্ভর করে আছে। এখন আর সবাই তাকে ধমক দেবে, গাল দেবে, নাহলে তো এরা হাঁপিয়ে মরে যাবে। অথচ সে দোষের কিছুই করে না, সে যা পারে সাধ্যমতই করে। সে যে জুতো সেলাই করে, তা কারও চেয়ে ভালও নয়, খারাপও নয়। এই নোংরা, ক্ষুধার্ত, একঘেয়ে কাজে সে অধিতীয় হতে চায় না।

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। নীচের তলার একটা সঁতর্সঁতে ঘরে চামড়া ও মোমের গন্ধের মধ্যে বসে সে কাজ করে, জীবনে মমতা নেই, আলো নেই, আনন্দ নেই, এ যেন তাকে নিষ্পেষণ করছে। কাজ করতে করতে যখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখনই মনে হয় কে যেন তার উপর একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি। “ওঃ” বলে একটা কাতরোক্তি বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে।

দুই ঋদেরটি চলে যাবার পর সে একটি ঘণ্টা ধরে এক পেয়াদার জুতোর হাঁল সারলো, ধোঁলা-ওলা লঠনের সামনে বসে। তার হাতুড়ির শব্দে লঠনের শিখাটি কাঁপছে। তারপর যন্ত্রপাতিগুলো ফেলে রেখেই, লঠনটা নিভিয়ে, সে বাইরে সিঁড়ির উপর গিয়ে বসে, কনসার্টিনা হাতে নেয়।

এখন চারিপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে, উপরের আকাশ ঘন নীল, নীচে সব কালো। চারিপাশে বাড়ীর দেয়াল এমনভাবে উঠে গেছে যে মনে হয় এক্টন যেন একটা কুয়ার মধ্যে বসে আছে। অন্ধকার আকাশে অস্ফুটভাবে দু-তিনটি তারা ঝিকমিক করছে। এক্টন কনসার্টিনা তুলে ধরলো।

একটা অস্ফুট সুর, কিন্তু এক্টনের কাছে সেই সুরই খুব জোরালো বলে মনে হলো। ঘরের বাইরে এর চেয়ে জোরে সে বাজতে চায় না। সে একবার উপর পানে তাকালো, বুড়ো পেয়াদাটা ঘরে আছে কি না জানতে। পেয়াদার কোম্বাটারের জানালা খোলা ছিল। সেখানে একজন মানুষের ছায়া দেখা গেল, চড়া গলা শোনা গেল : “আবার...তুমি বাজনা বাজাচ্ছ।”...

এক্টন হঠাৎ কনসার্টিনা রেখে দিল। পেয়াদা আরো

খানিক গজ গজ করলো, যেমন কুকুর আপন মনেই গজরায়। তারপর জানালার সামনে থেকে সে সরে গেল।

একটন বসে বসে ভাবতে লাগলো। সে খানিক বাজনা বাজাতে চায়। ছুটির দিনে সারাদিন শহরের বাইরে গিয়ে রেল লাইনের ধারে বসে, মনের সুখে বাজনা বাজানো যায়। সে জানে তার কোনদিনই কাজের অবকাশ নেই। কোন দিনই শহরের বাইরে যাওয়া হবে না। তবু, এই কথাটা ভাবতে তার ভাল লাগে। ছুটির দিনে সকালে সে বেরোয় চামড়া কিনতে। বিকালে বেরোয় খন্ডেরকে ছুতো দিতে, আর সন্ধ্যাবেলা বসে বসে মদ খায়।

সে সিঁড়ির উপর চূপ করে বসে থাকে। আকাশে আরো তারা দেখা যায়। জানালা দিয়ে আলো পড়ে দেয়ালে। উপর পানে তাকালে মনে হয় সবকিছুই উজ্জ্বল ও আনন্দময়। নীচের পানে তাকালে মনে হয় সবকিছু অন্ধকার ও নিরাশ্রয়। মাথা নীচু করে বসতেই সে অভ্যস্ত। তাকিয়ে থাকে অন্ধকার উঠানের পানে। নিজের একঘেয়ে জীবনের কথা সে ভাবে। অস্পষ্ট, আকর্ষণ নেই। কেমন করে সে এই শহরে এসেছিল তা আর ভাল মনে পড়ে না। ছেলেবেলার যেটুকু তার মনে পড়ে, সে শুধু মার খাওয়া। মুচীর কাছে খিদে মত খাটা। মদ কিনে আনা, রাস্তা ও পুলিশ। তারপর যখন বয়স বেড়েছে, সে মুচি-মনিবের কাছ থেকে পালিয়েছে। রাস্তায় দিন কাটিয়েছে। খুচ-খুচ কাজ করেছে। কত বছর এইভাবেই কেটেছে। বেশী মদ খেয়ে পুলিশের মার খেয়েছে। হাজতেই কত রাত কেটে গেছে। তারপর সে প্রেমে পড়েছিল এক সূচী-শিম্পীর। প্রতিবেশী মেয়েটি প্রথমে তার কথা শুনে হেসে বলেছিল সে নির্বোধ। মুচীর কাজ করতে করতে তার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, একটা নতুন সার্ট কিনেছিল আর জানাগারে গিয়ে গরমজলে স্নান করে এসেছিল। মেয়েটির সঙ্গে সে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিল। তবে তার চিন্তে যে সংগীতের মুহূর্ত না জেগেছিল। তা মুখ ফুটে তাঁর কাছে বলতে পারেনি।

একদিন সে এক-জোড়া নতুন জুতো তৈরী করে মেয়েটিকে উপহার দিয়েছিল। তারপর থেকে মেয়েটি তার নাম ধরেই ডাকতো, এবং চা-খাবার নিমন্ত্রণ করতো। যখন সে শুনেছিল তার কি রকম রোজগার

তখন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিক কেঁদেছিল। তার পর পিয়াদার বউকে বলেছিল যে একটনকে বিয়ে করতে তার কোন আপত্তি নেই। পরে এই কথা শুনে একটনের খুশি আনন্দ হয়েছিল। সে একটি নতুন জামা পরে বাদাম ভাজা ও চকোলেট কিনে মেয়েটির কাছে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিল। এমন সময় পিয়াদা ও একজন পুলিশ এসে তাকে ধানায় নিয়ে গেল। ধানায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল একটা পুটলি সম্পর্কে এবং ভাংকা বলে কাউকে সে জানে কি না। আর জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন রাত আটটার সময় সে ইভানোভের সরাইখানায় বসে বীয়ার খেয়েছিল কিনা। তার বোরোফেরা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছিল।

একটন কোন পুটলা-পুটলির কথা জানতো না, ভাংকা কেও চিনতো না। তবে সরাইখানায় গিয়ে সে বীয়ার খেয়েছিল। এর মধ্যে দোষের কি থাকতে পারে তা সে ভেবে পারেনি।

এক পরিণতি হয়েছিল কারাবাস। সে নির্দোষ তবু তাকে ছ'মাস জেলে থাকতে হয়েছিল। এই আবিচারে সে মুগ্ধে পড়েছিল। মুক্ত আলো-হাওয়ার জন্য ও সূচী-শিম্পীর সঙ্গে দেখা করার জন্য যে ব্যাকুল হয়েছিল। সে যখন ছাড়া পেল তখন জেলখানার নোংরামি তার মনকে এমন নিষ্পেষিত করেছিল যে সে আর সূচী-শিম্পীর কাছে যেতে ভরসা পায়নি। পরে লোকমুখে শুনেছিল মেয়েটি এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে বিপথগামী হয়েছে।

নিরাশা ও বেদনায় তার মন ভারী হয়ে উঠেছিল। সে বুঝতে পারেনি কোথায় গেলে সে সান্ত্বনা পাবে। জীবনটা আগের চেয়েও একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। মদ খেয়েও আর মনে আনন্দ জাগতো না।

এই সব কথা সে ভাবছিল নিরাসক্তভাবে, যেন এসব অন্য কারো জীবনে ঘটেছে। তবু কেমন যেন একটা নৈরাশ্য সে বোধ করছিল, মদ খেলে এই ভাবটা হয়তো কেটে যায়।

বাড়ীর তিনতলার একটি জানালা খুললো। এক ঝলক আলো এসে পড়লো উঠানে। রেশমী পর্দাটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। কেউ কড়া সুরে পিয়াদা বাজাচ্ছে। তারপর উচ্চ কণ্ঠের বাক্যলাপ ও হাসি এবং পিয়াদা বন্ধ হয়ে গেল।

এটন সব শুনলো ও দেখালো। এবার সে কনসার্টিনা আবার তুলে নিল, ভাবলো বাজনা বাজাতে পারলে মনটা খুঁসি হবে। রাত তখন বেশী হয়েছে। এটন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। তার ঘুম এলো না। মনে পড়লো চামড়ার দাম দিতে হবে। গত সপ্তাহে অকারণে চামড়াওলা তার মুখে একটা চড় মেরেছিল, ঠোট ফুলে উঠেছিল, মাড়ি থেকে রক্ত পড়েছিল।

ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। ঠাণ্ডায় তার শীত কর্কাছিল। তখন সে স্বপ্ন দেখলো, সে মদ খেয়ে পথে টলছে, একখানি গাড়ী তাকে চাপা দিয়ে পথের উপর ধেংলে দিয়ে গেল।

॥ ২ ॥

পরের দিন ব্রিবার। সন্ধ্যাবেলা এটন সরাইখানায় বসেছিল। অর্গানে একটা সুর বাজাছিল, তেমন মধুর নয়। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। খিদেমংগাররা টেবিলে টেবিলে ছুটোছুটি করছিল। লোকগুলো জ্বরে জ্বরে কথা বলছিল ও হাসাছিল। বিলিয়ার্ড খেলার ঘর থেকে বল মারার ঠুক ঠুক আওয়াজ আসছিল। এটন সেই ঘরে গেল। সে খেলতে পারে না। কিন্তু খেলা সে ভালবাসে—কমন্স সবুজ কাপড়ের উপর শাদা বলগুলি ঠুক ঠুক করে লাগছে।

দুজন কেরাণীবাবু খেলছিলেন। তাদের মধ্যে লম্বা লোকটি এমন কৌশলে বল মারছিল যা দেখে এটন খুঁসি হলো। ভাবলো ‘ভালো খেলোয়াড়।’ আরেকজন যে ভালভাবে বল মারার জন্য গলদ ঘর্ম হচ্ছে তার উপর তার সহানুভূতি জাগলো।

“আমিও তো খেলতে পারি আমি ভাল খেলবো।”

এটনের কথা শুনে কেরাণীবাবুর মারে ভুল হয়ে গেল। সে চটে উঠে বললো, “তোমার এখানে কি চাই? ওদিকে কি জায়গা হচ্ছে না?”

এটন বোকা বনে গেল। সরে এলো। অপমান ও বেদনাবোধ মনে জাগলো।

হাতের লাঠিতে খাঁড়ি মাথাতে মাথাতে কেরাণীবাবু বললো—“এখানে নাক গলাতে এসেছে।”

লাঠির জোগানদার বলে উঠলো, “সরে পড়ো না বাপু, তোমার জন্য খেলার গোলমাল হচ্ছে।”

এটনের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে, খেলোয়াড়ের হাতে একটা ছড়ি যোগান দিয়ে জোগানদার বললো, “ব্যাটা ভিথারী!”

এটনের মুখ লাল হয়ে উঠলো। আরো সরে আসতে গিয়ে বিলিয়ার্ড বলের বাকসে তার মাথা ঠুকে গেল। সে থমকে গেল।

তারা আর তাকে লক্ষ্য করলো না। খেলোয়াড় বল মারতে লাগলো। খাবার ঘর থেকে গানের হুজুড় শোনা গেল। এটন এবার জোগানদারের কাছ থেকে একটা দেশলাই চাইল। জোগানদার বললো, “ওই তো টেবিলের উপর দেশলাই পড়ে আছে।”

এটন কারও সঙ্গে খানিক কথা বলতে চাইছিল। মদ খেয়ে সে বিষম ভাবটা কাটাতে পারে নি। বিষমতা যেন তাকে চেপে ধরছিল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে বলে উঠলো “সঙ্গী না থাকলে ভারী বিপ্রী লাগে।”

জোগানদার তার মুখের পানে একবার অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে হাসলো, তারপর তফাতে সরে গেল।

এটন খাবার ঘরে ফিরে এলো। আধ বোতল মদ নিয়ে পান করলো। তারপর চুপ করে বসে রইল। মনে হতে লাগলো বাজনার সুর ও লোকের কথাবার্তাগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। এটন বুঝলো নেশা জমে আসছে। এতে সে মনে মনে বিরক্ত হলো। যেন এই মদ্যপান তার পক্ষে দোষনীয় নয়। আর কেউ অবিরাম তাকে অপমান করে মদ্যপানে বাধ্য করছে। সে ভাবলো, “আমি খেটে খাই, আমি চাই কারও কাছে কেঁদে অভিযোগ জানাতে।” বাজনার সুরটা তাকে আরও বিমর্ষ করে তুললো। সে নিজেই এবার বেসুরো গান ধরলো। গাইতে গাইতে তার চোখে জল এলো।

একজন খিদেমংগার এসে বললো, “এখানে গান গাইবেন না, মাতলামি করবেন না।”

“কেন গাইব না?”

“গাইবেন না। আপনি এখন বাড়ী যান।”

“কেন?”

“আপনি মাতলামি করছেন, বাড়ী যান।”

এটন উঠে পড়লো। মাথার টুপীটা পড়ে গিয়েছিল

তুলে নিলে। তারপর বিড় বিড় করে বললো, বেশ আমি চলে যাচ্ছি। একজন খেটে-খাওয়া মানুষের কোনখানেই বসার স্থান নেই...হু* অবাক কাণ্ড...

“ঠিক কথা, আপনি এখন যান।” খিদমৎগার বললো।

এটন খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। অপমানের অনুভূতি তার মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠলো। মাতালের মনোকষ্ট দেহেও অস্বস্তি জাগলো। টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে টলতে টলতে সে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তখন তার এমনই মস্ত অবস্থা যে সে কিছুই ঠিকমত দেখতে শুনতে পাচ্ছে না। সে শুধু দেখছে কতকগুলি মুখের ছায়া, শুনছে কয়েকজনের গলা, আর কয়েকটা শাদা বল তার সামনে সবুজ কাপড়ের উপর নড়া-চড়া করছে। এটন খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল। বুঝতে চাইল বিলিয়ার্ড টেবিলে কি হচ্ছে। যে কেরানীবাবুটি গালি দিয়েছিল সে সামনে এলো। এটন তার পানে তাকালো। “আমাকে খেলতে দাও।” বলে সে বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে এগিয়ে গেল।

“কি?” বলে কেরানীবাবু তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে। বলে উঠলো—“পনেরো—পনেরো!”

—“কিসের পনেরো?” এটন জিজ্ঞাসা করলো।

“সরে যাও—সরে যাও।” যোগানদার বললো। কিন্তু এটন তাকে সরিয়ে দিয়ে কেরানীবাবুকে বললো—“আমি খেলবো...আমি খেলতে চাই...একজন খেটে-খাওয়া মানুষ কেন খেলতে পারে না যদি যে খেলতে চায়?”

যোগানদার তার হাত ধরলো।

“ছেড়ে দাও, কেন আমায় ধরছ, আমি একজন খেটে-খাওয়া মানুষ—আমি কেন খেলতে পাব না?”

“খ্যৎ, একটা মাতাল, জানোয়ার—” কেরানীবাবু বললো, “তুমি চুপ করে কি দেখছ?”

যোগানদার এটনের কাঁধ ধরে বললো—“বেরিয়ে যাও।” এটন অত্যন্ত অপমান বোধ করলো। “ছেড়ে দাও।” বলে হাত ছাড়াতে গিয়ে তার জামাটা ছিঁড়ে গেল। “তুমি আমায় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাও?” বলে সে বিলিয়ার্ড টেবিলের সবগুলি বল হাত দিয়ে ঠেলে দিলে। কয়েকটা বল টেবিল থেকে নীচে পড়ে গেল। এবার

তারা এটনকে চেপে ধরলো, বারাম্বা দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। একজন তার মুখে একটা খুঁসি মারলো। কেরানী-বাবু বলে উঠলো—“ঠিক করছে।”

রাস্তার দরজা খোলা। তারা এটনকে ঘাড়ে এক রন্দা মেরে বের করে দিলে। এটনের মাথা ঘুরে গেল। সে পথের উপর পড়ে গেল। আবার হাঁটতে লাগলো, সে গড়িয়ে গেল নদীর কিনারা অবধি।

“এই—ও খবরদার।” এক গাড়েয়ান চীৎকার করে উঠলো। এটন শুনতে পেল পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটে গেল। সে কোন মতে উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। আকাশের তারাগুলো তার চোখের সামনে নাচতে লাগলো, চোয়ালে একটা যন্ত্রণা দেখা দিল। হাঁটুতে সে হাত বুলালো। সেখানকার প্যাণ্টটা ভিজে গেছে, হয়তো রক্তে, নাহলে জলে।

“তোমাদের এই ব্যবহার।” এটন তিস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, “বেশ!”

এবার সে পরিস্কার বুঝতে পারলো যে তার জীবনে সুখ নেই। এই জীবন তাকে কষ্ট দিচ্ছে অবিরাম। তার কাছা পেল। দু হাত মুঠো করে যে তাকালো সরাইখানার দরজার পানে। “এই খেটে-খাওয়া মানুষের ভাগ্য।” বলে, সে ধীর পদে এগিয়ে চললো। সরু পথটা দিয়ে সে এসে পড়লো বড় রাস্তায়, সরাইখানার সামনে। সেখানে একটা জোরালো আলো জ্বলছে। গাড়েয়ানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। সেই সময় কেরানীবাবু দুজন খেলা শেষ করে সিগারেট ফাঁকতে ফাঁকতে বেরিয়ে এলেন। তাদের দেখেই এটন চমকে উঠলো। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বিদ্বেষ জেগে উঠলো পকেট থেকে চামড়া কাটা ছুরী বের করে সে ছুটলো দুজনের পিছনে।

পথে অনেক লোক—মেয়েরা হাসতে হাসতে চলেছে। কে একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিলে। কিন্তু কোন দিকে এটনের নজর ছিল না। তার নজর ছিল শুধু সামনের টুপি মাথায় দুটি লোক এগিয়ে চলেছে। তিন চার দল লোক পার হয়ে সে ওদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছালো। কেরানীবাবু দুজন হাসতে হাসতে চলেছিল। সামনে লাল টুপি পরা এক মহিলাকে দেখে তারা থামলো। একজন বলে উঠলো, “এই যে মাসকা।”

“তোমরা কোথায় চললে?” মহিলা বলে উঠলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে এন্টন তার ছুরীখানি এক কেরাণী-বাবুর পিঠে বসিয়ে দিল। সে বুঝতে পারলো, ছুরী জমা ভেদ করলো, নরম মাংস ভেদ করলো, তারপরেই হাতে ভিজ্জে ভিজ্জে কি লাগলো। ছুরী ফেলে দিয়ে এন্টন দৌড়ালো। তারপরেই যে শুনতে পেল পিছনে চাঁৎকার ও পায়ের শব্দ।

প্রচণ্ড ভয়ে এন্টন অন্ধকার সরু গলি দিয়ে ছুটলো। পিছনে তখনও চাঁৎকার শোনা যাচ্ছে। পিঙ্গাড়া ছুটে আসছে। পুলিশ ছুটে আসছে। কয়েকজন লোকও ছুটে আসছে। এক পথ থেকে আরেক পথে সাড়া উঠছে—“ধরো, ধরো—পাকড়াও।”

এন্টন হাঁপাচ্ছে। এক পথ থেকে আরেক পথে ছুটেছে। সর্বত্র ঘাম দেখা দিয়েছে। খালের পাড় দিয়ে এক নোংরা পথ ধরে সে চলেছে। একজন পুলিশ তার হাত ধরলো কিন্তু পিছলে গেল। সে ভলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো, কিন্তু এন্টন তখন অনেকটা চলে গেছে।

এন্টন ছুটেছে, লাফিয়ে, ভিঙ্গিয়ে, গাড়ি মেরে জানোয়ারের মতো সে পালাচ্ছে। ভীতি তার দেহে অসাধারণ শক্তি জুগিয়েছে। যারা পিছনে তাকা করে আসছিল তাদের চাঁৎকার ও পুলিশের হুইশিলের শব্দ পিছনে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। হালকা পথের আলোয় আর কাউকে দেখা গেল না।

পুল পার হয়ে, খানা ভিঙ্গিয়ে সে ঘাস জমির উপর দিয়ে ছুটলো। এখন সব অন্ধকার ও নির্জন। দূরে দু-একটা আলো মিট মিট করে জ্বলছে। এক পাশ ঘন অন্ধকার বন বলে মনে হয়। গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যায়।

॥ ৩ ॥

সারা রাত সে এক খানার মধ্যে পড়িছিল। তার চারিপাশে ছিল বড় বড় নরম ঘাস আর উপরে ছিল ঠাণ্ডা অন্ধকার আকাশ। সূক্ষ্ম কণা কণা বৃষ্টি পড়ছিল। সে ঠাণ্ডায় পড়িছিল, তার সারা দেহ ভিজ্জে গিয়েছিল। মাথার মধ্যে টুকরো টুকরো ভাবনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। একটা বিষয় সে পরিত্যক্ত বুদ্ধি—আগের জীবন শেষ হয়ে গেল। সে তার ঘরে আর ফিরে যেতে পারবে না, আগের কাজ আর করতে পারবে না। প্রথমে এই কথা ভাবতেই সে

অবাক হয়ে গেল, এবং আতঙ্কিত হলো। তারপরেই বুঝতে পারলো এ ছাড়া আর গতি নেই, মনে মনে সে খুসিই হলো “সত্যি কি সব শেষ হলো?” এই কথাটা বলতে বলতে সে উঠে বসলো।

“ওঃ—যথেষ্ট ভুগেছি।” এমনভাবে সে কথাগুলি বললো, যেন কেউ তাকে নির্ধাতন করছে। অতীত থেকে সে মুক্তি পেল। এইটা ভাবতেই সে খুসি হয়ে উঠলো ভবিষ্যতের আতঙ্ক কেটে গেল। ঠাণ্ডা জনহীন প্রান্তরকে মনোরম বলে মনে হলো। সেই শীতের হাওয়া মনে হলো স্নিগ্ধ সন্নিবেশ।

সকালবেলা ভিজ্জে গায়, ভিজ্জে মাথায় সে মাঠ পার হয়ে গেল। সরু একটা পথ ধরে একেবারে নগরের আরেক প্রান্তে গিয়ে পড়লো। এদিকটায় সে কখনও আসেনি। জায়গাটা অজানা বলেই তার মনটা হালুকা হলো। নিজে কে মুক্ত বলে মনে হলো। রৌদ্র-উজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে সে খোস মেঝাজে হেঁটে চললো। অন্যদিন এই সময় তাকে কাজ করতে হয়, আজ তার কোন কাজ নেই। সে এখন যেমন খুসি চলতে পারে। ঘরের ভাড়া দিতে হবে, চামড়ার দাম দিতে হবে, এসব ভাবনা আর নেই। তার নোংরা ও ছেঁড়া পোষাক দেখে পথের লোকেরা তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। লোকে তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে লক্ষ্য করে সে আনন্দময় একটা উত্তেজনা বোধ করলো। সারাদিনই সে পথে পথে ঘুরলো। একটা সরাইখানা থেকে কিছু খেয়ে নিলে। তারপর বিকাল বেলা আবার মাঠে এসে শুকনো ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো।

দ্বিঘন্টার সীমার কারখানার চিমনীগুলো দেখা যায়। চিমনির ধোঁয়া শহরের মাথায় জমছে, কালো পর্দার মতো। সারা মাঠ শুষ্ক। কাল রাতে যেটাকে বন বলে মনে হয়েছিল সেটা একটা কবরখানা। সে দেখতে পাচ্ছে ছোট ছোট ক্রশ ও সাদা অরপিকা সবুজ পাতার অবকাশে। এন্টন তাকিয়ে রইল কবরখানার পানে।

সে অনুভব করলো শান্তি, মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। পুলিশের ভয় তার নেই। ঠাণ্ডা, ক্ষুধা, একেরেয়েমি ও অবিচার স্বাধীন জীবনে যা তাকে সহ্যেতে হয়েছে, তার চেয়ে জেলখানার জীবন অনেক ভাল। গত রাতের ভয়াবহ ঘটনা ভাল করে বোঝার মতো মন তখন তার ছিল না। সে যে একটা মানুষকে খুন করেছে, সে জন্য অনুতাপ বা কল্পনার কোন অনুভূতি তার

ছিল না। বরং সে যে একটা দুঃসাহসের কাজ করেছে এজন্য গর্ব বোধ করছিল। সে বলে উঠেছিল, “এতদিনে তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছ।”

সন্ধ্যাবেলা মাঠের উপর ছায়া ঘনিয়ে আসছিল। কবর-খানা অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। এবার এক্টনের মনে দুঃখ জাগলো। সে সত্য ও সুন্দরের অভাব বোধ করলো। সে আকাশের পানে তাকালো। অতল স্বচ্ছ আকাশ। সেই অসীম নির্মল আকাশই তার চিন্তে দুঃখ বোধ জাগলো। সে

উঠে বসলো। সারা মাঠ অন্ধকার ও জনহীন। সে চীৎকার করে উঠলো, “তারপর...”

সে এগিয়ে চললো শহরের দিকে মধুর পদে। দু কুঁচকে তাকাতে লাগলো চারিপাশে যেন সে আজ কারও গলা টিপে ধরতে চায়।

প্রশস্ত মাঠের উপর দিয়ে মুক্ত বাতাস বইতে লাগলো। সহজভাবে, দুঃখের বারতা নিয়ে।

গল্প

প্রসাদ

দীপেন রাহা

সুমনাদেবী একজন ঠাকুর ভক্ত। খোল করতালের আওয়াজ শুনলেই বিনা সংকোচে সেখানে বান। এজন্য তার সুনাম আছে পল্লীতে। অনেকেই বলে, ভ্রমণ ভক্ত বড় একটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, সাধু সন্ন্যাসীর খবর পেলেই তিনি ছুটে যান। দুষ্ঠ লোকরা বলে, নিজের টাকা আছে, গাড়ী আছে, তাই ছুটে যেতে পারেন। কিন্তু গাড়ী বা বাড়ীর খরচ ধারেন না সুমনাদেবী। এ একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এজন্য তাকে স্বামী ও অন্যান্যদের কাছে টিকা টিকানী শুনতে হয়। কেউ বলে ‘তুচ্ছ’, আবার কেউ বলে, সংসারের দায়দারিত্ব এড়িয়ে যাবার ছল।

সমালোচনা যতই তীব্র হয় ততই সুমনাদেবীর জিদ বেড়ে যায়। মঠাধ্যক্ষ, সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ সবাই তাকে খাতির করেন। কাজেই তিনি বাড়ীতে পাওনা হিসাবে সর্বত্র আদর যত্ন পান এবং ন্যায্য পাওনা বলেই সানন্দে তা গ্রহণ করেন।

সেদিন একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে পূজা, আরতি ও যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পান সুমনাদেবী। গৃহকর্তা সুলতা সেন এসে করজোড়ে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। পূজা আরতি শেষে প্রসাদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। খুশী হয়েই সম্মতি জানিয়েছেন সুমনাদেবী। যথাসময়ে

উপস্থিত হয়ে প্রসাদ নিতে বসেছেন। কিন্তু মোটা চালের ভাত প্রসাদ ও আটপোরে তরকারী দেখেই তার রসনা বিদ্রোহ করল। পাছে অন্যান্য ভক্তরা মনে কিছু করেন তাই তিনি কোন রকমে এক গ্রাস গ্রহণ করে, অপরের অজান্তে বাকী ভাত তরকারী শালপাতায় ঢাপা দিয়ে উঠে পড়েন। তার ধারণা প্রসাদ হবে ক্ষীর, সন্দেশ ও সুস্বাদু খাদ্য। ভাত হলেও সে মিহি চালের, ডাল তরকারী হবে উঁচু দরের। কারণ, ঠাকুরের কাছে যা’ তা’ ভোগ দেওয়া চলে না।

কিন্তু সুমনাদেবীর বাড়ীতে ব্যতিক্রমটা দেখে তিনি খুবই বিরক্ত হন। দুপুরে বাড়ীতে খাবেন না বলেই জানিয়ে এসেছেন। কাজেই একটা বেলা তাকে কষ্ট পেতে হল।

কয়েকদিন পর হঠাৎ দেখা গেল সুমনাদেবীর দক্ষিণ হস্তের করতলে ও অঙ্গুলিতে চর্মরোগ হয়েছে। কদর্য চর্মরোগ। যন্ত্রণার কাতর হয়ে পড়লেন। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের ডাকা হল, ওষুধপত্রের কোন কাজ হল না দেখে সুমনাদেবী কাতর হয়ে পড়লেন। ক্ষতের পরিমাণ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের অশান্তিও তাঁর বেড়ে চলেছে। হঠাৎ একদিন তম্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সুমনাদেবী স্বপ্নে দেখলেন, সেদিন প্রসাদ নেওয়ার সময় যেসব মহিলারা তার পাশে বসেছিলেন, তারা তার প্রসাদের প্রতি ভাচ্ছল্য-

ভাব দেখে বিদ্রূপ করছেন আর বলছেন প্রসাদ অবহেলা করলে এরকম হবেই, কষ্ট পেতে হবে।

এই স্বপ্ন তার স্মরণ যেন ফিরিয়ে আনল। তিনি বুঝলেন, তার হাতের ঘা তার সেদিনকার প্রসাদের প্রতি অবহেলার প্রতিক্রিয়া। তাই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সেই সন্ধ্যাসীর কাছে যাওয়ার জন্য, যিনি পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞ পরিচালনা করেছিলেন।

সুমনাদেবী পাগলিনীর মত সন্ধ্যাসীর আশ্রমে গেলেন। তাঁর পা দুটো জড়িয়ে কেঁদে বললেন, আমার হাতের ঘা ভাল করে দিন।

স্বামিজী স্মিতহাস্যে বললেন, মা হাতের ব্যাওজ খোল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর ভবিষ্যতে আর কখনও

প্রসাদকে অবহেলা করবে না। মনে রাখবে প্রসাদ কম, বেশী, ভাল, মন্দ, তিক্ত, সুস্বাদুর প্রশ্ন আসে না। প্রসাদ প্রকার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। প্রসাদ গ্রহণে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

সুমনাদেবী অশ্রুবৃদ্ধকণ্ঠে বললেন, বাবা, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমায় ক্ষমা করুন।

স্বামিজী সুমনাদেবীর ডানহাতখানা নিজের দুহাতের মধ্য চেপে ধরলেন। কয়েক মিনিট পরে হাতটি ছেড়ে দিয়ে বললেন, যাও মা, এবার ভাল হয়ে যাবে।

কয়েকদিন পর দেখা গেল তার হাতের ঘা নেই। ক্ষতের চিহ্নমাত্র নেই। সুমনাদেবীর চোখ দুটো আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

গল্প

পাথরের কান্না

রিক্তা মুখোপাধ্যায়

জানিনা আমি, কেউ শুনছে কিনা সেই চাপা দীর্ঘশ্বাস, যা ছড়িয়ে আছে চাঁর, দেওনার আর পাহাড়ী পাইনের অরণ্যে। হিমেল বাতাস বরফের চাবুক হয়ে শন শন করে যখন আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের খাঁজে, তখন কি কেউ শুনছে এক অতৃপ্ত প্রাণের করুণ আর্তি, যা গুমরে গুমরে উঠছে পথের বাঁকে বাঁকে। যে পথ চলে গেছে পূণ্য তীর্থ পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে যে পথের বুকে ঝরে পড়েছে অনেক তীর্থযাত্রীর ক্লান্তির ঘাম, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বেদনার অশ্রু। তার মধ্যে থেকে হয়তো আলাদা করে খুঁজলে পাওয়া যাবে না গুরু এর কথা। তবুও তীর্থপথের প্রাচীন পাথরের খাঁজে আটকে আছে সেই বোবা কান্না।

সুবুটা আমি জানি না, শেষটা জানি। আর পাঁচজন পূণ্যকামীর মতই গুরু মাকে নিয়ে বেরিয়েছিল তীর্থের পথে। স্বপ্ন সঙ্গী তীর্থকামীদের মতই তার এই তীর্থ পরিক্রমা, শুমু তার মার জন্য। মায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গুরু দীর্ঘমাস ঘরছাড়া। সস্তরটা বছরকে

পার করে দেওয়া মাকে নিয়ে এসেছে এক একটি তীর্থস্থানে। আবেগ আপ্ত মা করেছে দেবদর্শন। আর গুরু দেখেছে মায়ের মুখে তৃপ্তির হাসি। এবার ফেরার পালা। শেষ তীর্থ পশুপতিনাথ দর্শন করে ফিরে যাবে নিজেদের গাঁয়ে।

যাত্রীদের পেছনেই থাকতো গুরু। সামান্য একটু আশ্রয় আর বিশ্রাম পেলেই ও খুশী। দুর্গমপথে থাকতো একটা লাঠি আর পিঠের ওপর একটা ঝোড়ায় কমলমুড়ি দেওয়া বৃদ্ধা মা। ঝোড়াটা একটা শক্ত-কাপড়ের ফিতে দিয়ে কপালের সঙ্গে আটকানো থাকতো। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পথ চলতো গুরু। এভাবেই মাকে নিয়ে ও তীর্থযাত্রা করেছে। যাত্রা প্রায় শেষ। ও জানে পাহাড়ঘেরা গুর ছোট গাঁয়ে গুর জন্যে অপেক্ষা করে আছে মাইল।

রাতের মত বিশ্রাম দেয় দলটা। গুরু পিঠের থেকে মাকে সমস্ত নামায়। সামান্য কিছু খাবার পর ওরা একান্ত সঙ্কেচে রাতের শয্যা পাতে একধারে। অভাব আর দারিদ্র্য ওদের মাথা তুলতে দেয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মা আর ছেলে যাত্রীদল থেকে একটু তফাতে থাকে, একটি কমলের উষ্ণ আশ্রমে মা

আর ছেলে। শ্রান্ত গুরু—এর মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত আরাম আর উত্তাপ জমা হয়ে আছে মায়ের বুকের ঘন সান্নিধ্যে। আবেশে ওর দুচোখ বুঁজে আসে। কাঁপা হাতে ওর চুলে আঙুল ভুবিয়ে মা বলে, ‘গুরু, গায়ে ফিরে এবার তোর বিয়ে দেবো বেটা! বড় ভালো মেয়ে মাইলি’। নিঃশব্দে হাসে গুরু। মা খুশী, মায়ের খুশীতে ও খুশী। বন্ধ চোখের পাতায় ভেসে ওঠে গায়ের ছবি। যেখানে মাইলি নামে একটা পাহাড়ী ফুল ভেড়া চরায়, ঝোরা থেকে জল নিসে আসে মাথায় করে। ওর আপেল রাঙা গালে টোল পড়ে গুরুকে দেখে। বুকের দুপাশে লম্বা কালো বর্ণী দুটো দুলিয়ে জুম চাষের সময় খাবার নিসে যায় ক্ষেতে। মাইলি ভারি মিষ্টি নাম। বাইরে তুষার পড়ে বৃষ্টির গুড়োর মত। পাইনের মাথায় পেঁজা তুলোর মত জমে তুষার। আর মিষ্টি টুকরো স্বপ্ন জমা হয় ধনরাজের ঘুমভরা চোখে।

প্রতিদিনের মত আজও ভোর হয়। যাত্রীদল প্রস্তুত হয় তুষারতীর্থ পশুপতিনাথের পথের উদ্দেশ্যে। সামান্য পথ বাকি। তারপর ওরা পৌঁছে যাবে লক্ষ্যে। ‘পশুপতিনাথ-জি-কি জয়,’ বলে যাত্রীদল পথে নামে। বাইরে তখনও মিহি নুনের গুঁড়োর মত বরফ পড়ছে। আজকের দিনটা বড় দুর্ভোগময়। মাকে গরম নুন-চা খাইয়ে হাত ধরে ঝোড়াতে বসিয়ে দেয় গুরু। তারপর সযত্নে কমল দিয়ে মাকে ঢেকে দিয়ে বলে ‘চুপচাপ বসে থাক মা, বাইরে বড় দুর্ভোগ। ঝোড়ার মধ্যে বসে দুহাতের অঞ্জলীতে গুরু—এর মুখখানাকে ধরে মা বলে, ‘সাবধানে পথ চালাস বেটা।’ তারপর বলে, ‘তোর খুব তর্কালিফ হচ্ছে গুরু এভাবে আমাকে বইতে’। অজস্র বাল রেখাঙ্কিত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গুরু মুচুকে হাসে বলে, ‘আমি যখন ছোট ছিলাম মা, তুইতো আমায় পিঠে বেঁধে সারাদিন কাজ করাতিস। তোর কি তখন তর্কালিফ হত?’

বলিষ্ঠ হাতে ঝোড়াটা তুলে ফিতেটা কপালে আটকে গুরু পথে নামে। কুয়াশায় হারিয়ে গেছে পথ। পায়ের তলার পাথর তুষারে পিচ্ছিল। ঝোড়ায় বসে মা বার বার সাবধান করে, ‘সামাল বেটা!’ পাহাড়ের ছেলে গুরু, একটা পাহাড়ী গিরগিটির মত ধীরে ধীরে চড়াইএর পথে ওঠে! সত্যি খুব শ্রান্ত লাগে গুরুএর। কতদিন ধরে ঘর ছাড়া ও। পথের ক্রান্তিতে আছেই। তার সঙ্গে আছে পেটের খিদে, আর শীতের ছোবল। মাঝে মাঝে ধেমে হাঁ-করে বড় বড় শ্বাস নেয়। ওর মা সম্মুখে ওর পিঠে হাত বোলায়। পথ চলতে চলতে দুহাত দিয়ে কপালের ফিতেটা পরখ করে গুরু, খুব পুরোনো হয়ে গেছে দীর্ঘ তীর্থ পরিক্রমায়। তা হোক, তাদের যাত্রাপ্রত্যঙ্গ শেষ। দূর থেকে যাত্রী দলের নিশানা আসে—‘জয় পশুপতি নাথ জি কি জয়’। মুখ তুলে তাকায় গুরু কুয়াশার মধ্যেও অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় মন্দির চূড়া। আনন্দে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয় গুরু এর। চোঁচিয়ে বলে, ‘দেখছিঁসু মা, দেওতার মন্দির নজরে আসছে।’

দুহাত তুলে প্রাণাম করতে যায় মা। আর সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে। কপালের ফিতেটা ছিঁড়ে ঝোড়া শুদ্ধ ছিটকে পড়ে অতল স্পর্শী খাদের অন্ধকারে। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আত্ননাদ—‘গুরু বেটা—আ—আ—আ’... একটা তীব্র কাঁকনি খেয়ে পাথর হয়ে যায় গুরু। বাবা চোখের শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে ঝোড়া সমেত তার মা পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে নৈমে যাচ্ছে খাদের অন্ধকারে। হঠাৎ থর থর করে কেঁপে ওঠে গুরু এর শরীর। গলাদিয়ে একটা জাস্তব আত্মচিৎকার বার হয়—‘মা...আ!’ সেই আত্মহ্বয়ের সঙ্গে এসে মেলে দুর্ভাগ্যিত যাত্রীদের জয়ধ্বনি, ‘জয় পশুপতি নাথ জি কি জয়।’

‘যোগের বিধান—জাতির জন্য। অনিশ—ঈশ্বর হইতেছেন জাতি-রূপ সমীকৃতিবিগ্রহে। উৎসর্গ ভাগবত জীবনের নীতি।.....একে অন্যকে উৎসর্গ করিবে। প্রত্যেকে পরস্পরকে উৎসর্গ করিয়া নিত্য-সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইবে—তাহারই উপর দিব্য পরিবার, সম্বন্ধ, সমাজ ও জাতির প্রতিষ্ঠা।’

—সম্বৎসর শ্রীমতিলাল

সংযুক্তাদের বাড়িটা ছিল ঢাকুরিয়ার বাবুবাগানে। পাড়াটাকে বেশ উন্নত বলা যায়। বাস স্ট্যাণ্ড, রেল স্টেশন, বাজার, ডাক্তারখানা সবই প্রায় হাতের কাছে। এসব সুবিধা দেখেই সংযুক্তারা এখানে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল। ওদের ফ্ল্যাটটা ছিল দোতলায়। বাড়িওয়ালারা থাকতেন পাশের ফ্ল্যাটে একই তলায়। ভাড়াটাও এবাজারে খুব বেশী ছিল না। তার বিয়ের পর পরিবারে লোকজন একটু বেশী থাকলেও কুলিয়ে যেতো। ক্ষুর-শাশুড়ি, সংযুক্তা ও তার স্বামী রক্ততকে নিয়ে এখন চারজনের সংসার। রক্ততের বোনেদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে।

রক্তত প্রথমটায় বিয়ে করতে রাজী না হলেও মায়ের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে। ভাইদের পড়াশুনা, বোনেদের বিয়েতে রক্ততের বিরাট দান আছে। সে নিজেও জানে যে, সে বড়ভাই, তাই এসব তাকেই দেখতে হবে। বাবা রিটারার করেছেন। ভায়েরা দুজনই চাকরী পেয়ে কলকাতার বাইরে থাকে। তাই কলকাতার ফ্ল্যাটে রক্ততকে বাবা মাকে নিয়ে বছর খানেক একই থাকতে হয়েছে। মা-এর ববাবরই ইচ্ছা ছিল রক্ততের জন্য একটা সুন্দরী বউ নিয়ে আসবে। অনেক কষ্ট করে রক্তত এ সংসারকে দাঁড় করিয়েছে। সে যেন একটু শান্তি পায় আর তারাও একটু সেবা স্বপ্ন পায়। এ স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠতো তার মা।

রক্তত ববাবরই ছেলে হিসাবে ভাল, পড়াশুনার এবং স্বভাব চরিত্রে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই একটা অঘটন ঘটলো। প্রথম দর্শনেই ও যেন সংযুক্তার প্রেমে পড়ে গেল। সংযুক্তা সবে মাত্র বাংলায় এম এ-র ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। দু একদিন ক্লাশ শুরু হয়েছে। রক্তত তখন ম্যানেজমেন্টের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে খুব বাটাঘাটি করছে। ববাবরই সে সিরিয়াস, সব ব্যাপারেই। একদিন হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে রক্তত নামার সময় সংযুক্তাকে উঠতে দেখলো। প্রথম দেখাতেই কেন যেন একটা শিহরণ খেলে গেলো তার শরীরে। মেয়েটাকে তার ভালো লাগলো। দু'বছর ধরে ক্লাস করছে, কত মেয়েকেই না দেখেছে রক্তত, কিন্তু কোন মেয়েকে দেখে তার এরকম মনে হয় নি। মেয়েটার

সঙ্গে কোন কথা সেদিন না হলেও রক্ততের মনে দোলা দিতে শুরু করলো এ ঘটনা। অথচ এরকম প্রতিদিন কত মেয়েকেই সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে। কারুর কারুর সাথে ধাক্কাও হয়ে যায় কখনও কখনও। কিন্তু এমনটি হয় না।

এরপর একটা ডিবেট অনুষ্ঠানে দুজনের আলাপ হলো। সে অনুষ্ঠানে সংযুক্তা হয়েছিলো প্রথম এবং রক্তত হয়েছিলো দ্বিতীয়। ধীরে ধীরে আলাপ আরো গাঢ় হয়েছে। রক্তত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ও যখন পড়াশুনা করে তখন একমাত্র উপায়ী তার বাবা। সেদিক দিয়ে সংযুক্তারা একটু পরস-ওয়াল। এক মেয়ে। তার ইচ্ছা এম এ-র পর রিসার্চ করবে এবং কলেজে পড়াবে। সংযুক্তা স্বভাবে মার্জিত, ভদ্র কিন্তু একটু স্বাধীনচেতা। সে মনে করে মেয়েদেরও অনেক কিছু করার আছে। ছেলোদের থেকে তারা কোন অংশে কম নয়।

সংযুক্তার এরকম চিন্তাভাবনা রক্ততের ভাল লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা রক্ততের কয়েকে। ম্যানেজমেন্ট পাশের পর সে একটা চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। সংযুক্তার সাথে তার মাঝে মাঝে দেখা হয়। তবে আগের মতো নয়। রক্তত মাঝে মাঝে ফোন করে সংযুক্তাকে প্রোগ্রামের কথা জানায়। রক্তত এর মধ্যে একটা ভালো চাকরী পেয়ে যায়। সংযুক্তা এরপর একদিন রক্ততকে বিয়ের কথা পাড়ে। রক্তত বলে, 'সংযুক্তা, একটা কথা মনে রেখো, ভালো-সাগা মানে ভালো-বাসা নয়।' এরপর সংযুক্তা আর কথা বাড়াননি। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

বছর খানেক পার হয়ে গেছে। রক্ততরা বাড়ি পাশে ঢাকুরিয়া এসেছে। অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে। মা প্রায়ই বিয়ের কথা বলেন। রক্তত কোন কথাই বলে না। রক্ততের একটা মনে মনে ভয় আছে যে বেশী শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করে আনলে যদি তার সাথে মা-বাবার অ্যাডজাস্টমেন্ট না হয়। তাহলে সারাজীবন তাকে জ্বলে মরতে হবে। কিন্তু বিধাতার লিখন কোন দিন মুছে যায় না। রক্ততের মা যে ছেলের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখেন নি তা নয়। ভালো মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে। তার মা নিজেকে কয়েকটা মেয়েকে দেখে এসেছেন। কিন্তু রক্তত

রাজী হয় নি। এর মধ্যে রজতের বাবা মারা গেলেন। মা উঠে পড়ে লাগলেন ছেলের বিয়ে দিতে। রজত বললো, 'ভায়ের বিয়ে দিয়ে দাও, তাহলেই আপাততঃ সমস্যা মিটে যাবে'। মায়েরও কাজে সাহায্য করার জন্য একজন থাকবে।

রজত নিজেকে যতই অফিসের কাজে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করুক, পারে না। অফিসে সে এখন একসিকিউটিভ। অফিসের কাজে তাকে প্রায়ই দিল্লী বোম্বে যাতায়াত করতে হয়। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়।

সংযুক্তা রিসার্চ করছে। সে কলেজে প্রফেসরীও পেয়ে গেছে। তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বাবা-মা তেমন চাপাচাপি করেন না। বাবা-মাও জানেন সে স্বাধীনচেতা। সংযুক্তা বছর খানেকের মধ্যে আরও উন্নতি করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে লেকচারার হয়েছে। বাংলায় পি এইচ ডি করেছে। কাগজে তার ছবি ছাপা হয়েছে। রজত তা লক্ষ্যও করেছে।

দীর্ঘ ছ বছর পর দুজনে আবার মুখো-মুখি। রজত একটি বিশেষ প্রয়োজনে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছে। সামনে তাকিয়ে দেখে সংযুক্তা। একেবারে মুখোমুখি। রজতই আগে কথা বলল। কয়েকটি কথাতেই সে বুঝতে পারলো সংযুক্তা বিয়ে করে নি। সংযুক্তা স্বাধীনচেতা ঠিকই, তা বলে সে স্বার্থপর নয়। তার ত্যাগই রজতকে এবার আঘাত দিল। মনে মনে তার ছ বছর আগের ভালো-লাগা সংযুক্তা ভালারাসার পাত্রীতে পরিণত হলো। রজতের অনুরোধেই একটা রেগুৱেস্টে বসতে সংযুক্তা রাজী হলো। কোথায় আর বসবে। সেই মোচাকে। এখানেই কতবার এসেছে তারা, কত গল্প করেছে। কিন্তু সংযুক্তা ছ বছরে একবারও মোচাকে ঢেকেনি। মোচাকে সেদিন তারা দুঘণ্টার বেশী ছিল। অনেক কথার পর দুজনেই দুজনের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে দুজনেই এমন ভাব দেখালো যেন দুজনেই বিয়ে করবে না সারাজীবন।

সেদিনের পর থেকে বরফ গলতে লাগলো। দুজনে আবার কাছাকাছি এলো। একদিন সংযুক্তা রজতদের বাড়িতে এলো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

সংযুক্তাকে দেখে রজতের মার খুঁব ভালো লাগলো। সংযুক্তাদের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে একদিন সংযুক্তাদের বাড়ি হাজির। সরাসরি সংযুক্তার বাবার কাছে রজতের বিয়ের প্রস্তাব পাড়লেন। সংযুক্তার বাবা এর আগেই মেয়ের কাছ থেকে রজতের সম্বন্ধে জেনেছিলেন। কেউই আর আপত্তি তুললেন না। বিয়ে হয়ে গেল।

সুখের সংসার সংযুক্তার। তার স্বাধীনতায় রজত ও তার মা কেউই প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন নি। ছ সাত মাস পরে একদিন তার মা সংযুক্তাকে বললেন : 'বোমা চাকরীটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? আমাদের ঘরের মেয়েরা চাকরী করতে গেলে ঘর সংসার দেখবে কে?' এই হল কাল। রজতও পরে পরে সংযুক্তাকে বুঝিয়েছে চাকরী ছাড়ার জন্য। টাকারতো এখন রজতের অভাব নেই।

সংযুক্তা বলেছে, 'তাহলে আমার কি কোন স্বাধীনতা নেই। লেখাপড়া শিখলাম, রিসার্চ করলাম। আমার সাধনা কি ব্যর্থ হবে। ঘরের বোঁ হয়ে রান্নাবান্না করবো আর সংসার করে নিজেকে ক্ষয় করবো। এ হতে পারে না। চাকরী আমি ছাড়তে পারবো না।'

রজত প্রথম থেকেই সংযুক্তাকে চেনে। যে কোন মূল্যে সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রস্তুত। রজত মাকে বুঝিয়েছে যে তার কাজের সুবিধার জন্য একটা লোক রাখতে। কিন্তু মা তাতে রাজী নন। তাঁরও জেদ বোঁমা এবং ছেলে তার কথা শুনবে না কেন। সংসারে অশান্তি বাড়তে লাগলো।

রজতের মায়ের হাট্ট স্ট্রোক হোল। তিনি শয্যাশায়ী হলেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কিন্তু সংযুক্তার সেবায় কোন ঘাটতি হয়নি। সে একমাসের ছুটি নিয়ে শ্বাশুড়ির সেবা করেছে। কারণ সে ভাবতো সকলেরই চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা আছে। তার শ্বাশুড়িরই বা স্বাধীনতা থাকবে না কেন? মৃত্যুর আগে সংযুক্তাই পাশে ছিলো। মা তার মাথায় হাত রেখে বলতে লাগলেন, 'তোমরা সুখী হও।' সংযুক্তাও দেখলো মা যেন কত সুখী। তাঁর চোখে মুখে সুখের, শান্তির ছাপ। আশ্তে আশ্তে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এলো।

অন্তরালে

দীপঙ্কর বিশ্বাস

দেখতে দেখতে এমি করেই দিন চলে যায় ; মাস পেরিয়ে ফিরে আসে নতুন বছর—সঙ্গে নিয়ে উৎসব আয়োজনের অঙ্গীকার, অলঙ্কার ।

গ্রীষ্মের আগুনঝরা রুদ্ধ বৈশাখ শেষে বর্ষা আসে—অন্তত বাংলার ঋতু হিসাব তো তাই বলে । তবুও এ হিসাব ঘ্যান আজ আর ঠিক সময় মানে না । বর্ষা এখন খাম-খেয়ালী—ঠিক ঘ্যান সেই পাগলী মেয়ে । ইচ্ছামত খেলে বেড়ায়, জুকিয়ে বেড়ায় মেঘে মেঘে । বর্ষা যায়, শরৎ আসে । সেই নীলাকাশ আকাশ জুড়ে ছেঁড়া মেঘের চঞ্চলতা, হলুদ রাঙা নরম আলো, পথের পাশে বনের ধারে সাদা কাশের অবাক মেলা, জল থৈ থৈ পুকুর নদী, ছড়িয়ে থাকা শিউলি-সকাল, সবুজ ধানের প্রতিশ্রুতি—সব মিলিয়ে শরৎ ঘ্যান নিজেই একটা কবিতা, একটা নিটোল কবিতা । তাই বুঝি অবাক চোখে কবির চেরে থাকা—

‘আজি কি তোমার মধুর মুরতি

হেরিনু শারদ প্রভাতে,

হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ

বালিছে অমল শোভাতে ।’

শুধুই কি তার ‘মধুর মুরতি’ ? শরতের মধুমত্ত আরো ঘ্যান অন্য কোথাও জুকিয়ে আছে । আমরা জানি—সবাই জানি, সে আনন্দ তার উৎসবে । কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্বণ । আর এই তেরোর অনেক কটাই বুঝি শরতে । কিন্তু অনেকের মধ্যেও যে একজন সবচেয়ে বড় । সবচেয়ে প্রিয়—সে বুঝি সেই উৎসব, সেই দুর্গোৎসব—আগের পূজা, এখন উৎসব । অনেক বড়, অনেক ব্যাপক তার রূপ আজ ।

সমস্যা—সমস্যা আর সমস্যা । সমস্যায় আমাদের হাত-পা আজ বাঁধা হয়ে গ্যাছে বুঝি । জীবনের সহজ সরল প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে, আমরা যন্ত্রণার জটিল পথে এগিয়ে চলছি । আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের উৎসব, ক্যানন বর্ণহীনতার স্নান হয়ে যায় আজ । তবুও মনের মধ্যে একটা মন থাকে । শরৎকালেই মনটা ক্যানন দুলে ওঠে । দুলে ওঠে ঐ সাদা কাশের সুখের মত । ঐ চাঁদনী রাতের আলোর মত । স্নান সূর্যের শেষের আলোয় ক্লান্ত দীঘির ঢেউ-এর মত ।

সেই কবে রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য করলেন অকাল-বোধন, আর সেই বাসন্তী-দুর্গা থেকে সেই শরৎ বোধনই হয়ে উঠলো প্রিয় এবং প্রাণময় শারদোৎসব । আজকের এই পূজার ব্যবহারিক সূত্রও বহুদিনের । পেছনে তাকালে যে ঐশ্বর্যের ধূসর মাইল স্টোনটা চোখে পড়ে সে ১৫৮০র । প্রথম পূজার প্রবর্তন করেন কংসনারায়ণ । পূর্ববাংলার রাজসাহী জেলার তাহিরপুরের বাঙালী ভূ-স্বামী, সম্রাট আকবরের দেওয়ান, বাংলার সুবেদার । কংসনারায়ণের সে প্রবর্তন আজ সময়ের সিঁড়ি পেরিয়ে চলে এসেছে, অনেক দূর । আকৃতি, প্রকৃতি, আয়োজনে, বোধকরি, প্রয়োজনেও এ উৎসবের পরিবর্তন আজ । শরৎ আসে (বলা ভালো, শরতের সীমা ছাড়িয়ে কখনো এ পূজা, এ উৎসব কাঁতকেও পা বাড়ায়) । কাজের তাড়া আসে, ছুটির নেশা ধরে, নতুন পোষাকের আঁজ আসে, দোকানের ভিড় বাড়ে, শহরে গ্রামের মোড়ে ফেস্টুন ওড়ে, চাঁদার বিল ঘোরে বাড়ি বাড়ি—তারপর দিন এগিয়ে আসে কাছে, অনেক কাছে । ঢাকের কাঁঠিতে বাছনা বাজে কিন্তু প্রাণের মধ্যে স্পন্দন জাগে না—মাইকের অমায়িক উল্লাসে শান্তি উদ্ভাস্ত হয়ে পড়ে । তারপর বিসর্জনের বিবাস্ত নৃত্যে হেসে ওঠে আদিম উল্লাস । অবিস্বাস্য অতিমান নিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে ঐতিহ্য । হাঁপিয়ে ওঠে কিছু মানুষের অবাক বিস্ময় । দিন পেরিয়ে যায়—পুজো ফুরায়, উৎসব ফুরায়, কদরিয়ে যায় সব আয়োজন । ভাঙা প্যাণ্ডলের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হলো—তবু ঘ্যান কিছুই হলো না—বাকি থেকে গ্যালো ঘ্যান অনেক-অনেক কিছু ।

আজকের আয়োজনে আলো আছে, চাকচিক্য আছে, প্রতিযোগিতা আছে—কিন্তু আন্তরিকতা—হৃদয়ের হিরণ্ময় স্পর্শ আছে কি? নেই । এক ভেঙে আজ দুই হয়, কিম্বা আরো—কিন্তু দুই মিলে আজ এক হয় না তো ! বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ এবং আত্মমুখীতায় বড় মগ্ন, বড় মুগ্ধ হয়ে গেছি আমরা ! আমরা সেই আগের মত মিলতে পারি না । মনে মনে হৃদয়ে হৃদয়ে সব কিছুর মধ্যে কোথায় ঘ্যান একটা ফাঁক থেকে গ্যাছে আজ । ‘পঞ্চগ্রাম’ উপন্যাসে তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড় বেশি করে মনে পড়ে

যায়। মনে পড়ে যায় তাঁর সেই সত্যানুভূতির দিব্য উচ্চারণ—

“মানুষের একতার বোটা কোথায় কে কাটিয়া দিয়াছে—
আর বাঁধা যায় না।” সত্যিই কি বাঁধা যাবে না আর
কোনদিন? আমরা কি সত্যিই ফিরে পাব না সেই হৃদয়,
সেই আনন্দ, সেই উৎসব।

বন্যা আসে, অনাবৃষ্টি আসে—যুছে দিয়ে যায় আমাদের
আনন্দ, আমাদের উৎসব, আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের

বুকের গভীরে কোথায় যান একটা স্বপ্না আছে—থেকে
যায়। আগের মত পূজোর গন্ধ কিছতেই যান বাতাসে
ভেসে আসে না। কেন জানি না, বুকচাপা কামার সঙ্গে
তবুও উচ্চারণ করতে ভালো লাগে—

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমোহ নমঃ ॥

ঐতিহাস

মহানগরী কলকাতার ঐতিহাসিক পরিচিতি

বিশ্বনাথ রায়

১৬৮৬ সালে জব চার্নক ও তার সঙ্গীরা অস্থায়ীভাবে
বসবাসের জন্য সূতানুটি বাজারের কাছে গুটিকয়েক মাটির
ও খড়ের কুটির নির্মাণ করে। কিন্তু ইংরেজ বণিকদের এই
প্রচেষ্টা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কেননা এদেশের তৎকালীন
শাসক শায়েস্তা খানের, জন্য এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে ওরা
বাধ্য হয়। যদিও সাময়িকভাবে বসতি উঠে গিয়েছিল
তথাপি এই অঞ্চলের আকর্ষণ জব চার্নকের কাছে আদৌ
কমেনি। নতুন শাসক ইব্রাহিম খানের আমন্ত্রণে ১৬৯০
সালের ২৪শে আগস্ট বসবাসের জন্য জব চার্নক আবার
ফিরে আসে সূতানুটি গ্রামে। এই দিনটি শুধুমাত্র কলকাতা
শহরের ইতিহাসেই গুরুত্বপূর্ণ নয়—সমগ্র ভারতেরও। কারণ
ঐ দিনটিতে জব চার্নক বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব
দেওয়ার ভিত্তিতে বাঙ্গলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার আইনগত
অধিকার পায়।

শহর গঠিত হওয়ার আগের স্থান বিবরণ

হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা গ্রাম (বর্তমান বড়বাজার
টাকশাল থেকে স্ট্র্যাণ্ড রোডের কার্টম হাউস পর্যন্ত) এবং
গোবিন্দপুর গ্রাম (বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের কার্টম হাউস
থেকে গড়ের মাঠের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত) অবস্থিত ছিল।
সূতানুটি গ্রামটি (বর্তমান বাগবাজার খাল থেকে বড়বাজার
টাকশাল পর্যন্ত) সূতার বাজার হিসাবে গড়ে ওঠে। কলিকাতা

গ্রামে স্থানীয় জমিদারদের অফিস-কাছারির প্রাণকেন্দ্র ছিল।
গোবিন্দপুর গ্রামেই ছিল কিন্তু ঘনবসতি। এই তিনটি ক্ষুদ্র
গ্রামের তিন দিক ঘিরেই ছিল জলা ও নিচু জমি। তা সত্ত্বেও
এই অঞ্চলটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবেই পরিচিতি
লাভ করে। এই অঞ্চলটি শুধুমাত্র ব্রিটিশদের কাছেই গুরুত্ব
পায়নি, পাঁচটি স্থানীয় বণিক পরিবার অর্থাৎ গোবিন্দপুর
গ্রামে বসবাসকারী চারটি বসাক ও একটি শেঠ পরিবারের
কাছেও অসীম গুরুত্ব পায়। সম্ভবতঃ শেঠদের প্রতিষ্ঠিত
গোবিন্দপুত্রী ঠাকুরের নাম থেকেই গোবিন্দপুর গ্রামের
নামকরণ হয়েছিল।

সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) ছেড়ে কিছু কিছু বাসিন্দা হুগলী
নদীর পূর্বাঞ্চলে (বর্তমান গার্ডেনরীচ অঞ্চল) এসেছিল।
কারণ নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের জাহাজ ও নৌকাগুলি
যাতায়াতের পথে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতো। জব চার্নকের
আগমনের একশ বছর আগে থেকেই পত্নীগাঁজরা বাঙ্গলায়
ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বর্তমানের গার্ডেনরীচকেই নদী বন্দর
হিসাবে ব্যবহার করতো। এরই মুখোমুখি হুগলী-নদীর
পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বেতোড় গ্রাম। আরও ছিল বাঙ্গলার
সুবেদারের ফোর্ট—যেখান থেকে আরকানী জলদস্যুদের
দৌরাস্তা দমন করা হতো। পত্নীগাঁজদের অবস্থান কালে
বেতোড় গড়ে ওঠা বন্দরের মাধ্যমে মরসুমী বাণিজ্যিক

লেনদেন চলতো। পর্তুগীজ ও ভারতীয় ব্যবসায়িকদের বেতোড় অঞ্চলটিতে খুবই আকর্ষণ ছিল। ফলে ঐ অঞ্চলের হুগলীনদীর পশ্চিমদিকে গোবিন্দপুর গ্রামে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘনবসতি গড়ে ওঠে।

সূতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামকে ঘিরেই তুলার চাষ হতো। স্থানীয় উৎপাদনে কিছু তন্তুবায় পরিবার জীবিকা নির্বাহ করতো। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কলকাতায় চাষের উপযোগী উল্লেখযোগ্য জমিতে তুলা উৎপাদন হতো। সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও বন্দরের অবলুপ্তির পর, বসাক ও শেঠ পরিবার গার্ডেনরীচের কাছে গোবিন্দপুরগ্রামে বসতি স্থাপন করে এবং পর্তুগীজদের সংগে তুলাজাত উৎপাদন সামগ্রীর ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যদিয়ে সূতানুটি বাজারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

হুগলীনদীর পূর্বাঞ্চলটি অবস্থানগত নানা সুযোগ সুবিধার জন্যেই বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেই গড়ে ওঠে। কারণ বেতোড় বন্দরে ছিল নঙ্গর ফেলার প্রয়োজনীয় সুবিধা ও বৈদেশিক বাজার। এছাড়াও নিকটেই ছিল বাণিজ্য-প্রধান গ্রাম সূতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সূতানুটি স্থায়ী হাট বা বাজার। সূতানুটি বাজার সপ্তাহে দুদিন বসতো। কালীঘাটের কালীমন্দিরটি সকলের কাছেই পবিত্র ধর্মীয় স্থান হিসাবেই আকর্ষণীয় ছিল। সূতানুটি ও কালীঘাট গ্রামের সংগে আদিগঙ্গা থেকে সরাসরি একটি রাস্তা (পিলগ্রীম রোড) যুক্ত ছিল। বাণিজ্য কেন্দ্রের সংগে বিখ্যাত ধর্মীয় স্থানের সংযোগের গুরুত্ব নিশ্চয় এই অঞ্চলকে অধিকতর উন্নত করতে অনেকাংশে সাহায্য করে।

নীচের উদ্ধৃতি আলোচ্য মূল্যায়নের সপক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক : “the Banks on the both sides of the river were alive with people and a brisk trade was carried on. . . . Attracted towards Beor, by the magnetism of the Portuguese trade, the various forces and influences which combined to produce the capital of India are seen assembling themselves together gradually, quickly, surely”. যদিও এই অঞ্চল খুবই অস্বাস্থ্যকর, সংগত সৈন্যে, জলা ও নীচু ভূমি বলে বিদেশী বসবাসকারীদের গুরুতর অভিযোগ ছিল।

সুতরাং সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বলা যায় পর্তুগীজদের বেতোড়গ্রামে বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হল গ্রাম থেকে শহর গড়ে উঠার প্রথম স্তর। তারপর দ্বিতীয় স্তরের বিকাশ ঘটে যখন পর্তুগীজ বণিকেরা সমস্ত ব্যবসা স্থানান্তরিত করে বেতোড় থেকে সূতানুটিতে। ক্রমবর্ধমান শহরের তৃতীয় স্তর হলো, ইংরেজ কর্তৃক কলকাতায় কলকারখানা ও ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন।

বাসস্থান ও জনসংখ্যার বন্টন

প্রথমযুগের নথিপত্রে জানা যায় কলিকাতা পরগণায় লক্ষীকান্ত গাজুলীর (১৫৭০—১৬৪৯) জমির রায়তীন্দ্র ছিল ঐ অঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দীতে। তাঁর অফিস বা কাছারি ছিল বর্তমান ডালহাউসী অঞ্চলে। কথিত আছে দোল উৎসব উপলক্ষে তাঁর এসেট্টের পুকুরের চারধার স্থানীয় বাসিন্দারা লাল আবীরে রাঙ্গিয়ে দিত। ঐ সূত্রেই একটি অস্থায়ী বাজারের পত্তন হয়। সম্ভবত এই উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলের নামকরণ হয় লালদীঘি এবং লালবাজার।

ক্ষুদ্র উপাখ্যানে কথিত দোল উৎসব ও অস্থায়ী বাজারকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে নিয়ে বলা যায়, এই অঞ্চলের চারধারে ছিল জনবসতি। এই অঞ্চলের ক্রমবৃদ্ধিতে জমিদার বংশধরদের অবদান কম ছিল না। গোবিন্দপুর গ্রামের বসাক ও শেঠ পরিবার ছাড়াও এই অঞ্চলের ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী ও তার নিকট আত্মীয়রা কালীঘাটের কালীমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁদের প্রপৌত্র ছিলেন মহারাজা নবকুমার। ইংরেজ বসতির আগে পর্তুগীজরা ক্রাইড স্ট্রীটে (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) কাপড়ের ফ্যাকটরির (পর্তুগীজদের ভাষায় “Algodom”) প্রবর্তন করেছিল।

ইফটাইগিয়া কোম্পানির সময়ের অল্প কিছু আগে কলিকাতা গ্রামের উত্তর দিকে বিভিন্ন জাতির ব্যবসায়ীরা বসবাস করতো। ঠিক এই সময়ে সূতানুটি গ্রামে নতুন বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের উল্লেখযোগ্য ক্রমবৃদ্ধি দেখা যায়। গোবিন্দপুর গ্রামে অবস্থিত গঙ্গার খালের দক্ষিণে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারগুলির সঙ্গে তন্তু ও মৎস্যজীবী পরিবারগুলি বসবাস করতো। কলিকাতা গ্রামে যখন ফোর্ট উইলিয়ামের

নির্মাণ কাজ চলে তখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বসতি নিজনিন্দ্র আবাসস্থল ছেড়ে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে।

অকুশি ভিত্তি

সত্যিকথা বলতে কি, এই অঞ্চলে প্রথম তাঁতশিল্প স্থাপনের মধ্যে দিয়েই সৃচিত হয় এই শিল্পনগরী। প্রাথমিক শিল্প বিকাশের ভিত্তিটি উন্নীত হয়েছিল। কেননা এখানে শ্রমিক, উৎপাদন পণ্য ও অর্থ স্থানীয় এলাকায় পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাসকারী তন্তুবায় পরিবার, বসাক ও শেঠদের ব্যবসায়িক উদ্যম এবং স্থানীয় তুলার সরবরাহ থাকায় তখনই অনুভূত হয় ভবিষ্যৎ শিল্পনগরীর অর্থবহ ইংগিত। যদিও এই প্রচেষ্টা খুবই ছোট ও সীমিত ছিল। তথাপি তখনকার দিনের এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। কারণ এই শিল্প সম্ভাবনাকে ভিত্তি করেই ইংরেজ ও পর্তুগীজরা বসতি স্থাপন করে। তখনকার দিনে ভবিষ্যৎ শহর-রাষ্ট্রের কোঁকই এই শহরের বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। স্থানীয় আকর্ষণীয় বাজার ও তার সুনাম, কৃষি, শিল্প, প্রভৃতির মাধ্যমে ইংরেজ বণিকেরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে উন্নীত করেছিল একটি বৈদেশিক বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র ও একটি সম্ভাবনাময় পশ্চাৎভূমি। তখন অবশ্য পশ্চাৎভূমি শুরু হয়েছিল মাত্র তিনমাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া সীমানাকে ঘিরেই।

তখনকার দিনে কলকাতার চারধার ঘিরে গড়ে উঠে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এছাড়াও বাঙ্গলার নদীতীরে শুরু হয় অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বসতি। কারণ এই অঞ্চলে জিনিষপত্রের দাম খুব কম ছিল। তখনকার বেতোড় বাজার কলকাতা বন্দরের মতই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ও বসবাসকারী বিদেশী বণিকদের উদ্যমে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যিক সেনদেন গড়ে তোলে সূতানুটি হাট বা বাজার।

শহরের ক্রমবৃদ্ধির রূপরেখা

ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হওয়ার পর থেকেই সূতানুটি উৎপাদন ও রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ভারতের গোয়া, সুরাট ও মাদ্রাজ অঞ্চলের মুরোপিসান ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা সূতানুটির ব্যবসায়ীদের অবস্থানগত

বাণিজ্যিক সুবিধা ছিল বেশী। সূতানুটির অপেক্ষাকৃত সস্তা পণ্য-সম্ভারের সঙ্গে পাঞ্জা দেওয়ার সম্ভাবিত উচ্চ অঞ্চলগুলির ছিল না। সূতানুটির পণ্য সংগ্রহের খরচ কম, নদী পথে বর্টনের সুবিধা, সস্তা পরিবহন খরচ ও স্থানগত সুবিধা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি সুসংগঠিত ও বিস্তারিত হয়েছিল। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাইরে থেকেও এই অঞ্চল দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে ৫০ বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতের নদী-বাণিজ্যের অর্ধেকেরও বেশী কলকাতার আওতায়ে এসে পড়ে।

এখানে আমরা দেখতে পাই তিনটি গ্রামের অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের পারিপার্শ্বিক, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ শহরের অর্থবহ রূপরেখা। যুক্তিসঙ্গত কারণেই নীচের গতিশীল উপাদানগুলি দিয়েই প্রাথমিক বৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল চিহ্নিত করা যায়। (ক) উৎপাদনের কাঁচামালের প্রাপ্যতা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (খ) ক্রমবিস্তারের উপযোগী জমির প্রাপ্যতা (গ) যোগসূত্রের বৃদ্ধি ও পরিবহনের স্বল্প খরচ (ঘ) বহিরাগত জনসংখ্যার বৃদ্ধি (ঙ) অর্থনৈতিক কার্যকলাপে স্থানীয় সম্পদের বিনিয়োগ।

১৬৯০ সালের আগে থেকেই পাটনা, সাতগাঁও, কাশীমবাজার, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে ইংরেজদের বাঙ্গালায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। পাটনা ছিল লবণের মুখ্যবাজার ও ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমের যোগসূত্র। মুর্শিদাবাদ ও কাশীমবাজারে ছিল সিল্কের ব্যবসা। ঢাকা ছিল পূর্ব বাঙ্গালার মিহি কাপড় ও তুলাজাত পণ্যের মুখ্য কেন্দ্র। হুগলী ছিল উত্তর ভারত ও উত্তর বাঙ্গালার প্রবেশ পথ। কিন্তু ইংরেজদের সূতানুটিতে কারখানা প্রতিষ্ঠান একটি ভিন্ন ধরনের পোল্যারাইজেশন শুরু হয়। অন্তর্দেশীয় নিগমনের কেন্দ্রীভূত অবস্থান বিমুদ ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন যুগের সূচনা করে। রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে একটি স্থানিক পদ্ধতির খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছিল।

নদী-পরিবহনের সুযোগে অন্তর্দেশীয় যোগসূত্রের ফলে ক্রমবিস্তৃত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কারণে নানান ধরনের আকর্ষণ অতি দ্রুত অঞ্চলগুলির যোগসূত্র, জনসংখ্যার

প্রবাহ, মূলধন ও পণ্যসম্ভার বাড়িয়ে তোলে। ব্যবসায়িক লেনদেনের দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক কেন্দ্রাভিসারী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে। কলকাতায় ইংরেজদের বসতির ১৫ বছরের মধ্যে কেন্দ্রাভিসারী বাণিজ্যশক্তি নগর উন্নয়নে সক্রিয় ব্যবসায় ভিত্তিক শহরীকরণের মূল ভিত্তি রচনা করে।

শহরের গঠন ও শহরীকরণের ক্রমোন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা

প্রথমযুগে বসতি সংগঠিত হয়েছিল মাটি ও খড়ের ঘরে। ঘরের ছাউনি যা ছিল তাতে বৃষ্টি ও বড়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত না। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে আকস্মিক আগুন লেগে অঞ্চলের কুঁড়েগুলি অতি সহজে আগুনে পুড়ে যেত। ভৌগোলিক আবহাওয়া বসবাসকারীদের এই অঞ্চল সম্পর্কে তিস্ততার সৃষ্টি করেছিল। সূতানুটি গ্রামকে ঘিরে ছিল একদিকে গভীর জঙ্গল ও অন্য দিকে লবণ হ্রদ। এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় ছিল ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয় ও আন্তিক গোলোযোগজাত অসুখ-বিসুখের মন্ডাস্রক বিষ। ফলে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য অধিবাসী মন্ডা যেত। শুধু তাই নয়, ব্যবসার খাতিরে জম্প সময়ের জন্য যে সমস্ত নাবিক আসতো তারা অনেকেই এই মারাত্মক আবহাওয়ার বলি হতো। ফলে জব চার্ণকের সময়েই বাসিন্দারা এই অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার বড় তোলে।

জব চার্ণকের মৃত্যুর পর Bayর কাউন্সিল সদস্যরা বসতির স্থান পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে লণ্ডনের পরিচালকের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। উক্ত আবেদন পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে পরিচালক বাণিজ্যের প্রসার ও তার ক্রমোন্নতির যুক্তিতে অনড় থাকতো এবং বাঙ্গালার কোন অঞ্চলই অস্বাস্থ্যকর বলে তারা বিশ্বাস করতো না। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভাষায় “it may not be as unhealthy as any other part of Bengal”. প্রাকৃতিক অবস্থান এই অঞ্চলের শহরীকরণের কেন্দ্রায়ন পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

বলা যায় তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকতায় সূতানুটি স্থানটি নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথমটি হ’ল,

মুঘল সরকারের অনিচ্ছা বা অনীহা। অবশেষে সেই অনিচ্ছাও দুরীভূত হয়েছিল। কিন্তু অন্য দুটি স্থায়ী প্রকৃতির। স্থানিক বৈচিত্র্য ও জলপথে সজীব বন্দরের প্রকট অভাব—যা আজও আছে। এছাড়াও ছিল জলাভূমি ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। বলা বাহুল্য, তখন এই দুইটি অসুবিধাকে হাক্কা করে দেখা সম্ভব ছিল না।

ক্রমাগত পলি সঞ্চয় ও জোয়ার ভাটা যাতায়াতের পথ ও যাতায়াতের সময়ের আনুকূল্য করেনি। এমনকি বর্ষার সময়েও নয়। আবার অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করেছিল ২০ ফুটেরও বেশী উঁচু জোয়ারের ঢেউ। এছাড়াও জলের নীচে নানারকম খাড়ির (estuary) প্রতিবন্ধকতা থাকায় প্রয়োজন হয়েছিল খননের। এই অঞ্চল অতিক্রমের জন্য পলি অপসারণের অভাবে জাহাজ ও নৌকাগুলিকে উচ্চ জলরাশির প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। এই সমস্ত বাধা কখন কখন এমনকি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও বহুবার পরিবর্তিত হতো। বিভিন্ন উপলক্ষে বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিপদ সংকেত দেওয়া হতো। ১৬৯৮ সালের “Chuttanuti diary and consultations”—এ ঐ সংকেত ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

“Hooghly Pilot Service” প্রবর্তন হওয়ার কিছু আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে ঐ সমস্যা প্রকটভাবে অনুভূত হয়েছিল। জব চার্ণকের সহকর্মী মিঃ জোসেফকে “Pilot of the Ganges” হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সম্ভবতঃ কোম্পানী উক্ত সমস্যাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপারের বাইরে প্রথম সরকারী কর্মী নিয়োগের সূত্রপাত করে। এই পাইলটটির কাজ ছিল নদীর গতিবিধির উপর সমীক্ষা চালানো এবং নদী পথে কোম্পানীর আসন্ন সমস্যাগুলির সুরাহা করে বাংলার প্রধান সার্ভিস কেন্দ্রকে সজীব রাখা।

সূতানুটির ঠিক অবস্থানের নদীমুখ থেকে প্রায় ৮০ মাইল ভিতর জুড়ে মুখ্য জলপথে বন্টন ব্যবস্থা ছিল। গঙ্গানদীর এখান থেকেই বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন চলতো। গঙ্গা উপত্যকার বাণিজ্যিক উন্নয়নের অর্থনৈতিক যুক্তি যথেষ্ট দানা বেঁধে ছিল। প্রাথমিকভাবে জব চার্ণক এই অঞ্চলটি পছন্দ করেন গুটিকয়েক কারণে। যথা—

(ক) খাজনা ভিত্তিক জমির সহজ প্রাপ্যতা ও নদীর কাছাকাছি বাজার (খ) গার্ডেনরীচে নদ্রর ফেলার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা (গ) পিলগ্রিম রোড থেকে কালিঘাট—যা বিস্তৃত ছিল মুর্শিদাবাদ অবধি (ঘ) ধীরে মত গ্রামটি ঘিরে খাল, জঙ্গল, জলাভূমি এবং নদীর পশ্চিম দিকে প্রাকৃতিক রক্ষণ ছিল। অর্থাৎ এই অঞ্চলে পুনরায় বসতি গড়ে ওঠার ও আশ্রয়কার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিহিত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে আশ্রয়কার উপায় এবং কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাকে ম্লান ও স্তিমিত করে দিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ঐ উপাদানগুলি কলকাতা শহরের কেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে আঞ্চলিক স্বাস্থ্য ও বন্দরের নাব্যতার প্রতিবন্ধকতার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে শহরীকরণে বাধার সৃষ্টি করে। সূতানুটি গ্রামে প্রথম বিদেশীদের বসতবাড়ী নীচের পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত হয়েছিল। (১) একটি পুণ্ড্রাগার (২) একটি খাবার বাড়ী (৩) সেক্রেটারীর অফিস (৪) একটি পোষাক ঘর (৫) একটি রান্নাঘর (৬) কোম্পানীর চাকরদের ঘর (৭) এজেন্টদের জন্য তিনখানি বাড়ী (৮) রক্ষীর বাড়ী।

অসম্পূর্ণ মাটির সজ্জিত কুঁড়ে ঘরগুলিতেই বেশীর ভাগ লোক বসবাস করতো। একমাত্র পাকাবাড়ী ছিল এই অঞ্চলের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর।

১৬৯৭ সালে বর্ধমানের রাজা বাঙ্গলার নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা, বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত করতে সাহায্য করে ছিল। বিদ্রোহের শেষে ইংরেজ বণিকেরা আশ্রয়কার জন্য প্রত্যাশিত অনুমতি পায়। ফলে সূতানুটি গ্রামের দক্ষিণে একটি কেল্লা গড়ে সামান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে। এই অঞ্চলে বিদেশী বণিকদের উদ্যমে সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয় কেল্লা বা দুর্গ। ১৬৯৮ সালে ইংরেজ বণিকেরা স্থায়ী ফ্যাক্টোরি প্রতিষ্ঠা করে। শুধু তাই নয়, বাঙ্গলার নবাবের বিধিসম্মত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী তিনটি গ্রামও কিনেছিল। তারপর লণ্ডন কোর্ট থেকে শহরের প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা, সার্বিক উন্নয়ন ও নগরে বহিরাগত বসবাসকারীদের

সম্পর্কে উৎসাহ ব্যঞ্জক চিঠি পেত কোম্পানী। ফলে বিরাট সংখ্যক ভারতীয় বণিকরাও সূতানুটিতে বসবাস করতে অনুপ্রাণিত হয়।

তখন ক্রমবর্ধমান শহরের জনসংখ্যার কোন আদমশুমারী হয়নি। কিন্তু শহরের বিস্তার, নাগরিক সংখ্যা, রাজস্ব ও বাজারের আয় প্রভৃতি থেকে তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা বা আঁচ করা অসম্ভব নয়। ঐতিহাসিক নির্দেশিকায় জানা যায়, ইমিগ্রেশন প্যাটার্ন অর্থাৎ শহরের জনসংখ্যায় বসবাসকারি বিভিন্ন জাতির কাঠামো। হুগলী ও ব্যাঙেল থেকে পতুগাঁজ ও অন্যান্য যুরোপীয় বাসিন্দাদের কলকাতায় এসে বসবাস শুরু হয়। বাস্তবিকপক্ষে অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের নবাগত যুরোপিয়ানরা জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়েছিল। জনসংখ্যার আধিক্যে পতুগাঁজদের ভাষা শহরের ‘lingua-franca’ বা প্রধান ভাষা রূপে পরিগণিত হয়। প্রথম যুগে ঐ সমস্ত লোকেরা শহরে কোম্পানী কর্তৃক জাহাজ ও সামরিক বাহিনীতে কেরানী পেশায় নিযুক্ত ছিল।

শহরের ক্রমবৃদ্ধি এবং শহরীকরণের উপাদানের অবস্থান

সূতানুটির দক্ষিণে কলিকাতা গ্রামে প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ করা হয়। ফোর্টের চারিদিক ঘিরেই শহরের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ১৬৯৭ সালে ঐ অঞ্চলের পূর্বতন বসবাসকারীদের মধ্যে চাষী ও মৎস্যজীবী পরিবারগুলি বাধ্য হয়েছিল সূতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস করতে। ফোর্টের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সূতানুটিতে বসবাসকারীরা তাদের বাসস্থান ফোর্টের দক্ষিণ অঞ্চলে সরিয়ে নেয়। এই অঞ্চল ‘টাউন-কলিকাতা’ ও পরবর্তীকালে ‘হোমাইট টাউন’ রূপে খ্যাত হয়। লালদীঘী থেকে পানীয় জলের সহজপ্রাপ্যতা ও রক্ষণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই যুরোপিয়ান বসবাসকারীরা স্থানান্তরিত হয়েছিল। সূতানুটি বাজার ও নতুন শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শহরের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বাণিজ্যিক কেন্দ্রের উপযোগী করে এই রাস্তার (ক্রাইস্ট স্ট্রীট) আরও উন্নয়ন হয়।

অফিস সংস্থার নিযুক্ত ব্যক্তিদের বসবাসের জন্য সমগ্র অঞ্চলের উত্তর দিকে ৩৪০ ফুট, দক্ষিণদিকে ৪৮৫ ফুট, পূর্বদিকে ৭১০ ফুট ও পশ্চিমদিকে ৭১০ ফুট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। ফোর্টের ভেতরের এলাকা বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সংস্থা এই দুইটি সেকশনে ছিল বিভক্ত। প্রধান অফিস এবং কোম্পানী অফিসের কর্মচারীদের বাসস্থান ফোর্ট এলাকার মধ্যেই ছিল। উত্তর সেকশনে ছিল মিলিটারী স্টোর্স, মেডিক্যাল স্টোর্স প্রভৃতি, দক্ষিণ সেকশনে ছিল সরকারী বাড়ী—যার কিছু অংশ ফ্যাকটরীর প্রধান ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ফোর্ট নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পরই “rope walk” ও জাহাজের কোবিন উৎপাদনের কারখানা নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এছাড়াও ফোর্টের একটু দক্ষিণে মিশন রোডে বর্তমান ব্যাঙ্কশাল নির্মিত হয়। আধুনিক সলকাতায় ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট নামে যার স্মৃতি আজও বহন করে আসছে।

ক্রমবর্ধমান শহরের বসবাসকারীদের জীবনে একই সঙ্গে তিনটি জিনিষের অর্থাৎ হাসপাতাল, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জায়গা ও শহরের লোকদের জন্য ‘tavern’-এর চাহিদা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, শহরজীবনে হাসপাতাল ও ‘tavern’ একান্তই প্রয়োজন। কোম্পানীর ঠিক উল্টোদিকে বর্তমান St. John’s গীর্জার কাছে সর্বপ্রথম হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য কেন্দ্রে যুরোপিয়ানদের জন্য ‘tavern’-এর একাধিক লাইসেন্স মঞ্জুর করে। বিশেষত অতিথি ও শহরের লোকদের জন্যেই এই ‘tavern’-এ পাওয়া যেত সাধারণ পানীয়।

বর্তমান রাইটারস বিল্ডিং এর পশ্চিমাংশে গীর্জা নির্মিত হয়েছিল। ১৭০৯ সালের জুনমাসে (St. Anne’s Church) নতুন গীর্জার উদ্বোধন করা হয়। কোম্পানীর ভরফ থেকে কাউন্সিল কলকাতায় ইংরেজদের গীর্জা নির্মাণের জন্য জমি উপহারসহ নগদ ১০,০০০ হাজার টাকা দান করে। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদৌল্লা কলকাতা আক্রমণের সময়ে এই গীর্জাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

শহরের বিস্তার এবং প্রথম যুগে জমি ব্যবহারের প্যাটার্ন

নতুন বসবাসকারী ও ফোর্টের চারদিক ঘিরে অনিয়মিত

বসতি গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে গুটিকয়েক ছিল পাকাবাড়ী। বাড়ীগুলির নির্মাণে কোন প্র্যানের অনুমোদন ছিল না। শহর গঠনে জনসংখ্যা ঘনত্বের রমোচ্চতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সূতানুটি ও গোবিন্দপুরে কিছু ধনী আমলা ও ব্যবসায়ী বাগান বাড়ী নির্মাণ করেছিল।

সূতানুটির (বর্তমান বাগবাজার) উত্তরে মিঃ পেরিন ও গোবিন্দপুরের (বর্তমান কুলীবাজার) দক্ষিণে মিঃ সার-ম্যানের ছিল বড় বাগান। এছাড়াও এই অঞ্চলের উচ্চ আয়ের লোকদের ব্যয়বহুল বসতির সন্ধান পাওয়া যায়।

সাবর্ণ চৌধুরীর কাছারি (লালদিঘি) পুনরুদ্ধার করে তার চারদিক ঘিরে ঘাস, গাছ রোপন ও একটি পার্ক নির্মাণ করা হয়। অতি-জনাকীর্ণ শহরের ভিতরে অবসর যাপনের জন্য পার্ক শহরীকরণের একটি বৈশিষ্ট্য। ফোর্ট ও পার্কের চারিদিকে কেন্দ্র করে একটি ছোট বসতি গড়ে ওঠে। এই হোয়াইট টাউন, পুকুরের উত্তর পূর্ব দিকে পুনরায় বিস্তারলাভ করে এবং তার দক্ষিণাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছিল। গঙ্গা থেকে একটি খাল বসতির দক্ষিণাঞ্চল থেকে লবণ হ্রদের শুরু পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। এই বর্ধিত হোয়াইট টাউন উত্তর দিক পর্যন্ত গিয়েছিল। বর্তমান বড়বাজার এবং মুরগীহাটার প্রায় কাছাকাছি পতুংগীজ ও আরমেনিয়ান কলোনী গড়ে ওঠে। বর্তমান বড়বাজার ঐ সময়ে বাজার-কলিকাতা নামেই পরিচিত ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলের বসবাসকারীরা ক্রমপরিবর্তনশীল ‘settlement pattern’ এর সূত্র ছিল পরিচিত।

১৭০৭ সালে কলিকাতা-গ্রাম বাজার-কলিকাতা ও শহর-কলিকাতায় বিভক্তির সময়ে একটি সমীক্ষা বা অনুসন্ধান করা হয়। বাজার-কলিকাতা (বর্তমান বড়বাজার) এলাকার জমি ছিল ৪৮৮.৫ বিঘা। তার মধ্যে বাড়ী নির্মিত হয়েছিল ৪০১.৫ বিঘা জমিতে। ১৭ বছরে সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে ইংরেজ বসতি ছিল খুব ঘন। নানা ধরনের দোকান ও পণ্যগারের বাড়ীগুলি ছিল প্রধানতঃ কুঁড়ে। এই অঞ্চলে যুরোপিয়ান, পার্শী, মুঘল, আরব, চাইনীজ, আফ্রিকান প্রভৃতি জাতির লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের পেশা ভিত্তিতেই বসবাস করতো।

এই অঞ্চলের বিশেষকরে তিনটি গ্রামে বিহরাগভের প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং এখানের জমি ব্যবহার প্যাটার্ন ছিল শহরীকরণের অনুরূপ। বাজার-কলিকাতা এলাকায় শহরীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম পূর্ণতা অর্জন করে। ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জমি ব্যবহার এবং অকৃষি কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে শহরীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম যুগের শহরীকরণের প্যাটার্ন চেনা যাবে বসবাসকারী এবং জনত্বের প্যাটার্নের তিনটি উপাদান থেকে :

(১) গৃহের ঘনত্বের অনুপাত = ৪০১ : ৪৮৮

(২) নানাবর্ণের জাতির জনসংখ্যার কাঠামো থেকে বহুজাতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

(৩) এই অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব।

ঠিক এই সময়ে শহর কলিকাতা অংশের বাইরে মোট ১,৭১৭ বিঘা জমির মধ্যে ২৪৮ বিঘা জমি বাড়ীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কলিকাতার সমস্ত গ্রামের মোট ২,২০৫ বিঘা জমির মধ্যে ৬৫০ বিঘা জমি বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে কলিকাতার গৃহের ঘনত্ব ও জনসমাকীর্ণতা সূতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের চেয়ে কম ছিল। ১৬৯২ বিঘার মধ্যে ১৩৪ বিঘা জমি বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তিনটি গ্রামের গৃহের সমাকীর্ণতা কিংবা গৃহ-জমির অনুপাত নীচে দেওয়া হলো :

কলিকাতা ৬৫০ : ২,২০৫ কিংবা ১ : ৩.৪

সূতানুটি ১৩৪ : ১ ৬৯২ „ ১ : ১২.৬

গোবিন্দপুর ৫৮ : ১,১৭৮ „ ১ : ২০.৩

মোট ৮৪২ : ৫,০৭৫ „ ১ : ৬.০২

সুতরাং বলা যায় এই অঞ্চলের জমি ব্যবহারের প্যাটার্ন ছিল প্রায় ও কৃষিভিত্তিক। তিনটি গ্রামের মোট জমির বেশীর ভাগই কৃষিতেই ব্যবহৃত হতো। প্রায় অর্ধেক জমিতে ধান, তুলা, তামাক, সবজী প্রভৃতির চাষ হতো। এমনকি শহর কলকাতায় যেখানে যুরোপিয়ান বসতি গড়ে ওঠে সেখানেও ৪৯৬ বিঘা জমিতে ধান ও ৭৭ বিঘা জমিতে সবজীর চাষ হতো। এছাড়াও প্রত্যেক গ্রামকে ঘিরে ছিল পর্যাপ্ত পড়ে জমি ও জঙ্গল।

প্রথমযুগে মাটির ফুঁড়ে ঘরে গ্রাম্য পরিবেশেই বসতিগুলি গড়ে ওঠে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকেই ক্রম-

বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই শহরের বৃদ্ধির ঘটে। নীচের উপাদানগুলি শহরের বৈশিষ্ট্য গঠনের পক্ষে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(১) দুর্গ নির্মাণ এবং পরিষ্কৃপনা মাফিক গৃহ নির্মাণ।

(২) দুর্গের চারিদিক ঘিরে বসতি স্থাপন।

(৩) ব্যাকশাল নির্মাণ, নগরখানা স্থাপন, নদী সৈকতে 'wharves' ও পাইলট সার্ভিস।

(৪) পার্ক নির্মাণ, সার্বজনীন হাসপাতাল ও গুটিকয়েক 'taverns'-এর পত্তন।

(৫) সূতানুটি ও টাউন-কলকাতার বাজার এলাকায় জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ও অকৃষি কার্যকলাপ।

(৬) ক্রমাগত জনসংখ্যার অন্তঃপ্রবাহ, নাগরিক কর্মব্যস্ততা এবং রক্ষণ ব্যবস্থা।

(৭) হাতে পাকানো সুতোর উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়কে ভিত্তি করে শিম্পায়ন গড়ে ওঠে—যা ভবিষ্যৎ শহরীকরণের অর্থবহ ইংগিত।

শহরীকরণের সূচকসংখ্যা

শহরের গঠন এবং তার বৃদ্ধি যে কোন অর্থনৈতিক স্থানের গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতি উন্নয়মান অবস্থাগুলি কোন বিশেষ স্থানে সংগঠিত বা কেন্দ্রীভূত হলে তখন সেই পর্যায়কে 'functional pole system' বলাযো। বর্ধিত হারে খাজনা, কর, দাম এবং (১) ব্যবসা-বাণিজ্য (২) শিম্প (৩) পরিবহন ও যানবাহন (৪) যোগাযোগ (৫) নির্মাণ (৬) সার্ভিস প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের বৃদ্ধির লক্ষণ বুঝা যায়।

উপরের কার্যকলাপগুলি প্রথমযুগের কলকাতার অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে হওয়াতে এক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিসর বৃদ্ধিলাভ করে। ফলে গ্রাম্য এলাকাগুলি শহরে বৃদ্ধান্তিত হয়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের চাপে শহরগঠন ও উন্নয়ন কেন্দ্র বিন্দুর প্রতিফলন এই অঞ্চলে শহরীকরণের সূচনা করে। শহরীকরণের উত্তম সূচক হল শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব।



বিগত অধঃশতাব্দী : বাংলার সমাজচিত্র

রণজিৎ কুমার সেন

বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলার সমাজচিত্রকে মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমভাগ ১৯০৩-১৯০৪ থেকে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত প্রায় পনেরো বছর; এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা কাল থেকে ১৯৮০-৮৪ পর্যন্ত মোট পঁয়ত্রিশ বছর। গান্ধীজীর লবণ আইন আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩০-এ, তার জের চলে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে ফলবতী ক'রে তোলা। তখনও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী যথেষ্ট জোরের সঙ্গে সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। যদিও '২৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তার উল্লেখ ছিল। এই কালের মশোই বাংলার প্রবলভাবে দেশা দেয় সন্ত্রাসবাদ। ঢাকা আর্মারী কেস, চট্টগ্রাম অজ্ঞাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদের যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে মাস্টারদা সূর্য সেনের রণকুশলী আক্রমণ ও গ্রেপ্তারবরণ ও এবং পরিণামে ফাঁসিকাঠে প্রাণবিসর্জন যেমন ছিল বাংলার সমাজজীবনের এক বিপ্লবী চিত্র, তেমনি সেই চিত্র সম্প্রসারিত হয়েছিল বরিশালে, মোদিনীপুরে ও কলকাতার রাইটসের অলিম্ফযুদ্ধে। বিনয়, বাদল ও দীনেশের আত্মবলিদান ছিল বাংলার বিপ্লবী যুবমানসের ঐতিহাসিক নিদর্শন। বৃহত্তর ভারতের ক্ষেত্রে মীরাট ষড়যন্ত্র, গদর-

বিপ্লবের প্রসুপ্তধারা ও পরবর্তী সময়ে নোবিদ্রোহ প্রভৃতির উৎস ছিল একটাই, তা হচ্ছে ইংরেজের হাত থেকে ভারতের স্বাধিকার ফিরে পাওয়া। একদিকে গান্ধীবাদী অহিংস বিদ্রোহ, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ—দু'টি মিশ্র রাজনৈতিক আদর্শ তখন এদেশের যুবজীবনে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৫-এ এলো শাসনসংস্কার এবং ১৯৩৭-এ দেখা দিল সংগঠিত মুসলীম জাগরণ। দেখা দিল কম্যুনাল এয়য়ার্ড। এই একই দেশের বুকে দাঁড়ালো দুই বিরোধী রাজনীতি : হিন্দু ও মুসলীম। পিছন থেকে ইন্ধন যোগালো ইংরেজ। তারা দেখলো—অনুন্নত মুসলীম সম্প্রদায়কে হিন্দুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারলে এদেশে তাদের কায়মী স্বার্থ দৃঢ় হবে। ফলে পৌত্তলিক হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের নানা দাবী উঠলো। হিন্দু-প্রভাবিত কংগ্রেসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো মুসলীম লীগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম 'শ্রী ও পদ্ম' হিন্দু-পৌত্তলিকতার নিদর্শন হিসেবে মুসলীম লীগের চাপে বর্জিত হলে, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামের গোড়া থেকে 'শ্রী' বর্জন করলেন। বাংলার শ্রীহীনতার একটা বিষাদময় চিত্র স্পষ্ট চোখে ভেসে উঠলো। এই প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই দেশের সমাজজীবন ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। রাজনীতি সমাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছু নয়।

যখন ঐ সময়ে জনগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি তখন আমরা একটি অন্য ধরনের সূচক

ব্যবহার করবো অর্থাৎ বাড়ী-জমির অনুপাত বা গৃহ অতি-জনাকীর্ণতা।

নির্দেশিকা :—

1. Ray, Biswanath : "Calcutta : A Study".
Bulletin of the Socio-economic Research Institute, Calcutta, vol. 5, No. 1 & 2, 1971 pp 35—39.
2. Calcutta : A study in urban growth dynamics Calcutta, 1972.

3. Roy, A.K. A Short History of Calcutta, vol II, Part II, Calcutta, 1902.
4. Wilson, C.R.: Old Fort William in Bengal : A Selection of Official Documents dealing with its history. Vol. I London, 1906.

কিন্তু তা সত্ত্বেও আর একটি বৃহত্তর শাস্ত্র চিত্র ছিল। তা হলো এদেশের সাধারণ মানুষের প্রথাসিদ্ধ ও চির-অভাস্থ জীবনযাত্রা। পাল-পার্বণ, উৎসব ও লোকাচারে মিশ্রিত নববর্ষ, ইতু-তুযু-গিনাথ-ওলাইচণ্ডী-কালী-শিবরাত্রি-রথযাত্রা জন্মাষ্টমী-শীতলা-মনসা-দুর্গোৎসব-গাজন—কোনো কিছুই যেমন থেমে ছিল না, তেমনি থেমে ছিল না মহরম-সবেবরাত-ইদুজ্জোহা ও ইদুলফেতর। শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধারাও পাশা-পাশি চলেছে। ব্রাহ্মসমাজ তখন আন্দোলনহীন সাম্প্রতিক মন্দির-উপাসনা ও মাঘোৎসবে নিজেকে সংস্থিত রেখেছে। কিন্তু গ্রিশের দশকেব শেষাংশে মার্ক্সীয় দর্শনের ভিত্তিতে সমাজবাদ বা সাম্যবাদের সন্তুপিত গুঞ্জন উঠলো। বুদ্ধিজীবী মহলে। তার মূল আদর্শভূমি বলশেভিক রাশিয়া। এই দশকেরই গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ ক'রে তার উপর গ্রহ প্রণয়ন ক'রে বাঙালী পাঠকের বোধের জগতে একটা বিরাট আলোড়ন আনেন। জওহরলালের রুশযাত্রারও তেমনি প্রতিফলন ঘটেছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে। বাংলায় বঙ্গমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' মতো রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' যেমন শিক্ষিত সমাজে রাজনীতি-চেতনা সঞ্চার করেছিল, তেমনি নবজাগরণে উদ্বোধিত করেছিল চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশীয়তা এবং রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত ও কাজী নজরুল প্রমুখ বিভিন্ন কবির দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গদেশে শুধু অবিভক্ত ভারতের অঙ্গমাত্রই ছিল না, ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বঙ্গদেশের ভূমিকা ছিল মুখ্য। সেই ভূমিকায় সংস্কৃতির এমন ক্ষেত্র ছিল না—যেখানে নেতৃত্বের মণ্ডে ছিলেন না ভারতগৌরব মহাপ্রাণ বাঙালী ব্যক্তিত্ব। গোথলের কণ্ঠে তাই সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল : 'What Bengal thinks to day, India thinks tomorrow.' সংস্কৃতির অন্যতম বাহন সংবাদ ও সাময়িকপত্র, অর্থাৎ Press. মুদ্রণশিল্পে এবং সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশনে বাঙালীর অগ্রগতি ছিল সেদিন লক্ষ্য করবার মতো। শুধু সংস্কৃতি প্রচারই নয়, সংবাদপত্রের মাধ্যমে গোটা দেশের মানসিকতাকে তুলে ধ'রে তার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ

করা হয়েছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—তারই অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিল মাত্র অন্যান্য প্রদেশবাসী। হিন্দু মেলা ও অন্যান্য স্বদেশী মেলা প্রবর্তনের পিছনেও ছিল সেই জাতীয়তাবোধ। নানা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিক্ষাসম্প্রসারণও ছিল সেদিন বাঙালী কর্মচারার অন্যতম একটি দিক। ফলে সারা ভারতের শিক্ষিতের হারের দিক থেকে বাঙালী-শিক্ষিতের হার ছিল মাত্রাধিক। তৎকালীন আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীরা শুধু নিজ ভূমিতে নয়, ভারতের যে-অঞ্চলেই গেছেন, গড়ে তুলেছেন নানা উন্নয়নমূলক ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এমনি করে প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন', উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে 'প্রবাসী' পরিবর্তিত করে করা হয় 'নিখিল ভারত'। এই সময়ের অবকাশে যে সব সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাদের মধ্যে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ', 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ', 'লিটল থিয়েটার' এবং 'প্রান্তিক শিল্পী সঙ্ঘ' প্রধান। যাত্রাগানের প্রসার ও নবনাট্য আন্দোলনও পাশাপাশি ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে মুসলীম লীগ রূপ নিলেও সাধারণ মুসলমান ও সাধারণ হিন্দুর ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য তখন খুব একটা বড় আকারে দানা বেঁধে ওঠেনি। হিন্দুর রথযাত্রায় বা দুর্গোৎসবে এবং মুসলমানদের সত্যপীরের সিম্মীতে বা ঈদ-মোবারকে উভয়প্রণীর প্রীতি-আলিঙ্গন অব্যাহত ছিল। এখনও তার বহু নিদর্শন ইতিহাসসিদ্ধ হয়ে আছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের চক্রান্ত এদিক থেকে মুসলমান সমাজকে যত তিস্ত করে তুলেছে, এমনটি অন্য কোন সম্প্রদায়কে নয়। কিন্তু একথা ভুললেও চলবে না যে, হিন্দুর মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানসমাজ কোনোকালে ছিল না। মুসলমানদের মসজিদ মুসলীম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চিরকাল যেমন উদ্যোগী ও ক্রিয়ামূলক, হিন্দুর কোনো দেব-দেউল হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করতে সেখানে কোনো দিনই কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের উদারতা বা ওদাসীন্যই হিন্দুসমাজের ক্ষতির কারণ। সেটা দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন

ঘটনায়। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই দাঙ্গার অগ্রভূমিকা হিন্দুর নামের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সম্ভবন্ধ হিন্দুশক্তির পরিচয় কোথাও সুস্পষ্ট নয়। রাজ-নীতির বাইরে তখন ইংরেজ-শাসনাবধীন এ দেশীয় সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল মোটামুটি অনাড়ম্বর। টাকার মূল্য ঊর্ধ্বমুখী থাকায় পণ্যের বাজার ছিল ভার-সাম্যগ্ৰস্ত। '৩২, '৩৪ কি '৩৬, '৩৮ সালে একমণ চালের দাম ছিল দু' টাকা থেকে তিন টাকা। একখানি উৎকৃষ্ট শান্তিপুরী ধুতির দাম ছিল বারো আনা থেকে এক টাকা মাত্র। মাত্র হলেও তখনকার চৌষট্টি পয়সায় টাকার হিসেবে সেই ছিল বিরাট দামী। এক সের রসগোল্লা পাওয়া যেতো বোল পয়সা বা চার আনায়। তখন পাই, আধলা ও ডবল পয়সাও বাজারে প্রচুর চালু ছিল। পাই-পয়সাতেও ক্রয়মূল্য বিনিময় হতো। শীতকালে দুধের সের নেবে যেতো তিন পয়সায়, চড়তে চড়তে বর্ষায় গিয়ে দাঁড়াতো খুব বেশী হলে দশ পয়সায়। ঘি, দুধ, মাছ, ভাত—এ নিত্যস্ব গরীব যে, তারও পাতে কখনো অভাব ঘটতো না। তাতে ভেজাল ছিল না। মানুষের নৈতিক অধঃপতন ছিল, কিন্তু তা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না, ফলে তা ব্যাপক আকার নিতে বাধাপ্রাপ্ত হতো। চুরি ছিল, খুন ছিল—তও সীমিত সংখ্যক। ফলে সমাজের উপর তার প্রভাব ছিল সামান্য। জনসংখ্যানুপাতে বেকার সমস্যা ছিল, কিন্তু তা নিয়ে কোনো সংসার নিরন্ন হতো না, কারণ গৃহীর আয় যত সামান্যই হোক, তার মধ্যে একটি যৌথ পরিবার মোটামুটি শান্তিতে খেয়ে-পরে কাটিয়ে দিতো। বেশ-ভূষা ছিল সাধারণ, ধূতি-জামা ও চাদরে রপ্ত ছিল সকলে। ওভার-শিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার বা পুলিশসুপার তখন থাকি হাফ-প্যান্ট পরতে অভ্যস্ত ছিলেন; ফুলপ্যান্টের খুব বেশী রেওয়াজ ছিল না। ইংরেজ রাজত্বে এদেশের মানুষ এদেশীয় পরি-ধানেই সুখী ছিল, আর সেই সুখ ছিল পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সমতাময়। ১৯৪৬-এর গোড়া পর্যন্ত এইভাবে একটা সামাজিক মানসিকতার ঋক ছিল এদেশ। তাতে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির যেমন পরিষ্করণ ঘটতো, তেমন ছিল পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি।

সম্প্রদায়গতভাবে তাতে প্রথম আঘাত করলো ১৯৪৬-

এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এ দাঙ্গা প্রযোজনা করেছিল মৈদিন কিছু ধরকার মুসলীম লীগ নেতা। তার মূলে ছিল এদেশে পাকিস্তান কামের করা। শ্লোগান ছিল—লড়্কে লেঙ্গে পাকিস্তান। পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা তখন প্রাণের ভয়ে ছুটতে শুরু করলো এখানে ওখানে এবং কলকাতায়। কিন্তু এই কলকাতাও প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। '৩৯ সালে যুদ্ধ বাধলেও এদেশ আক্রান্ত হলো '৪২ থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ও সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান মানুষের মননক্ষেপে দাবুণ আঘাত হানলো। সেই আঘাতের মধ্যেই দেখা দিল মহাযুদ্ধের সন্ত্রাস। বিশ্বযুদ্ধ এমনই একটি বিষয়—যা মানুষের স্বাভাবিক ভাবনাগুলিকে ও সামাজিক মূল্য-বোধগুলিকে পাল্টে দেয়। সেই পরিবর্তনের ডেউ এসে আছড়ে পড়লো এদেশে। যুদ্ধের ফলে একদিকে এলো মুদ্রাস্ফীতি, অন্যদিকে বাজার হয়ে উঠলো আক্রান্ত। এবং এই সুযোগে ইংরেজপুষ্ট একশ্রেণীর ধনিকের চক্রান্তে সারা দেশে এলো দুর্ভিক্ষ। নেই দুর্ভিক্ষের চিত্র অবর্ণনীয়। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হলো, পরিবারে ধরলো ভাঙন; অবিশ্বাস, সন্দেহবাদ, বিদ্বেষ ও ভেজালে ছেয়ে গেল দেশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে '৪৬-এর দাঙ্গা সমাজ-দেহে যে আঘাত হানলো, সে-আঘাত সহ্য করবার মতো শক্তি ছিল না মানুষের। '৪২ সালে গান্ধীজী প্রবর্তিত 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনে সারা দেশ যেভাবে জেগে উঠেছিল, তা যেন হঠাৎ কেমন স্তিমিত হয়ে গেল! বঙ্গদেশ থেকে 'ইভাকুইজ'দের দলে দলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আগমন, '৪৩-এ দুর্ভিক্ষ, '৪৪/'৪৫-এ নেতাজীর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, এবং '৪৬-এর দাঙ্গা বাংলার সমাজজীবনে যে প্রতিপ্রেক্ষার সৃষ্টি করে, তার ফলে মানুষের জীবনযাত্রা খুব দ্রুত পাল্টে যায়। তবু প্রত্যাশা ছিল—মানুষ স্থিতধী হবে, প্রাচীন মূল্যবোধে ফিরে আসবে মানুষ, সহনশীলতা ও বিশ্বাস নিয়ে পাশাপাশি বাস করবে হিন্দু ও মুসলমান। কিন্তু রিয়ার্ডক্রফ রোয়েদাদে ভারত বিভাগ এবং তারই ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা সেই প্রত্যাশার মূলে কুঠারাঘাত করলো। পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার স্থলিত নক্ষত্রের মতো

এসে ছিটকে পড়লো পশ্চিমবঙ্গে। এখান থেকেও বহু মুসলমান পরিবার সরে পড়লো পাকিস্তানে। পাকিস্তানের যে-অংশে পূর্ববাংলা, সেখানে হিন্দু ও মুসলমান চিরকাল বাঙালী হিসেবেই বাস করতো; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিষয়ে তার মূল হলো উৎপাটিত। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হাতে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের নারীরা হলো ধীষতা ও পরিবারগতভাবে অনেকেই খুন হলো দিনের পর দিন। যারা পারলো, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলো পশ্চিমবঙ্গে। উদ্বাস্তু হিসেবে তাদের কারুর বা স্থান হলো লজরখানায়, কারুর বা পথে ফুটপাথে। যারা কিছুটা সঙ্গতিসম্পন্ন, তারা কেউ পোড়ো জমি জবরদখল করে নতুন করে ঘর বাঁধলো, কেউ ভাড়াটে হয়ে বাস করলো এখানে-ওখানে। বাড়িওয়ালাদের তখন মন্ত সুযোগ। একতালের ৫০ টাকার ফ্ল্যাটের ভাড়া চড়লো ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায়, তার সঙ্গে সেলামী ও অগ্নিম। ফলে একশ্রেণীর মানুষ উঠলো দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে, আর একশ্রেণীর মানুষ হলো ক্রমিক শোষণের শিকার। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত এই ইতিহাসই এখানকার প্রকৃত বাস্তব চিত্র।

এই চিত্রের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পর্বের উন্মোচন। এই পর্ব যেমন সমৃদ্ধির, তেমনি অবক্ষয়ের। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ও স্বাধীনতাই সেদিন সৃষ্টি করেছিল অবক্ষয়ের। অখণ্ড বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে পূর্ববাংলা বা পূর্বপাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু হলো উদ্বাস্তু। তাদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, তন্তুজীবী, ধীবর, তাঁতি, ঢাকি, মাল্যকার স্বর্ণকার, বাজুকার, শিম্পী—সকল শ্রেণীর মানুষই ছিল। তাদের শ্রমে যেমন এখানকার অনুন্নত ফলন ও গড়ন নতুন রূপ পেলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনসংগ্রামও দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠলো। দীর্ঘকালের একটা সুসংবদ্ধ জীবনযাত্রায় ভাঙন ধরলে যা হয়, তার চেয়ে অধিক ভাঙনে নেমে এলো দেশবিভাগের অভিশাপ। মানুষকে এখানে এসে যে-পরিবেশে বাস করতে হলো, সেটা কোনো দিক দিয়েই তাদের পক্ষে সুস্থ পরিবেশ নয়। একদিন যাদের গোয়ালে গরু ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, ক্ষেতে ফসল ছিল, চৌকিশালে ঢেঁকি ছিল, ছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ,

এখানে এলো তারা নিঃশব্দ ও নিঃসম্মল হয়ে। যে সংস্কৃতির ধারক ছিল তারা, এখানে এসে তার বিকাশের মুখ হলো বন্ধ। অন্যদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা গেল অসঙ্গতি, নোংরামি ও বিভিন্ন দলের পারস্পরিক কোন্দল। অফিস-আদালত হলো ঘুষের ক্ষেত্র। দিনে দিনে এখানে নতুন প্রজন্ম যারা এলো—তারা এলো এই সার্বিক নীতি-বিবর্জিত নোংরা রাজনীতি ও কুৎসিত সামাজিক পরিবেশে। শিক্ষার কোনো মান রইল না, শিষ্টাচারের কোনো বালাই রইল না। কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ রইল না, নিয়মানুবর্তিতা সম্পূর্ণ নিষ্কিহ হলো, বেকারের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে কয়েক লক্ষে দাঁড়ালো। দেশীয় নেতারা স্বপ্ন দেখলেন Socialistic Pattern of States-এর—যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। পশ্চিমবঙ্গ ক্রমে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলো। নানা রাজনীতিক দলে বিভক্ত হয়ে গেল মানুষ। বাঙালী হলো লাঞ্চিত, ঘৃণিত। যে বাঙালী একদিন দেশে রাজনীতির জন্ম দিয়েছে, স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে ধর্মে-জ্ঞানে-শিল্পে-সাহিত্যে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে দেশকে পথ দেখিয়েছে, সেই বাঙালী শুল্ক নিষেধের প্রদেশেই পরবাসী হলো না, বিতাড়িত হতে লাগলো আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা থেকেও। অখচ বঙ্গাল-খেদা আন্দোলন কিন্তু কোন স্থিতিশীল বাঙালীর মনকেই স্পর্শ করলো না। এই 'Isolated' মনোবৃত্তিই ক্রমে বাঙালী থেকে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করে তুললো। পরবর্তীকালে এই বিচ্ছিন্নতাবাদই দেশে প্রবলভাবে নানা দিক দিয়ে দেখা দিল। যে পাকিস্তান ভারত থেকে বেরিয়ে গেল, সেই পাকিস্তানই ভারতের বিরুদ্ধে দু'বার আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো '৬২-তে ও '৭১-এ। '৭০-৭১-এর যুদ্ধ আরও জটিল হলো। পূর্ববাংলা তথা পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানেরা দেখলো—তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনীতে মাত্র পর্যবসিত। তারা তাই স্বাধিকার চেয়ে আত্মশক্তিতে জেগে উঠলো। তাদের সর্বাত্মক দমনে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী শুরু করলো গণ-হত্যা। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসে আশ্রয় নিল পশ্চিম-বঙ্গে। পূর্বপাকিস্তানের অসহায় বাঙালী মুসলমানেরা চাইলো ভারতের সাহায্য। ভারত তাদের ফৌজী সাহায্য

দিনে প্রতিষ্ঠিত করলো নতুন বাংলাদেশ। পূর্বপাকিস্তান হলে: বাংলাদেশ। ঐকমিক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে বাংলাদেশ দিনে দিনে ভারতের সঙ্গে নৈতিক বন্ধুত্বের সীমা লঙ্ঘন করে ক্রমে ভারতবিশেষে লিপ্ত হলো। রাজনীতির কি অস্তুত খেলা! এই উপমহাদেশে এক ভারতবর্ষ তিনটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো। ভারতীয় তথা বঙ্গ-সমাজে এর প্রভাব সুখকর হলো না। অন্যদিকে '৬৯-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নৃশাল আন্দোলন এক তীব্র সম্মার্সের সৃষ্টি করলো। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে মানুষের নৈতিক মান ক্রমেই ধ্বংসে যাচ্ছিল। বিশৃঙ্খলার সুযোগে ছাত্র ও যুবসমাজে এলো অরাজকতা, শিক্ষাক্ষেত্রে এলো নৈরাজ্য, শাসনক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের যথেষ্টাচারিতা প্রবল হয়ে উঠলো, নৈতিক মূল্য হাস পেয়ে বাজারের দ্রব্যসামগ্রী হলো অগ্নিমূল্য। তার মতোই আহারে ও বেশ-ভূষায় বিজ্ঞাতীয় লোভের মায়া গেল বেড়ে। অপরদিকে দিনের পর দিন ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, খুন, লুণ্ঠন, চুরি, আগলিং, ধোঁরাও, ধর্মঘট, লক-আউট, লে-অফ, ছাত্র-অসন্তোষ, সমাজবিরোধীদের দৌরাডা, নিদারুণ অর্থসঙ্কট, খরা, বন্যা প্রভৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের গোটা সমাজব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ভারতসরকার যে জবুরী অবস্থা ঘোষণা করলো তার দ্বারাও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নানাভাবে নিগৃহীত ও বিপর্যস্ত হতে লাগলো। পরিবার পরিকল্পনার নামে শুরু হলো জ্বরদস্তি। মিসায় বিনা বিচারে বন্দী হলো নানা সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ। সেন্সরশিপ প্রয়োগ করে বহু সাহিত্য ও সাহিত্যপত্রের স্বাধীন মতামত রোধ করা হলো। হাহাকার উঠলো সংস্কৃতি জগতে। সেই সঙ্গে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত মরিচকাপির উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচার, কলকাতায় আনন্দমার্গীদের পিটিয়ে ও পুড়িয়ে মারা, ঝাড়খণ্ডীদের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবী, ষ্টিদরপুর ডকের ডি. সি-হত্যাকাণ্ড ও মস্তানী অত্যাচার, নার্সের শ্রীলতাহানি ও প্রাণনাশ প্রভৃতি মর্মান্তিক ঘটনাবলীও এই বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনকে কলঙ্কিত করতে বাকী রাখলো না। এই চিত্রই কম-বেশী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক চিত্র। এই ভাঙনের পথে শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতিও অবক্ষয়ের রূপ ধারণ করলো। কিন্তু একপ্রণীর বুদ্ধিজীবী চাইল সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দেশের অপসংস্কৃতির বিলোপ সাধন করতে। ইতিমধ্যে কলকাতায় গত কয়েক বছরের

নানা শহরকেন্দ্রিক গ্রন্থমেলা, চিত্রপ্রদর্শনী, যাত্রা, গ্রুপ-থিয়েটার ও চলচ্চিত্র উৎসব প্রভৃতিতে নব-সংস্কৃতি-বিকাশের একটি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার দ্বারা সামগ্রিক সামাজ্যচিত্রের উন্নতি প্রকাশ পায় না। সরকারী বাজেটে নানা কর ধার্য হয়ে ও যানবাহন প্রভৃতিতে বাড়তি ভাড়া প্রযুক্ত হচ্ছে পণ্যের মূল্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। যদিও এদেশে ইতিমধ্যে মাস্ক্রবাদের প্রসার বেড়েছে, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে মাস্ক্রের দর্শন অধিকাংশ মানুষ উপলব্ধি করতে পারেনি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যদিও বারো-ক্রাশ পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন, এবং বেকারভাতা, কৃষকভাতা, বিধবাভাতা প্রভৃতি প্রচলন করে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদী মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু এই অনুদানের সুফল সমাজের সর্বস্তরে গিয়ে পৌঁছাতে না। অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব লোডসেজ প্রভৃতির ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উৎপাদনক্ষেত্র দারুণভাবে মার খাচ্ছে। খেলার স্টেডিয়াম, বাসকটাও প্রভৃতি গড়ে উঠলেও কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের অভাবে এখানে হলুদিয়া থেকে শুরু করে বৃহত্তর নানা শিল্প গড়ে ওঠার অভাবে ও নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে এখানকার অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়েছে। সম্প্রতি পূজা উৎসব প্রভৃতি যেমন বেড়েছে, তেমনি মন্দা দেখা দিয়েছে বিদ্যানুশীলনে ও চর্চায়, শৈথিল্য এসেছে কর্মে। সত্যের অপলাপ, মিথ্যাচার, শ্রদ্ধা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘৃষ, ভেজাল প্রভৃতি সর্বস্তরে বিরাট আকার নিয়েছে। জমির ফলন বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ফলনের মূল্যমান সাধারণ মানুষের ধরাছোয়ার বাইরে। পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রাম-বাসস্থার আংশিক উন্নতি হলেও গ্রামসমূহের মর্মের স্থল এখনও ফাঁকা ও শূন্য। আমরা আপাতদৃষ্টিতে বাইরে থেকে দেশের যে চিত্র দেখতে পাই, সে-চিত্রের সঙ্গে সমাজের আস্তর-চিত্রের খুব একটা মিল নেই। সেই মিলকে খুঁজে পেতে হবে। এদেশকে এই দেশেরই চিরন্তন আদর্শ নিয়ে নতুন করে গড়ে উঠতে হবে। নানা সম্বন্ধে এই বাংলার হাড় ও মজ্জা ভেঙেছে ও খেঁচলেছে; তাকে নৈতিক অস্ত্রোপচার করে রক্তে মাংসে সজীব করে তুলতে হবে। তার জন্যে চাই অজস্র আদর্শবান মানুষ। সেই মানুষেরই আজ শুধু অপেক্ষা।

(আলোর ধারা—১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

না। এদিকে বিকেল হলে আসছে আর আকাশও কালো হয়ে এলো। কোন আশ্রয় নেই আমাদের তিনজনের। শীর্ণ দেহীকে কি যেন খাওয়ালো মহিলাটি। ধীরে ধীরে উঠে বসছে। কিন্তু আর সময় নেই। প্রচণ্ড হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষার পড়তে লাগলো। বৃষ্টি আর রক্ষা হলো না। এই বরফের তলাতেই জমে থেকে শেষ পর্যন্ত জীবাস্থ হতে হবে। মাগের নাম করতে করতেই চৈতন্য লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কবে জ্ঞান হলো জানি না। কারণ তারিখও সময়ের হিসেব আর নেই। দেখি শুলে আছি একটা কাঠের কুঠিয়াতে। চোখ মেলতেই দেখি একজন প্রবীণ বলিষ্ঠ পুরুষ হাতে একটা ছোট ফল, আমার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, ‘খা লেও বেটা। আরাম হোগা।’ না মিষ্টি, না তেতো, কষায় আছে খানিকটা। ফলটি টপ্পারির মতো দেখতে। ওটি চিবিয়ে খাবার কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম গা গরম হয়ে উঠছে। উঠে বসে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় এসেছি আমি। বয়স্ক পুরুষটি বললেন, তুমি তো তোমার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। এক মায়ী তোমাকে রক্ষা করেছেন। ডাকলেন ‘এ মায়ী ইধর আও।’ দেখি সেই প্রবীণা মহিলা ধীর সঙ্গীকে আমি রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলাম। তিনি কাছে আসতেই আমি বিস্ময়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম। আবার চেতনা হারালাম। অতলে তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে শুনতে পেলাম, ‘ডেরো মং বেটা, ইয়ে বাবা তুঙ্গনাথজীকা স্থান।’ চেতনা ফিরে এসেছিল তখনই কিনা জানি না। শুনতে পাচ্ছি এক কণ্ঠস্বর—এই দেহের মধ্যেই পাবে মহাশ্মশানকে। হাড়, মাংস, মেদ, মজ্জা দিয়ে তৈরী তোমার এই দেহের মধ্যে ঐ দেখ চিতা জ্বলছে। দেখ মরে গেছ তুমি, তোমার দেহটাকে নিয়ে শেয়াল-শকুণ ছিঁড়ে খাচ্ছে। ঐ দেখ জীবন্ত মহাক্ষুধা প্রচণ্ড মুখ ব্যাদান করে সব গিলে ফেলছে। একমাত্র সত্য সেই মহাশক্তি। তার কোন নাম নেই, গোত্র নেই, শ্রীল অঙ্গীলের বাইরে, সং-অসত্তের ওপারে।

দেখলাম কার যেন অঙ্কার চুলের রাশি সামনে ঝুলছে। সেই চুলের অধিকারিনীকে চিনতে পারছি না। মুখখানা রাশিকৃত চুলের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে। অনেকক্ষণ বাদে

কালো কেশের মাঝখানে ফুটে উঠলো একখানা মুখ। কি তার বর্ণনা দেব জানি না।

রাত্রি দিন ঘুচে গেছে। তার কোন অর্থই হয় না এখানে। প্রতি মুহূর্ত, প্রতি পল যেন মহাকালের নৈঃশব্দ্য ইচ্ছিত বহন করে চলেছে। চোখ মেলে তাকালাম। কোথাও কেউ নেই। আমি একা একটা পাথরের উপর শুলে আছি। মাথার উপরে নীল আকাশ। মনে হলো দেহে কোন ক্রান্তি নেই। উঠে দাঁড়ালাম। পিছনে গগনচুম্বী মহাহিমবস্তুর অসংখ্য শিখরচূড়া। যতই এগোছি ততই নিরিবির্ভল হয়ে যাচ্ছে সব। বাতাসে হিমাদ্রী স্পর্শ। কৌন্দিক দিয়ে যে যাবো তা বুঝতে পারছি না। একটা মানুষ দেখছি না যে জিজ্ঞাসা করবো তুঙ্গনাথ মন্দিরে যাবার পথ কোথায়! আমি সৌখিন ভ্রমণবিলাসী নই যে সঙ্গে কুলি থাকবে, গাইড থাকবে। বেরিয়েছি গুরুর নির্দেশে অচেনা জায়গাতে নিজের স্থানটুকু করে নেবার জন্যে। খাদের দিকে তাকালে জ্বলম্বল হয়। আমার চলার পথ সরু হয়ে একে বেকে চলে গিয়ে নীচের দিকে গিয়ে যেন হারিয়ে গেছে মনে হলো। লতায় ছাওয়া নিরিবির্ভল পথ। দেখছি কোথাও স্বাভাবিক গুহা রয়েছে। তার সামনে ফুল ফুটে আছে অপূর্ব বৈচিত্র্য নিয়ে। আকাশে টুকরো মেঘে সোনার বর্ণ। হরমুখের তুষার-কিরীটে সোনার আভা জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু আমি হারিয়ে গেছি। সঙ্গে একটি ছোট খাবারের পুর্টল দেখেছিলাম। কোথায় কিভাবে তা পেয়েছিলাম জানি না। তা থেকে একটি ঘৃতপক্ক পুরী আর একটি লাভু খেতেই পেট ভরে গেল। লাভুটির আকার এমন কিছু বড় নয়, কিন্তু পাকস্থলীতে গিয়ে জলস্পর্শে যেন ক্রমেই বতুলাকার হচ্ছে। খিদের ব্যাপার চুকলো। এবার ভাবনা রাতের অঙ্কারকে। ভাবছি পথে যখন বেরিয়েছি তখন মা একটা ব্যবস্থা করবেনই। এই হিমালয়ের গহনলোকে ভগ্ন জরাজীর্ণ পাথরের অন্দরে কন্দরে বয়ে যাচ্ছে উদাসী বাতাস। তাতে বাতাস নয়, প্রাচীন ভারতের দীর্ঘশ্বাস। শেষ পর্যন্ত ওরই একটি কন্দর বেছে নিতে হলো বিশ্রামের জন্যে। কলকাতার রাস্তায় খোলা আকাশের তলায় যারা শুলে থাকে, তাদের দেখে ভাবতুম, কি করে থাকে।

এখানেও ঠিক ভেমনি মনের ভাব হলো। রাত্রির সবচেয়ে ভয় সাপ আর বিছে। ভালভাবে দেখে শুনে একটি কম্পর বেছে নিলাম।

রাত নেমে এলো হিমালয়ের বুকে। তার তাতে কি এসে যায়। ঐ মৌনী ধ্যানমগ্ন তাপসের কাছে কালাকাল তুচ্ছ। বাতাস তুহিন ঠাণ্ডা। প্রাণহীন শব্দহীন পার্বত্যলোক। শুধু বরগার শব্দ শোনা যায়। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি হাজার চারেক ফুট নীচু খাদ। নীচের দিকে অরণ্যানী। সামান্য আহারাঙ্গি স্নেহে জপে বসতে চেষ্টা করলাম। আমার সৌখিন আকাঙ্ক্ষা ছিল উন্মুক্ত হিমালয়ে বসে ধ্যান করবো। বসেছি চিন্তাটা সৌখিন। বাস্তবে যে তা দেখা দেবে ভাবি নি। মন স্থির হয়ে গেল। কানে শুনতে পেলাম ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে কোথাও। আর চরণের নুপুর ধ্বনি। কেউ যেন নাচছে আশ্বহারা হয়ে আর তার সঙ্গে ভেসে আসছে অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীতের রেশ। গান আমি জানি না, তবে শুনতে খুব ভালোবাসি। সেই গানের সুর, ভাষা যেন গলে গলে পড়ছে আমার সর্বাঙ্গে। তন্ময় হয়ে গেছি। ক্রমে আকাশের রং ফিকে হয়ে আসছে। মনে হলো নীচে উষাকাল আর উপরে নবসূর্য বন্দনা সভা বসেছে। নীলগঙ্গার নীলাভ তরঙ্গ দল ভেসে আসছে।

অবসান রাত্রির। শুনতে পেলাম অরণ্যপঙ্কীকুলের কুজুন-গুজুন। পর্বত গায়ে প্রভাত সূর্যের রশ্মিচ্ছটা হিমবিন্দু-গুলিকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছে। আবার পথ চলা। একসময় মনে হলো পথ আর নেই। একটি অধিত্যকার গিয়ে শেষ হলো। একটা ছোট কুঠিয়া—পাথরের তৈরী। বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি সেখানে। শুনতে পাচ্ছি মানুষের কথাবার্তা। আমার জিহ্বে যেন কথা বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো। দেখলাম একবৃদ্ধ, বসে কথা বলছেন একটি মেয়ের সঙ্গে। গিয়ে বললাম, 'নমো নারায়ণায়।' বৃদ্ধটি এক লহমা তাকিয়ে বসতে বললেন। মেয়েটিকে কি ইঙ্গিত করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিম্নে এলো লোটাভর্তি মাঠ। বৃদ্ধ বললেন, 'পিও।' বোধহয় এর জন্যেই আমার দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটু সুস্থ হলে বৃদ্ধ বললেন, 'কাঁহা যাওগে তুমি?' বললাম। একটু অবাধ দৃষ্টিতে যেন তাকালেন। বললেন, 'তুমি তো ভুল পথে এসেছ। এখান থেকে অনেক দূরে ভুঙ্গনাথজীর মন্দির। কদিন আগে প্রচণ্ড তুষার বড় বয়ে গেছে। রাস্তা সব বন্ধ। ফস নেমেছে। অনেক লোকজন চাপা পড়ে গেছে। তুমি বাঁচলে কি ক'রে?

তুমি আজ থেকে যাও, আরাম করো, কাল আসবে। একটা পথ আছে দেখিয়ে দেব তুমি পৌঁছে যাবে রাতের আগেই।'

রায়ে আহারাঙ্গির পর বৃদ্ধ আমার সঙ্গে কথা বলতে বসলেন। তিনি তো ন্যাস-প্রাণায়াম-কুঙ্কর কথা খুব বলে গেলেন। শুনতে ভাল লাগছে না। অবসাদে ক্লান্তিতে দেহ যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। মনে হচ্ছিল কেন এত কষ্ট করছি। কিসের আশায়? বৃদ্ধের শীর্ণ মুখখানি বলমল করে উঠল। হঠাৎ বললেন, 'ব্রহ্ম শক্তিকে দেখবে, জানবে বলেই বোরিয়ে এসেছ ঘর থেকে।'

বৃদ্ধের দৃষ্টির সামনে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। সম্মিত পেলাম পরদিন ভোরে। দেখি মেয়েটি ডাকছে 'মহারাজ যাওগে নেহি?'

তাড়াতাড়ি উঠে তৈরী হয়ে নিলাম। বৃদ্ধকে প্রণাম করতেই বললেন, 'বাঁবা তুমি কো পার লাগায়া, ডেরো মং।' বলেই ডাকলেন 'বেটি, লড়কা কো রাস্তা বাতা দেও।'

এবার মেয়েটিকে ভালভাবে দেখতে পেলাম। অল্প বিদ্যুতের মতো। জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি পথ চেন?' বললে, 'বেফিকির মুসাফিরকে পথ দেখানোই আমার কাজ।' চমকে উঠি, সত্যিই তো আমি মুসাফির। এই উপলক্ষের জন্যেই কি এই হিমালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?

কিছুদূর যাবার পর রাস্তা অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। পাশেই অন্তলস্পর্শী খাদ। মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে আমার হাত ধরে বললো, 'বাবুজি ডর মং করনা।'

আবিস্ট হয়ে গেলাম তার স্পর্শে। খানিকবাদেই শুনতে পেলাম ঘণ্টা বাজছে। মেয়েটি বললো, 'আন্তি যাও তুম, উয়ো দেখো ভুঙ্গনাথজী কী মন্দির।' সামনে গিয়েও ফিরে তাকালাম। শুধু ভেসে আসছে সুরেলা কণ্ঠ থেকে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

চমকে উঠলাম গুরুদেবের কণ্ঠস্বরে 'এই যে এসে গেছ, দেখ দেখি কত ভাবিছি আমরা তোমার জন্যে।' তাকিয়ে দেখি পাশেই আছেন ভৈরববাবা। গুরুদেব একটু একটু হাসছেন আর বলছেন, 'ধারা কে চিনতে পারলে না তো? কেমন পৌঁছে দিয়ে গেল তোমাকে।' মাথায় যেন ভূমিকম্প ঘটে গেল। ভৈরববাবার বাহুবন্ধনে পতন থেকে রক্ষা পেলাম।

* * *

থামলেন ডক্টর ব্যানার্জী। উদাসী চোখ নিবন্ধ বাইরের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে এলাম।

১৬০ পৃষ্ঠার পর

(Occipital Bone), পবিত্র (Ethmoid Bone), এবং কীলাভঃ (Sphenoid Bone)। নরদেহভিত্তিবিদেয়া বলেন এরা সবাই মিলে করোটি তৈরী করে, তার মধ্যে থাকে মস্তিষ্ক বা Brain। তাত্ত্বিক ভাষায় এটি হলো ‘মহাকপাল’। তারই মধ্যে রয়েছে সহস্রার ও ধ্যানকেন্দ্র। এই পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অথবা নরদেহে যা আছে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও তাই আছে। এই অষ্টকপালে সোমের তরঙ্গ জ্যোতি পরিপূর্ণ করে। অগ্নির পূজা করা সাধকের উদ্দেশ্য। অগ্নি ও সোমই হলো সর্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তেজ এবং অমৃত সবন এই তত্ত্বই হলো আনন্দরূপ ব্রহ্মের উপাদান।

মহাসাধক স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী বলেছেন, ‘এই সহস্রারূপ সূক্ষ্মতম চেতনাধার—বস্কারানির্মিত সত্যলোকের কেন্দ্রস্থানেই মহাকারণাকৃতি ত্রিকোণ যোনিমুদ্রা—যাহার ত্রিভুজ পঞ্চাশদ্বর্ণমালার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্কারাবলীতে নির্মিত। ইহার মধ্যস্থলেই বৈশ্ববচক্রে জগৎকারণস্বরূপ যোনিবীজ বর্তমান। ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ বা পরমশিবের স্থান।’
‘বৃহৎযোগিনী’তন্ত্রে এই স্থানে পঞ্চমতত্ত্বের বৈদিক মন্ত্র হলো—

বিষ্ণুর্ধোনিং কল্পয়তু স্বর্চা রূপাণি পিংশতু।

আসিগতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥

জ্যোতির্জরাম্যুবাটশক্তির্বিমানে রজসঃ স্থিতা।

সাক্ষ্যকোণা মহাদেবী বসুসিদ্ধি প্রদাগ্নি চিৎ ॥

—বিষ্ণু নিজেকে যোনিরূপে প্রকল্পিত বা বিন্যস্ত করুন। স্বর্চা একে সমগ্ররূপে অলংকৃত করুন। প্রজাপতি অভিব্যেক দ্বারা আর্দ্র করুন। ধাতা গর্ভ প্রতিষ্ঠিত করুন। জ্যোতির্ময়ী জরায়ু রজোময় বিমানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। উনিই অষ্টবাগরূপা অষ্টকোণা বিশিষ্টভাবে দীপ্তিশালিনী মহানভা। ইনিই অষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িনী বা বসুদের সিদ্ধিদায়িনী অগ্নিচিৎ। বিষ্ণু যোনিবিশেষ, স্বর্চা বা সোম অমৃতহরণে প্রবীণ দেবতা। মহা জ্যোতির্ময়ী সত্তাই অষ্টকোণ বিশিষ্টা কুণ্ডলিনী শক্তি যিনি অষ্টবাকরূপে জগৎ জুড়ে আছেন।

বিষ্ণু মোহিনী মায়া ধারণ করেন—এ কথাটিকে স্মরণ করলে ‘যোনি’ শব্দের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। বিষ্ণুই পৃথিবী বা ধরিত্রী। ধরিত্রীকেও আবার যোনি বলা হয়েছে।

ষট্চক্রের বিভিন্ন দলে বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে। সেগুলি মূল হিরেখারই বর্ণ। এরা সূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী শক্তিই ভাব বিকাশের মূল বলে তাকে জগৎশক্তির বা জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান বলা হয়। বর্ণের প্রথম আবির্ভাব ব্রহ্মরক্তের নীচে অ-ক-খ হিরেখায়। বর্ণমালার কারণ রূপে নিত্যাসিদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাতে জ্যোতির কণিকারূপে কুণ্ডলিনী মধ্যে সমস্ত বর্ণ থাকে। এই বর্ণগুলি তখন সুযুগ্ম। তারপর সুযুগ্মপথে নাড়িপথে সমস্ত বর্ণ উদ্ভিত হয়ে ওখানকার তেজস্তরে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় বাণীকে ‘পশ্যন্তী’ বলা হয়। এ হলো জ্যোতিপ্রধান অবস্থা। যোগীরা ছাড়া এই অবস্থায় বা তার আগেকার অবস্থায় সন্ধান কেউ পেতে পারে না। এর পরবর্তী অবস্থায় হৃদপথে বর্ণের উদয় হয়। তখন আন্তরনাদের প্রাচুর্য বর্ণমধ্যে অনুভূত হয়ে থাকে। তারপর প্রাণবৃদ্ধির সঙ্গে বর্ণসমূহের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাকে বলে অন্তঃসংকল্প দশা।

বিষ্ণুর যোনিরূপ প্রাপ্ত সম্বন্ধে ‘মোহিনীতন্ত্রে’ আছে বিষ্ণুর কারণাকৃতিই মোহিনী। এই মোহিনীর যন্ত্রময়রূপ হলো যোনি। শিব বা মঙ্গলময় পুরুষ বিন্দুরূপ। যোনি পৃথিবী স্বরূপা এবং লিঙ্গ আকাশের মতো। বিষ্ণুই নিজের পরম অবস্থায় মোহিনীরূপ ধারণ করে এই যোনিরূপে শক্তিপদবাচ্য হয়ে থাকেন। ঔ-কাররূপী শিবের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে ইনি যোগে স্বয়ং দেবীপ্রণবাকৃতি ধারণ করে থাকেন। বিষ্ণুর অন্য নাম বাসুদেব। ‘বাসু’ শব্দের এক অর্থ হলো যুবতী। অর্থাৎ যুবতীরূপ দেব যিনি তিনিই বাসুদেব।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য তন্ত্র সাধনায় দুটি মার্গ আছে—আর্দ্রমার্গ বা চীনক্রম এবং শুষ্কমার্গ বা নীলক্রম। নীলমার্গ বা নীড়মার্গও প্রকৃতপক্ষে আর্দ্রক্রম। কিন্তু যোগের দ্বারা বায়ু বা প্রাণকে অধিকৃত করে দেহরূপ ইন্দ্রকে জ্বালানোর জন্য তাকে শুষ্ক করতে হয়। তার অনেক বিধান আছে। তাই নীলমার্গকে শুষ্কক্রম বলে। মহাকুণ্ডলিনীরূপে নিজের অনুভূতি হওয়ামাত্র ধাতা বা আদিভারূপী জারপুরুষ জ্যোতির্জরায়ুর গর্ভাধান করেন। তখন যোগী হিরণ্যাগর্ভসুবর্ণরূপে ওই অণ্ডের খোলসটিকে ভেদ করে ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে চিদাকাশে পরমআনন্দময় অবস্থায় থাকেন। একারণে পরমশিবকে তন্ত্রের রসায়নশাস্ত্রে এবং নানাতন্ত্রে বিশেষত

যোগিনীহৃদয় তন্ত্রে ‘খেচর’ বলা হয়। ‘খাতা’ সংস্কৃতভাষায় আদিত্যরূপ ও উপপতি। তাই জ্ঞানপুরুষ বলা হয়েছে।

তন্ত্রের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের মধ্যে, মধ্যে গূঢ় রহস্য রয়েছে। একারণেই তন্ত্র বহুসাময়। একনোই সর্বসাধারণ্যে তন্ত্রের শব্দ বা বাক্যের গূঢ় অর্থ প্রকাশ করে বলা উচিত নয়। মহাশক্তি হলেন চিরকুমারী। জ্ঞানময়ী হবার জন্যে তিনি অনীশা বা পতিশূন্যা। তাই তাত্ত্বিকী যজ্ঞে মহাশক্তিকে কুমারী বা বিধবা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। রহস্যজ্ঞ যোগীর মার্গদর্শনের জন্যে এসব কথা ইঙ্গিতে বলা হয়। পরমশিব এর উপপতি অর্থাৎ পতি না হয়েও পতিস্বরূপ। ইনি পরমপুরুষ—অর্থাৎ স্বপুরুষ নন। মাকে তাই তন্ত্রে ‘পরশক্তি’ বলা হয়েছে। ইনি সাধারণী বা স্বকীয়া শক্তি নন। তন্ত্রের একটি রহস্যময় শ্লোক লক্ষ্য করুন—

অলিপিষিত পরব্রীভোগ পূজারতোহং
বহুবিকুলমার্গারক্ত সম্ভাবিতোহং
পশুজ্ঞানবিমুখেহং হস্তৈরবীমাশ্রিতোহং
গুরুচরণপরোহং হস্তৈরবোহং শিবোহং ॥

এখানে ‘অলি’ হলো ব্রহ্মরক্ত থেকে বিগলিত সোমধার বা অমৃতবৃষ্টি। ‘পিষিত’ অর্থে স্থূল দেহবোধে পরতত্ত্ব বোঝায়। ‘পিষিত’ নানে হলো আবার ‘নির্মিত’ বা ‘অলঙ্কৃত’। এই নির্মিত দেহ, যাতে আমার অন্তরের যথার্থ দৃষ্টিপাত সাহায্যে আমিষ বা আত্মসত্তার বোধ কেন্দ্রীভূত রয়েছে—এই জ্ঞানকেই রহস্যযোগে ‘পিষিত’ বলা হয়েছে। এবারে ‘পরব্রী’ শব্দের অর্থ দেখা যাক। ‘পরা যা ব্রী শক্তি বা সা পরব্রী পরাশক্তিরিতার্থঃ।’ অমৃততত্ত্বে স্থূলসৃষ্টির মধ্যে সূক্ষ্মশক্তির এবং পরাশক্তির বিশেষ আত্মাদানব্দ যোগ বা পূজাই হলো কোলসাধকের লীন হয়ে যাওয়া। কোলপুরুষ কুলকুণ্ডলিনী শক্তির নানাবিধ উপাসনামার্গে সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে নতুন আবিষ্কার করেন, নব নব অনুভূতি হয়। কোল দ্বিজ পাশব জীবনযাপনকারী সাধারণ পুরুষ থেকে সর্বদা বিমুখ হন। তার পাশবিক চেতনার সঙ্গে যদি তিনি সংশ্লিষ্ট হন তাহলে ভাবের ও মতিগতির পরিবর্তন হওয়া খুবই সম্ভব। তার জন্যে যে কোল ‘পশুপতি’ হতে চান তিনি সর্বদা একান্তে থেকে বিশ্বভরণকারিণী, রমণ-কারিণী ও বমনকারিণী ভৈরবী অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-

সংহারকারী মহাশক্তির শরণাপন্ন হন। গুরু বা মোক্ষকর্তা শিবতন্ত্রের চরণকে আশ্রয় করে ‘আমি ভৈরব’ অর্থাৎ ভরণশীল, রমণতৎপর ও বিশ্ববমনকারী (বা সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারী) পরমশিব—আমি সাক্ষাৎ শিব বা শক্তিরূপ আকরস্বরূপ পরমাশ্রয়—এই দিব্যজ্ঞানযোগে মহাসাধক সর্বদা আসনে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকেন। সহস্রারের মধ্যে অষ্টকপাল জ্যোতিকে ‘অবস্তম্ভ’ বলা হয়। অষ্টকপাল বা অষ্টকোণ জ্যোতির মধ্যে পরম কারণস্বরূপা যোনিমণ্ডল বর্তমান। এই যোনি বা ত্রিকোণমণ্ডল পঞ্চাশৎ মাতৃকার, ঝঞ্ঝারময় ধ্বনিতে তৈরী। তাই প্রতিটি কোণে ‘অ’ ‘ক’ ও ‘খ’ এই তিন বর্ণ থাকে। এর অন্য নাম একারণে ‘অকখ’ চক্র। এই হলো বিশ্বের ত্রিকমণ্ডলস্বরূপ। এটি পরমস্থান। এখানে পরজ্যোতির উন্মেষ উপলব্ধি করা যায়। চিন্মাত্র পরজ্যোতিকেই বলে পরগণেশব। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইনিই বুদ্ধ। ইনিই ঈশ্বর। এই দিব্যস্তরই হলো সদাশিবের স্বরূপ। এই বিদ্যা একান্তভাবে গুরুমুখী। অষ্টকপাল ও ত্রিকপালযোগে মন্ত্রযজ্ঞে অন্তরের অগ্নি জ্বালানোর কৌশল না জানলে অষ্টবলয়া কুণ্ডলিনীর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। মহামায়ার কৃপা এবং উপযুক্ত গুরু না থাকলে এই শক্তিকে প্রাণবস্ত্র করা যায় না। গুরুর সঞ্চারিণী শক্তি শিবের ক্রিয়াগুলির পেছনে কার্যকরী না হলে অগ্নি জ্বলে না, মন্ত্র সজীব হয় না, শুধু শব্দোচ্চারণই হয়। অতি কষ্টে দীর্ঘকালের অভ্যাস দ্বারা এই শক্তি আহরণ করা সম্ভব।

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী খ্রীষ্টীয়াসাম্রাজ্যপার কাছে শুনিয়েছিলেন যে নাথ সম্প্রদায়ের কাপালিক যোগীরা এই অষ্টবলয়া মহাশক্তির বিশেষ উপাসনা করতেন। সিদ্ধ কাপালিক বা সিদ্ধোঘদের মধ্যে বিশিষ্টানন্দনাথ হলেন প্রথম। একথা ‘মীননাথানন্দ লহরী’তে প্রকাশ আছে। বিশিষ্টানন্দনাথের পর কূর্মানাথানন্দ তাঁর আসনের অধিকারী হন। তাঁরপর তাঁর প্রধান শিষ্য মীননাথ বা মংসোন্দ্রনাথ তারাকুলের এই সিদ্ধাসনের অধিকারী হন। কূর্মানাথানন্দ ও মীননাথ তারাপীঠে এই নিয়ম করে গিয়েছিলেন যে কূর্মমুদ্রায় বা মীনমুদ্রায় সিদ্ধহস্ত হতে না পারলে কেউ বিশিষ্টের সিদ্ধাসনের অধিকারী হতে পারবেন না। বলা বাহুল্য তারাপীঠের দুলাল বামদেব উভয় মুদ্রায় অপূর্ব দক্ষতা লাভ

করেছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের দুই প্রধান শিষ্য হলেন সিদ্ধকাপালিক গোরক্ষনাথ ও সিদ্ধযোগী মহেশ্বরানন্দনাথ। গোরক্ষনাথ হলেন কালীকুলের সিদ্ধাচার্য। মহেশ্বরানন্দ এই বিশিষ্টের সিদ্ধাসনের অধিকারী হলেন। গোরক্ষনাথের প্রধান শিষ্য ছিলেন সিদ্ধ কাপালিক মল্লিকানাথ। তাঁর শক্তির নাম মল্লিকাদেবী ছিল বলে তিনি এই নাম গ্রহণ করেন। তারাপীঠের বিখ্যাত সাধক কৈলাসপতি বাবা অষ্ট শক্তি নিয়ে সাধন করতেন। এটিও অষ্টবলয়ার বীর সাধন। বামদেব এই অষ্টবলয়া মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। স্বামী নিগমানন্দ ও গুরু শ্রীবামদেবের সান্নিধ্যে থেকে অষ্টবলয়া মহাশক্তির অনুশীলন করেছেন।

যে কোন কুলাচার সাধনে গোপনতা ও মৃদুভাষা সর্ব-প্রকারে অবলম্বনীয়। ‘চীনাচার’ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে যে এটি বুদ্ধিচীন দেশের আচার বলে চীনাচার হয়েছে। আগেই জেনেছি চীনক্রম হলো আদ্রক্রম।

মহাভৈরব পরমশিব স্বয়ং বলেছেন তান্ত্রিক আচারসমূহ বুদ্ধ থেকে দেবীতে প্রকাশ পেয়েছে পরে চীনে তা রয়েছে। অন্য কোন বিষয়ে তার প্রকাশ হয় নি।

‘বামাচারঃ কুলাচারশচীননাথেন শঙ্করাং।

প্রকাশিতঃ শঙ্করেন মহারুদ্রাং প্রকাশিতঃ।।

মহাচীনা ধিপো দেবো মহাশ্যেন তয়েষ্বয়োঃ।

কুলাচারং কুলশ্রেষ্ঠে বামাচারঃ প্রযুক্তঃ।।

অসৌবাহেশ মহাশ্যে চীনতন্ত্রে মরোদিতম্।

কুলাচারমশেষেণ চীননাথেন বেষ্ট্যাপি।।’

(কালীভক্তিম্, দ্বাদশ পটল)

—এই বামাচাররূপ কুলাচার মহারুদ্র থেকে শঙ্কর প্রকাশ করেন। শঙ্কর থেকে চীননাথ প্রকাশ করেন। হে কুলশ্রেষ্ঠে! ভগবান শঙ্কর ও মহাচীনাধিপতি, তাঁদের

দুজনের মাহাত্ম্য হেতু এই বামাচাররূপ কুলাচার প্রচারিত হয়েছে। এ অতি যত্নসহকারে অনুষ্ঠেয়। এর বিশেষ মাহাত্ম্য চীনতন্ত্রে আমিই বলেছি। এই কুলাচার চীননাথও ভালভাবে জানেন।

এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে চীনতন্ত্র ও পরম ভৈরবেরই অবদান। কিন্তু চীননাথ নামে মহাযোগীর নাম অনুসারে ‘চীনাচার’ শব্দটি এসেছিল এ সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৈদিক ভাবনায় অগ্নি-সোম যেমন একটি বিশিষ্ট দেবমিথুন, তেমনি কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি ও সহস্রারস্ পরম-শিব এক বিশেষ মিথুন। অগ্নিতে যজ্ঞের শুরু, সোমে তার সারা। মূল্যধার ছেড়ে দিলে নাভিস্থান থেকে শুরু হয় চক্র-ভেদের পালা। অগ্নি হলো নাভি। সাধনার আদিতে থাকে অভীপ্সা, অন্তে আনন্দ। সোম হলেন আনন্দের দেবতা। এঁরা আমাদের অন্ধতমিষ্রা থেকে নিয়ে আসেন জ্যোতির রাজ্যে। সোমের মদ আমাদের কাছে মধুতে পরিণত হয়। দেহ-মনের অরুণিতে প্রাণরূপে নিহিত আছেন দেবতা। ধ্যাননির্মলনের সাহায্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটিয়ে জাগ্রত কবতে হবে চিন্তের উদ্যতি। এই উদ্যতি ও আত্মহুতির আকৃতি নিয়ে দিনের পর দিন সেই দেবতাকে সন্দীপ্ত রাখতে হবে। তিনিই প্রেরণা জাগান। ফলে, বিনা ইন্ধনেই জ্বলে ওঠেন তিনি প্রাণের গভীরে। দ্রব্যযজ্ঞ তখন রূপান্তরিত হয় জ্ঞানযজ্ঞে, দেহ হয় ষোগ্যাগ্নিময়। যিনি গৃহাধিত ছিলেন তিনি অচিহ্নিত ও চিহ্নিত বিবেকরূপে মর্ত্যচেতনায় আমাদের সামনে ধরা দেন জ্যোতিধারারূপে।

ঋণ স্বীকারঃ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী ও

প্রফুল্লচন্দ্র ভক্তদেব।

“হাতে হাত দাও, মহাগান গাও, ভেদাভেদ যত ভুলিয়া যাও
রচিয়া সজ্জ মিলিত অঙ্গ নিখিল ভারত চেতনা পাও।”

মাসিমা চলে গেলেন

মানিক বসু

মাসিমা চলে গেলেন। মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল এক সুন্দর মানুষকে। সারাজীবন শুধু সেবা করে গেছেন সবার। বয়স তাঁর দেহকে আক্রমণ করলেও অন্তরকে করতে পারেনি। তাই সারাক্ষণ তিনি কোন না কোন কাজে জড়িয়ে থাকতেন। আমরা সবসময় তাঁকে দেখেছি অভূত মানুষের সামনে আহাৰ্য্য তুলে দেবার কাজে অথবা অন্য কোন সেবার মাধুর্য্য নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে। অবসর সময়ে খবরের কাগজ পড়তেন। তাঁর এই চেহারাটাই আমাদের চোখের সামনে ছিল। তাছাড়া অসুখে বিসুখে ভুগতেনই না বলা চলে, তাই ভাবতেই পারা যায়নি এত চট করে সব শেষ হয়ে যাবে।



শ্রীমতী দেবী

মৃত্যুটাও সুন্দর,—বুধবার (৫ই সেপ্টেম্বর) রাতে পাশেই মাসিমা ছিলেন (রেণু মাসিমা)। তাঁকে কোন কষ্ট না দিয়েই আশ্রয় সুন্দরভাবে চলে গেলেন মাসিমা। সারা জীবন কারও সেবা নেননি, মৃত্যুর সময়েও নিলেন না।

১৯০৩ সালে চন্দননগরে শীল (বাবা বৈষ্ণবদাস শীল) পরিবারে জন্মেছিলেন। ছ'বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। মাত্র ১৭ বছরের মধ্যে পুত্র ও স্বামীকে হারান।

এদিকে (১৯২১ সাল) তখন সঙ্ঘগুরুর ভালবাসার ও কর্মযোগের অদম্য আকর্ষণে মানুষেরা আসছেন সঙ্ঘগুরুর পাশে। বাবা, দাদাদের ইচ্ছায় মাসিমাও চলে আসেন এই

শীতল সজীব ছায়ায়। বাকী জীবনটায় প্রবর্তকের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা সবকিছুর সঙ্গে সেবার ডালিহিসাবে নিজেদের ক্রমাগত গভীরভাবে নিবেদিত করেছেন। মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। তাই সঙ্ঘের কাজ আরম্ভ হবার আগেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিতেন রাত আড়াইটায় উঠে। অদ্বুত নিষ্ঠা। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

নভেম্বর ১৯২৯ সঙ্ঘজননী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আছেন। মাসিমা অকুণ্ঠ আন্তরিক সেবা করে চলেছেন। সঙ্ঘজননী বলেছিলেন, 'তুই আমার জন্য যা করছিস—তুই গত জন্মে নিশ্চয়ই আমার মা ছিলি।'

এরপর সেই বিশেষ মুহূর্ত সঙ্ঘজননীর মৃত্যুর আগে এল। সঙ্ঘজননী বললেন, 'আমি নির্ভাবনায় ওনাকে তোর উপর ছেড়ে যাচ্ছি, তুই ওনাকে দেখিস।' এই 'ওনাকে' সারা জীবন দেখে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করতে অনেক বাধা বিপত্তি পেরোতে হয়েছে। একটা ছোট্ট ঘটনা। ১৯৩০ সাল। সংঘগুরু গৃহত্যাগী হয়ে, সংঘের পাঁচ জনকে সম্ম্যাস দেবেন ঠিক করেছেন। তাই শ্রীমন্নিরে পাকাপাকি থাকার উদ্দেশ্যে ছ'জনই গঙ্গার তীর বরাবর এগিয়ে চলেছেন। মাসিমাও যেতে চাইলেন। সংঘগুরু ক্ষুব্ধ। কঠিন স্বরে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু আন্তরিক সেবাপরায়ণা আত্ম নিবেদিতাকে কেউই বিমুখ করতে পারেন না।

১৯৩৩-এ এলাহাবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর আহুত সনাতন ধর্মসভায় যোগদানের আগে মন্তক মুণ্ডন করে কঠোর সংঘের মধ্যে মানসিকভাবে সম্ম্যাসিনীর রত নিলেন সংঘগুরুর কাছে।

একটা কথা—মাসিমা খুব ভাল ছড়া জানতেন। মনে না পড়ায় এখানে উল্লেখ করতে পারলাম না।

যে কোন সৃষ্টি দেখে স্বভাবতই আমাদের পক্ষে ভেবে নেওয়া সম্ভব হয় না, 'পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর কথা। সংঘ-জননী, মাসিমা—এরকম অনেকের নিঃশব্দ আত্মনিবেদন প্রবর্তকের বিশাল কর্মকাণ্ডের ও চিন্তা-ভাবনার বিকাশে অপারিসমী সাহায্য করেছে।

পৃথিবীতে অনেক ক্ষেত্রে ষেরকম হয় যাদের নাম—যেসব সৃষ্টিকে আমরা প্রেষ্ঠ হিসাবে জানি, তাদের চেয়ে যোগ্য নাম,

তরুণ বৈজ্ঞানিক ডঃ অশোককুমার গিরি

ডঃ অশোককুমার গিরি এ বৎসর ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী থেকে ‘ইয়ং সায়েন্টিস্ট’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। সারা ভারতের মোট ১৫ জন তরুণ বিজ্ঞানীকে এই বৎসর এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ দূষণে যেসমস্ত রাসায়নিক সামগ্রী সক্রিয় তা আগামীদিনের জেনারেশনের (জিন ও ক্রোমোজোম) উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, এই বিষয়ই ডঃ গিরির গবেষণার বিষয়বস্তুর ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডঃ গিরি ১৯৮২ সালে মহাশুরে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অবিবেশন থেকেও ‘ইয়ং সায়েন্টিস্ট’ খেতাব লাভ করেন। ডঃ গিরিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তরুণ বিজ্ঞানী যিনি পব পর দুটো জাতীয় সম্মান পেলেন মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে। আগামী জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই সম্মান পত্র প্রদান করবেন।

ডঃ গিরি ১৯৭২ এবং ৭৪ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. Sc.-তে ফাস্ট ক্লাস সেকেন্ড এবং M. Sc.-তে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হয়ে উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৮১ সালে কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট (পি. জি. হাসপাতাল) মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ থেকে কলকাতার এক বিখ্যাত মেডিক্যাল জেনিটিসিস্ট ডঃ গীতা তালুকদার ও পদ্মভূষণ বিজ্ঞানী প্রফেসর অর্চনা শর্মার যুগ্ম তত্ত্বাবধানে পি. এইচ. ডি. হন।

সম্প্রতি ডঃ গিরি আমেরিকার এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির বিশেষ আমন্ত্রণে যেখান যান। পরিবেশ দূষণে এবং জেনারেশনের (জিন ও ক্রোমোজোম) উপর

ডাইঅক্সিন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কিনা সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ মতামত চাওয়া হয়েছিল। ডাইঅক্সিন এখন আমেরিকার একটা বড় পরিবেশ সমস্যা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় “এজেন্ট অরেঞ্জ” ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় গাছের পাতা ঝরানোর জন্য। তাতে এই ডাইঅক্সিন অনেক



পরিমাণে মিশ্রিত ছিল। ফলে ভিয়েতনামের অধিবাসী ও সে সময় যুদ্ধে কর্মরত আমেরিকান সৈন্যগণের মধ্যে এখন নানা মারাত্মক রোগে মৃত্যু ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে। এজন্য আজ ডাইঅক্সিন একটা বড় সমস্যা। ডঃ গিরির মতামত হ’ল ডাইঅক্সিন যে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে জেনারেশনের (জিন ও ক্রোমোজোম) উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কিনা তা এই মুহূর্তে আরও গবেষণা না করে বলা সম্ভব নয়। বর্তমানে

মহৎ সৃষ্টি আমাদের অগোচরে থেকে যায়। এক্ষেত্রেও, আমি প্রায় কিছুই জানি না, তবু আমিই করছি তার স্মৃতি তপণ। সত্যিই আশ্চর্য লাগে ব্যাপারটা ভাবতে। আমি আন্তরিক আনন্দ তাঁদের কাছে আমার অপূর্ণতা ও অজ্ঞতার জন্য।

আরেকটা ঘটনা। সংঘগুরু সবাইকে দেখাচ্ছেন, “দেখছ নির্মলাকে রাগের মাথায় এমন মেরেছি যে আমার হাতও নীল হয়ে গেছে।” কৃষ্ণধন চ্যাটার্জি বললেন, “আশ্চর্য,

আচ্ছা নির্মলাদি, আপনি ‘ছুটে পালাতে পারলেন না?’ মাসিমা বলেছিলেন ‘রাগের মাথায় অসুস্থ শরীরে আমাকে ধরতে গিয়ে উনি যদি পড়ে যান—তখন কি হবে?’ একটু ভাবলেই বোঝা যায় সংঘগুরুর প্রতি কত আন্তরিক ও গভীরভাবে আত্মনিবেদিতা ছিলেন তিনি। সেবাসম্মে তিনি নিঃশব্দে যে অমৃত আহরণ করেছিলেন তা রেখে গেলেন উত্তরসূরীদের জন্যে। অন্তরের প্রণতি জানাই এই নিবেদিতাকে।

শেষের পাতা—

রবি কর

বছর ঘুরে আবার এল শারদীয়া উৎসব। ফেলে আসা বছরের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এ বছরের চেয়ে আগেরটা বোধ হয় ছিল ভাল। এমনটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ আমাদের জীবনযাত্রা ক্রমেই দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। দেশে অশান্তি ক্রমে তুঙ্গের দিকে চলেছে। জন-গণেশ আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। ফলে, রাজ-নৈতিক ফন্সীবাজদের শিকার হয়ে ধু'কছে জন-গণেশ। করবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জীবনের নিরাপত্তা প্রায় শূন্যের ঘরে এসে গেছে। দরিদ্রশ্রেণীর একভাগ বাধ্য হয়ে সমাজ বিরোধী হচ্ছে, আর অপর ভাগ আরো হতসর্বস্ব হচ্ছে। ওদিকে মুনাফাখোর, কালোবাজারীরা, ব্যবসায়ীরা এবং কিছু সংখ্যক অসাধু কর্মচারী ক্রমেই স্কীতোদর হয়ে উঠছে।

যে দেশে এত সাধু সন্ন্যাসী আর বহু 'বাবা' 'মা' বা 'স্বামী'র শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা বহু লক্ষ অতিক্রম করে গেছে, সেদেশে এত বৈষম্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? বক্তৃতায় শুনি আমরা অমৃতের পুত্র! কিন্তু বাস্তবে আমরা কিছুই নই, শুধু কথার ফানুস উড়িয়ে বাহবা পেতে চাই। যে কাজ আমরা করি তার সঙ্গে বিবেকের/সংযোগ থাকে না বলেই এতো ঝঞ্জটা।

আমাদের সংস্কার, সংস্কারসাধনার উপরে জোর দিয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংস্কারসাধনা মুক্তির সহজ সাধনা। সংস্কার

ব্যক্তির বালাই নেই বরং আত্মনিবেদনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সম্ভবতই সাধনার সহজ উপায়। পৃথিবীর, বিভিন্ন রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে জাতি যত উন্নত, সে জাতি তত সংঘবদ্ধ। ব্যক্তির আত্মত্যাগই সংঘের প্রাণ। দেশকে যখন আমরা এইভাবে দেখতে পারবো তখনই আমাদের দেশমাতৃকার পূজা সফল হবে এবং দেশের সমৃদ্ধি হবে।

আজ মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলার সময় এসেছে— আমিই আমার পশু। একর শক্তিতে তাকে নির্জিত করতে পারিনি বলেই তোমার শরণ নিয়েছি। তুমি নিজের হাতে আমার শিরশ্ছেদন করো—আমার উষ্ণ হৃদয়রক্তে তোমার ঋণ পূর্ণ করো। রক্তবীজের মতো যে কামনাকে পেষণ করে কোন মতেই দমাতে পারি নি, তাকে তুমি সমগ্রভাবে গ্রাস করো। হৃদয়কে দুর্বল করে দিও না, ক্রীব করো না, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সামঞ্জস্য করে যেন নির্ভীক মুক্ত জীবনকে বরণ করতে পারি। ভাবের প্রমত্ততায়, কম্পনার আতিশয্যে, অন্ধ আবেগের উচ্ছ্বাসে, উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায় যেন নিজের আত্মসত্তাকে না হারিয়ে ফেলি। কর্মকে ফাঁকি দিয়ে চিত্তের মালিন্য হেঁচু অসময়ে আমাদের মধ্যে যে সাময়িক ধর্মভাব জাগে তাকে যেন মিথ্যে বলে সরিয়ে দিতে পারি। দৈনন্দিন কুরুক্ষেত্রে যেন অজ্ঞানের মতো কর্ম করে যেতে পারি।

ডঃ গিরি কলকাতায় সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজের একজন অন্যতম কর্মী। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য গত দুবৎসর যাবৎ ডঃ গিরি 'প্রাণ ও পরিবেশ' নামে একটি বাংলা পত্রিকা

সম্পাদনা করছেন। ডঃ গিরি প্রবর্তক সংঘের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং গুণগ্রাহী। আমরা তাঁর এই সম্মানে আনন্দিত এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এই তরুণ বিজ্ঞানীর আরও সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক : শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহালানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীতিবি কর কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রীতিবিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

PRABARTAK FURNISHERS LTD.



For

Furnishing your House to make it

a real

Home



Show Room : Phone : 27-9021 :: 61, B. B. GANGULY ST. CALCUTTA-12

Factory : Phone : 24-1536 :: 40, PULIN KHATICK ROAD, CALCUTTA-15

With Compliments From:

THE STAR MOTOR ENG. WORKS

Automobile Engineers, Body Builders, Spray Painters
and Dealers

Estd. 1939

Office: 241/1, ACHARYA P. C. ROY ROAD,
CALCUTTA-4.

Workshop: 6, ULTADANGA ROAD, CALCUTTA-4.

Phones: Office—55-4633 :: Resi—56-3430

With Compliments from:

M/s. K. K. Enterprise

Contractors, House Builders.

Everything in Electricals, Suppliers of
Polythene Tubes & General Order
Suppliers:

RAJABAZAR,

MIDNAPORE.

ELITE FURNISHERS

INTERIOR DECORATORS & FURNISHERS

Authorised dealers:

RILAXON, SUPER FOAM, NATIONAL
PILLO, U-FOAM ETC.

240/4, Bepin Behari Ganguly Street,

(Bowbazar) CALCUTTA-700 012.

Phone: Office: 27-1422 & 27-8562

Resi: 35-7458



“Do thou work, for, none can have even a moment's respite from work. Without it no knowledge can be acquired nor is *bhakti* begotten *sans* knowledge.”

SRI MOTILAL ROY
(“Temple of Inspiration”)



Space donated by a Well Wisher

With Compliments from :

Prabartak Printing & Halftone Ltd.

PRINTERS OF DISTICTION

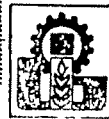
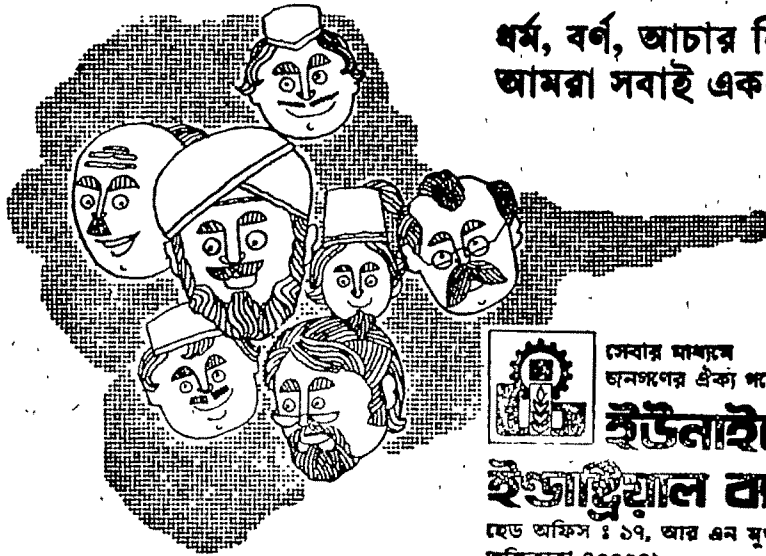
52/3, BEPIN BEHARI GANGULY STREET,

CALCUTTA-700 012.

Phone : 27-5141

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা

ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য পড়ে তোলায় ব্রতী

ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যান্ড লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জি রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

ফ্যাক্স অফিস : ৭ রোড কল ক্রস, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

চল্লিবাগান : ডে এন বিহার





যে সৌন্দর্য চিরদিনের

কিছু কিছু জিনিষ রয়েছে যা আমাদের চিরকালের সম্পদ। বাংলার তাঁত বস্ত্র ও হস্তশিল্প কালের করালগ্রাস উপেক্ষা করে আমাদের চিরকালের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ আমাদের একান্ত নিজস্ব এবং গর্বের বস্তু।

বাংলার শান্ত, স্নিগ্ধ রূপের মতই এর হস্তশিল্পজাত সামগ্রীতে রয়েছে স্বপ্নের ছোঁয়া। গৃহসজ্জার উপকরণ থেকে শুরু করে গয়না, কাঁধে নেবার ব্যাগ, মাদুর, তাঁতের শাড়ি এমন কি শার্ট ও প্যান্টের কাপড়—সবেরেই রয়েছে নিপুণ শিল্পীদের প্রাণময় শিল্পবোধের স্পর্শ।

সময় এই ঐতিহ্যকে সজ্ঞান করতে পারেনি।

নিজে বাছাই করবার জন্য আসুন ‘তন্তুজ’ বা ‘তন্তুশ্রী’-তে। এখানে পাবেন তাঁতজাত বস্ত্রাদি। হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর জন্য আসুন ‘মঞ্জুষা’ অথবা গ্রামীণ শিল্প বিপণিগুলিতে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥



With best Compliments from:



Bangalore Leasing Limited

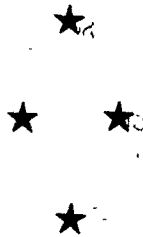
1A, 3RD FLOOR, CHURCH STREET,

BANGALORE-560 001

PHONE : 53638

Phone : 26-5556
27-5780

Gram : APEXPHARMA
Telex : 021-4122 APEX IN



APEX PHARMA

55/62, B. R. B. BASU ROAD

Ground Floor, B Block

CALCUTTA-700 001



FOR

DRUGS ● CHEMICALS ● MEDICINES

পরিবার কল্যাণ কনস্ট্রাক্টিভ সরকারী অনুদান

- ★ যারা ভেসেকটমি করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ১৪৫ টাকা। (খাদ্য খরচ বাবদ ১০ টাকা ও স্বাস্থ্য খরচ বাবদ ১৫ সহ)
- ★ টিউবেকটমির ক্ষেত্রে মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ১৩৫ টাকা (বিনা খরচে অপারেশন, পথ্য ও ঔষধাদি সহ)।
- ★ লুপ গ্রহণের জন্য মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ৯ টাকা।
উদ্যোক্তা বা PROMOTER-দের জন্য :—
 - (ক) প্রতি ভেসেকটমি কেসে—নগদ ১০ টাকা।
 - (খ) প্রতি টিউবেকটমি কেসে—নগদ ৬ টাকা।
 - (গ) প্রতি লুপ কেসে—নগদ ২ টাকা।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা :— ১৯৪/৮৪-৮৫

.....

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের মাস মিডিয়া ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত।

Space Donated by :

CALCUTTA FURNISHING STORES (P) LTD.

62, BEPIN BEHARI GANGULY STREET,

CALCUTTA-12



Phone : 35-7451 & 27-1742

অক্টোবর ১৩৯১

প্রবর্তক

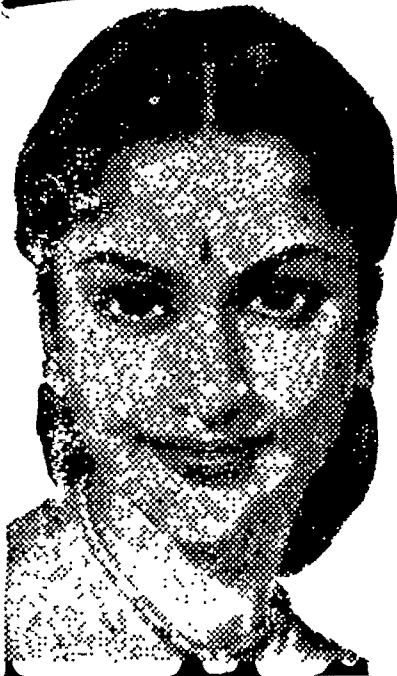
প্রতিষ্ঠাতা - সত্যেন্দ্র শ্রীমণিলাল

জনপ্রিয়তায় গৌরবমণ্ডিত

ক. হোডের
প্রসাধনী

৩৭ নং রাস্তা ক

ক. হোড এন্ড কোং কলিকাতা-১৪



মহাভদ্ররাজ
আম্বুর্বেদীয় সুবাসিত
কেশ তেল
কনক ট্যাল্ক
কনক সেন্ট



সঙ্কল্পগুরু শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজ, সঙ্কল্পগুরু মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনায় উজ্জ্বল এই গীতাভাষ্য নূতন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বহুর মধ্যে সঙ্কল্পগুরু মতিলালের জীবনভিত্তিক জীলা-বাদী শারীরক সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, যোগ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত।

মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর সুচিন্তিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিখিল ভারতশাস্ত্রের নির্ধক্ট স্বরূপ সুবহু ভূমিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

সূচীপত্র অগ্রহায়ণ ১৩৯১

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সম্মুগুরু শ্রীমতিলাল	২৪৫
সাধন কণা	সংকলন	সম্মুগুরু শ্রীমতিলাল	২৪৬
প্রসঙ্গত—মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠ	প্রবন্ধ	ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার	২৪৭
স্বদেশী আন্দোলন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	প্রবন্ধ	বর্ণজিৎকুমার সেন	২৪৯
বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ধর	প্রবন্ধ	বোমকেশ ভট্টাচার্য	২৫১
বাংলা সাহিত্যের সেতুবন্ধ—ঈশ্বর গুপ্ত	প্রবন্ধ	ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৫৩
গীতাঞ্জলির গান	প্রবন্ধ	মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়	২৫৬
হারানো সুর	কবিতা	কমলারঞ্জন আচার্য	২৫৮
সর্বনাশা এনকেফেলাইটিস্	স্বাস্থ্য	নাগার্জুন ভট্ট	২৫৯
অর্জুনকে দ্রোপদী	কবিতা	সমীরা বসু	২৬০
অম্পৃথ্যতা	আলোচনা	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৬১
পাপ মুছে যাক	কবিতা	সরোজ দাস	২৬২
অদৃষ্ট	গল্প	জগদ্বন্ধু দাস	২৬৩
ভোরের পাখী বিহারীলাল	প্রবন্ধ	ডঃ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৯
পাগল	গল্প	দীপেন রাহা	২৭২
হিমালয়ের কোলে	ভ্রমণ	শুভেন্দু রায়	২৭৫
পুস্তক সমালোচনা	...	...	২৭৮

প্রবর্তকের মিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি ইংরেজী মাসের ৯/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পর সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একখানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আবৃত্তিগাথার রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই, সম্পাদকের নহে।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

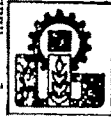
যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য পড়ে তোলায় দ্রুত

ইউনাইটেড

ইন্ডিয়ান প্রেস লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

টেলিঃ অফিস : ৭ ডেড লস ডেস, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

চেন্নাই : ৭ ডেড লস ডেস, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

Progressive/J18-16-80





বর্ষ ৬৯তম : ৮ম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৯১ : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৪

জীবনের আলো

আশ্রমের বড় বিধান—ঈশ্বরোপাসনা। গৃহীর ভবনে আজ ঈশ্বরের নাম নাই, তাই সংসারে অজ্ঞ এত হাহাকার। আশ্রমী বন্ধনমুক্ত হয়ে, আত্মবিস্মৃত জাতির কাণে এই ভগবানের নাম দাও। ঘরে ঘরে গৃহস্থদের সপরিবারে ঈশ্বরোপাসনা করতে শেখাও।...বেদান্তের বাণী—তুমি ভগবান। এই এই ভাগবতবোধ উন্মেষ করার শ্রেষ্ঠ উপায়—নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা।...হিন্দু আজ উপাসনার আশ্রয় ছুঁতে গেল। আশ্রমের বড় ধর্ম—নব উপাসনার প্রবর্তন। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্র, নারী, পুরুষ, বালব্রহ্ম পাঁচ মিনিটের জন্যও উপাসনা কর। আর কিছু না হোক—একবার স্বরণ করো—“ঈশ্বর তুমি হৃদয়ে বিরাজ করছ—তুনি আমি এক।” যা মুখে বলা তা না করায়, আমরা আজ উৎসর্গের পথে বসেছি। মুখে নরনারায়ণ, গুরু, ভগবান বল আবার পরমুহূর্তে ভগবদদর্শনের জন্য। নিজের মুক্তি মোক্ষের জন্য চিন্তিত হও কিসের জন্য? উপাসনা জাতিরক্ষাকারী সত্য আচারের প্রবর্তন কর। জাতিকে দাও একটা dynamic religion—একটা বীর্ষপ্রদ নূতন সাধনা।

অতীতের মৃত পদ্ধতির অনুসরণ করলে আর চলবে না। নবীন সতেজ আত্মার আগুন প্রাণে জ্বালিয়ে, প্রত্যেক অস্থিতে রক্তের প্রতি কণিকায় ভাগবৎ অনুভূতি ভরিয়ে এই তেত্রিশ কোটি নরনারীকে তেত্রিশ কোটি দেবতাতে পরিণত করার সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হও। ভারতে একটা নূতন জাতি, একদল নূতন মানুষের অভ্যুদয় হোক—যারা জুড়িয়ার স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নকে ধরায় নামিয়ে আনবে, মর্তে অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা সত্য করে তুলবে—জগতকে নবশান্তি, প্রেম, আনন্দনিকেতনে, নবরম্ভাবনে পরিণত করবে।*

—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

* ১৩৩০ সালের অক্ষরভূতীয়া উৎসবে ‘আশ্রম সম্মিলনে’ প্রদত্ত ভাষণের কিয়দংশ।

সাধন-কণা

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে ধারার বসতি
এ সুখ বুঝবে কারা।

এই প্রেম অতিশয় মমতাবৃত্ত, অতিশয় ঘনীভূত, নৈষ্ঠিক প্রেমে অন্তকরণ সম্যকরূপে নির্মল হয়, তাই সেখানে পুলকের জন্ম। ঘনীভূত প্রেম দ্রব হয় পুলকের শিহরণে, ধারারূপে সাধকের অন্তর বিধৌত করিয়া দেয়। সে পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুন্ড সর্বাঙ্গে ঢালিয়া যে শীতল হইয়াছে, তার সুখের মাত্রা কে বুঝিবে? চণ্ডীদাসের কথাতেই বলি :

সম্যক কহিতে নারি বিদরে পরাগ।

* * *

এ সাধনার পথে প্রধান বাধা, নিবৃত্তি। কোন ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মুখ যদি ফিরাইয়া দেওয়া হয়, সহজ গতি আর কোন দিন ফিরিবে না। সাধকের প্রত্যয় থাকা চাই যে, প্রবৃত্তি সহস্রমুখী হইলেও গতির মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। এই প্রবৃত্তি ঈশ্বর সাধনায় যুক্ত হইলে, উহাকে আর প্রবৃত্তি বলে না। তখন উহা রতি আকারে দেখা দেয়। প্রেমের গ্যাঢ় রূপই রতি। পুলক শিহরণ রতি উদয়ের সূচনা। ঈশ্বরে রতি জন্মিলেই রসসঞ্চার হয়, ইহাকেই রতি আনন্দন বলে। অন্তরে বাহিরে পরম শূচি হইতে পারিলে সকলেই এই অবস্থা লাভ করিতে পারে।

* * *

বৈদিক ধর্মে পাতঞ্জলির সাধন বিধির প্রয়োজন থাকিতে পারে; নবতান্ত্রিক বাঙ্গালী, তারা কেন পরধর্মের বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া ন্যূন পৃষ্ঠ হইবে? স্বধর্মে নিধন শ্রেয় না করিলে, আত্মার উদ্বোধন হয় কি? বাঙ্গালী আত্মধর্মে দীক্ষিত হও। পদ্মা-ভাগীরথী-প্রাবিত পূণ্য তীর্থে সাধনার অভাব নাই। চাই আত্মপ্রত্যয়, ভাগবতজীবন লাভের সূত্র আত্মাধ্য। ভজিতে ভজিতে নিগূঢ়ে অবধারিত পৌছিবে।

* * *

তবে কি আত্মশোধনের কোন ব্যবস্থা নাই? আছে। সে ব্যবস্থা পালন করা যার তার কর্ম নয়। কোপীন এক দণ্ডেই গ্রহণ করা যায়। হবিষ্যাত ভোজন ইচ্ছামায়েই হয়।

কিন্তু আত্মসমর্পণযোগীর যে শোধননীতি তা যেমন দুর্বোধ্য তেমন কঠোরসাধ্য। দুর্বোধ্য, কেন না বুদ্ধি দিয়া তাহা অবধারণের উপায় নাই। বুদ্ধিকে তলাইয়া অবচেতনার স্তরেই এ তত্ত্ব ফলিয়া উঠে। আর কঠোরসাধ্য এইজন্য যে, ইহার মধ্যে চেষ্টা করিবার কিছু নাই। যত শ্রম কিছুতে ইহা আসছে আসে না। নব সাধকের সুবিধার জন্য কিছু সংকেত দিতেছি।

* * *

শরণ যখন স্থির হয় অর্থাৎ ভাবের ভাবনা যিনি, তাঁর হাতে সব ছাড়িয়া সাধককে নিশ্চিন্ত হইতে হয়। আশ্রয়ে সব কিছু উঠাইয়া দাও। তাই বলিয়াছি, এই সঙ্গ যদি ভাঙ্গে, সাধকের জীবন সংশয় ঘটে। দীক্ষা-পূর্বে বিচারের অবসর। দীক্ষান্তে বিচার বুদ্ধি থাকে না। বাহিরের দিকে ওদাসীনা দেখা যায়। শরীর রক্ষার ব্যবস্থাটুকু ব্যতীত সাধকের অন্য চেষ্টা আর কিছুই থাকে না। শরীরের অন্যান্য ভোগ সবই নিবৃত্ত হয়। যদি কিছু থাকে, তাহা অভাস ও সংস্কারের খেলা, ঈশ্বর লীলা নহে। খাঁটি আত্মসমর্পণযোগী একথা ভাল করিয়াই বুঝে।

* * *

বাহিরে জাগিয়া উঠে ত্যাগ। শরীর পোষণ ব্যতীত কোন ভোগই ফুটিবার অবসর পায় না। কেননা, মন সতত যুক্ত হইয়া পড়ে অন্তরের সাধনায়। সেখানে যে হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে আহুতির বিরাম থাকে না। বলিধ্বংস জীবনের অসংখ্য বৃত্তি অবিরাম অগ্নিশুদ্ধ হইতে থাকে।

মধ্যযুগের সাধনায় ছিল দিব্য প্রকৃতি গঠনের উপায়— ত্যাগ ও নিগ্রহ। কিন্তু নিগ্রহে বৃত্তিনিচয়ের মূল বিনষ্ট হয় না। দুঃস্বপ্নরগীরা আকাঙ্ক্ষা ঘৃতাভূতি পাইয়া আরও অধিক জ্বলিয়া উঠে। জীবনের এই মহাসমস্যা মীমাংসার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে সবকিছু তুলিয়া দিতে উপদেশ দেন। গীতার এই আত্মসমর্পণযোগ বাঙলায় নানাছন্দে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। অতীতের প্রচেষ্টা সিন্ধুমূর্তি লইয়া উপস্থিত। বাঙ্গালী অকূলে কুলের কাণ্ডারী পাইয়া উল্লসিত, নব আশায় উদ্ভুদ্ধ।

* * *

প্রসঙ্গত—মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠ

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

তন্ত্রশাস্ত্রে এবং পুরাণে বলা হয়েছে সাধক তাঁর সিদ্ধি সাধনের জন্য মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ বা উপপীঠকেই বেছে নেবেন, কারণ এগুলি হলো দূত সিদ্ধির উপায়। অন্য সব তীর্থ মায়ের রাজধানী মাত্র, কিন্তু মহাপীঠ, সিদ্ধপীঠ, উপপীঠ তাঁর নিত্যলীলার নিত্য মন্দির। ব্রহ্মাণ্ডের মা যদি আমার মা হয়ে আদরে সোহাগে আমাকে ‘আম্ম আম্ম’ বলে না ডাকলেন তাহলে তীর্থে গিয়ে কি লাভ? তিনি যদি স্থালিতচরণে, ব্যাকুলকুন্তলে, চঞ্চলনয়নে দুই বাহু বাড়িয়ে আমার জন্যে ছুটে না আসেন তাহলে জন্মগ্রহণ ব্যাধি। মহাপীঠে গিয়ে কাকে দর্শন করবো—আমার যদি নিজের দর্শন করার ও দর্শন পাবার অধিকার না থাকে। মা যদি সহজেই এ চোখের গোচরে এসে যান, তাহলে এত সাধন, ভজ্ঞন, আরাধনা, উপাসনা কেন? মাকে দেখতে পেলাম না বলেই তো সব ছেড়ে মায়ের মন্দিরের পাশে এসে কাঁদছি, এ কাম্যায় কণপাত করে যদি মা তাঁর মন্দিরের দরজা খুলে দেন, নিজের হাতে চোখের জল মুছিয়ে দেন, দয়া করে স্তন চক্ষু দান করে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন তাহলেই বলবো তাঁর স্বরূপ দর্শন করেছি, তা না হলে দর্শন আর অদর্শন তো একই কথা। তাই বালি তীর্থ দর্শনের মতো মহাপীঠে গিয়ে সাধকের সহজে দেবদর্শন করার অধিকার নেই!

লোকেরা তীর্থে গিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করে, তেমনি যদি মহাপীঠে এসেও শুধু পিতৃশ্রাদ্ধ করি, তবে নিজের শ্রাদ্ধ করবো কোথায়? আমার যে মা ছাড়া সংসারে কেউ নেই—কার জন্যে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো? সাধকরা জানেন মাকে কিছু শোনানোর জন্যে মহাপীঠে যাওয়া নয়, অন্তর্ধামিনী মা তো সন্তানের কামা শূনে বসে আছেন। সেখানে যাওয়া কিছু শোনার জন্যে। তিনি যে অন্তরে বসে এতকাল শুনছেন, এবার বাইরে এসে তার কি উত্তর দেন তাই শুনতে হবে। যতক্ষণ তা না শুনছি ততক্ষণ মহাপীঠে যাওয়া সিদ্ধ হচ্ছে না। একথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন কেউ, মা শুনবেন অন্তরে বসে, আর উত্তর দেবেন বাইরে এসে—এ কেমন বিস্ময়কর। কিন্তু এই বিস্ময় ততক্ষণ যতক্ষণ ‘অন্তর ও বাহির’ দুটি বিষয়ের পরস্পরের

নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝে না উঠতে পারি। মহাপীঠে গেলেই দ্রুত সিদ্ধি হবে কেন? মহাপীঠ হলো বাইরেরকার বস্তু আর সিদ্ধি হলো অন্তরের। তাই দুয়ের সম্পর্কটাকে ভালভাবে বুঝতে হবে। যথাবিহিতভাবে সাধনা করতে পারলে সিদ্ধিলাভ হবেই এই দৃঢ় ধারণা না থাকলে অথবা সাধনার কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সিদ্ধির লক্ষণ খানিকটা প্রত্যক্ষ না করলে মহাপীঠ সাধনার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

জীবের জৈবী শক্তিকে পরাভূত করে ঐশী শক্তির আবির্ভাবকেই বলা হয় সিদ্ধি। মানবে দেবত্বের উপস্থিতি হলো সিদ্ধি। মায়াপাশ অতিক্রম করে মায়াতীত শিবসত্তার সাক্ষাৎকার হলো সিদ্ধি। সবই জীবের আত্মশক্তির মধ্যেই। সর্বশক্তি স্বরূপী মহাশক্তি জীবের দেহের মধ্যেই নিত্য বিরাজিত। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মরূপী হয়েও জীবের অদৃষ্টক্ৰমে তিনি নিজের লীলায় নিজেরি মায়ায় ধূমরাশি সমাচ্ছন্ন। সাধকের সাধন বাস্তব অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে মায়াময় ধূমরাশি বিদীর্ণ হয়। তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পায় স্বপ্রকাশ জ্যোতি নিম্নে জ্যোতির্ময়ী মা। সাধক তখন নিজে নিজের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে নিজের স্বরূপ হারিয়ে মায়ের স্বরূপে ডুবে যাবেন—এই হলো সিদ্ধির চরমাবস্থা। হৃদয়ের গ্রহি সব ছিঁড়ে যায়, সংশয় চলে যায়, কর্ম ক্ষীণ হয় সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারলে। তাঁর সাধনার প্রভাবে যিনি এইভাবে জ্যোতির্ময়ীকে জাগিয়ে তাঁর মায়ী ধূমের অন্ধকার বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে নিজের অন্তরে অন্তর্ধামিনীকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, তাঁর কাছে এ ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদাই একই রকম পীঠ। প্রতিটি স্থান সিদ্ধি স্থান। যিনি তাতে অসমর্থ তাঁর জন্যেই অন্য ব্যবস্থা। তাই মহাবৈদ্য ভগবান মুমূর্ষু জীবের অন্তরাগ্নি-স্বরূপী কুলকুণ্ডলিনীকে নিদ্রাভরনির্মীলিতা দেখেই বাইরের মহাপীঠে নিত্য প্রচ্ছলিত মহাজ্যোতি-স্বরূপী জগদম্বার কাছে গিয়ে তাঁর কারণ নিতে বলেছেন। অবশ্য দেহে মানুষ তার বাইরে আগুন জ্বালাতে পারবে সে আশা সুদূর পরাহত। তাই দাক্ষায়নী সতী দক্ষলীলাচ্ছলে ভক্তের জন্য, সাধকের জন্য, শ্রেলোক্য-ময় পুত্রের জন্য নিজের নিত্যহায়াময় দেহকে দান করে ইচ্ছাময়-দেহান্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দীনবন্ধু নারায়ণ

পতিতপাবন সেই জ্যোতির্মুস্তিতে একান্ত খণ্ডে বিভক্ত করে ধরতলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবুগাময় ভূতভাবন জীবের দেহে অগ্নিতাপ সংক্রামিত করে দেবার জন্যে নিজে ভৈরব-মূর্তি ধারণ করে মহাপীঠে রয়েছেন। তাই মহাপীঠে সাধারণ মানুষের মুক্তির সুব্যস্থা আছে।

জগদম্বার মৃতদেহ নিত্য। আসলে তাঁর নিত্য-চৈতন্য ছটময়ী মূর্তিকে কেউ মৃত বলতে পারেন না। তাঁর জন্মও মিথ্যা—আবির্ভাব মাত্র, মৃত্যুও মিথ্যা—অস্ত্যধান মাত্র। তাঁর মূর্তিকে কেউ যদি পাণ্ডুরোক্তিক দেহ বলে মনে করে থাকেন তাহলে তা মিথ্যে। এ শুধু চিন্ময়ীর চিন্ময়লীলা। তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ থেকে ব্রহ্মরক্ত পর্যন্ত সবই আত্মা। শুধু তাঁর লীলাশক্তিপ্রভাবে মহাদেবের সাধনাসিদ্ধির জন্য মূর্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছে। পুরাণের কাহিনী শুনে হয়তো মনে হতে পারে দক্ষনিন্দ্রী পতিব্রতা ছিলেন, তাই তাঁর নাম সতী। আসলে তা নয়। অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী যোগীন্দ্রা জ্ঞানেন—নিত্য সত্যস্বরূপিণী বলেই তাঁর নাম ‘সতী’। তাই তাঁর অঙ্গ কখনো অনিত্য হতে পারে না। জগৎও অসত্য অনিত্য। তিনিই শুধু সত্য। তাঁর দেহাঙ্গ সব সত্য ও নিত্য। তিনি ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপিণী। জ্যোতির মণ্ডল ও জ্যোতি, তার স্কুলিঙ্গও জ্যোতি। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গও জ্যোতি। তাই মহাপীঠগুলিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতের কথা বলা হলেও তা পূর্ণ মূর্তিময়ী দেবীতেই জাজ্বল্যমান। তা না হলে শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির পূজো হতো। ভক্তদের উদ্ধারের জন্যে সেই জ্যোতিই পাষণরূপে অধিষ্ঠিত। যে জ্যোতি অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপে

প্রত্যক্ষ হন, তিনি সাধারণ মানব দৃষ্টিতে পাষণরূপ হবেন তাতে বিচित्र নেই।

সাধকের সাধনাশক্তি, পীঠশক্তি, ও মন্ত্রশক্তি এই তিন শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্তরের ব্রহ্মশক্তি যখন পূর্ণভাবে মন্ত্রসাধ্য মহামূর্তিতে দর্শন দেবেন, তখনই অন্তরে বাইরে, বাইরে অন্তরে এক হয়ে যাবে। তাই বলা হয়েছে মহাপীঠে এসে তার কথা শুনতে হবে।

মহাপীঠের চেয়ে উপপীঠের বিশেষত্ব হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাতের অভাবেও ভগবান বা ভগবতী নিজের শ্রীমুখের প্রতিজ্ঞা বশতঃই সেখানে নিত্য অধিষ্ঠিত। সাধনার উপযোগিতা ও ফল মহাপীঠেও যেমন উপপীঠেও তেমন। ফলের তারতম্য অনুসারে উপপীঠ নাম হয় নি। ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপসত্তা সর্বস্থানেই সমান।

উপপীঠে নিজের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে জগজ্জননী যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সিদ্ধপীঠেও তাই। উপপীঠে লীলা-বিস্তার প্রসঙ্গে স্বতঃকৃত প্রতিজ্ঞা, আর সিদ্ধপীঠে সাধক-সাধিকার প্রতি পূর্ণপ্রসঙ্গতার জন্য ও তাঁদের গৌরব বাড়ানোর জন্যে মা এখানে প্রীতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন। মহাপীঠ ও উপপীঠে অধিষ্ঠানের কারণ নিজ লীলা আর সিদ্ধপীঠে অধিষ্ঠানের কারণ হলো ভক্তলীলা। মহাপীঠ ও উপপীঠ শাস্ত্রে নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ এবং সংখ্যাবদ্ধ কিন্তু সিদ্ধপীঠ তা নয়। তা অসংখ্য। সিদ্ধ পীঠের সৃষ্টি আগেও হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

“সত্য আশ্রয় কর। সাধনার বড় কথা—সত্য। নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই একমাত্র উপায়। যে সত্যকে বরণ করে সে নির্ভীক। যে অনন্য সত্যের আশ্রয়ে নির্বিকার, সেই জীবনের বড় জয় অধিকার করিতে পারে। দুঃখ ব্রতী হও, তপস্যা ক্রেশকর বলিয়া ভীত হইও না। যাহা করিবে তাহার সম্যক আচরণ শ্রেয়।”

—সম্বগুরু শ্রীমতিলাল

স্বদেশী আন্দোলন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

রঞ্জিত কুমার সেন

নেপোলিয়নের বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে : 'I Come, I saw and I won'. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনেও সেই উক্তির সার্থকতা লক্ষ্য করি। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে এসে দাঁড়াবার আগে তাঁকে দেখতে পাই একাধারে কবি ও ব্যারিস্টার হিসেবে রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ নিয়ে মামলা চালাতে। কি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দের বিচারে, কি আলিপুর বন্ড কেস ও তারকেশ্বর সত্যগ্রহ, কি ঢাকা ও দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা—সর্বত্র C. R. Das. এই মামলাগুলি ছিল পুরোপুরি স্বদেশী মামলা। সর্বত্র সেই অনন্য উক্তি : 'I Come, I saw and I won'.

প্রথম থেকেই দেশবন্ধুর জীবন ছিল দেশাত্মবোধে জাগ্রত। বাংলার সেই অগ্নিশুগে তাই যে-সব মহাপ্রাণ স্বদেশব্রতী ব্রিটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, তাঁদেরই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তখনকার গুপ্তসমিতির প্রতিটি মামলায় চিত্তরঞ্জন দেশপ্রেমের যে-প্রেরণা লাভ করেন, সেই প্রেরণাই তাঁকে একদিন সক্রিয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ মধ্যে এনে প্রতিষ্ঠিত করে। আইনের ক্ষেত্রে যেমন ছিলেন তিনি National Lawyer, জাতীয় জীবনে তেমন ছিলেন তিনি Uncrowned King বা মুকুটহীন সম্রাট। তাঁর রাজনীতিক জীবনে প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটে ১৯০৫ সালে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশ তখন অগ্নিদীপ্ত। একদিন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধের যে স্বদেশী ভিৎ গড়ে তোলেন, সেই ভিত্তির উপর গগনচুম্বি ইমারৎ গড়ে তোলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

সেদিন প্রবীণ ও নবীনের মতবিরোধে চিত্তরঞ্জন সানন্দে গ্রহণ করেন নবীনদের নেতৃত্ব। সেই ১৯০৫ সালেই বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সূচনা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ভাগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়ালিয়ারে জাতীয় জাগরণের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন : 'এই যে নতুন জীবন সঞ্চার—যাকে আমাদের সংবাদপত্রগুলি স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করেছেন, এই আন্দোলনই আঁচরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ হয়ে উঠবে।'

সে সময় সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পালের ওজস্বিনী বক্তৃতা, রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও রাধাবন্ধন

উৎসব দেশবাসীর প্রাণে যে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করে, তা আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্বল অধ্যায় হয়ে আছে।

ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন দেশবন্ধু। রাজনীতিক জীবনে সেদিন তাঁর নব অভিষেক। তার ভূমিকা রচনা করেন সুরেন্দ্রনাথ। ইংরেজি ভাষা পরিহার করে দেশবন্ধু এই প্রথম সভাপতির ভাষণ দেন বাংলায়। তিনি একাধারে কবি ও বৈষ্ণবসাহিত্য-ব্যাখ্যাতা, বাংলাই ছিল তাঁর যোগ্য ভাষা। বাংলার প্রাণভূমির উপর দাঁড়িয়ে তিনি দেশবাসীকে শোনান 'বাংলার কথা'। বলেন : '...যে অধিকার আজ আমরা দাবী করছি, তা যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত,—এই অধিকার থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস খৃষ্টান, এস—সকলে সম্মুখে বলি : আমাদের অধিকার আমরা চাই ; স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।'

বাংলার প্রাণভূমি থেকে সেদিন এই আহ্বান সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যা ছিল সেদিন বাংলার দাবী, তা-ই একদিন সোচ্চার হয়ে উঠলো সমগ্র ভারতবাসীর কণ্ঠে। এরই ভিত্তিতে আমরা স্বয়ং করতে পারি গোখলের সেই বিখ্যাত উক্তিটি : 'What Bengal thinks to-day; India thinks to-morrow.'

এ্যানী বৈশাফ্ট ও বাজ গঙ্গাধর তিলক তখন 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করে স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবী করেন। দেশবন্ধুকে তা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষত : এ সময়ে এ্যানী বৈশাফ্টকে অন্তরীণ রাখার ফলে কলকাতার ভারতসভা হলে তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু প্রভৃতি। দেশবন্ধু বলেন : 'I do not think the God of humanity was crucified only once ?'

আইন ব্যবসা তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ, সারা বাংলার নানা শহর ও পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেশ ও জাতিকে সংগঠিত করে চলেছেন দেশবন্ধু। দেশে তখন মডারেট ও চরমপন্থী দু'টি দল। চরমপন্থী হিসেবে দেশবন্ধুর কার্যাবলী

ও বক্তৃতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গভর্ণর রোনাল্ডসে বলেন :
'Mr. Das is an astute politician.'

ভারতে মর্টেগু-মিশন আসার পর থেকে সুরেন্দ্রনাথের স্থান অধিকার করেন দেশবন্ধু। ১৯১৭ সালের কলকাতা কংগ্রেসে তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন : 'আমি চাই—সমস্ত ভারতবাসী যেন সম্মুখে বলতে পারে যে, আমাদের শাসনযন্ত্র আমরাই পরিচালনা করবো। এদেশে দীর্ঘকাল ধরে আমরা আমলাতন্ত্রের প্রভু দেখেছি, আর তা দেখতে চাই না। সকল বিষয়ে আমরা দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা চাই।'—বলতে বাধা নেই যে, দেশবন্ধু তখন ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে। বৃটিশের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির চেতনাকে জাগ্রত করে স্বদেশী আন্দোলনকে বেগবতী করে তুলতে সেদিন দেশবন্ধুর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। 'মর্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিফর্ম রিপোর্ট' এবং 'রোলট বিলের' বিরুদ্ধে তিনি সেদিন সোচ্চার।

এদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী শুরু হয় তখন সত্যগ্রহ আন্দোলন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য যে ভারতীয় কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটিরও অন্যতম সদস্য ছিলেন দেশবন্ধু। অমৃতসরের ৩৪তম ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনেও তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধান। তাঁর বিদ্রোহী চিত্র সেদিন অগ্নিমাখত হয়ে উঠেছিল। যুবচক্রে জাগ্রত করে দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে তিনি উচ্চারণ করেন : 'মা, এতবার সংহারমূর্তিতে প্রকাশ হও মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করি।'

এ সময়ে দেশবন্ধু আইন ব্যবসা, বিলাস-ব্যসন সব পরিত্যাগ করে ফকিরের বেশে দেশের সামনে এসে উপস্থিত হন, কণ্ঠে তাঁর মাতৃবন্দনার মন্ত্র। তিনি তখন স্বদেশবন্ধু—দেশবন্ধু। কংগ্রেসের সংগঠনী শক্তিকে দৃঢ় করবার জন্যে বাদে তিনি সহায়করূপে গ্রহণ করেন, তাঁরা হচ্ছেন কিরণশঙ্কর, সুভাষচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের

মতো আত্মত্যাগী পুরুষ। গোড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন থেকে শুরু করে কাকে কোন্ কাজের দায়িত্ব দেবেন, দেশবন্ধুর সে-বিচারবোধ ছিল প্রখর। তিনিই হাওড়া কংগ্রেসের গুরু-দায়িত্ব দিয়েছিলেন কথাসিঙ্গী শরৎচন্দ্রকে। পত্রিকা প্রকাশ করলেন তিনি 'বাংলার কথা', 'ফরোয়ার্ড' ও 'নারায়ণ'। এ সময়ে তিনি বিলেতীবস্ত্রের বহুৎসব করেন, এবং 'স্বরাজ-সাধনা', 'বন্ধবন্ধু' প্রভৃতি নানা রচনা লিখে আপামর জনসাধারণের মনে এক গভীর দ্যোতনার সৃষ্টি করেন। বৃটিশ সরকার হয়তো এতদিন এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, তারা যন্ত্রণার ক'রে কারাবদ্ধ করলো দেশবন্ধুকে।

এই কারাদণ্ড ভোগ কালেই ভারতীয় কংগ্রেসের গয়া-অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন; পরে বোম্বাই অধিবেশনেরও সভাপতি হন তিনিই। এ সময়ে মতিলাল নেহরু তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় দেশবন্ধুর নতুন দল হিসেবে 'স্বরাজ্য দলের' শক্তিবৃদ্ধি পায়, এবং মডারেট দলকে পরাজিত করে তিনি কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের পতাকা উত্তীর্ণ করেন, সেইসঙ্গে পৌরপ্রতিষ্ঠানেও স্বরাজ্যদল প্রাধান্য লাভ করে। স্বাধীনচেতা বিপ্লবী মেয়র হিসেবে কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানকে সেদিন নতুন ক'রে গড়ে তোলাও ছিল দেশবন্ধুর অন্যতম কৃতিত্ব। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয় ফরিদপুরে। সেখানেও সভাপতি দেশবন্ধু। এখানেই প্রকৃতপক্ষে সমাপ্তি ঘটে তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের বিপুল কর্মসাধনার। এর মাত্র ছ'মাস বাদেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে লোকান্তরিত হন।

প্রাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে দেশকে এক সুমহান ঐতিহ্যে গড়ে তুলতে তিনি চিরকাল যেমন বিপ্লবীদের আগ্রহ দিয়েছেন, তেমনি জাতির উদ্দেশ্যে নিজের স্বর্ঘ্য দান ক'রে দেশবন্ধু সেদিন হস্তভাগ্য দরিদ্র দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। স্বদেশ-ব্রতের এমন উজ্জল নিদর্শন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল ॥

বিপ্লবী উপেন্দ্রকুমার ধর

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য

হাইলাকান্দির “পূর্বায়ন” সাপ্তাহিক পৌঁছিয়ে দিলো অগ্নিযুগের বিপ্লবী উপেন্দ্রকুমার ধর বিগত ১১ আগস্ট শিলচর মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে ৮১ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অমরলোকের যাত্রী হয়েছেন। প্রাণে আঘাত পেলাম। উপেনন্দা ছিলেন জীবন-সাথী পুরমবন্ধু। বিপ্লবী অর্থে উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদী নহে। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ছিলো মহান আদর্শ। পুরাতন ছিন্ন মাসিকে পড়েছি ঢাকার বিপ্লবী নরেন সেনের জীবন কাহিনী। তাঁরা দিনের বেলায় স্কুলে ছাত্র পড়াতে, আদর্শ শিক্ষকরূপে। সন্ধ্যারপর খোল-করতালে ভক্তিভরে করতেন নাম কীর্তন। আবার গভীর রাতে বিপ্লবীদের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে ধর্মীর ঘরে ডাকাতি। একবার এক জমিদার বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে একজন উত্তেজনা বশত এক নববধূর গলার হার ছিনিয়ে নিতে যেই উদ্যত, অমনি দলের একজন তাঁর গালে সজোরে চপেটাঘাত। নারী মাত্রই যে দেবী—মাতৃবৎ। দূরে এক বৃদ্ধা এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলেন : ওগো ওরা যে সাধারণ ডাকাত নহে, ভদ্র ঘরের সন্তান।

উপেন ধর তাঁর চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান গ্রন্থের ১০/৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : “বিপ্লব মানে শুধু ধ্বংস নয়। ধ্বংসের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন “chaos is necessary for the birth of a new Sun. বিপ্লবীদের চরিত্র কিরূপ—এ সম্পর্কে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নাই। হাজারীবাগ জেলে থাকাকালীন আমি প্রত্যক্ষ করেছি, অনেক কংগ্রেসী নেতা আমাদের গকে ভীতির চক্ষে দেখতেন। ভাবতেন, ইংরেজ নিধন এবং অর্থ-ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আমাদের একমাত্র করণীয় কর্ম। তারা ভাবতেও পারেন নি যে দেশের স্বার্থে ও বৃহত্তর আদর্শের জন্য প্রয়োজন বোধে ঐ সমস্ত কার্যভঙ্গাপ অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। ইতিহাস এ শিক্ষাই দেয়। বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এরূপ কর্ম কোন ক্ষেত্রেই করেন নি। তাদের চরিত্র সংস্কৃত এবং সর্বপ্রকার সেবামূলক কাজে অগ্রণী। এরা নীরব আদর্শ দেশকর্মী, ভগবানে বিশ্বাসী ও আদর্শোন্মীষ।”

উপেন ধরের জন্ম হয় গ্রীহটে, বিপ্লবের কর্মস্থল কাছাড়ের হাইলাকান্দি ও ভারতের উত্তর পূর্বপ্রান্তর। ১৯২২ ইং এর

কথা। কাটাখাল-জালাঘাটের রেল লাইনের পশ্চিম সুর হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে আগত রেলকর্মী রাজেন্দ্র দাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটে উপেন ধরের খেলার মাঠে। রাজেন্দ্র দাসই প্রথম প্রদান করেন বিপ্লবের অমোঘ বীজমন্ত্র উপেন ধরের কর্ণ কুহরে। রাজেন্দ্র দাসের পিতৃ বিয়োগের বাতী শুনলে উপেন ধর যান চট্টগ্রামে। ঐখানে সূর্য সেন (মাষ্টারদার) সহযোগে গোপনে আরম্ভ হয় মিলিটারী ট্রেনিং, দুর্জয় ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংসের মরণজয়ী সর্বভাগী বিপ্লবীদের দৃঢ় সংকল্প।

বেত মেরে কি মা ভুলাবে,

আমরা কি মান্নের সেই ছেলে।

দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,

কে পালাবে মা ফেলে ॥

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহারদের মর্মস্পর্শী এ গান। উপলক্ষ—অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুশীল সেনকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নির্মম বেত্রাঘাত। দেশমাতৃকার সেবার অবদান স্বরূপ সুশীল সেনকে নেতাজী সুভাষ আজাদ হিম্ম ফৌজ অধিকৃত আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গবর্ণর পদে বরণ করেছিলেন সানন্দে। গ্রীহটের বানিয়া-চঙ্গের সেন বাদাসের হেম সেন, বীরেন সেন, সুশীল সেন, শ্রীশ সেন প্রমুখ কয়েক ভাই। ১৯২১ খৃঃ-এ সেন বাদাসই সর্ব প্রথম বিপ্লবের বীজ রোপন করেন হাইলাকান্দিতে।

ডঃ আশা দাশ তাঁর “বিশ্বের সশস্ত্র অভ্যুত্থান” গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “বিপ্লবী উপেন ধর সূর্য সেনের অন্যতম শিষ্য। ভবিষ্যৎ সশস্ত্র গণ-বিপ্লবের জন্য যাঁরা তাঁর নির্দেশে কাজ করতেন উপেন ধর সেই inner organisation-এর সাংগঠনিক কর্মী। ১৯২৪ সালের পর কাছাড় ও আসামের বিভিন্নস্থানে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সূর্য সেনের নির্দেশে তিনি সংগঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪-২৬ এর শেষে সূর্য সেন ও উপেন ধর পলাতক অবস্থায় সুরমা উপত্যকায় করিমগঞ্জের কবিরাজ অবনী লাহিড়ীর সহযোগে বিপ্লবের সংগঠন কাজ করেন। ঐদিকে অবনী লাহিড়ী জীবন সারাহে কাশীপ্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ্রের “ভবানী মন্দির” গ্রন্থখান। তাঁদের জীবনের

বিপ্লবের রূপরেখা অঙ্কিত করে। তার সংগে ছিলো ইটালীর দ্রাণকর্তা ম্যাটাসিনীর Duties of man আর Path of Perfection গ্রন্থদ্বয়। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁদের ধ্যানের দেবতা। শ্রীঅরবিন্দের বাণী...There are times in a nations history when Providence places before it, one work, one aim, to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. Such a time has now arrived for our Mother Land, when nothing is dearer than her service when everything else is to be devoted to that end. If you will study, study for her sake, train yourselves body, mind and soul for her service...work that she may prosper, suffer that she may rejoice.

শ্রীঅরবিন্দের বাণী তাঁদের বিপ্লবের কর্ম পথে ইন্ধন জোগাইয়েছিল সর্বতোভাবে। ১৯২৭ ইং তে উপেন ধর ও হাইলাকান্দির হাইস্কুলের হেডমাস্টার রাজকুমার সেনের পুত্র সুশীল সেনকে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উপেন ধর ৭ বৎসর ও সুশীল সেন ৫ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশে হাজারীবাগ ও গন্ডা জেলে প্রেরিত হন। জেলে অমানুষিক অত্যাচারের ফলে উপেন ধর কয়েকবার অনশন করেন ও সুশীল সেনের মস্তক বিকৃতি ঘটে

সনৎ দত্ত কুমিল্লা কলেজের ছাত্র। (আমার মনে হয়, তিনি হাইলাকান্দির জ্যোতিষ দত্ত উকিলের পরিবারভূক্ত ছিলেন। নিজে এখানে থাকাকালে ঐ পরিবারে এক বিয়ে উপলক্ষে মাস্টার্স কক্ষানীর সঙ্গে 'ইনক্রাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিও হয়েছিল। বিপ্লবী উল্লাস করের যাতায়াত ছিল এখানে।)

উপেন ধর তাঁর 'চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান' গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "১৯৩০ ইংতে সনৎ দত্ত ও উমাশঙ্কর পাটোওয়ার আমার সঙ্গে হাজারীবাগ জেলে দেখা করেন। সনৎ দত্ত শ্রীহট্টের মৌলবী বাজারের অনিল দাসকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে মনিপুর হয়ে বার্মা এবং তথা হতে false ভিসা করে সহাইতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে দেখা করে অস্ত্র শস্ত সহ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয়বার যাবার সময় শ্যামদেশে false ভিসার জন্য ধরা পড়ে জেল হয়। ইংরাজ সরকার তাঁকে ভারতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলে শ্যাম সরকার রাজনৈতিক পলাতকরূপে তাঁকে মুক্তি দেন। ইংরাজ

সরকার তাঁর আর সন্ধান পাননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সনৎ দত্ত Air crush এ মারা যান। তাঁর মত মহান কর্মী বিরল।"

উপেন ধরের বিপ্লবের কর্মক্ষেত্র ছিলো হাইলাকান্দিতে আর প্রবর্তক সংঘের সাধক-সাহিত্যিক রাধারমণ চৌধুরীর অন্তরাশ্রা ও নাড়ীর বন্ধন ছিলো হাইলাকান্দি-কাটলীছড়ার সঙ্গে। ১৯২৯/৩০ ইং হাইলাকান্দি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবসের সভায় রাধারমণ চৌধুরী যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সে স্মৃতি এখনো মনে জাগে। উপেনদা হাজারীবাগ জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসামে হন অন্তরীণ। তখন আমার সঙ্গে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্বদা হতো ভাবের আদান প্রদান। তদবধি উপেন ধর ও রাধারমণ চৌধুরী আমার জীবনপথের আলোদিশারী। রাধারমণ চৌধুরী পরে বিরাটের সন্ধান পেয়ে সংঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করেন প্রবর্তক সংঘের ছত্র ছায়ায়।

উপেনদা হাজারীবাগ জেলের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "জেলে থাকাকালীন আমার সতীর্থেরা বলেছিলেন জেল জীবনে কোন প্রতিবাদ না করে দেশের সেবা করতে। আমার সংকল্প ছিলো অন্যায়ের প্রতি-রোধ করতে গিয়ে যদি দুঃখ বরণ করতে হয়, তাই করবো। দীর্ঘদিন ব্যাপী পর পর অনশন করায় জেলের অনেক পরিবর্তন ঘটে। জেলে পাঠাগার স্থাপিত হয়। শহীদ যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু বরণে রাজনৈতিক বন্দীরা অনেক সুবিধার অধিকারী হন। আমার অনশনের ফলে জেলে সুযোগ সুবিধা হওয়ায় বরণ্য নেতারা আমাকে স্নেহ করে 'রাজা' নামে ভূষিত করেন। আমার সতীর্থ সনৎ দত্তের পিতৃদেব ষোগেশ দত্ত ছিলেন পুলিশ সুপারেন্টেনডেন্ট। তিনি বলেছেন : আই, জি পুলিশের নির্দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পুস্তক পড়তে দেওয়া হতো, যাতে বিপ্লবীরা গোপন আন্দোলন ছেড়ে সাম্যবাদের মাধ্যমে গণআন্দোলন করে। বিপ্লবীদের মধ্যে যাদের ভারতীয় কৃষি ও সভ্যতার জ্ঞান ছিলো না, তারাই বিপ্লববাদের পথ ছেড়ে সাম্যবাদের পথে ধাবিত হয়।"

উপেনদা তাঁর গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় আবার লিখেছেন : "জেলে আচার্য কৃপালনী, সীমান্ত গান্ধী, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ,

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ নেতাদের সাথে পরিচয় ঘটে।...১৯৩৪ সালে মাঠারদা সূর্য সেনের ফরাসি সংবাদ পাই। সে দিন মাঠারদার প্রতিশ্রদ্ধা জ্ঞানাতে সকলই মিলিত হয়েছিলেন।”

আদর্শবাদী বিপ্লবীরা চির নবীন। উপেনদা ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চ শিরঃ। স্বাধীনতার পর তিনি ইচ্ছা করলে নানা সুযোগ সুবিধা পেতে পারতেন, কিন্তু সে পথের পথিক হন নি। উপেনদা রাধারমণদা ছিলেন অভিন্ন হৃদয়। আমার সাহিত্যসাধনার মূলে রাধারমণদা ও উপেনদা। আমার প্রথম গ্রন্থ ‘মীরাবাদি’ প্রকাশ করেন রাধারমণদা। গ্রন্থখানা অর্পণ করি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কর কমলে। সঙ্গে উপেনদা দু’লাইনের পত্রে আমার পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন—ইতি “রাজা সাহেব”। সঙ্গে সঙ্গে ইন্সটিগুর কভারে সারস্বত দক্ষিণা।

উপেনদা ছিলেন নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আঞ্জীবন সভ্য। আমরা একসঙ্গে যোগদান করেছি বহু সম্মেলনে। কয়েক বৎসর পূর্বে কাকোড়ী ষড়যন্ত্রের বিপ্লবী শ্রীশচীন বকসী আহ্বান করেছিলেন বারাণসীতে বিপ্লবীদের

সম্মেলন। তাঁদের সঙ্গে উপেনদার কথা আলাপ প্রসঙ্গে সকলই একবাক্যে তাঁর ত্যাগ তপস্যা দেশ সেবার উচ্চ প্রশংসা করেন। রাধারমণদা দু’বার ও উপেনদা প্রায়ই কাশী ধামে আসতেন। আমার মাকে তাঁরা মা জননী বলে ডাকতেন মাও তাঁদের স্নেহ করতেন আপন সন্তানের মত। উপেনদা ভারতে বহুতীর্থ ভ্রমণ করেছেন। কখনো একা কখনো আমি তার সাথী। পূজ্য গোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীঅনিবার্ণ, স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ, কাশ্মীরের অশোকানন্দ প্রমুখ সাধুসন্তের সান্নিধ্য লাভ করেছেন তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে। ‘জীবন রত্ন’, ‘Whither India whither Assam,’ “What then we must do, ‘জাতীয় সংকটের সমাধান কোন পথে’ ‘চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান’ গ্রন্থ প্রণয়ন করে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন জীবন পথে। প্রথম তিরোহিত হলেন রাধারমণদা, তারপর উপেনদার বিরহে এখন বন্ধুহীন নিঃসহায়। অন্তে শ্রদ্ধার্থ অর্পণ করি উভয়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শিবভূমি কাশীধাম থেকে।

বাংলা সাহিত্যের সেতুবন্ধ—ঈশ্বর গুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতচন্দ্র রায়ে যে-যুগের অবসান তার সঙ্গে রঙ্গলালে যে-যুগের সূচনা সেই যুগের সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন স্বনামধন্য কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তাঁর মধ্যে অসামান্য সাংবাদিক-প্রতিভার বিকাশ হয় যে-দৃষ্টান্ত সর্ব দেশে সর্ব যুগে বিরল। তিনি একটি শক্তিশালী সাহিত্যসেবী-সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি ক’রে যান যার জন্যে তাঁকে প্রকৃত অর্থে দলনায়ক বা দলপ্রধান আখ্যা দেওয়া যায়। ১৭৬০-১৮৫৮ পর্যন্ত প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যজগতে তাঁর চেয়ে বড়ো ব্যক্তিত্ব আরো দেখা গেলেও তাঁর মতো প্রখর মানসিকতা, খুব কম কবি ও সাংবাদিকের মধ্যে দেখা গেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত এক প্রেরণাসমুজ্জ্বল কবিগোলা বা কবিগানের

শিল্পীদের এক উন্নত আধুনিক সংস্করণ ছিলেন। কবিগানের শিল্পীদের অবজ্ঞার চোখে দেখাই সাধারণ রীতি। কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত বা তথ্যনির্ভর নয়। কাব্যরসের বিচারে ১৭৬০-১৮৫৮ সালের কবিগোলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গদ্যকবিতার শিল্পীদের চেয়ে সর্বাংশে উন্নত। “কবিগোলা” বিশেষণটি তাল্ফিলাদ্যোতক; কবিগানের শিল্পী বলে এঁদের বর্ণনা করাই বৃচিসম্মত। এই সব শিল্পীদের মধ্যে রামনিধি গুপ্ত, দাশরথি রায় ও ঈশ্বর গুপ্ত অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এ-সত্য অস্বীকার করা সাহিত্যিক অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। কবিগানের শিল্পীদের রচনায় শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণ, সমালোচনা, তর্ক, মতভেদ প্রতিদিনের সামাজিক জীবন

সমক্ষে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হ'ত। এ'রা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে যুগনিষ্ঠ ও স্বকাল-সচেতন ছিলেন। ইশ্বর গুপ্ত ঐ সঙ্গে ছিলেন এক মহা যুগন্ধর পুরুষ।

বাস্তবসচেতন ব্যঙ্গবোধের তীব্রতার সাহায্যে “কবি”-কুল পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে সমসাময়িকতার শাঁস এনে দিয়েছিলেন। তাঁদের শিল্পশক্তি অল্প ছিল; কিন্তু তাঁদের সাহিত্যদৃষ্টি বায়ুলোকের পরিবর্তে সমকালীন জগতের মস্তিষ্কান্তরে নিবদ্ধ ছিল। তাঁরা কেবল পূর্ববর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যের জাবর কাটতেন না। এখানেই ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের মস্ত পার্থক্য। ভারতচন্দ্রের মতো অসাধারণ কবি-ব্যক্তিত্বও মঙ্গলকাব্যের রোমন্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্যত কবি-কুল স্বাধীন মানবিক রসসম্পত্তির দিক দিয়ে নরনারীর প্রেমানুভূতির আলোচনা করেছেন—এটা খুব বেশি অগ্রগতির চিহ্ন। তাঁদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বেনামিতে কবিতা লিখবার রেওয়াজ ক'মে গেছে। বস্তুত রাধাকৃষ্ণের ছদ্মনামে নিজের প্রেমানুভূতির কবিতা রবীন্দ্রনাথ ও ষ্টিভেন্সলালকেও লিখতে হয়েছিল। সৌন্দর্য থেকে “কবিগলা”-রা যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় চিয়েছিলেন। চিন্তার স্বাধীনতা ও মনস্তত্ত্ব-অভিজ্ঞতার পরিচয়, ধর্মের আবেষ্টন থেকে মানব প্রবৃত্তির মস্তিষ্কায়ন করে তার জয়-ঘোষণা কবিগানের শিল্পীদের একটা বড়ো কীর্তি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের Cavalier কবিদের মতো এই বে-পরোয়া ভাব, এমন সমাজনিরপেক্ষ প্রেমের ধারণার উদ্ভব সে-যুগে কি করে হয়েছিল, তা গভীর ভাবে চিন্তার বিষয়। তাঁদের প্রণয়-কবিতায় সমাজকে উপেক্ষা করার স্পষ্টতর নতুন যুগ-মনোভাবের পরিচায়ক।

কৌলীন্যপ্রথার জন্য পরিবারমধ্যে সঞ্চিত প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা ও গুপ্তপ্রেমের সূপ্ত অভিমান এই নতুন ভাবধারার উৎস। কৌলীন্য ভঙ্গ করার প্রবণতা থেকে লুকিয়ে-রাখা প্রেমের বাসনাকে চরিতার্থ করার প্রয়াস ও প্রচলিত সমাজ-বন্ধনের প্রতি বিদ্রোহের ভাব প্রত্যেক উচ্চ বর্ণহিন্দু পরিবারে গোপন ছিল। সে-যুগের কাব্য-ভাব-গগন নিরুদ্ধ বেদনাময় প্রেমের অনুভূতির বাষ্পে উদ্ভূত ও আচ্ছন্ন ছিল। ঐতিহ্যের গ্রাস থেকে প্রেমকে মুক্তি দিলেন কবিগলা'রা। রাধাকৃষ্ণের অঐবধ প্রেমের পৌনঃপুনিক বর্ণনার গতানু-গতিকতা থেকে বাংলা কবিতা ও গান এ'দের সাধনায় মুক্তি

পেয়ে নবীন ভাবে উদ্ভূত হ'ল। নারীর প্রেম-নিবেদনের স্পর্ধা কৌলীন্যপ্রথারিষ্ট সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ধৃত হ'ল। কবিগানের শিল্পীদের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁদের এই প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। যুগসঞ্চিত অচরিতার্থ বাসনার প্রধূমিত জ্বালাই তাঁদের লেখনীতে সাহস জ্বলিয়েছিল। তাঁদের কাব্যেই এই সাহস প্রথম স্বাধীন আভিযান্ত্রিক লাভ করে। রসের এই উচ্ছল অনর্গল প্রকাশের জন্যেই তাঁদের কাব্য-সম্প্রদায় এক কালে “রস-গ্রন্থাবলী” আখ্যা লাভ করেছিল।

ইশ্বর গুপ্তের মধ্যে আধুনিকতার প্রভাব স্পষ্ট। আরো পঞ্চাশ বছর আগে জন্মালে তিনি প্রকৃত অর্থে “কবিগলা” হতে পারতেন। কিন্তু সন্ধিপূর্বে জন্মগ্রহণের জন্যে তাঁর রচনায় পূর্বযুগের ভাবধারা ও শিল্পকাজের সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাব বিমিশ্রভাবে দেখা যায়। তাঁর আধ্যাত্মবিষয়ক কবিতায় বাংলা কাব্যে চর্যাপদের যুগ থেকে চিরপ্রচলিত ধারার সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি মঙ্গল-কাব্যের ধারায় বিশেষ বিশেষ দেব বা দেবীর বন্দনা না করে কেবল ইশ্বর-আরাধনাবিষয়ক কবিতা রচনা করে প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম ঘটালেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর ওপর রামমোহনের প্রভাব সক্রিয় হয়ে থাকবে। এতদিনে মঙ্গল-কাব্যপ্রবাহ সম্পূর্ণ শুষ্ক হ'ল। তিনি ইশ্বরের স্মরণ ভাব কল্পনার ওপরই জোর দিয়েছেন। রামপ্রসাদের মতো তাঁর মধ্যেও অনুযোগপরায়ণতার ভাব দেখা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদের ভক্তির নিবিড়তা তাঁর রচনায় দুলক্ষ্য। তাঁর মধ্যে উচ্ছ্বাস খুব কম, তাঁর সব কবিতাই যুক্তিপন্থী। এই ‘যুক্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়াসই’ আধুনিক যুগের মনোধর্ম।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ব্যঙ্গ ও শিল্প-কুশলতায় মিল থাকলেও তিনি মঙ্গলকাব্যের ধারা পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করেন নি। চর্যাপদের “সন্ধা ভাষা” তিনি ছড়ায় পুনঃপ্রয়াগ করলেও কোন গুপ্ত তাত্ত্বিক বা যৌগিক সাধনার প্রভাব তাঁর রচনায় একেবারে নেই। রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রভাবে সার্বভৌম সর্বজনীন ইশ্বরই তাঁর আরাধ্য হলেন। যে-ব্যঙ্গপ্রবণ মনোবৃত্তি তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম, সেটি আধুনিক-বাস্তববোধের রসে পরিপুষ্ট। সমসাময়িক সমাজজীবন ও পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতি থেকে উদ্ধৃত বিকৃতির বিরুদ্ধে তাঁর

বিদ্যুৎ-বাণ বর্ষিত হয়েছে। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় তাঁর ব্যঙ্গপ্রিয়তার উপলক্ষ সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর সময়ে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ পরবর্তী যুগের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই কারণে তাঁর ব্যঙ্গ-প্রাণতার লক্ষ্যস্থল খাস ইংরেজ সমাজ যতটা, ইঙ্গবঙ্গসমাজ ততটা নয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর তাঁর ব্যঙ্গ সর্বদা উদ্যত ছিল। পরবর্তী যুগে হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের ব্যঙ্গবাণ প্রধানত ইঙ্গবঙ্গদের লক্ষ্য করেই নিক্ষেপ করেছিলেন।

যে কারণে প্রতিধ্বনি ধ্বনিকে সর্বদা ব্যঙ্গ করে, ঠিক সেই কারণে নিজেদের স্বর্ণ গোপনের জন্যে আধুনিক ভারতীয়রা সর্বদা ইংরেজ জাতির সব কিছুই দোষাবহ জ্ঞান করে ব্যঙ্গ করে। ঈশ্বর গুপ্তও এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর বাস্তববোধ সমসাময়িক ইংরেজ সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে লব্ধ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সজাত। অনুরূপভাবে, আমাদের দেশপ্রেম বা প্যাট্রিয়টিজম সম্পূর্ণভাবে পাকাত্য ভাবধারণগত। অথচ আমাদের দেশপ্রেম তথা জাতিবৈরের প্রথম শিকার হয়েছিল ইংরেজরাই।

পূর্বতন কাব্য-ঐতিহ্য ছিল মামুলি শাস্ত্র অনুসারী। নতুন যুগপ্রভাব মৌলিক চিন্তার উন্মেষ সাধনে সমর্থ হ'ল। সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির অবাধ ক্ষুরণ হ'ল। দেশপ্রেমের সবল কিন্তু সংকীর্ণ উচ্ছ্বাসও দেখা গেল তাঁর কবিতায়। তীক্ষ্ণ বাস্তবরস বাস্তবালি সমাজের পক্ষে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে তাঁর কবিতায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। সমাজের সর্ব অঙ্গের পর্যালোচনায় তিনি নব-অজিত বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। যে কোন বাস্তব চিত্র রূপায়নের সময়ে তাঁর স্বাভাবিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা তৎপর হয়ে উঠে। পৌষ-পার্বণের বর্ণনা দেবার সময়েও তিনি একানবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরবার কারণগুলি সুকৌশলে দেখিয়ে দিয়েছেন যে-মুন্সিআনা পূর্ববর্তী কবিরা কল্পনাও করতে পারতেন না।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের একটি প্রবল লক্ষণ হ'ল ব্যঙ্গ-প্রবণতা। ব্যঙ্গরস ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে তাঁর ব্যঙ্গ করার শক্তি ব্যঙ্গের প্রয়োজন না থাকলেও বাস্তবচিত্র অঙ্কন-কালে আত্মপ্রকাশ করত।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে অন্তর্নিহিত বাস্তববোধের উৎকট আতিশয্য দেখা যায়। তাঁর অভিনব বর্ণনাত্মক বিভিন্ন ক্ষতুতে মানুষের বিভিন্ন দুঃখের বর্ণনা দান করে। কালিদাস-জয়দেব-বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-প্রমুখ প্রকৃতিবর্ণন-

ব্যাপার অভিজ্ঞ প্রাচীন কবিদের সঙ্গে তাঁর বর্ণনপদ্ধতির একটা স্পর্শিত বৈপরীত্য দেখা যায়। তিনি ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধির সাহায্যে ভিন্ন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্পদ আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন নি। কোন উৎসাহমানস উপলব্ধিকে তিনি কখনও আমল দেন নি। চোখ মেলে দেখে যা পেয়েছেন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। ফলে, অসংস্কৃত ঐন্দ্রিয়িক বলিষ্ঠ বাস্তববোধ প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে পরিষ্কৃত হয়েছে। তাতে তাঁর কবিতা কাব্যগুণে পূর্ববর্তীদের চেয়ে সমৃদ্ধতর হয়েছে তা নয়। তবু এই সব কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের জন্যে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হলেও জীবনীশক্তির প্রাবল্য লক্ষণীয়। বাস্তববোধ ও সত্যনিষ্ঠার জাগরণ প্রয়োগে তাঁর দান ও কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

মনোভঙ্গিতে যুক্তিবাদ কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে কণ্ঠকম্পনা তাঁর বিশেষত্ব। ড্রাইডেন-এর কবিতায় যেমন দার্শনিক ও ধূপদী ভঙ্গির মিলিত প্রকাশ, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তেমনি যুক্তিবাদ ও কণ্ঠকম্পনা যুগপৎ সমাবিষ্ট। তাঁর “গ্রীষ্ম” একটি স্বচ্ছ অনুভূতির বিবরণবিষয়ক কবিতা; “গ্রীষ্ম” পূর্ববর্তী কবিদের ঐতিহ্যের স্পর্শহীনতার জন্যে অনাড়ম্বর রচনা; সেই কারণে এখানে তাঁর কবিত্ব অমার্জিত সরলতায় অভিব্যস্ত। পূর্ববর্তী কবিদের ভাবাদর্শ তাঁকে স্পর্শ করে নি। “বর্ষা” কবিতায় তিনি সংস্কৃত কাব্যের ঐতিহ্যকে একেবারে অতিক্রম করেন নি। বর্ষার সচেতনীকরণে তাঁর বাস্তববোধ পুনরভিব্যস্ত। “শরৎ”-বর্ণনায় কবিত্বের স্পর্শ দেখা যায়।

প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির মাধুর্য না দেখে, তার স্বতন্ত্র নিঃস্ব সত্তার অন্তর্নিহিত রূপ ও রস যথেষ্ট মনে না করে, প্রকৃতির ওপর মানজীবনের ধর্ম আরোপ করে মানবজীবনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা অধোমুখ বা ক্ষয়িষ্ণু যুগের স্বভাব। বর্তমানে গদ্যকবিতার অক্ষম শিল্পীদের হাতে প্রকৃতি বর্ণনার এই স্বভাব আবার রূপ পরিগ্রহ করছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের হৃদয় অবলম্বনে আধুনিক উনিশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদকে রূপায়িত করেছেন, এটাই তাঁর বিশেষত্ব। এভাবেই তিনি ভারতচন্দ্র ও রঙ্গলালের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করেছেন। তিনি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও বাঙ্কমচন্দ্রের গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর সে-ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

গীতাঞ্জলির গান

মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, সংগীত রত্নাকর

গীতাঞ্জলির গানগুলিতে কবিগুরু হৃদয়ভরে তাঁর জীবন-দেবতার পায়ে দু হাত ভরে অঞ্জলি দিয়েছেন। শিম্প-শৈলীর এক অপূর্ব মহত্তম প্রকাশ। বিশ্বজনীন এর আবেদন। নিখিল বিশ্বের মানুষের মনে এ গানের সুর অতি আশ্চর্যভাবে স্পন্দ করে! বৈদান্তিক শিক্ষার সাবরস্তু এর অভিব্যক্তি!

কবির অপূর্ব লেখনীর অমৃতময় পরশে গীতাঞ্জলির গানগুলি ভাবের সুসমা-লালিত্যে, অপবূপ রূপে ও রসে স্নিগ্ধ ও স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাব, ভাষা ও সুরের অপূর্ব ত্রিবেণী সংগমের এক অত্যাশ্চর্য প্রকাশ কবির সৃষ্ট এই গানগুলি। জীবন দেবতার মহিমময় প্রকাশ কবির ধ্যানসমাহিত দৃষ্টিতে। তাঁর কাছে কবির প্রার্থনা, নিবেদন, ভিক্ষা, আশা, প্রেরণা, জীবনের শ্রেষ্ঠ চাওয়া-পাওয়া সবিশেষ বিশেষণে কবি তাঁর তৃষিত জাগ্রত হৃদয়-এ জ্বালাতে চেয়েছেন একটি চির জাগরণকে প্রেমের অনিবার্ণ দীপাশিখা।

‘যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে

মুক্ত কর হে বন্ধ।

সম্ভার কর সকল কর্মে

শাস্ত তোমার ছন্দ।’

প্রত্যয়ের প্রথম আকর্ষণে তিনি যখন উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি নিয়ে দেখা দেন, তখন শুধু যে বাইরের অন্ধকার-ই ঘুচে যায় তাই নয়, তাঁর মধুর স্পর্শে মনের যাবতীয় আঁধার নিমেষে মিলিয়ে যায়। তাই, কবি গেয়েছেন—

‘আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলো।

আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো।’

তিনি প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন তাঁর মূর্ত আবির্ভাব। পাতাল পাতাল যখন আলো নাচে, নীলা নভে যখন মেঘ ভেসে যায়, তাঁর প্রেম ও করুণা এই বাতাসে যা সকল সময়েই মধু-বর্ষণ করছে।

‘গীতাঞ্জলি’র গানগুলি পড়লে ও সে সুরের রসাস্বাদন করলে মনে হয় না এগুলি জড়পৃথিবীর, কোন মরণশীল কবির হাতের রচনা; মনে হয় দু্যলোক ভুলোকের কোন অমর স্বর্ষির স্বর্গ হতে ঝরে পড়া কোন দৈববাণী!

মানুষের প্রকাশ যে কত মহৎ হতে পারে, লিখনী যে কত সুন্দর হতে পারে এ গীতিকাব্যখানি তার আশ্চর্য নিদর্শন!

ওদের মধুর সুরগুলি যখন কানে ঝংকার তোলে, ওদের ভাবের গভীর গহনে ডুব দিলে দেখতে পাই কত শত নানা উজ্জ্বল বর্ণের মনি মুক্তা রাশি!

এই গীতিকাব্যে স্বর্গ ও মর্ত্যের এক অশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে। সুদূর কিম্বরলোক গন্ধর্বপ্রদেশের সঙ্গে আমাদের ধরিত্রীর এক প্রগাঢ় সেতুবন্ধন—মানুষের ভাবের রাজ্যে গীতগুলিকে এক চিরস্থায়ী আসন দিয়েছে।

এ গান যেন ইন্দ্রিয়লোক ছাড়িয়ে কোন সুদূর অতীন্দ্রিয়-লোকের সন্ধান আনে—‘আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে

কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে’।

বসন্তবাহারের চঞ্চলতা কবির তৃষিত চঞ্চল মনটিকেই রূপ দিয়েছে।

‘আমার খেলা যখন ছিল তোমার মনে

তখন কে তুমি তা কে জানতো

তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে

জীবন বয়ে যেত অশান্ত’।

উপরের দুটি গানেই সেই পরম রূপের, সুন্দরের স্বতঃ প্রকাশ দেখি। প্রকৃতির দৃশ্যে, গন্ধে গানে কবি তাঁর স্বাভাবিক আবির্ভাবকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এত কাছে, এত অঙ্গাঙ্গিভাবে তিনি আছেন যে কবি একদা তাঁকে নিজের খেলার সাথী হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। এখানেই কবির দৃষ্টির সূক্ষ্মতা! তাই ঈশ্বর তার কাছে কোন না-দেখা বিরাট পুরুষাকার কোন মূর্তি নয়। তিনি তো নিত্য বহু! পায়ে চলা পথের সাথী। প্রেম ও অনুভব থাকলে তাকে প্রকৃতির সবখানেই দেখতে পাই। তাই তো কবি বলেছেন,

‘আমার নয়ন ভুলানো এলে

আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।

শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে

শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে।

অরুণ রাঙা চরণ ফেলে নয়ন-ভুলানো এলে’।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ একদিন যেমন সোনার বরণ সহস্র ডাফোডিলসের হাওয়ার তালে তালে নৃত্য দেখে বিস্মিত হয়ে যান, গাছের পতার নাচে কবির হৃদয় হরণ করেছিল—এই তো সকল চাওয়া-পাওয়া।

পরমতম প্রাপ্ত। প্রকৃতির পরম রূপময় প্রকাশেই তার বাক্তিত্ব পরমবস্তুকে যে চিন্তে পারে সেই তো অনুভবযুক্ত মানুষ।

‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

পরশ সখা বন্ধু হে আমার।’

ঝঙ্জাময় মঙ্গীলপ্ত আকাশের সেই ভীষণতার মধ্যে কবি তার পরমবস্তুর সাথে একান্ত নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে চাইছেন। সেই ভীষণতা ও রুদ্ধতার মধ্যে কবি যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন তা স্পষ্ট ও সত্য।

রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে, ভাবে, অভাবে নিলিপ্ততায় কবি তাঁর জীবনদেবতাকে দেখেছেন বা দেখা পাওয়ার ব্যাকুলতায় তাঁর মন চঞ্চল হয়েছে। প্রতিদিন দেখার মধ্যে তার নতুনত্ব কবিকে মুগ্ধ করেছে, তাই কবি গেয়েছেন—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে

এসো গন্ধে, বরণে, এসো গানে।

এসো সঙ্গে পুলকময় পরশে

এসো চিন্তে অমৃতময় হরষে

এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়নে।

চরম ব্যাকুলতায় সকল বস্তুর সন্ধান মেলে। তার ক্ষণিক অমৃতময় পরশ নিমেষে আমাদের জড় মনকে চেতনাদীপ্ত করতে পারে।

‘গীতাঞ্জলি’র কথাগুলি যেমন মধুময়, তার সুরগুলিও ততোধিক সুমিষ্ট, কথা ও সুরের এমন আশ্চর্য মিলন অপর কোন সংগীতে বিরল। ব্যাপ্ত ও গভীরতায় জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ একমাত্র বিঠোফেন ছাড়া আর কোন সঙ্গীতজ্ঞ দেখা যায় না। কথা ও সুর একই খেয়ায় পারাপার হচ্ছে কিভাবে তা দেখা যাক, যেমন :—

‘আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলো’

এ গানটি উষাকালে সন্ধ্যার উদয়ের সঙ্গে সকালের ভৈর রাগের কোমল সুরটিকে ব্যবহার করেছেন। তাই শক্তিময়ে আবাহন ও পূজা এখানে যথার্থ।

অন্য আর একটি গান, —‘আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিষে এল

গেলরে দিন বয়ে,

বাঁধনহারা বৃষ্টি ধারা স্বরুছে রয়ে রয়ে।’

উপরোক্ত গানটিতে রয়েছে শান্ত ও গভীর ইমন্ কল্যাণের

প্রয়োগ। মনে হতে পারে বৃষ্টি তো ঝঝঝঝ পড়ে কাজেই ছটফটে। কিন্তু নির্জন অধারে কবির নিলিপ্ত মন সেই বারিধারার মধ্যে কী বাণী শুনতে পাচ্ছেন? এখানে বৃষ্টি দাতা, কবি গ্রহীতা, অপর কোন তৃতীয় প্রাণী নেই, কাজেই চঞ্চলতা নেই। আছে ধ্যান, তাই ঐ রাগের প্রয়োগ প্রকৃষ্ট হয়েছে।

এই গীতিকাব্যের সুন্দর গানগুলি আমাদের মনের অসামঞ্জস্য ও দৈনন্দিন কলুষতাকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তে এমন একটি পারসপেকটিভের মধ্যে দাঁড় করায় যাতে মানুষের ভাবের তন্ত্রীতে ওরা সক্রিয় ছন্দের মতো বেজে ওঠে।

কবি বলেছেন, ‘আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণাগকে ভাষা দিতেছে। আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ বেদনা ও নব বসন্তের বনাস্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার ব্যাধা বিস্মৃত বিহ্বলতা।’ সুর শ্রবণে হঠাৎ মনের ভিতরকার বহুদিনের বদ্ধ জানালা হঠাৎ খুলে যায়। কবির ভাষায় ‘বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ আলোকরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। গানের সুরে যখন হৃদয়ের গহন দেশ জেগে ওঠে তখন এই মাটির পৃথিবী আপনাকে ব্যক্ত করে।

কবির কাছে প্রকৃতির কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, তার সাথে তিনি গভীর একত্বাভাব পানিয়ে ছিলেন। যেমন করে মহাকবি দ্রষ্টা কালিদাসের ‘মেঘদূত’-কাব্য কবিকে গভীর-ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। কবির রোমাণ্টিক বিহ্বলতায় প্রকৃতির মধ্যে যে চেতনা খুঁজে পেয়েছিল তা মানব জীবনে পরম সত্য। তাই তিনি বলেছেন,—

‘চিন্তা আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে’। ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে অধার করে আসে’, আর ‘ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন লুটেছে ঐ ঝড়ে, বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে’ ‘অস্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল’। তিনি যেমন মেঘের মধ্যে মানুষের ব্যথার ঘনীভূত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আবার অবিরাম বারিধারার মধ্যে কবি আপনার মধ্যে কি এক সৃষ্টির চঞ্চলতা পাওয়া-না পাওয়ার, দেখা-না দেখার জন্য অস্তরে দারুণ কলরোল শুনিয়েছিলেন।

কিছু সবচেয়ে বড় গান হল মানুষের জয়গান। তাই কবি শেলির স্বাইলার্কের মতো সুদূর দিগন্তে থাকতে পারেন নি। ওয়াল্ড'সওয়াথের মতো তিনি মানুষের হাসি কান্না ব্যথা ভোলাতে, ছুটে এসেছেন মাটির পৃথিবীর টানে, ভারত-জান্নীর পাদপদ্মে তিনি তাঁর প্রাণের একান্ত অঞ্জলি দিয়ে বলেছেন,

‘হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে -

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।’

অন্য একটি গানে, ‘যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন/সেইখানেতে চরণ তোমার রাজ্য/সবার কাছে সবার নীচে সব-হরাদের মাঝে।’ তিনি নিপীড়িত মানুষের প্রতি

গভীর ভালবাসা জানিয়েছেন। আর একটি গানে তিনি সাম্যের আহ্বানে সকল অবহেলিত মানুষের মুক্তি চেয়েছেন ও তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন,—

‘মানুষের অধিকারে বণ্ডিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়িয়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।’

তাই ‘গীতাঞ্জলি’র গানগুলিতে সকলের ব্যথা বেদনাকে তিনি আপন অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। বাইরে তার মর্মান্তিক প্রতিফলন ঘটেছিল।

হারাগো সুর

কমলারঞ্জন আচার্য

সেই যখন চলতে শিখেছি, তখন হতে

আমিতো চলেছি পথের নিশানাতে

চলার রেখা টুটোনতো কোন মতে

—তবে কেন এমন হল ?

আমি তখনো চলতে শিখিনি

সেই অচলার কথা এখনো ভুলিনি

হায় ! সুখে ভরা সেই দিন আর রজনী

—কোথায় হারিয়ে গেল।

এ হারাগোর ব্যথা ভুলতে পারি না তো

সারা মন জুরে হাহাকার কতো

সেই যে—ক্ষপার মাণিক খোঁজার মতো

—কেবল হারাগোকে খুঁজি,

সে কালে দেখেছি—আমার ধ্যানের পুরুষেরা

কি বিশাল প্রাণ, কতো মমতায় ভরা

আজ যে দেখি—রঙ মাখানো চলচ্ছবি এ’রা

—কিছুই না বুঝি।

সত্য আর ন্যায়-নীতিক দু’পায়েতে খেলে দিয়ে

এ কাল কি চলল শুধু ছল-চাতুরী নিয়ে ?

কোথা মানুষ—বিবেক, কোথা কোমল হিয়ে,

—সব কি চলে গেল ?

আজ কেন রে মন-বীণাটি আর

উছল-সুরে রিণরিণিয়ে তোলে না ঝংকার

কেন আজ শুধু বীণার তার ?

—জবাব কোথা বল ?

কঠোর ঘায়ে শুধু বীণা, তন্ত্রীগুলো ছিন্ন

সুর-তান-লয়—সব হারিয়ে সে আজ মহাশূন্য !

প্রাণ জাগিয়ে নতুন সাজে করবে কে আর ধন্য

কোথায় রূপকার ?

মনকে আমি শূন্যই কতো বার—

শূন্য-বীণায় সুর সৃজনে বাঁধা কি তোমার,

হারাগো সুর ফিরে পেতে ছিন্ন-বীণার তার

—জুড়বে নাকো আর ?

মন হেসে কল্প—ছিন্ন-বীণায়

তার জুড়িলে পঙ্কুতা যায়

হারাগো সুর আর কি রে হায় !

ফিবে পাওয়া যায় !

সর্বনাশা এনকেফেলাইটিস

নাগাজুন ভট্ট

এনকেফেলাইটিস রোগ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় মহামারী আকারে দেখা দিলেছে। সরকারী হিসেব মতে এ পর্যন্ত রাজ্যে ৪৮৫ জন মারা গিয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছেন ১১২৫ জন। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সীতেশ লাহিড়ী বলেছেন, বর্তমানে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা গেছে। এই জেলায় মারা গেছেন ২৬০ জন, বীরভূমে ৯০ জন, বাঁকুড়াতে ৯০ জন, হুগলীতে ৪০ জন এবং মেদিনীপুরে ৫ জন। হাওড়াতে একটি তের বছরের কিশোরী এই রোগের আক্রমণে অকালে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েছে অতি সম্প্রতি।

এনকেফেলাইটিস হলো মস্তিষ্কের প্রদাহ। নানা কারণে তা ঘটতে পারে। মস্তিষ্কে ভাইরাসের আক্রমণের জন্যে অথবা স্কোটকাঁদ বা অবুঁদের জন্যে প্রদাহের সৃষ্টি হতে পারে। সিরিফালিসের জন্যেও প্রদাহ হতে পারে তবে এহেন ঘটনা কম বললেই চলে। উপসর্গ ভেদে এই রোগকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—মেনিংগো এনকেফেলাইটিস, এনকেফেলোমায়েলাইটিস এবং মেনিংগো এনকেফেলোমায়েলাইটিস।

বিশেষজ্ঞরা আবার এনকেফেলাইটিসকে তিনটি শ্রেণীতে চিহ্নিত করেছেন ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে, যেমন পাস্চাত্য ইকুইন এনকেফেলাইটিস (WEE), প্রাচ্য ইকুইন এনকেফেলাইটিস (EEE) এবং ভেনেজুয়েলীয় ইকুইন এনকেফেলাইটিস (VEE)। এই তিন শ্রেণীর এনকেফেলাইটিস রোগবীজাণু-মশক বাহিত।

প্রাচ্যদেশীয় শ্রেণীটি জাপানী গ্রুপের। বিশেষজ্ঞরা বলেন এই ধরনের রোগের বীজাণু বহন করে কিউলেঙ্গ মশা। কিউলেঙ্গ মশার মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে। পশ্চিমবঙ্গে মহামারী আকারে যে রোগটি হচ্ছে তা হলো জাপানীজ-বি এনকেফেলাইটিস (Japanese B encephalitis)। জাপান, চীন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, মালয়, বার্মা, ভারত, ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মশা নানা-স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের কামড়ে শিশু ও বয়স্ক উভয়েই এই মারাত্মক রোগের কবলগ্রস্ত হয়। টিক (tick) বা কীট

বাহিত হয়েও এই রোগবীজাণু বয়স্কদের আক্রমণ করে। শূন্যের এবং নানা ধরনের ঘুরগী ও পশু পালন আমাদের দেশে সর্বত্র হয়ে থাকে। যেমন গো-বসন্তের ঢীকা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তেমনি জাপানে শূন্যেরের দেহ থেকে প্রতিবেশক ঢীকা তৈরী করা হয়েছে। সেখানে শূন্যেরের খামারগুলি সুনিয়ন্ত্রিত, আর আমাদের দেশে তার চিহ্ন মাত্র নেই। ডোবা, খাল, পচা জলের কাছে, খোলা জ্বেলের ধারে শূন্যের ঘুরে বেড়াতে আমরা দেখে থাকি। এখানে কিউলেঙ্গ মশা তার বংশবৃদ্ধি করে প্রচণ্ড হারে। এরা এনকেফেলাইটিস রোগের ভাইরাস বহন করে। আমাদের দেশে যখন গ্রীষ্মকাল বা বসন্তকাল তখন নানা দেশ থেকে পাখী উড়ে আসে, স্থান নেয় জলাশয়ের ধারে, জঙ্গলে। তারা অনেক সময়ে এই রোগবীজাণু বয়ে নিয়ে আসে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। প্রাচ্যদেশীয় ভাইরাস দ্বিতীয় এনকেফেলাইটিস রোগে কেন্দ্রীয় স্নায়ু সংস্থা (Central Nervous System) প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে মৃত্যুর হার বাড়ে, যারা বেঁচে থাকে তারাও দৈহিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গ্রীষ্মের শেষে বর্ষায় মশককুলের প্রজনন যখন তীব্রভাবে বাড়ে তখন এই রোগেরও আক্রমণ শুরু হয়। বিষুবীয় অঞ্চলে প্রতি মাসেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বাচ্চাদের আক্রমণ জোরালো হয়, ফলে অকালে তারা মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়।

গ্রুপ-বি মশাবাহিত ভাইরাস (যা আমাদের দেশে আছে) এবং কীটবাহিত ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশের পর কয়েকদিন বাদে রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায়। আগেই বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্নায়ু সংস্থা এই ভাইরাসের আক্রমণে পঙ্গু হয়ে যায়।

রোগ যখন প্রকাশ পায় তখনকার উপসর্গগুলি যেন একসঙ্গে এসে পড়ে। হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর হয়, প্রবল মাথাধরা থাকে, বাড় শক্ত হয়। রোগী উঠতে পারে না, চোখ লাল হয় (কনজাংটিভাইটিস), আলো অসহ্য লাগে (ফোটোফোবিয়া), দেহে অস্থিরতা আসে, বমি হয়। ধীরে ধীরে রোগীর উপসর্গ বাড়তে থাকে। ভুলবকা শুরু হয়, তারপর রোগী চেতনা হারিয়ে ফেলে, ক্রমে অচৈতন্যাবস্থা গভীর হতে থাকে

(কোমা), অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। রোগীর মৃত্যু হয়। অনেকে আবার সম্ভ্রান থাকে কিন্তু ডাকলে সাড়া দেয় না বা কোন আঘাত পেলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন ক্রিয়া হয় না। মস্তিষ্কে প্রদাহ হয়।

যদি রোগের তীব্র আক্রমণের সময় মৃত্যু না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে আসতে থাকে রোগী। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে রোগী সুদীর্ঘকাল অচেতন্য হয়ে থাকে, তার বুদ্ধিবৃত্তি কমে গেছে। অসংলগ্ন কথা-বার্তা বলে, নানাভাবে হাত-পা ছোঁড়ে, কখনো গুম হয়ে থাকে আবার কখনো প্রচণ্ডভাবে হাসে বা কাঁদে।

ম্যালেরিয়া, হার্নিপিস ইত্যাদি রোগও এনকেফেলাইটিস ডেকে আনতে পারে। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে বটে তবে রোগ প্রতিরোধের ভাল ব্যবস্থা নেই। এমনকি জাপানেও ভাল নেই।

রোগ আক্রমণ হলে আইস-ব্যাগ রাখতে হবে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে, ফ্লুইড শিরাপথে দিতে হবে, বেড-সোয়ের চিকিৎসা করা দরকার, রোগীর বমি ও মলমূত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদ স্থানে নিয়ে বীজাণুনাশক দ্রব্য দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। রক্ত দিতে হতে পারে।

মশা মারার জন্য ডি. ডি. টি. ছড়াতে হবে, ঘরে বেগন ইত্যাদি জাতীয় দ্রব্য স্প্রে করে দিন, খোলা নর্দমায় বীজাণু নাশক দ্রব্য ছড়ান; এবং মশারি খাটিয়ে শোবেন।

বেশী ঘর এবং তার সঙ্গে অন্যান্য উৎসর্গ থাকলে অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন আপনার একটি ভুল একটি অমূল্য জীবনকে নষ্ট করতে পারে।

অর্জুনকে জ্যোপদী

সমীর বসু

তোমার লক্ষ্যবেধে জগৎমুগ্ধ আমার সাধনা সিদ্ধ
তুমি হইলে মোর পতি,
কহে সভাসদগণ আর সব প্রিয়জন
যুবতি! তুমি ভাগ্যবতী ॥
কৃষ্ণপ্রিয়সখা; ভীষ্ম মেহধন্য
সর্বজনে সর্বদা তুমি বরণ্য ॥
হইলাম অর্জুন-রমণী
কাটিল শুবরজনী
আসিলাম স্বশুর আলয়ে
হস্তিনাপুরে ॥

মাতৃ-আজ্ঞা রক্ষার্থে আমার দিয়েছ বলি
রাহি না শুধু তোমার বধু আমি পাণ্ডালী।
আমি এক সম্পদ যার পাঁচ অংশীদার,
পঞ্চমামী আমার তাই পাঁচ সংসার ॥
সমানে করেছ ভাগ এক মানবী-আকার,
কিন্তু হৃদয়! তাকে করিতে ভাগ সাধ্য কার।
আজিকার নিশি কেবল তোমার আমার,
অস্তর-তত্ত্ব তব ইচ্ছা জানিবার।
ভূষিত মহাকাব্যে নানা ভাষ-অলংকারে,
শ্রেষ্ঠ-নারীর সম্মান করি দিয়েছেন মোরে ॥

অস্পৃশ্যতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

আজকাল প্রায়ই অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে নানা স্থানে, বিবিধ পত্রিকায়, রেডিওতে দৃষ্ট ভঙ্গিমায়, ওজস্বিনী ভাষায়, শ্রেষ্ঠপূর্ণ কর্তে বক্তৃতা শুনতে পাই। বহু চেষ্টা করেও এইসব বক্তৃতার সারমর্ম বুঝতে পারলাম না। যারা অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছেন, তাঁরা কি ব্রাহ্মণ, অরাক্ষণ, জাতিত্ব গলাধরে বেড়ান না, একসাথে খান না, বিবাহ দিতে চান না? বাংলায় ঠিক এই জিনিষটা আছে কি? ট্রাম, বাস, ট্রেনে, হোটেলের রেস্টুরেন্টে আমরা কি ছুৎমাগ বিচার করি? বহু ব্রাহ্মণ অরাক্ষণে বিবাহ হচ্ছে না কি? এই অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁরা কি নতুন করে এক সম্প্রদায়ের ভিতর অস্পৃশ্যতার বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছেন না?

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যারাই বলছেন, তারা সকলেই সমাজে এই কুপ্রথা চালু করার জন্য ব্রাহ্মণকেই দায়ী করেছেন। ব্রাহ্মণ তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য সমাজে এই প্রথা চালু করেছেন। ব্রাহ্মণ মনগড়া একটা দুর্যোধ্য শ্লোক আউড়ে এমন ভীষণ বিভৎস পরিণামের ব্যাখ্যা করেন 'যে লাখে লাখে লোক হাত ষোড় করে ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়ে অস্পৃশ্যতা মেনে নিলেন।

ছোট্ট একটা সংসারে বহুরকম চেষ্টা করে, কঠোর শাসন করেও ছোট্ট একটা ছেলেকে স্ব মতে এবং পথে আনা যায় না। রাজশাস্তি কত রকম শাস্তির ব্যবস্থা করে, এমন কি ফাঁসী, শিরোচ্ছেদ, গিলোটিন-এর দ্বারাও অপরাধ মুক্ত কর্তে পারেন না, আর সেখানে এক তুড়ি দিয়ে কোটি কোটি লোককে ব্রাহ্মণরা বশীভূত করে ফেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ৩. ১. ১৮৯৮ তারিখে দেওঘরে শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখেছিলেন—“ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তৎকালিক আবশ্যিকতার বেগ লাগে তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা আপনি কতকগুলো আচারের আশ্রয় লয়।.....আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যেমন অনেক সময় ভৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী অতি অহিত উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পায় কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়। (স্বামীজীর বাণী ও রচনা ৮ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা)।

যারা অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা বলছেন, তাঁরা কি অস্পৃশ্যতা মুক্ত হতে পেরেছেন? তাঁরা কি বাসী অশুচী কাপড় পরে নোংরা অবস্থায় খেতে বসেন? সেই সময়টা তাঁরা নিজেরদের কাছেই নিজেরা অস্পৃশ্য হন না কি? তাই বলছি, অস্পৃশ্যতা আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছি—অশিক্ষা, কুশিক্ষা, স্বার্থপরতার দ্বায়ে। আর ঋষি বা ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টি করেন নি। তাহলে মা দশভূজার পূজা অস্ত্রে বিজয়াদশমীতে আব্রাহ্মণ চণ্ডালে আলিঙ্গনের প্রথা তাঁরা কর্তেন না। “যঃ স্মরেৎ পুষ্পরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরো শূচী”—এমন্তও তাঁরা রচনা কর্তে পারেন না। গীতায়ও আছে—পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ।

অস্পৃশ্যতা চিরন্তন। পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। তবে রকম ফের হতে পারে। এই অস্পৃশ্যতা ইংলণ্ডেও আছে লর্ড এবং সাধারণ পরিবারের মধ্যে। ৮ম এডওয়ার্ড তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমেরিকায় কাল খলা তার সাক্ষি। বড় অফিসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং নিম্ন পদস্থ কর্মচারী তার পরিচয়। Education, status, standard-এর অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে একবার ভেবে দেখেছেন কি? অশুচী বস্তুমায়েই অস্পৃশ্য। সুতরাং অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হলে অশুচীকেও শূচীশুদ্ধ হতে হবে। অস্পৃশ্যতার বিশদ ব্যাখ্যা এখানে করতে চাইছি না। তবে অস্পৃশ্যতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু too much of everything is bad. আমাদের হয়েছেও তাই। অতিরিক্ত কাল দিলে খাদ্য যেমন অখাদ্য বা অস্পৃশ্য হয়, অতিরিক্ত বিনয় বা ভদ্রতাও তেমনি hypocrisy বলে মনে হয়। তাই গোড়ামি, অহঙ্কার, অভিমান অস্পৃশ্যতাকে অতিরিক্ত করে বিকৃত দূষিত করে ফেলেছে।

নীতিবাক্যে আছে, তৈলাস্ত বা অন্নাত ব্যক্তি স্নাত ব্যক্তিকে পথ ছেড়ে দেবেন। এখানে ব্রাহ্মণ বা অরাক্ষণের কোন উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণই যে অরাক্ষণকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন তাই নয়, অরাক্ষণও ব্রাহ্মণকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন। ঢাকার একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। শ্রীলালমোহন শাহ, শম্ভুনিধি, তাঁর বিরাট প্রাসাদের দোতলায় গরদের ধূতি চাদর পরে, মালা হাতে বসে আছেন। কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ

কিছু প্রাপ্তির আশায় দোতলার তাঁর কাছে উঠে গিয়েছেন। শশ্বনিধি মহাশয় দ্রুত ব্যস্ত হয়ে হাত নেড়ে বলে উঠলেন— “নীমে নীচে নীচে যান।” যাদের motto ‘ভূগাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা, অমানিনা মান দেনা, কীর্তনীয় সদাহরি’, সেই বৈষ্ণবশিরোমণি মালা হাতে প্রেমময় ঠাকুরের সামনে বসে থাকেন, তখন কেউ, অবশ্য, অতি দরিদ্র তাঁর কাছে কোন আশা নিয়ে গেলে, কিরূপ ব্যবহার করেন, দেখেছেন কি? অস্পৃশ্যতার জন্য অনেকেই ব্রাহ্মণকেই দায়ী করেছেন। আমি তাদের কথা একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমিও স্বীকার করি। তবে ব্রাহ্মণ দায়ী নন। গোড়া ব্রাহ্মণ দায়ী। গোড়ামিটাই দায়ী, তা সে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শাক্ত যাই হোক। অস্পৃশ্যতার জন্ম দম্ভ, অহংকার আত্মসন্তুষ্টি থেকে। পণ্ডিত—মুখের, ধনী—দরিদ্রের, বুদ্ধিমান—বোকম্ব, অস্পৃশ্যতা গড়ে উঠেছে।

অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হলে, চাই গোড়ামী, দম্ভ, অহংকারের অপনোদন। চাই সুশিক্ষা। সে শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যভিমानी দ্বারা হবে না। পাশ্চাত্যশিক্ষা—আমাদের উপর divide and rule ছিল যাদের policy, যারা শিখিয়েছেন—আমাদের আর্য ঋষিদের শিক্ষা ভুলো, গাঙ্গাধুরী, যারা শিখিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রদত্ত অযোগ্য, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমானীর দ্বারাও হবে না। চাই আর্থশিক্ষায় শিক্ষিত নিরভিমानी ব্যক্তি। যে শিক্ষায়, প্রভূত ধন রত্ন উপেক্ষা করে ঋষিপত্নী বলেছিলেন—যেনাহং নম্রতস্যাম তেনাহং কিং কুর্যাম্। চাই সেই শিক্ষা যা শেখাবে—equality, fraternity and benevolence তবেই অস্পৃশ্যতা বিষ-মুক্ত হবে জাতি।

পাপ মুছে যাক

সরোজ দাস

প্রায় মনে হয়
কেন এই পৃথিবীতে আসা
কেন বেঁচে থাকা
কি আমার করণীয়
কি আমার লাভ
কি আমার পাপ?
আবার এ-ও মনে ভাবি
এ জীবন মহামূল্যবান
বাঁচাটা নির্বন্ধ আমার
তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি
ততক্ষণ কর্ম করি সার।

আমি রেখে যাব কিছু দাগ
দিগ্নে যাব কিছু উপহার
ধূপের গন্ধের মত
গানের সুরের মত
তার রেশ বহুকাল রবে অম্লান
লাভ-ক্ষতি, হিসাব-নিকাশ
সমস্ত শূন্যে তোলা থাক
দানের মহিমায় আমার
সব পাপ ধুয়ে মুছে যাক।

অমলের মা অমলের মাথায় হাত বুলািয়ে বল্লেন—‘মা, অমু, ঘুমোগে যা ; এ্যাতো রন্দুরে কোথাও-বেবুস্ নে ।’

অমল আশ্বে আশ্বে খাটের ওপরে গিয়ে শুলো ।

মা ভাবলেন, অমু খুব শান্ত হয়েছে ।

চোখ বুজে অমলের মোটেই ভালো লাগলো না । এক একবার চোখ মেলে দেখতে লাগলো—মা ঘর থেকে গিয়েছেন কি না । এপাশ ওপাশ করছে দেখে মা কাছে এসে বল্লেন—‘কি রে, কি হচ্ছে অমু ?’

চোখ মেলে আবার চোখ বুজলো অমল । মা তার গায়ে হাত বুলািয়ে বল্লেন—‘ঘুমো, লক্ষ্মীটি আমার, আজ তোকে ঝিনুক ঘসে দেব’খন ।’

অমল বল্লো—‘ঠিক দেবে তো ?’

মা ‘হ্যাঁ’ বলে অমলের পাশে শুলে পড়লেন । অমল মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে রেখে ভাবতে লাগলো শ্যামুর কথা । শ্যামু তার বন্ধু, সমবয়সী—বয়স সাত আট বছর । পুরো নাম তার—শ্যামল, বাড়ীর লোকে আদর ক’রে তাকে ‘শ্যামু’ বলে ডাকে ।

সংসারের কাজের পরে মায়ের শরীর খুব অবশ হয়ে পড়ে । অমলকে বুকে জড়িয়ে ধ’রে, কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন, কিছু-ই ঠিক পেলেন না তিনি ।

অমল চোখ মেলে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো—তারপর আশ্বে আশ্বে মায়ের শিখিল বাহুদুটিকে সরিয়ে দিলো । কিছুক্ষণ মায়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এসে, অমল এক দাঁড়ে শ্যামুর কাছে গিয়ে উপস্থিত । শ্যামু তখন ঝিনুক হাতে একটি কাঁচা আমের খোসা ছাড়াতো ।

‘চল, ওই গাছের আম খুব মিষ্টি ; চল, দু’টি পেড়ে নিয়ে আসি গিয়ে ।’ —অস্থিরচিত্তে বল্লো শ্যামু । তারপর নিজের ঝিনুকটিকে অমলের হাতে দিয়ে বল্লো—‘তুই আজ আম কাটবি ; বুঝলি ? আর আমি বাবুর মতো বসে বসে খাবো ।’

কথাটি শুনে অমল খুব খুসী—মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো সে ।

শ্যামল বল্লো—‘তুই একটু বোস, আমি লবণ আর

লক্ষা নিয়ে আসি গিয়ে ; তুই ততক্ষণ ঝিনুকটা এই শিলের ওপর থস্ ।’ বলতে বলতে সে রানমাঘরে লবণ আর লক্ষার খোঁজে ছুটলো । অমল বসে শিলের ওপর ঝিনুক ঘসতে লাগলো ।

শ্যামল ফিরে এসে বল্লো—জানিস অমু, দিদি আমার ঘরে ফেলেছিলো আর কি ! ছিকল খুলে যেই দরজাটি ধাক্কা দিয়েছি, অমনি আর বাবি কোথা ; কোঁ করে উঠলো দিদি । পরক্ষণেই “কে রে” বলে দিদি উঠলো চৌচিলে । দরজাটি বন্ধ ক’রে না, একদম জলের টবের মাঝে, তাই তো দ্যাখ্ না, কাপড়টা আমার কেমন ভিজে গেছে !’

অমল হো হো ক’রে হেসে উঠলো ।

শ্যামল চটে গিয়ে বল্লো—অমন করে হাসছে, বোকা কোথাকার !—বলতে বলতে তার হাত থেকে ঝিনুকটা কেড়ে নিলো ।

অমল তার দিকে একবার বড় চোখে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলো—কিছুক্ষণ চুপ ক’রে থেকে সে বল্লো—‘না দিলি, বিকেলে মা আমায় একটি বানিয়ে দেবে ।’

শ্যামল তার ভিজে কাপড়খানি দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিলো । অমলের রাগ প’ড়ে গেলো, বল্লো—‘চল’ ।

শ্যামল বল্লো—‘চল’—বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের ঝিনুকটি অমলের হাতে দিয়ে দিলো ।

অমল জিজ্ঞেস কর্লো—‘কি ক’রে এদিয়ে আম কাটবো ?—দেখিয়ে দেনা ।’

শ্যামল হঠাৎ অমলের হাতখানি টেনে নিয়ে ঝিনুকের মাঝের ছিদ্রটি তার হাতের ওপর, রেখে বল্লো—‘খোসার ওপর এমনি ক’রে রেখে, এমনি ক’রে টান দিবি’ বলে সত্য-সত্যি টান দিলো ।

অমল চৌচিলে উঠলো—তার হাতের খানিকটা চামড়া উঠে গেলো । এক মুঠো ধূলা ক্ষতস্থান লাগিয়ে দিয়ে বল্লো—‘চল, চল—’

অমল কাঁদলো না—জিজ্ঞেস করলো—‘তুই কি ক’রে এমনি ঝিনুক তৈরী করলি !’

শ্যামল বল্লো—‘শিলের ওপর জল দিয়ে এমনি এমনি ক’রে ঘর্ষিবি’—বলে হাত দিয়ে তার গায়ের ওপর দেখিয়ে

দিলো। তারপর বললো—‘ঘসুতে ঘসুতে মাঝে ছিদ্র হ’য়ে যাবে—এই তো হ’য়ে গেলো—!’

অমল বললো—‘তা হ’লে-ই হ’য়ে যাবে? এত সোজা! তোরটার মত হবে তো?’

শ্যামল বললো—‘হ্যাঁ রে হ্যাঁ!’

অমল যেন কম্পনায় ঝিনুক ঘসুতে লাগলো।

আমের গাছের নিকটে এসে পরনের ভিজে কাপড়খানা খুলে ফেলে অমলের হাতে দিয়ে শ্যামল বললো—‘তুই এমনি ক’রে ধব্—আর আমি গাছের ওপর থেকে একটি একটি ক’রে ফেলবো; একে কাঁচামিটে আম—তারপর রসালো।’

শ্যামলের আদেশে অমল গাছের ডালার দুই হাতে কাপড় টান ক’রে ধ’রলো।

শ্যামল গাছের ওপর উঠে গেলো। গাছরক্ষক লাল পিপড়েগুলো একতাবদ্ধ হ’য়ে তাকে যথাসাধ্য বাধা দিলো; কিন্তু বুদ্ধিবলে শ্যামল তাদের সবাইকে হার মানিয়ে দিলো। গাছের একদম সিঁচকে ডালের ওপর গিয়ে সে উঠলো।

অমল বললো—‘কি সর্বনাশ! তুই অতদূরে গিয়ে উঠেছিস্!’

মুখে আঙ্গুল দিয়ে শ্যামল চুপ ক’রতে সংকেত ক’রলো।

তারপর এক একটি ক’রে দশটি আম অমলের কাপড়ের ওপর ফেলে দিয়ে, নিজে একখানা আম মুখে বাধিয়ে শ্যামল নেমে পড়লো গাছ থেকে।

ভয়ে অমলের হৃৎকম্প উপস্থিত। সে ভাবছিলো—কামিনী পিসী যদি একবার ঠিক পায়.....তবে! যে লোক! বাপ্ রে বাপ্! তার গাছের আম কাঠবিড়ালী পর্যন্ত দাঁতে দিতে ভয় পায়। সে দিন বিশেষ যখন ওই গাছের আম পাড়ছিলো, কামিনী পিসী তখন মুখে তামাকের গুড়ো দিয়ে কোমরে কাপড় বেঁধে হাতে ঠ্যাংগা নিয়ে এমনভাবে বিশেষকৈ ধাওয়া করেছিলো, যে মাকালীও বোধ হয় বিক্রমে পিসী কামিনীর কাছে হার মেনে নিতেন। ও বছর সাতগায়ের পাচু মোড়লের ছেলেকে না কি কামিনী পিসী বটি দিয়ে কাটতে গিয়েছিলো—কারণ, সে না কি কামিনী পিসীর আমের গাছে একটি টিল ছুড়িছিলো।—অমল এসব কথা মায়ের মুখে শুনছিলো; তাই, মা তাকে বারণ ক’রে দিয়েছিলেন ওগাছের কাছে খেতে।

শ্যামল এসে বললো—‘চল, শীগগীর পালাই; কামিনী পিসী দেখলে আর নিস্তার নেই।’

ভয়ে অমলের গলার স্বর বিকৃত হ’য়ে গেলো। সে বললো—‘মা যদি জানতে পান, তবে—’

শ্যামল বললো—‘তুই এবার পালাগে—’

অমলকে টানতে টানতে শ্যামল মাঠের রাস্তায় হাটতে লাগলো। তারপর মাঠের ধারে যেখানে দিঘিটি প্রায় বৃদ্ধে গেছে, সেই দিঘির একটি ভাঙ্গা-চুরা বাঁধানো ঘাটের ওপর গিয়ে তারা বসলো। ঘাটের ওপরকার প্রাচীন বটগাছটির পাতায় ঘেরা ডালপালাগুলি তাদের মাথার ওপর ছায়া বিস্তার ক’রতে লাগলো। আর সেই বটগাছটির ডালপালাগুলির ওপর দিয়ে ঈর্ষায় ছুটাছুটি আরম্ভ ক’রলো কাঠবিড়ালীর দল একতাবদ্ধ হ’য়ে।

নির্জন স্থান। দুপুর বেলা। ঢেউয়ের ওপর ঢেউ খেলে সূর্যের কিরণরাশি ধাবিত হ’চ্ছিলো সুবিশীর্ণ মাঠের দিকে সীমার সন্ধানে।

শ্যামল বললো—‘দাঁড়া দেখি, একটা কলার পাতা কেটে নিয়ে আসি।’—ব’লেই সে কলার পাতার খোঁজে গিয়ে ঢুকলো চৌধুরীদের কলার বাগানে।

ভয়ে অমলের গলা শূন্য হয়ে আসছিলো। মায়ের কাছে সে শুনছে—দুপুর বেলায় এখানে না কি এক বিরাট ভূতের রাজা জল খেতে আসে। তার না কি মল্লোর মত দাঁত, হাতীর কানের মত কান, আর নাকটি না কি তাদের রান্নাঘরের ড্রামটির মত মোটা। সে যখন হাটতে থাকে, তখন না কি ভূমিকম্প হয়; আর যখন সে হা করে, তখন না কি পাঁচ সাতটি গরু এক সাথে তার গলার ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। মা একদিন বলেছিলেন—ওখানে গেলে ওই ভূতের রাজাকে আমি ব’লে দেবো; তখন দেখবি, কি করে তোকে গিলে খায়?

মায়ের মুখে বলা আর নিজের কানে শোনা সেই ভূতের ভয় অমলকে পেয়ে বসলো। সে ভাবতে লাগলো—ভূত যদি সত্যি সত্যি-ই এসে যায়, তবে সে কি ক’রবে! আর চোখ খুলে ব’সে থাকা ঠিক নয় মনে ক’রে অমল চোখ বন্ধ ক’রলো। চোখ বুজলে কি হ’বে—ভূতের রাজা তার মানস-চক্ষে এসে দেখা দিলো! অমল চোখ বুজে রইলো

খুলতে সাহস ক'রলো না, পাছে সত্যি সত্যি-ই ভূত দেখতে পায়।

এদিকে শ্যামল বিরাট দুই কলার পাতা কেটে উচু ক'রে ধ'রে আনতে লাগলো দিঘির মাঠের দিকে। শো শো শব্দও হ'তে লাগলো বাতাসে।

অমল ভাবলো—এসেছে, রোষ হয়, আর রক্ষা নেই! চোখের পাতার ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারলো না—তাই, সে দু'হাতে চোখ টিপে ধরলো।

এই সব দেখে শ্যামলের হাসি উছলে পড়ছিলো। সে আস্তে আস্তে অমলের কাছে এসে নাকি সুরে বললো—'কি-রে'।

অমল বললো—আর আসবো না, ভূতের রাজা—আজকের মতো ক্ষমা করো।

শ্যামল হি হি ক'রে হেসে বললো—অম, একবার চোখ খুলেই দ্যাখ্ না-কে।

অমল স্বস্তি বোধ ক'রে চোখ মেলে বললো—ও, তুই।

অমল ঢোক গিলে আবার বললো—'আমি ভাবলাম, ভূতের রাজা।'

শ্যামল অগ্রহা ক'রে বললো—'নে নে, এখন আমগুলো কাট' তো'।

দু'জনে চারটি আম কট্ কট্ ক'রে কেটে ফেললো। তিনটি লস্কা ও এক মুঠো লবণ ছিটিয়ে দিয়ে কলার পাতার ওপর আমের কুচিগুলো মেখে নিলো। মুখে দিয়ে দু'জনেই থু থু ক'রে ফেলে দিলো।

অমল চোঁচিয়ে বললো—'উঃ! কি ঝাল! এতো লস্কা দিতে তোকে বললো কে?'

শ্যামল রেগে গিয়ে বললো—'এতো লবণ তুই দিলি কেন?'

অমল বললো—'তিন তিনটে লস্কা দিলি তুই চারটে আমে—আমি তো তিন মুঠো লবণও দি-ই নি। উঃ, শেষ পর্যন্ত ঝালের জ্বালা এই ঝিলের পচা জ্বলে মেটেতে না হয়।'

ঝালে অমলের জালা নিগত হ'তে লাগলো—কান নাক তার লাল হয়ে উঠলো। কানের ভেতর হাতের আঙ্গুল চুকিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি ক'রতে লাগলো।

শ্যামলেরও ঝাল লেগেছিলো, কিন্তু স্বীকার করতে সে

রাজি নয়। দাঁতে দাঁত চাপিয়ে সে সহ্য করতে লাগলো। অমলের কাছে গিয়ে সে বললো—'যা না, জ্বলে মুখ ধুয়ে আয় না।' অমল মুখ ধুতে ঘাটে নামলো শ্যামলও নামলো তার পেছন পেছন।

জ্বলের কাছে গিয়ে শ্যামল বললো—'এমনি ক'রে ধো তো দেখি, এমনি ক'রে ধো', বলতে বলতে নিজের মুখখানি তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিলো। ঝালের জ্বালা একটু কম পড়লে শ্যামল বললো—দেখলি তো—কেমন কমে গেলো!

অমল মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

বাকী আমগুলো জ্বলের ভেতর ফেলে দিয়ে তারা যার যার বাড়ীতে ঢুকবার পথে।

শ্যামল অমলকে ডেকে বললো—'দ্যাখ আজ কিস্তি বাড়ীর পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়'বি—কেউ ঠিক পাবে না, বুঝলি?'

অমল অনুগত ভূতের মতো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

এই ছিলো অমল ও শ্যামলের প্রায় দৈনন্দিন কাজের কর্মসূচী—সারাবৎসরব্যাপী।

সুখে দুঃখে, আনন্দে অভিমানে, তাদের দিনগুলি বেশ কাটতে লাগলো। কিস্তি প্রকৃতি যেন তাদের এই অবস্থায় থাকতে দিতে নারাজ।

অমল বেশ বড় হ'য়ে উঠলো—শ্যামলও তার সমবয়স্ক। তারা এখন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় তারা কিভাবে পাশ ক'রবে, এই আলোচনায় তাদের অধিকাংশ সময় কাটে।

পরীক্ষায় দু'জনেই উত্তীর্ণ হ'লো। অমলদের অবস্থা ভালো। সে কলেজে পড়তে যাবে। কিন্তু শ্যামলের কলেজে পড়া দুরাশা মাত্র। দুবেলা দুটো অমের সংস্থান যাদের হয় না, তাদের ছেলে কলেজে পড়বে এশুধু আকাশ-কুসুম ছাড়া আর তো কিছু-ই নয়।

অমল একদিন শ্যামলকে ডেকে নিয়ে গোপনে বললো—'চল, শ্যামু, আমরা দু'জনে একসাথে গিয়ে কলেজে পড়ি—তুই না গেলে, আমি একলা থাকবো কি করে?'

শ্যামল তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললো—'না না, অমন

করিস্ নে, অমু। মা-বাপের এই দুরবস্থা চোখের ওপর দেখে, আমার পড়া-ই কি বড় হ'য়ে গেলো।'

অমল শ্যামলের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললো—‘তাই ভালো। শ্যামু, চল আমরা একত্রে অন্য কোথাও চলে যাই— আর বেশী পড়ে কি হবে?’

বাধা দিয়ে শ্যামল বললো—‘না, না, ওকথা বলিস্নে, অমু, পড়া বন্ধ করিস্ নে। আমার অদৃষ্টকে তুই কেন.....’—বলতে শ্যামলের কণ্ঠরোধ হস্বে এলো, চোখের জলে চোখ ভরে উঠলো।

তারপর অমলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে সে বললো—‘তবে, যা, অমু.....’

অমল বুঝলো, শ্যামলের মনে আজ কিসের জন্য এত হাহাকার—কিসের অভাবে তার তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে আজ পড়তে যেতে অক্ষম।

অমল মনে মনে ভাবলো—‘কেন এই পার্থক্য। আমার চেয়ে তো শ্যামু খারাপ ছেলে নয়। আমি পড়তে পারবো—আজ সে পারবে না কেন? না, না, সে অদৃষ্টকে কেন বিশ্বাস করবে?’

শ্যামলকে ঝাঁকি দিয়ে সে বললো—‘না, না, তোকে পড়তে-ই হবে।’

শ্যামল বিষাদের হাসি হেসে বললো—‘না, তা হয় না; তুই কি পাগল।’

অমল চলে গেলো—কিন্তু নিয়ে গেলো সে, তার মনের মাঝে দুটি কথার প্রকাণ্ড একটা বোঝা—কেন এই পার্থক্য, আর এই অদৃষ্ট-ই বা কি।

কলেজে পড়তে বাবার দিন এলো। অমলের মা, বাবা, দিদি, সবাই ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে—কিন্তু অমলের চোখ যেন খুঁজছিলো, অন্য কাউকে। দুর্গশত হ'ল সে; শ্যামু আজ আসে নি ব'লে.....।

মাঝ নৌকা ছেড়ে দিলো.....। অমল তেমনি ক'রে খুঁজে যেতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই শ্যামলকে সে খুঁজে পেলো না। অভিমান করলো সে মনে মনে।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শ্যামল সব দেখছিলো। দেখছিলো অমল তাকে খুঁজছে; কিন্তু অমলের সামনে যেতে সে পারে নি। সে ভেবেছে, অমল যদি কোঁদে ফেলে।

তার চোখের জল পড়ছিলো দরদর ক'রে। কাপড় দিয়ে একবার চোখের জল মুছে ফেললো। আবার ভর্ষি হ'য়ে গেলো তার চোখ—চোখের জলে। কোন দিন সে ভাবতে ও পারে নি অমলকে ছেড়ে তার থাকতে হবে। পড়তে যেতে পারে নি ব'লে তার এ চোখের জল নয়। চোখের জল, তার বন্ধুকে ছেড়ে থাকতে হ'বে ব'লে.....।

শ্যামল মনমরা হ'য়ে বাড়ীতে ফিরে এলো। তার দিদি জিজ্ঞেস করলেন—‘অমল বুঝি আজ পড়তে গেলো?’

শ্যামল মাথা নেড়ে বললো—‘হ্যাঁ’। তারপর ঘরের ভেতর গিয়ে খাটের ওপর উপুড় হ'য়ে শুষে পড়লো।

দেখতে দেখতে পাঁচটি মাস কেটে গেলো। সেই যে গিয়েছে অমল আর ফিরলো না—শ্যামলের কাছে একখানি চিঠিও সে লেখে নি।

শ্যামল ভাবলো—অমল, বুঝি তাকে একেবারে-ই ভুলে গেছে। যাক্ ভুলে, ভুলে যাওয়া-ই ভালো। ভুলে যেতে সে নিজেও চায়, তবে পারে কই। সহস্র নাগ যেমন লক্ষ্যগকে বেঁধে ফেলেছিলো, সহস্র চিন্তার নাগ বেঁধে ফেললো তেমনিভাবে শ্যামলের মনটাকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে অমলকে। কথায় কথায় সে অমলের উদারতার কথা বলে দিদিকে।

অমল কলেজে এসে ভিড়ে গিয়েছে ছাত্রদের দলে। আজ ওখানে যায় ফুটবল খেলতে; কাল যায় সেখানে থিয়েটার করতে। এই সব নিয়ে-ই এখন সে ব্যস্ত। শ্যামলের কাছে চিঠি লিখবার মতো সময়েরও, বুঝি, আজ তার অভাব। সময় পেলেও চিঠি লিখবার ইচ্ছাটা তার আর এখন নেই। শ্যামলের মতো কত বন্ধু আজ তার আশেপাশে.....।

পুজোর ছুটিতে বাড়ী যেতে মা লিখেছেন। কিন্তু বন্ধুরা থিয়েটারে সব চেয়ে বড় পার্টটি দিয়েছে অমলকে। তাই, সে মা-কে লিখে দিলো ছুটিতে সে বাড়ি যেতে পারবে না।

শ্যামল দিদিকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রায়ই খবর নিতো অমলের মায়ের কাছ থেকে।

দিদি এসে বললেন—‘অমল চিঠি দিয়েছে—’

শ্যামলের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো.....‘দিদি তা’ লক্ষ্য করলেন; তবে সাহস করলেন না কিছু বলতে।

শ্যামল এইভাবে দিদিকে চুপ ক'রে যেতে দেখে, বুঝলো সব কিছু-ই। বললো 'বুঝেছি—আসবে না—না?'

মাথা নেড়ে দিদি জানালেন—হ্যাঁ। ব'লে-ই দিদি ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

সাত দিন শ্যামল অমলের কথা চিন্তা করলো। আট দিনের দিন রাতে কাঁপিয়ে তার জ্বর এলো। পরের দিনে-ই তার জ্ঞান বিলুপ্ত। ঘরে পয়সা নেই যে ডাক্তার ডেকে আনবে। অমলের মা এসে দেখে গেলেন শ্যামলকে। বললেন—'ডাক্তার ডাকাও—টাকা পয়সা যা লাগে, আমি-ই তা দেবো।'

জ্বরের ঘোরে বার বার সে অমলকে ডাকলো। বোধ হয়, সেদিনের সেই আমচুরির স্বপ্ন দেখেছিলো। অর্ধশুটঘরে সে বললো—'এমনি ক'রে তুই ধর—আমি এক একটি ক'রে ফেলে দেবো—' আবার কিছুক্ষণ পরে সে বললো 'এতো লবণ দিলি কেন? —যা যা, জলে মুখ ধুয়ে আয় না।'

সেই জ্বর-ই শ্যামলের কাল-জ্বর।

ডাক্তার এসে ব'ললেন রোগীকে পরীক্ষা ক'রে—'অমরা চেষ্টা করি মাত্র; কিন্তু অদৃষ্টের লিখন আমাদের মানতেই হবে।'

সেই দিনই শ্যামলের জ্ঞান ফিরে এলো। তবে ক্ষণ-কালের জন্য। দিদিকে সে জিজ্ঞেস করলো—'কই, অমল কি এসেছে?'

দিদি কোন কথা বললেন না।

আবার শ্যামল জিজ্ঞেস করলো—'পুছো তো এলো, অমল কেন এলো না, দিদি।'

দিদির উত্তর দেবার মতো কিছুই নেই।

* *

এদিকে অমল মাথায় পরচুল, কোমরে একখানি তরবারি, গায়ে চক্চকে একটি পোষাক প'রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিলো—কেমন দেখায়।

হঠাৎ টেলিগ্রামের পিণ্ডন এসে হাক দিলো—'অমল বাবু আছেন? আপনার টেলিগ্রাম আছে।'

টেলিগ্রামের নাম শুনেই অমলের চোখে স'রষের ফুল দেখা দিলো। সর্বান্ত তার কাঁপতে লাগলো। সেই দিয়ে

টেলিগ্রামটি হাতে নিলো অমল। খুলে দেখে, তার মা লিখেছেন—'Come sharp Shyamoo serious'

একটু বিরক্তি বোধ করলো অমল।

সেদিন রাতে বেশ সুন্দর অভিনয় করলো অমল। তার অভিনয়ে চমৎকৃত হ'য়ে দুজন দর্শক দু'টি পদক উপহার দিলেন তাকে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বেশ গর্ব-বোধ করতে লাগলো অমল।

রাতে বহুদিন পরে শ্যামুর মুখখানি তার মনে পড়লো। সে যেন শূন্যে পেলো শ্যামু তাকে বারবার ডাকছে—

অমল বাড়ী বাবে, জানাবার জন্য ভোরে উঠে বন্ধু-বান্ধবের কাছে গেলো। তারা তাকে অভিনন্দন জানালো অমল তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠলো নৌকায়।

নদীর বাঁকে বাঁক ঘুরলো নৌকাখানি। অমলের মন কেন যেন হঠাৎ ধড়াস করে উঠলো! দুর্ভাবনার করাল ছায়া অমলের মনটাকে ছেয়ে ফেললো—

অধীর হ'য়ে অমল মাঝিকে জিজ্ঞেস করলো—'মাঝি, আর কতদূর?'

—'বাবু, হাপ'নারা নাওতে উঠাই তো বলতে থাকেন— আর কতো দূর; না'য়ে ব্যাটাদের যে নাও বাইতা বাইতা পরাণ যায়। চুপ কইরা বইয়া থাকেন—'

—'না, মাঝি, তাড়াতাড়ি ক'রে জায়গা মতো পৌঁছিয়ে দেও—পুরস্কার পাবে।'

—'বাবু, কিরায়্যা আর দুটো চাল ডাল পাইলাই হবো ভগওয়ান তুমারে মঙ্গল করবি।'

অমল ভাবলো—'শ্যামু যদি.....।' আর ভাবতে পারলো না অমল।

অমল দেখতে পেলো—ধু ধু ক'রে আকাশে কালো ধূয়া উঠছে। মাঝিকে কাকূতি মিনতি ক'রে আবার সে বললো—'একটু জোরে বাণ্ড মাঝি—'

ঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে চিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অমলের মা, শ্যামলের দিদি। চোখের জলে তাদের চোখ ভরপুর.....চিতার আগুন লোলজিহ্বা বের করে জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। নিরন্তর শো শো শব্দ—মাঝে মাঝে শব্দ বিকট।

অমল উর্দ্ধ্বাসে নৌকো থেকে নেমে মায়ের কাছে এসে

ভোরের পাখী বিহারীলাল

ডঃ প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নবজাগ্রত বাঙালী জাতি বহুদিনের মস্তুরতা ও শিথিলতাকে দূরে সরিয়ে সমুদ্র তরঙ্গের উত্তাল উচ্ছ্বাস ও কলরবকে কাব্য-বীণায় বাঁধবার চেষ্টা করে এবং তারই ফলে ‘ছন্দ মহাকাব্য’-গুলির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই শুদ্ধ বর্ণনা সম্পূর্ণ মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতাকে কৃত্রিম বলতে পারি না, কারণ এই সকল মহাকাব্যগুলির বিরাট আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হয়ে লিরিকের ফল্গুস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী কবিমানস একান্তভাবে গীতিময়ী হওয়ায় মধুসূদনের প্রচণ্ড কবি-প্রতিভাও এই মহাকাব্য-ধারাটিকে চলমান রাখতে সক্ষম হয়নি। বিহারীলাল চক্রবর্তীই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বাঙালী কবি যিনি নিভৃতে বসে নিজের মনের কথা বললেন, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গীতিকাব্য-ধারার সূচনা করলেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে বাংলা কাব্যে ‘ভোরের পাখী’ বলেছেন,— আধুনিক কালে গীতি কবিতার সেই অতি প্রভু যে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরেছিল। সে সুর তার নিজের।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিহারীলাল ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর প্রথম কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি ‘অবোধ বন্ধু’ (১৮৬০) নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করেন। ‘প্রেম প্রবাহিনী’ কাব্য সম্পূর্ণ এবং ‘বঙ্গসুন্দরী’ কাব্যের কিস্তিদংশ এতে প্রকাশিত হয়। বিহারীলাল যৌবনে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

দাঁড়ালো। মা কেঁদে উঠলেন ; শ্যামলের দিদিও উঠলেন কেঁদে।

অমল বুঝলো, কত কড় ভুল করেছে সে।

নিদি বললেন—‘আর একটু আগে এলে দেখা হ’তো—
জন্মের মতো।’

অমল নিজের ওপর খিঁকার দিয়ে মনে মনে ভাবলো
দেবী ক’রবার দোষটা তার নিজেরই।

চিতার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অমল।
তার মনে পড়লো, আমচুরির কথা ; মনে পড়লো, ছোট-

‘বন্ধু বিয়োগ’ এবং ‘প্রেমপ্রবাহিনী’ (১৮৭০) কাব্য দুটিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ‘নিসর্গ সন্দর্শন’ (১৮৭০) কাব্যে এই প্রভাব ক্ষীণমান এবং কবির নিজস্ব রীতি দেখা দিয়েছে। ‘বঙ্গসুন্দরী’ (১৮৭০) কাব্যেই বিহারীলালের স্বকীয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিহারীলালের খ্যাতি তাঁর ‘সারদা মঙ্গল’ কাব্যের উপর মূলতঃ নির্ভরশীল। ‘আর্যদর্শন’ পত্রিকায় প্রথমে ষষ্ঠঃ প্রকাশিত হয়ে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সারদামঙ্গলেরই শেষাংশ হিসাবে লেখা হয় তাঁর পরবর্তী কাব্য ‘সাধের আসন’ (১৮৮৯)।

বিহারীলালের পূর্বে বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা গীতি-কবিতার সুর শুনতে পেরেছিলাম। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা প্রত্যক্ষভাবে নিজের অনুভূতি প্রকাশ না করে রাখাক্ষের কথার অন্তরালে তা ব্যক্ত করেছেন। বিহারীলালের কবিতায় স্বকীয় অনুভূতির প্রকাশ প্রত্যক্ষ। এখানে কবির আত্মভাব বা মন্যমতাই সর্ব প্রধান। সেই মন্যমত দৃষ্টির আলোকে জাগতিক বন্ধুর বাহ্যরূপের অন্তরালে এর অন্তর রূপটি কবি দেখতে পান। নিখিল-জগৎকে দেখার এবং আপনাকে প্রকাশ করার রীতি—সমস্তই কবি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ফলতঃ নিসর্গ প্রকৃতি এবং জাগতিক সকল অভিজ্ঞতাই বিহারীলালের কাব্যে নির্বিশেষ সৌন্দর্যের ইঙ্গিতবাহী। বিশেষ চেতনার এই নির্বিশেষত্ব লাভের জন্য প্রয়োজন হয় আত্মমগ্ন ভাবদৃষ্টি। বিহারীলাল প্রকৃতপক্ষে ধ্যানস্থ হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর

খাটো কতো কথা ; মনে পড়লো, শ্যামুর সেদিনকার কথা
—‘পড়া বন্ধ করিস্ নে, অমু’।

চিতার আগুন দাউ দাউ ক’রে জ্বলতে লাগলো, বাতাস এসে তার সহায়ক হ’লো। নিমেষের মধ্যে শ্যামলের দেহখানি নিঃশেষ নিশিচ্ছ হ’য়ে গেলো আগুনে।

অমলের মনে পড়লো—একদিন কথাপ্রসঙ্গে সে বলেছিলো, অদৃষ্টকে সে বিশ্বাস করে না ; কিন্তু আজ—আজ অদৃষ্টই জয়ী হ’লো। না হ’লে, জন্মের মতো শ্যামলের সাথে তার শেষ দেখা হ’বে না কেন।

কাব্যে ‘রূপ’ অপেক্ষা ‘ভাবের’ প্রাধান্য। তাই বিহারীলালের ‘সারদা-মঙ্গল’ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সারদা-মঙ্গল এক অপরূপ কাব্য।...সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো ‘সারদা-মঙ্গলের’র সোনার গ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয় কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুন্দর সৌন্দর্য স্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাখ্যাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।”

‘সারদা মঙ্গল’ কাব্যে বিহারীলাল দেবী সরস্বতীকে বিভিন্নরূপে অঙ্কন করেছেন। ‘তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেমসী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দম্ম-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন, কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন। কখনো তাঁহার সংহার মূর্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দময়ী।’

কবি বিষাদিনীকে বলছেন—

আমি, একী, কেন কেন,
বিষম হইলে হেন।
আনত আনন-শশী, আনত নম্রন,
অধরে মধুরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
ধরধর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন।
কবি অভিমানিনীকে বলছেন—
আজি এ বিষম বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে, কাঁদালে, দেবী জন্মের মতন।

সারদা মঙ্গলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, “আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বিহারীলালের কাব্যে আমরা রোমান্টিসিজমেরও প্রকাশ লক্ষ্য করি। এই রোমান্টিসিজমের জন্ম ‘বিস্ময় এবং সৌন্দর্যবোধের মিলনে’। বিহারীলাল বলেন—

‘রহস্য ভেদিত তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভাল, বুঝিলেই নেভে আলো।’

জীবন, জগৎ, প্রকৃতি কোন কিছুরই রহস্য ভেদ করতে বিহারীলাল চান নি এবং এই জন্যই তাঁর ‘সারদা মঙ্গল’

এবং ‘সাধের আসন’ কাব্য দুটির সর্বত্র স্পষ্ট অর্থ করা যায় না। সারদা মঙ্গলে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বন্দনা করা হয়েছে। এই লক্ষ্মী দ্বৈত স্বরূপে প্রকাশিত, একদিকে তিনি ‘বিশ্ববিকাশিনী’ অন্যদিকে তিনি ‘কান্তিরূপিনী’। বিহারীলালের সারদার সঙ্গে এই জন্যই রোমান্টিক কবি শেলীর ‘intellectual beauty’ তুলনা করা হয়ে থাকে। বিহারীলালের সারদা ‘কাগ্যার সৌন্দর্যছায়া’, ‘প্রত্যক্ষের অপত্যক্ষ মহিমা’। সাধের আসন কাব্যে তিনি নিজেই বলেছেন—

‘কাহারে খেয়াই দেবী, নিজে আমি জানি নে’।

আপাতদৃষ্টিতে বিহারীলালের সারদা মঙ্গল এবং সাধের আসন কাব্য দুটির মধ্যে আখ্যায়িকার একটি ক্ষীণ সূত্র লক্ষ্য করা গেলেও, তাকে শব্দকাব্য বা মহাকাব্যের আখ্যা দেওয়া যায় না। এর মধ্যে নরনারীর মিলন, বিচ্ছেদ, সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার কাহিনী এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতির রূপ ও রস-বৈচিত্র্য থাকলেও তার উপর এমন এক অপরিচিত ধূপছায়া রঙের আবরণ ছাড়িয়ে দেওয়া আছে, যাতে আমাদের ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাব্য দুটির জাতিধর্ম নির্দেশ করা যায় না।

বিহারীলাল সচেতন শিপূর্ণী ছিলেন না। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ‘বিহারীবাবু সর্বদাই কবিত্তে মশগুল থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ত ঢালা থাকিত, তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয় তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কবি ছিলেন।’ এই জন্যই দেখি তাঁর কবিতা কল্যাণবির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুন্দর নয়। শব্দ ব্যবহার, অলঙ্কারের প্রয়োগ ও কবিতার ছন্দে মাঝে মাঝে অসতর্কতা এবং শিথিলতা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিহারীলালের নিকট কাব্যকল্যাণ অপেক্ষা কবিত্বদয় বা কবিত্বরিচয় অনেক বড় ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিহারীলাল বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। সে যুগে পিরামিডতুল্য মহাকাব্যের বিরোদ্ধ, ভাষা ও ছন্দের ধূপদী ব্যবহার এবং বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্য পাঠক সমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলা কবিতার যে খাত বদল হল, তা বিহারীলালকেই এই নবতর কাব্যধারার পথিকৃত বলে নির্দেশ করল। স্বীয় অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এবং সৌন্দর্য-বিস্ময়ের সাধনার দ্বারা বাংলা-গীতি-কাব্যের আধুনিক যুগ সূচিত হল।

এও একটা সংসার। তবে ঘরে নয়। প্রকাশ্য ফুটপাথের ওপর। খুব ভোরে ভেসে যায়। রাতে জম-জমাট। বুড়া, বুড়ী, ছেলে মেয়ে, বউ, সবাই ফুটপাথের কোণটা জুড়ে বসে। ইন্টার উনুনে কুড়ানো কাঠ, পাতা ও খড়ের জ্বালানীতে রান্না হয়। যাওয়া আসার পথে নিত্য চোখে পড়ে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যা ভ্রমণের সময় চোখে পড়ে হরেন বাবুর। ওরা সকালে কোথা যেন চলে যায়। বোধ হয় বুজি রোজগারের জন্য। আবার সন্ধ্যা ভ্রমণ থেকে ফেরবার পথে চোখে পড়ে সেই জমিটি সংসার। রান্নাবান্না, সংসার।

মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে : সারা দিনটা ওরা কোথায় কাটাচ্ছে ?

আবার উত্তরটা তিনি নিজেই দেন : অভাব কলকাতায়, যাগণা বা কাজের অভাব কি ?

রাতে ফেরবার সময় ইচ্ছে করেই হরেন বাবু চলার গতি আরো কমিয়ে দেন অকুস্থলটার কাছে এসে। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। ওরা কি রান্না করে দেখা থাক।

গ্যাসের আলোতে ও বেশী পাওয়ারের চশমায় স্পষ্ট চোখে পড়ে। কতগুলো দাগী আলু, শুকনো শাক, পাতা, ডাটা, সব মিশিয়ে কড়াই-র ওপর চাপিয়ে দেয় মধ্য বয়স্কা স্ত্রীলোকটি। তার মুখ ও পরিচ্ছদ দেখে বুঝা যায় না, সে সম্ভবা না বিধবা। কড়াই থেকে একটা খোঁয়া বেরোয়। মনে হয় তেলের পরিমাণ কম বলেই খোঁয়ার পরিমাণটা বেশী। কখনও কখনও তাদের খাওয়াটাও চোখে পড়ে। দুটো তিনটে দল। আলাদা সংসার,

পাটিশন বিহীন। একটা দল ছোট, একজন পুরুষ, একজন নারী, দুটো কিশোর।

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে সংকেচ বোধ হয়।

তবু না দেখে থাকা যায় না। ওই ছেঁছড়া আর বোলতার বাচ্চার মত মোটা মোটা ভাত খেয়ে তারা তৃপ্ত। কিশোর দুটোকে দেখে হরেন বাবুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তার নাতির বয়সী হবে। পরমে ছেঁড়া প্যান্ট, গায়ে জামা নেই। শরীরের হাড়গুলো যেন বেঁড়িয়ে আছে। চোখগুলো গর্তে। কিন্তু মনে কোন দুঃখ আছে বলে বুঝা যায় না। বাপমার সঙ্গে খুশী মনেই কথা বলছে। খাওয়ার জন্য চেচামেচি নেই, গালাগালি হৈ চৈ নেই।

সেদিন হরেন বাবু ইচ্ছে করেই গায়ে পড়ে আলাপ করলেন পুরুষ লোকটির সঙ্গে।

তোমাদের এখানে প্রায়ই দেখি। খুব কষ্ট করে থাক, খাও। তরকারীর পোড়া গন্ধ নাকেও আসে। দেখে খুব কষ্ট হয়। মাছ জোটে না। ছেলে দুটোর নিশ্চয়ই মাছ খেতে ইচ্ছে হয়।

কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকায় ছেলেরা ও তাদের মা। তবে প্রোট দেখে কটু মন্তব্য করে না। ভদ্রলোক হয়ত বলে ফেলবেন, অত কষ্টের কী দরকার। আমার বাড়ীতে এসে তোমরা স্বামী স্ত্রী কাজ কর, খোরাকী ও হাত খরচ পাবে, ছেলেদের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে দেবো অন্যায়। এরকম প্রস্তাব তারা কয়েকবার পেয়েছে ; গ্রহণ করেনি। কাজেই খুবই অপসন্ন মনে জবাব দিচ্ছে, শিশুদের বাবা। উপকার না করলেও অপকার করতে পারে ভদ্রলোক। ফুটপাথে থাকা খাওয়াটা বন্ধ করে দিতে পারে। এই আশংকায় সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছে।

বুকপকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে হরেন বাবু লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, একটু মাছ কিনে খেও।

তারপর বাড়ীর উদ্দেশ্যে খুশী মনে পা বাড়ালেন।

ইঠাং তার কাশে এল তাদের যুগপৎ মন্তব্য : লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। পাগল না হলে কেউ পাঁচটা টাকা হাত ছাড়া করে ?

॥ আরাধনা শুভ ॥

ব্যক্তিগত বারান্দায়

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ২.৫০

সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী

১৮-এ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

অনেকদিন ধরেই বেড়াতে যাবার কথাবার্তা চলছিল। প্রাক-পূজাতে মা-বাবার সাথে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দেবাদুন, মুসৌরী, বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ ঘুরে এলাম। আজ সেই বৈচিত্র্যময় ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসেছি। হাওড়া থেকে দুন-এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে তৃতীয় দিন ভোরবেলায় হরিদ্বার পৌঁছে সোজা চলে গেলাম হোটেল। এখানে আমরা মালপত্র রেখে ব্রহ্মকুণ্ডে বা হরকিপৈরীতে স্নান করতে চলে গেলুম। হরিদ্বারে গঙ্গাই প্রধান আকর্ষণ। এখানে আদি-গঙ্গার পথ বদল হয়েছে। বাঁধ দিয়ে কৃত্তিম স্রোত তৈরী করা হয়েছে। পবিত্র জায়গা। রাজা যখন এখানে ব্রহ্মার তপস্যা করেছিলেন। গিয়ে দেখি হাজার-হাজার নারী, পুরুষ এবং শিশু হর-কিপৈরীতে স্নান করছে। জল বরফের মত ঠাণ্ডা। স্রোতও প্রচণ্ড, স্রোতের টানে মানুষ যাতে না ভেসে যায় সেজন্যে ঘাটের ধারে লোহার শেকল বাঁধা। অনেকেই শেকল ধরে স্নান করছে। আমার ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলুম হর-কিপৈরীতে বড় বড় মাছের প্রাচুর্যের কথা, তাই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মাছকে খাওয়ানোর জন্য একটোজা আটারগুলি কিনে নিলুম। মাছগুলিকে নিয়ে একটু মজা করার জন্য আটারগুলিগুলো একটার পর একটা ছুঁড়তে লাগলুম। কিন্তু মোটে দুচারটি মাছ ভুস করে ভেসে উঠে কপাকপ করে খেয়ে পালালো। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। অবশ্য পরে অনেকের মুখে শুনেছি মাছের ঝাঁকের উপস্থিতি অনেকাংশে নির্ভর করে জলের গভীরতার ওপর। হোটেলটি ছিল হর-কিপৈরীর খুবই কাছে। ওখানে কাপড়-চোপড় রেখে চলে এলুম।

তারপর স্বাবার পর্ব চুকিয়ে দিয়ে আমরা অটোরিক্সায় করে বেরিয়ে পরলুম হরিদ্বার পরিক্রমা করতে। প্রথমেই কনুমল, হরিদ্বার থেকে প্রায় দু মাইলের পথ। গঙ্গানদীর প্রাঙ্গণে অবস্থিত রাজা দক্ষের ঋষিদের এখানেই সভা হয়েছিল। নীলধারা এবং ভাগীরথী সঙ্গম-স্থান খুবই পবিত্র। সম্প্রতি দক্ষেশ্বরে মন্দিরটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। তারপর আমরা সপ্তর্ষি আশ্রমে গেলুম। এখানে সপ্তর্ষি অর্থাৎ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, অরী ও গৌতম তপস্যা করে-ছিলেন। সেজন্য গঙ্গা আজও এখানে সাতটি ধারায় প্রবাহিত

হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে গড়ে ওঠা সপ্তর্ষি আশ্রমটি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উদ্বোধন করেছিলেন।

আমরা এরপর ভীমগোদা, কল্যাণ আশ্রম, পবনধাম, ভূমানিকেশ্বর, অবধূত মণ্ডল, বিশ্বকেশ্বর মন্দির, শ্রবণ মন্দির, ভোলাগিরি মন্দির ও আশ্রম, মায়াদেবীর মন্দির, গীতাভবন, গোরক্ষনাথ মন্দির, আনন্দময়ী আশ্রম, মানব কল্যাণ, শিবানন্দ আশ্রম, ভারতমাতা মন্দির, সন্তোষীমাতা মন্দির, শঙ্করাশ্রম, অর্ধাবদ্যালয় ও মনসাদেবীর মন্দির দেখে নিই। মনসাদেবীর মন্দির শিবালিক পর্বতশিখরে অবস্থিত। আমরা রোপওয়ে করে মন্দিরে গিয়েছিলুম। ওখান থেকে হরিদ্বারের অপব্রুপ প্রকৃতি এবং সুন্দর ও রমণীয় দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখলুম। সন্ধ্যার আগেই ফিরে এলুম হোটেল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে ও সামান্য জলযোগ করে একটি দেশলাই পকেটে করে সোজা চলে গেলাম হর-কিপৈরী ঘাটে আরতি দেখতে এবং একটি পাতার নৌকাসহ প্রদীপ কিনে নিয়ে ঘাটের কাছে বসলুম। আরতি শেষ হলে প্রদীপ জ্বলে পাতার নৌকাটি গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দিলুম। নৌকাটি খানিকটা দুলতে দুলতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে গেল। অপরিচীত আনন্দ নিয়ে ফিরে এলুম হোটেল। এখানের মত হৃষিকেশেও সন্ধ্যারতি দেওয়ার প্রথা আছে। রাতে খেয়ে বিশ্রাম করলুম।

পরের দিন হৃষিকেশ ও লছমনঝোলা ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে আমরা হরিদ্বার স্টেশন থেকে রওয়ানা হলাম। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের পথ প্রায় চৌদ্দ মাইল। চারিদিক পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা এবং মুনি-ঋষিদের বাসস্থান। স্বর্গলোকের তোরণদ্বার হৃষিকেশ থেকেই হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিকন্দের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে হৃষিকেশ পৌঁছে গেলুম। তারপর অটোরিক্সায় করে ঘুরে ঘুরে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখলুম। ওই দিনটিতে আকাশের মুখ ছিল ঝকঝকে নীল। সাদা সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিলে ভেসে যাচ্ছে। মিস্তি বাতাস। চারদিকের দৃশ্য সুন্দর। নদীর পাশ দিয়ে চলেছি। গঙ্গা এখানে হরিদ্বারের চেয়ে শান্ত। হৃষিকেশ এবং লছমনঝোলা নদীর দুই তীরে অবস্থিত। লছমনঝোলা

জায়গাটি যেমন সুন্দর, ঠিক তেমনি শান্ত। পাহাড়ের কোলে ছোট জায়গা—এখানে আশ্রম আছে অগুস্তি। লোকজনও কম। গেরন্দবাড়ি চোখে খুবই কম পড়েছে। এখানে দ্রুতসূত্র সত্যনারায়ণ মন্দির, ভরত মন্দির, ত্রিবেণী ঘাট, গুরুদ্বার, রঘুনাথ মন্দির, লছমনঝুলা, স্বর্গাশ্রম, পরমার্থ ভবন এবং শিবানন্দ আশ্রম। এছাড়াও শঙ্করাচার্যের স্মৃতি-নির্মাণিত মহেশ যোগীর আশ্রম এবং গীতাভবন। গীতাভবন প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে এবং দেওয়ালে দেওয়ালে দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী চিত্র। গীতাভবনের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো সমাজসেবা এবং ধর্মীয় ভাবধারাগুলির বহুল প্রচার করা। এখান থেকে হরিদ্বারে ফিরলুম বিকেল বেলায়। রাত্রে খেয়ে বিশ্রাম নিলুম।

পরের দিন সকাল সাতটায় শেয়ার ট্যাক্সিতে করে রওনা হলুম হিমালয়ের মানস কন্যা ও পাহাড়ের রাণী মুসৌরি এবং দেবাদুনের দিকে। দুপুর বারোটায় মধ্যে মুসৌরিতে পৌঁছে গেলাম। মুসৌরির উচ্চতা ২০০৫ মিটার। ক্যাপ্টেন ইয়ং মুসৌরিতে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলেন ইংরাজ আমলে। এখানকার পাহাড়ী পথগুলি উঁচুনিচু একদিকে ঘরবাড়ি এবং অপর দিকে পথের ধারে বনানো হয়েছে টানা রেলিং। হঠাৎ নজরে পড়ল হাতে টানা রিক্সার মত সামনের দিকে ডাঙা লাগানো এক সাবি গাড়ি—যা দুজন লোকে টানে। ঐ গাড়িতে করেই মুসৌরির দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিলুম। আমরা যা দেখছি তার মধ্যে ক্যামেলরক বা উটাকৃতি পাহাড়টি বিস্ময়কর এবং আরও বিস্ময়কর লেগেছিল মুসৌরির সর্বোচ্চ চূড়া লালটি (৮০০০ ফিট) থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা কেদার ও বদ্রীনাথের ভূষার চূড়া। এরপর আমরা ঝাওয়াঘর বা বুলঘর থেকে রোপওয়েতে করে পাড়ি দিয়েছিলুম ‘গানাইল’-এ। বস্তুতঃ এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোমুগ্ধকর। কেমটি জলপ্রপাত শহর থেকে প্রায় পনেরো কিঃ মিঃ দূরে। এটি মুসৌরির অপর একটি আকর্ষণ। তাই স্থানটি শেয়ার ট্যাক্সিতে করে ঘুরে এলুম। ওখানেই ঝাওয়াঘর এবং কেনাকাটার পর্ব চুকিয়ে ফেললুম। হরিদ্বারে কয়েকদিন নিরামিষ খেয়ে মুখটা

কেমন বেন হয়ে গিয়েছিল। তাই এখানে একটি পরিচ্ছন্ন হোটেলে ঢুকে তৃপ্ত করে আমিষ খাবার খেলুম। তারপর মুসৌরিকে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে করে সাঁপল পথ ধরে নীচের দিকে নামতে লাগলুম। পিচ ঢালা রাস্তা। গাড়ি ছুটেছে। ধীরে ধীরে গাড়ি নেমে এলো সমতলে। দুদিকে ফসলের ক্ষেত, মাঠও একেবারে সবুজ, মাঝে মাঝে লোকালয়, ঘরবাড়ি, দোকানপাট। এটিই স্বাপর যুগের দ্রোণাচার্যের নামে নামাঙ্কিত আধুনিক সামরিক শহর দেবাদুন। দেবাদুনের ডিম্মারপার্ক, সহস্রধারা, ডাকাতে গুহা, সামরিক বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখতে দেখতে সন্ধ্যানাগাদ পৌঁছে গেলাম হরিদ্বারে। রাত্রে খেয়ে বিশ্রাম নিলুম।

আমরা হরিদ্বার থেকে সকাল ছটা নাগাদ বেরিয়ে শোনপ্রয়াগ ছুঁয়ে গৌরীকুণ্ডে সন্ধ্যার আগে পৌঁছে গেলাম। ওখানেই রাতিবাস করলুম। কারণ গৌরীকুণ্ডে বাসে ঝাওয়া পথ শেষ। এখান থেকেই হেঁটে যাওয়ার পথ শুরু। কেদারনাথ ৭০০০ ফুট উঁচুতে। গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথের দূরত্ব প্রায় পনের কিলোমিটার। অপারিসীম কষ্টের পথ। সৌন্দর্যের পথ। প্রায় সব পথই চড়াই। গৌরীকুণ্ড থেকে ওটার মধ্যে তৈরী হয়ে ‘জয়বাবা কেদারনাথ’ বলে ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলুম। শুরু হল পথচলা। এপথে কষ্ট আছে। সেটুকু জয় করতে পারলেই শুধু আনন্দ—অপার আনন্দ। সকালের দিকটা মেঘলা ছিল। প্রথমে জঙ্গল-চটিতে পৌঁছলুম। এখানে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলুম। তারপর রামওয়াড়া চটির দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। রামওয়াড়া থেকে কেদারের দূরত্ব মাত্র ৫ কিমি। এখানে চটির সংখ্যাও বেশি। হঠাৎ সূর্যমাসা মিঠে রোদ ছড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। ঘোড়ার পিঠে চড়াই ও উঁরাই দুইই আতঙ্কের। সহিসরা বারবার বলে দিচ্ছে যে চড়াইতে সামনের দিকে এবং উঁরাইতে পিছনের দিকে ঝুঁকতে। মাঝে মাঝে উটোপাট্টা হয়ে গেলে সহিসরা আবার শুষরে দিত। এইভাবে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে এগোতে লাগলুম। হঠাৎ সামান্য দূরে দেখতে পেলুম রামওয়াড়া চটি। এখানে এসে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লুম। একে ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নেই, তারপর মানসিক দিক থেকেও প্রস্তুত নই।

তাই বোড়া থেকে নেমে চটিতে গিয়ে চা ও পকোড়া খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলুম। ক্ষণিকের বিশ্রামের পর পুনরায় শুরু হল পথচলা। মানুষ, বোড়া, ডাঙী, কাঙী সকলেই একসাথে চলেছি একান্তবর্তী পরিবারের মত। পরস্পর পরস্পরের সংবাদ নিচ্ছি। কাউকেই অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে না। সবাই যেন কত আপনজন। সংকীর্ণ রাস্তা। এর মধ্যে একজন অপরজনকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলেই নিশ্চিত মৃত্যু। হঠাৎ চোখে পড়ল যাত্রাপথে গাছপালার সমারোহ যেন ক্রমশঃ কমে আসছে। মেঘের আড়ালে সূর্যমামার লুকোচুরি। মাঝে মাঝে দুএক পশলা বৃষ্টি। ফলে শীতের তীব্রতাও বাড়তে লাগলো। পথচলা মন্থর হয়ে পড়লো। তা সত্ত্বেও আমরা অজ্ঞানাকে জানা এবং অদেখাকে দেখার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললুম। মজার ব্যাপার, বোড়াগুলি কখনোই পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলতে চায়নি। সবসময় খাদের গা ঘেঁসে চলতেই অভ্যস্ত। ভয়টা এখানেই। সমস্ত রাস্তায় সহিসরা আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করছিল। মন্ডাকিনী সেতু নজরে পড়তেই সকল যাত্রীই বলে উঠল ‘জয় বাবা কেদারনাথ’। আমিও তাদের সঙ্গে গলা মেলালুম। এতক্ষণ প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পথ চলে এসেছি। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কেদার মন্দির। শুধু বরফ আর বরফ। কল্পিতপক্ষে পথের ভয়ঙ্কর-সুন্দর রূপ দেখা এখানেই শেষ হলো। জন্মাকিনীর উপত্যকায় কেদারনাথের মন্দির। কেদারনাথে মূর্তি নেই। মন্দিরের ভেতর ঘাড়ের ঝুঁজের মত কালো

পাথরের টিপি। ওটাই নাকি শিবের বাহন। এখানে রাত কাটাবার মেজাজটাই আলাদা। সন্ধ্যায় পূজারতি দেখে ঘুমোতে গেলুম। তারপর দিন সকালে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় কেদারনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরীকুণ্ডে ফিরে এলুম। এখানে চটিতে শুয়ে স্থিতিচারণার মাত্র দিগ্বে বারবার মনে পড়ছিল জরাজীর্ণ সহিসদের বিবর্ণ মুখ এবং হাড়িসার বোড়াদের মুখ। দুয়ের মুখই যেন অপূষ্টির প্রতীক। এখানে খাবার পর্ব চুকিয়ে দিয়ে বুদ্ধপ্রয়াগে রাত কাটিয়ে বিকেলের বাসে করে শৈলশহর যোশীমঠে পাড়ি দিলুম। বুদ্ধপ্রয়াগ থেকে ১৩৯ কিলোমিটার পথ। পাহাড় পরিবেষ্টিত যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথের বাস ছুটে লাগলো। পৌঁছে গেলুম বদ্রীনাথ। মন্দিরের মধ্যে নারায়ণের মূর্তি। অলকানন্দা মন্দিরের প্রাক্ষণের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এখানে রয়েছে, তপ্তকুণ্ড, নারদকুণ্ড, শঙ্করাচার্যের মন্দির ও নীলকান্ত পর্বত—যা পর্বটকের কাছে আকর্ষণীয়। বদ্রীনাথে কয়েকদিন কাটাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হল না। কেননা, তখন দুটো বিরাট যজ্ঞ হচ্ছিল। লোক হয়েছিল প্রায় হাজার দশেক। স্বভাবতই বদ্রীনাথে একদিন কোনো রকমে কাটিয়ে একরাশ ব্যাধা নিয়ে আবার ফিরে এলুম হরিদ্বারে। বাড়তি কটা দিন এখানেই কাটালুম। ভালই লেগেছিল। ঐসমস্ত তীর্থস্থানে আমরা লক্ষ্য করছি জাতপাত ঠাই করে নিতে পারিনি। মানুষে মানুষে সম্পর্কই সর্বত্র প্রাধান্য পাচ্ছে।

পুস্তক সমালোচনা

কাব্যকণা—রচয়িতা শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, প্রকাশক—শ্রীভবুণ বসু, স্টেশন পল্লী, ডানকুনি, হুগলী। চার টাকা।
বিখ্যাত কবি ও গীতিকার শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বিরচিত কাব্যকণা শীর্ষক কবিতা পুস্তক পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছি। সাম্প্রতিক কালে প্রকৃত কাব্যরসসিক্ত এমন রচনা পড়তে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরে বাংলা

কাব্যসাহিত্যে গদ্য কবিতা নামক এক সোনার পাথরবাটি বা কীঠালের আমসত্ত্ব জাতীয় রচনার যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু ভ্রমদাশঙ্করের কথাই ঠিক “গদ্যে কবিত্ব হয় কবিতা হয় না”। দল বাজির জোরে গদ্য কবিতা সাময়িক পরিচয়গুলির আসর অধিকার করলেও প্রকৃত কবিতা Traditional Poetry লিখে যেতে থাকেন। পৃথিবী পার হয়ে বন্দীর বন্দনা লিখে বুদ্ধদেব বসুও হৃদয়ের জগতেই

পুনপ্রবেশ করেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কালিকাক্ষর সেনগুপ্ত, কুম্ভধন দে, শৈলেন্দ্রকুমার লাহা প্রভৃতি এই ঐতিহ্যের পথেই চলেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছুকাল গদ্য কবিতা লিখে “ছন্দোহারা কবিদের” সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেছিলেন, পরে দিলীপ-কুমার, নিশিকান্ত, রবি গুপ্ত, এবং আরো অনেকে এই ছন্দোমধুর জগতেই তাঁদের কাব্য সাধনার অনুষ্ঠান করেন। কবি বিনয়ভূষণ এই ধারায় উল্লেখযোগ্য সাধক। তাঁর কাব্যে গদ্যকবিতার বিকৃত অনুপ্রবেশ ঘটে নি। দ্বারা জীবন তিনি হুম্মের সহজ মাধুর্যের পরিবেশে কাব্যসুধা পরিবেষণ করেছেন। কাব্যকণায় তারই শেষ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

কাব্যকণায় ২৫টি কবিতার মধ্যে প্রথম নয়টি কবিতা কবির আত্মানুভূতির পরিচায়ক। এগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনা বিনয়ভূষণের কবিতায় নেই, তিনি শান্ত, সমাহিত, স্বৈর্ষ্যে অবিচল, জীবনকে তিনি প্রীতির চোখে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর আসক্তি জনিত মৃত্যু-ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েন নি। ভগবানকে কবি বন্ধুভাবে চিরসঙ্গীর মতো গ্রহণ করেছেন, পৃথিবীকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছেন। ‘পাশুশালার’ কবিতায়, ‘তারপর’ কবিতায় কবি প্রিয়াবিরোগবেদনায় তাঁর যে কাতরতা তা সংযত শালীনতায় প্রকাশ করেছেন। এই চরণগুলি উপভোগ্য :—

বাসনা-নিশ্চল মনে নেমে এল অনন্ত ক্রন্দন

নির্বাপিত দীর্ঘশ্বাস হাতে নিয়ে নামিলাম পথে

তারপর জীবন্তী ভাসালাম সাগরের বুকে

সে সমুদ্রে একাকী যে আপনার অস্তিত্বের লয়ে

ভাষাহীন আশাভরা ভাবিতেছি আছে কি সমুখে...

ছয়টি কবিতায় কবি ষড়্ ঋতুর প্রকৃতি বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলি মামুলি ঋতুবিষয়ক কবিতা নয় বা রবীন্দ্রনাথের ঋতুরঙ্গ কবিতাবলীর দ্বারা একটুও প্রভাবিত নয়। ‘পোষালী স্বপ্ন’ সম্পূর্ণ মৌলিক কবিতা বহুবাদী বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর

দ্যোতক অথচ নীরস গদ্যকবিতা নয়—জীবনরসের অনুভূতিতে টাইটুম্বর। হুম্মের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়।

শেষ দশটি কবিতায় কবি দশজন যশস্বী ব্যক্তির বন্দনা গান করেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর মন্বয় উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। আধুনিক সুকান্তও তাঁর স্নেহদৃষ্টি এড়িয়ে যান নি। পৃথিবী যে ক্রমশঃ কঠিন গদ্যময় হয়ে উঠছে বিনয়ভূষণ তা অনুভব করেছেন।

বইটির ছাপা বাঁধাই-প্রচ্ছদপট সবই চমৎকার। এটি সকলের কানে পড়া উচিত। প্রচ্ছদপটে লিখিত কবির রচনার কারণ বর্ণনাটিও বড় সুন্দর। বহুকাল পরে এমন একটি ভাল কবিতার বই পড়ে বড় তৃপ্তি পাওয়া গেল।

—অধ্যাপক শ্রীমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুবর্ণ নদীর স্বর্ণরেণু—ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় : প্রকাশক : রে এ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস, কলিকাতা ৬। মূল্য ৮ টাকা মাত্র।

সুবর্ণ নদীর স্বর্ণরেণু ছোটোদের অভিযান সংক্রান্ত বই যা একদা ঝলমল শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন এনেছিল। বইখানি ছোটোদের হলেও বুড়োদেরও ভাল লাগবে। স্বর্ণের সন্ধানে অভিযাত্রী দল অষ্টেলিয়ার সোনা মাথা নদীর বালুকা ভূমিতে ডয়ংকর অভিযান চালিয়ে তা সংগ্রহ করে বাড়ী ফেরার পথে ভুবো চুষক পাহাড়ের ধারায় জাহাজ ভেসে যায়। সবাই যারা বিবুদ্ধাচরণ করেছিল তারা মারা পড়ে—ভাল যারা ছিল খৃষ্টাব্দসান্নী তারা বাড়ী ফিরতে সক্ষম হয় এবং স্বর্ণ সংগ্রহের কিছুটা পেয়ে বড় লোক হয়ে যায়। ওরা ছিল আসলে আমেরিকার ক্লোরিডা অঞ্চলের অধিবাসী।

বইখানির ভাষা ও গল্প বলার ভঙ্গী মনোগ্রাহী। পড়তে বসলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। বইখানির প্রচ্ছদও ছাপাই ভালো। তাই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—তিমিরবরণ

সম্পাদক : শ্রীতৃপ্তকান্ত মহলানবিশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গান্ধী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীতিব কর কলিকাতা পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং
প্রবর্তক প্রিণ্টিং এন্ড হাফটেন লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গান্ধী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণভূষণ রায় কলিকাতা মুদ্রিত।

মাস ১৩৯১

করুণ

প্রতিষ্ঠাতা - মহাশয় শ্রীমণিলাল

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

জনপ্রিয়তায় গৌরবমণ্ডিত

ক. হোডের

প্রসাধনী

ক. হোড এডমকান কালকাতা-১৪



মহাভদ্ররাজ
আয়ুর্বেদীয় সুরাসিত
কেশ তেল
কলক ট্যালক
কলক সেন্ট



সঙ্কল্পকৃষ্ণ শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপলব্ধিতে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজ, সঙ্কল্পকৃষ্ণ মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনার উজ্জ্বল এই গীতাভাষ্য নতুন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বহুর মধ্যে সঙ্কল্পকৃষ্ণ মতিলালের জীবনভিত্তিক জীলা-বাদী শারীরিক সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, যোগ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত।

মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর সুচিন্তিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিখিল ভারতশাস্ত্রের নির্ণয় স্বরূপ সুবৃহৎ ভূমিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

সূচীপত্র মাস ১৩৯১

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশান্তি	সম্মুগুরু শ্রীমতিলাল	৩০৯
সাধন কণা	সংকলন	সম্মুগুরু শ্রীমতিলাল	৩১০
বাস্তবের বিরোধে নির্বিরোধের সাধক	ভাষণ	অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত	৩১১
মানুষের খোঁজে	কবিতা	চারুণকবি বৈদ্যনাথ	৩১৪
বাস্তি জীবনে ও ধর্মজীবনে ধর্মের অপরিহার্যতা	প্রবন্ধ	অধ্যাপক উমাপদ নাথ	৩১৫
মীণাক্ষী মন্দির, মাদুরা	ভ্রমণ	শ্রীঅর্জুনকুমার মুখোপাধ্যায়	৩১৭
আনবোই আনবো	কবিতা	শ্যামল দাশগুপ্ত	৩২০
আলোড়ন	গল্প	শ্রীশান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১
পার্বত্যজেলা দার্জিলিংয়ের অর্থনৈতিক সমীক্ষা	সমীক্ষা	শ্রীবিষ্ণুনাথ রায়	৩২৫
অব্যক্ত	গল্প	কল্যাণকুমার সামন্ত	৩৩১
সংবাদ-কণা	সংকলন	রমা রায়	৩৩৩
চিঠিপত্র	...		৩৩৪

প্রবর্তকের নিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি ইংরেজী মাসের ৯/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পত্র সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একস্থানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আকর্ষণীয় রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই, সম্পাদকের নহে।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

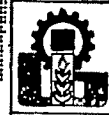
যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মীধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য

ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাবল লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-৭০০০০১

চলিঃ অফিস : ৭ রোড লস রোড, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬

তেলুরমাণ : জে এন বিজয়





বর্ষ ৬৯তম : ১০ম সংখ্যা : মাস ১৩৯১ : জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

জীবনের আলো

...চাই একদল সর্বভাগী সন্ন্যাসী—যাহারা জাতিটার অমূল পরিবর্তন করিয়া আগাগোড়া ইহা নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ইহারাই হইবে দেশ ও জাতির পুনর্নির্মাণে ঈশ্বরপ্রেরিত দেবজাতি। ইহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, পৃথিবীর সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বরতত্ত্বে আপনার সবখানিকে উঠাইয়া নিরন্তর জাতিগঠনের জন্য ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি সবকিছুকে দেশ ও জাতির ভোগ ও অধিকারের জন্ত গড়িয়া তুলিবে। ইহাদের কোন স্বার্থ নাই, না ইহজগতের, না তুরীয়ার। ইহাদের সাধনার প্রতীক্ষা নাই, কেননা ঈশ্বরপ্রেরিত চিহ্নিত সন্তান নিত্যসিদ্ধ। ভগবানকে যে পায় নাই তাহার পক্ষেই বিরাট সাধনা করিতে হয়। ঈশ্বরযুক্তি জীবনের মূল কথা যাহাদের, তাহাদের সাধনা মায়ার আবর্ত। এই নির্মম রক্ত সন্ন্যাসীর অভ্যুত্থানে নুতন কর্মযজ্ঞের অবতারণা হইবে, যাহা হইতে ভগবান কলায় কলায় প্রবুদ্ধ হইয়া জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

আমরা ইহাই ভারতের নির্মাণযুগের মহাতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করি। যেদিন দেখিবে ভারতের নির্মাণ যজ্ঞে, মাঠে হল কাঁধে লইয়া এই সিদ্ধার্থগী কটিতটে চীর জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেদিন দেখিবে রাজনগরীতে নগরীতে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে এই সন্ন্যাসীর দল কোপীন পরিধান করিয়া কুবেরের ধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে—সেইদিন জানিবে জাতির নবযুগ।

শঙ্কর, বুদ্ধের ত্যাগ তোমরা দেখিয়াছ। তাঁহারা পরমতত্ত্ব প্রচারে আবিভূত হইয়াছিলেন। আজ দেশতত্ত্ব প্রচারে শঙ্কর-বুদ্ধের দল নুতন ছন্দে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীকে ভোগ, ঐশ্বর্য ও স্বাধিকার কেমন করিয়া রাখিতে হয়, করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতে। এই ভাগবত অগ্রদূতগণের হস্ত কাম-কাঞ্চনে বাঁকিয়া পড়িবে না, অথচ কলুষ পক্ষে তাঁহারা ডুবিয়াও মরিবে না। এই সিদ্ধকোটির অসংখ্য মানুষ বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একবার প্রত্যয়েয় আগুন বুকে স্থলিয়া উঠিলেই মেঘের দলে ছদ্মবেশী সিংহ গজিয়া উঠে—আমরা তাহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াই। ভারতের কর্ম যে ইহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। কোথায় তোমরা, উদ্ধুদ্ধ হও।*

—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

সাধন-কণা

সঙ্কটগুরু শ্রীমতিলাল

যোগ একটা মহা-বিপ্লব। যেখানে যোগ বিপ্লবময় নয়, অবস্থারিত জ্ঞানও, সেখানে ধর্ম এখনও পুরাতন খাতেই বিহতেছে। গতানুগতিক স্বভাব আশ্রয় তারিয়ারে চলিয়াছে, ধর্মের বিদ্যুৎ বীর্ষ সেখানে ফুটে নাই।

* * *

যোগশক্তি পুরাতন স্বভাবকে ছিন্ন করিয়া, নূতন প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিবে। যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংসারে ছিল, সেখানে আগুন ধরাইয়া দিবে। যোগ আহ্বান করিয়া আনিবে বিশুদ্ধতা, অশান্তি,—একটা আমূল সর্বব্যাপী ছন্দোভঙ্গ। যে যোগ লইয়া শান্তির আশা করে, বিমুগ্ধ ভ্রান্ত সে। বিপ্লবকে, সৃষ্টিছাড়া কে যে ভয় করে, যোগের পথে সে যেন না আসে। এলে দারুণ নৈরাশ্যে অঁচিরে তার বুকখানি ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

* * *

সর্বনাশের পঞ্চতপা আগুন জ্বালিয়া যোগের সাধককে সাধনা করিতে হয়। সে হোমকুণ্ডে তার সব আত্মা পড়ে—তার যা কিছু প্রেম, যা কিছু শ্রেয়। যোগ পথের পথিক সব দিয়া হাটের কাঙ্গাল সাজিয়াছে। তার আপন বলিতে কিছুই নাই। ঘর সংসারে আগুন ধরিয়াছে। রেহ মমতা পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। এ যোগের বড় সর্বনেশে শক্তি। এ শক্তি বড় নির্মম, নির্দয়। কোনও আপোষ মীমাংসার ধার ধারে না।

* * *

মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, দারা-সুত—সংসারের কোন সম্বন্ধই ত মিথ্যা নয়। কিন্তু সবই আজ ব্যর্থ, নীরস, সামঞ্জস্য হীন। সর্বত্র অশান্তি। ঘরে ঘরে ছাই-চাপা অপ্রেমের আগুন—বাইরে যেখানে কোন চিহ্ন নাই, সেখানেও অন্তরে মিলনের অভাবে হাহকার। যোগের ক্ষেত্রে এই

বিরহ ও অমিলন আরও প্রকট হয়। বাহ্য সামঞ্জস্যের কৃত্রিম আবরণ যোগ টানিয়া ছিঁড়িয়া দেয়। ভিতরের উলঙ্গ বিকট অবস্থাটাই তখন ফুটিয়া উঠে।

* * *

যোগজীবনে প্রাকৃত জীবনের যে ছন্দোময় সামঞ্জস্য তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, উদ্ধতন পরা প্রকৃতির নূতন ছন্দ, দিব্য সামঞ্জস্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, ঘোরতর বিপ্লব পুরাতন অরাজকতা চালান। এই অবস্থা ততদিন চলিবেই, যতদিন না একেবারে নবশক্তির অবতরণে জীবনের প্রতিষ্ঠান আগাগোড়া সবখানি আনকোর নূতন হইয়া উঠে।

* * *

যোগের বিধান—জ্ঞাতির জন্ম। জ্ঞাতি আমাদের সাধনার ধন। অনীশ ঈশ্বর হইতেছেন জ্ঞাতিরূপ সমষ্টি-বিগ্রহে। উৎসর্গ ভাগবত জীবনের নীতি। উহাই সমষ্টি জীবন-যাপনের একমাত্র বিধি। দেবজীবন প্রয়াসী একে অন্যকে উৎসর্গ করিবে। এইরূপে প্রত্যেকে পরস্পরকে উৎসর্গ করিয়া নিত্য সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইবে। তাহারই উপর দিব্য পরিবার, সম্ব, সমাজ ও জ্ঞাতির প্রতিষ্ঠা। সেখানেও ভোগ ধর্ম নহে—উৎসর্গই মিলনের সনাতন বিধানরূপে ফুটিয়া উঠে।

* * *

স্বামী স্ত্রীকে আত্মসমর্পণ করিবে, স্ত্রীও করিবে স্বামীকে। এই পরস্পর আত্মদানের উপরই দাম্পত্য মিলনের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। সম্বন্ধ মধুর হয় না, উৎসর্গের দাবী যদি হয় একদিক থেকেই, উভয়েই যদি পরস্পরকে সম্পূর্ণ সম্মানভাবে আত্মসমর্পণ না করে। আসলে পরস্পরে দেওয়া-দেওয়ি না হইলে প্রেম কখনও মৃত হয় না, মিলন যত্ন সফল হয় না।

বাস্তবের বিরোধে নির্বিরোধের সাধক

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত

সংঘগুরুর আবির্ভাব উৎসবে, আমার মত অনাধিকারীকে, সভাপতিত্বে আহ্বান করেছেন আপনারা—এটাকে সংঘগুরু তথা বিশ্বগুরুর হেতুবিহীন কৃপা ছাড়া আর কি বলবো।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আবার আধ্যাত্মিক সাধনাতে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল। ধর্ম আর বিজ্ঞানে বিরোধ বোধ হয় না কি? এই প্রশ্নটা শুনছি অনেক বন্ধু বান্ধবের মুখে। কিন্তু আমার সর্বদাই মনে হয়, বিরোধ তো নেই—ই বরং উভয়ে উভয়ের অনুকূল। সত্যকে লাভ করা, সত্যকে জানা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সত্যস্বরূপ হওয়া—বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, বিরোধ কেন থাকবে?

কিন্তু সবার আগে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রশ্নোৎপন্ন হচ্ছে, ধর্ম কি? বিজ্ঞান বা Science কি? —সূত্র নির্ণয় করা। এক ইংরেজ অধ্যাপিকা বলছিলেন—“আপনাদের শবরের কাগজে দেখা যায় অনেক সময়—Men are sleeping on the pavement. আমরা হাসাহাসি করি। বলি এ কেমন অর্থহীন ইংরেজী। কারণ আমাদের ভাষায় pavement শব্দের অর্থ রাস্তার মধ্যস্থল—যেখানে গাড়ী ঘোড়া সব চলে। সেখানে শুয়ে থাকাতো সম্ভব নয়।” অবশ্য American English এ pavement অর্থ foot path. সুতরাং একই ইংরেজী শব্দ দুই ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে দুই ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। কোন শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে, সেটা নিয়ে নাকতোলা—অবৈজ্ঞানিক। কোন অর্থে ব্যবহার হচ্ছে সেটাই জানা দরকার সবার আগে। Science বলতে Political science, Social science, Commercial science, Science of Arts, Science of philosophy ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করতে চাই। যা কিছু মানুষের মন ও বুদ্ধির বিচারশীল ভূমিকে জাগ্রত করে, সেই বিচারকে জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে একের ছন্দকে আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই বিচারকে আচারে পরিণত করতে শক্তি দেয়,—তাই Science. তাল গাছ থেকে তাল পড়ল, আপেল গাছ থেকে আপেল পড়ল, মোটা মানুষটি সেদিন চেয়ার ভেঙ্গে পড়ে গেল—এমনি সব কষ্ট রকম পড়া রয়েছে—সকল পড়ার মূল সূত্রটি, ছন্দটি আবিষ্কার করার সাধনা

বিজ্ঞানী নিউটনের। ধর্ম কি বলে? আধ্যাত্মিক ধর্ম বলে : সবার মধ্যে যা এক হয়ে আছে, আবার একের মধ্যে বহু হয়ে আছে, সেই নির্বিরোধের ভূমিটি, supra intellectual. সেই ঈশ্বাতীতকে জানা-পাওয়া-হওয়ায় মানব জীবনের সার্থকতা। আমার মনে হয় উপনিষদ এই Scienceকেই বলেছেন অবিদ্যা। সেই নির্বিবোধ ভূমিটিই বিদ্যা, যেখানে এক বহুরও প্রশ্ন নেই, যেখানে অস্তি নাস্তিরও প্রশ্ন নেই (মা আনন্দময়ীর ভাষায়)।

সুতরাং অবিদ্যা বিদ্যা নয় বটে, কিন্তু বিদ্যার বিরোধীও নয়। কয়েক বছর আগে Indian Science Congress Association হয়েছিল বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্বোধন সংগীতে গীত হচ্ছিল সেই উপনিষদের বিখ্যাত শ্লোক কটি—“অবিদ্যা মৃত্যুতীষ্ম। বিদ্যায়ামৃত মম্বদুতে”—মনুষ্যের মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হলে অবিদ্যা চাই। মন বুদ্ধির বিকাশ চাই। আর অমৃত পাওয়া যাবে বিদ্যায় অর্থাৎ মনো বুদ্ধির অতীতে।

এইভাবে ভূমিকা করলাম এইজন্যে যে, সংঘগুরু শ্রীমতীলাল রায়ের জীবনে এই সামঞ্জস্যের সূত্রটি আমি সুন্দর ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে শুনতে পাই। শ্রীঅরবিন্দের আদেশকে মনেরই অন্তর্গত এক উর্ধ্ব ভূমিতে—শ্রদ্ধা ভক্তির ভূমিতে, স্থান দিয়েছেন। সংঘ স্থাপন সম্পর্কে সংঘগুরু উদ্ভূত করছেন শ্রীঅরবিন্দের পদ : “যাহারা বলিবেন, সংঘের দরকার কি? সব একাকার হবে, মুক্ত; সর্বঘটে থাকিবে, ইত্যাদি। সত্যের ইহা একটি দিক মাত্র। জগতের গতি শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে। মূর্তি ভিন্ন জীবনের effective গতি নেই। অরূপ মূর্ত হয়।” গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি যেমন একদিকে বিভিন্ন সাধনার পদ্ধতিকে অনুসরণ করে, পরীক্ষা করে দেখতেন; তেমনি চিন্তার জগতে সমাজ, রাষ্ট্র, স্বীয় পরিবার, স্বীয় বিশ্বাস-শক্তি, সব কিছুকে সমন্বয়ের, সূত্রে বেঁধে চলার সাধনায় এক অনবদ্য সংগ্রামে দীক্ষিত ছিলেন তিনি।

হিন্দুর ধর্মতো শুধু আত্মিক সাধনাই নয়। হিন্দু গৃহস্থের বিধান : মানবিক ধর্ম ও পারিবারিক ধর্ম, নৈতিক ধর্ম, সব কিছুকে যথাযথ স্থান দেওয়া, মান দেওয়া।

সংঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় স্বগৃহে সহধর্মিণীর সেবাকে নিষ্কাম সেবাকে, যা অনবচ্ছিন্ন নিষ্কাম দীপ শিখার মত শুভ কামনায় জ্বলতো, তাঁকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। আবার সমাজের দুঃখ দারিদ্রে ব্যাখ্যাত যারা তাদেরও উপেক্ষা করতে পারতেন না। তাদের ব্যাখ্যায় তিনি ব্যাখ্যাত হয়ে পাগলের মত ছুটতেন। পণ্ডীচেরিতে শ্রীঅরবিন্দকে গুরু দক্ষিণার মত প্রতি মাসে ৮০ টাকা পাঠাতেন। আবার যখন চাকুরী নেই, শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন—“তোমার টাকা না পেয়ে প্রায় অনাহারে আছি।” ওদিকে মতিলালের নিজের পরিবার নির্ভর করে আছে এক ভক্তের সাপ্তাহিক তিনটাকা প্রণামীর উপর, নিজে অনাহারে আছেন, তার জন্য আনন্দের অভাব নেই, জনসেবার বিরাম নেই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ব্যাখ্যায় বিগলিত তিনি। আবার যখন বিশ্বজোড়া বিপ্লবের ডাকে যুবকরা তাঁর নেতৃত্বের আশ্রয় ছুঁচ্ছে, তখন তাঁর সব ভেসে যাচ্ছে—কোথায় আহার, কোথায় বিশ্রাম, কিছুরই স্থিরতা নেই। সংসার পড়ে রইল, স্ত্রী পড়ে রইলেন, উপায়কি? খুবই ব্যথার সঙ্গে শুধু স্মরণ করছেন সেই উপেক্ষিত সংসারকে। তিনি মেনে নিতে পারছেন না, এই বিরোধকে। ঐ যে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের কথা বলেছি। হৃদয়ে চাই—ঐক্যকে চাই, সত্যের ছন্দ, সত্যের ঐক্য আবিষ্কার করাই লক্ষ্য। সেটি আবিষ্কার না করা পর্যন্ত মনের বিশ্রাম নেই। সে আবিষ্কার দর্শনের যুক্তি দ্বারা নয়, কাব্যিক কল্পনা দিয়ে নয়, সমগ্র জীবন দিয়ে পাওয়ার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করতেন।

মা আনন্দময়ীকে একজন বলছেন, মা, আর সংসার ভালো লাগছে না,—শুধু ভূতের বেগার খেটে মরা। মা বলছেন : “ভূত কেন হবে মা, ভূতনাথকে দেখো।” সংঘগুরু মতিলাল রায় সেই ভূতনাথকেই খুঁজছেন। সংসারের গৃহকোণে এবং সমাজে, যুবকদের উত্তেজনায়, রাষ্ট্রে, পৃথিবীতে, মহাবিশ্বে। তাই বলছি, Science আর ধর্ম উভয়ের সাধনা, বিদ্যা আর অবিদ্যা একাকার করে একসুরে বাঁধার চেষ্টা মৃত্ত তাঁর জীবনে। সেই চেষ্টা এক বেদনার সুরে যেন অনুরণিত। এমন সাধক খুবই কম পৃথিবীতে। যেখানে জীবন আর জীবিকায় বিরোধ, ঘর আর বাইরে বিরোধ, ত্যাগ আর ভোগে বিরোধ, বুদ্ধি আর বোধিতে

বিরোধ—বেদনার ক্রন্দন রূপে বাজছিল সেখানে সমাধানের সমাধির জন্য ব্যাকুলতায়।

মতিলাল রায়ের যিনি জীবনসঙ্গিনী তিনি এক অপূর্ণ নারী। সেই নারী এসেছিলেন সেই ক্রন্দনকে ছানিত সংগীতে রূপায়ণের চেষ্টায় সদাজাগ্রত সহযোগীর মত। মতিলাল সামঞ্জস্যকে, হৃদয়কে খুঁজছিলেন জীবন দিয়ে, প্রাণে প্রাণে। একদিকে ঋষির ধারা, ঋষির জীবন—অপরদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিশ্বব্যাপক আন্দোলন। কোনটাই সহজ নয়। আরামের, বিলাসের পথ নয়। সেই দুর্গম পথে সহযোগীতা করতে ভগবানের আশীর্বাদ রূপে পেরেছিলেন সহধর্মিণীকে। “ভার্যাম্ মনোরমাং দেহি, মনো-বৃত্তানুসারিনীম্”, এই প্রার্থনা ঋষিরও প্রার্থনা। না চাইতেই পেয়েছেন এই আশীর্বাদ। অপূর্ণ এই মহিলা। তাঁর যেন কোন দাবী নেই স্বামীর কাছে। শুধু সেবার একটু অধিকার। সেও বড় সহজ নয়। স্বামীর জীবনে রয়েছে অগ্নির মত প্রচণ্ড উন্মাদনা—জীবনের চরম সত্যকে পেতে হবে জীবন দিয়ে। কিন্তু দুর্বলতার ছবি, যা তিনি অঙ্কিত করেছেন নিজের লেখনীতে, তা মানব সাধকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ মানবিক। তাঁর আত্মসমর্পণের সাধনার পথে যে দুর্বলতার কথা তিনি বাস্তব করেছেন, সকল দুর্বল মানুষ তার মধ্যে ভরসার আলো পাবে।

আমার মনে জাগছে, মা আনন্দময়ীর জীবনের একটা সময়ের কথা। তিনি নিবিষ্টভাবে নাম করছেন, আর সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে, কে যেন এক অলক্ষ্য শক্তি, নানান রকম আসন করে যাচ্ছেন, নানান মুদ্রা করে যাচ্ছেন; তিনি যেন শুধু দেখছেন, মজা দেখছেন। এমনি করে রাত ভোর হয়ে গেল, তারপর সেই শক্তি যেন শরীরটাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল উঠোন ঝাঁট দিতে, বাসন মাজতে, রান্না বসাতে। কিন্তু মা দেখছেন, যেন সেই একই আসন মুদ্রা চলছে; সেই শক্তির মজার খেলা। লোকে বলছে—এই বউটি কত কাজ করে, কত কষ্ট; হাতে পায়ে হাজা হয়েছে, সারাদিন জল ঘেঁটে ঘেঁটে। কিন্তু ঐ বউটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, যেন সর্বদা খুশিতে ভরপুর। —শোনগো বউ, তোমাকে কি বলে ডাকবো আমরা। সবাইকে তো অমুকের মা, তমুকের মা বলি, তোমাকে কার মা বলবো? তুমি খুশীর মা। এই ছবি—আদর্শ। যেখানে মন

নেই, মানামানি নেই, ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই—সেখানকার ছাঁবি। কিন্তু আমাদের মত মানব সাধকে মন দিয়েই ভেবে ভেবে মনাতীত হতে হবে। ভাবছি আমার বক্তৃতা দেওয়া নয়, মা-ই এই শরীরটাকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াচ্ছেন বা তিনিই বলছেন। বক্তৃতা শেষ হলে সবার কাছে বিদায় নেওয়ার সময় মন দিয়েই ভাবতে হবে, মা-ই বিদায় নিচ্ছেন, বাড়ী রওনা হচ্ছেন। সেই সময় জী হস্ততো ধমক দিয়ে বললেন, আহা তুমি যে কি কর? বাম পায়ের জুতো ডান পায়ের ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ের! আমিও বিরক্ত হয়ে হস্ততো বলবো,—তুমি বড় disturb করছো। আমি এখন সবই মা করছেন ভাবছি।

সংঘগুরু মতিলাল রায় নিজের জীবনে এই সব দুর্বলতার ছবিগুলি সুন্দর করে এঁকেছেন। তিনি নিজেকে মহাপুরুষ রূপে আঁকেন নি। তিনি যেন সব সাধারণ দুর্বল মানুষের আপনজনের মত হয়ে সবাইকে ডেকে বলছেন—আমি-সমপনের সাধনায় যে সব দুর্বলতা প্রতিবন্ধক হয়, আমারও তাই ছিল। আমিও সহধর্মিণীর সমালোচনায় বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু সহধর্মিণী কি করেছেন—মুখ দেখেই বুঝেছেন অসুরের কথা। তখনই কিছু না বলে পরে শাস্তভাবে বলেছেন : দেখো, যেমন তোমার কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে দেখছো, তেমনি মানুষের যে সমালোচনা, তাকেও ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে দেখতে হবে। দুর্বলতাকে অতিক্রম করে ক্রমশঃ প্রেম ছেড়ে শ্রোয়ের দিকে অগ্রসর হতে তিনি সর্বদাই ছিলেন সহযোগিনী, সত্যিকারের সহ-ধর্মিণী। ভগবান মতিলাল ডাকছেন মানুষকে “হে ভগবান তুমিই পণ্ডভূতের কাঁদে পড়ে, দুর্বলতায় কাঁদছো। আমিও তেমনি কেঁদে কেঁদেই আজ ভগবান। সাহস অবলম্বন কর। সবারই হওয়ার কথা—সবাই যে ভগবান।”

শ্রীমতিলাল রায় অতীতের মানুষ নন। বর্তমানের মানুষ। কারণ বর্তমান জগতের দিকে তাকালে দেখি রাজনীতি আর বিজ্ঞান নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের শোকেশে ঝুলিয়ে রাখার জন্য। রাজনৈতিকরা তার কোন মূল্য দেয় না। তারা বিজ্ঞানকে চায় শুধু তাদের দুর্ভিত্তিকির অঙ্গ রূপে। এতো প্রত্যক্ষ দেখছি। প্রাচীনকালে, কোন নতুন চিন্তাধারা প্রচার করা হত, আলোচনা দ্বারা তর্কসভার

মাধ্যমে। সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল তখন এই ভারতে। বর্তমান যুগে, আসুরিক দস্ত আর শয়তানের দুর্ভিত্তিক রাজনীতির নেতাদের মস্তিষ্কে অবলম্বন করে কাজ করছে। তারা বলছেন—আমিই ঠিক আর কেউ ঠিক নয়। তার প্রমাণ কি? না, আমার হাতে বেশী অস্ত্র আছে। মন বুদ্ধির নীচে রয়েছে। প্রাণাবেগ—সেখানে হিংসা, বিদ্বেষ, দস্ত। তাকেই উত্তেজিত করে কাজ করে রাজ-নৈতিক নেতারা। বিজ্ঞানের বুদ্ধিকে, বিচারকে, বিশ্লেষণকে তারা ভয় পায়। তাই তারা intellectual মানুষকে এড়িয়ে চলে—ধর্মকেও সেই কারণে চায় না তারা। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রীমতিলাল রায় আমাদের পথ—যে পথ শ্রীঅরবিন্দের দ্বারা নির্দিষ্ট।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, “রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে। দিতে হবে শুধু এই সকলের নতুন আকার, নতুন প্রাণ।”

কি রূপ আছে এখন? কি রূপ চাই? বিশ্বের রাজনীতিতে Science নেই—আছে শুধু আসুরিক emotions আসুরিক বৃত্তির হাত থেকে মুক্ত করে রাজনীতিকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করতে হবে। বিভেদকে উপজীব্য না করে তাতে মিলনের, কল্যাণের, প্রেমের, ভগবানের গান ধ্বনিত করতে হবে। সমাজকে দাস্তিক অসুরের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। অসুর রাজনৈতিকদের দাস করে হরিজন আর বর্ণ হিন্দুতে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছে, শিক্ষা দ্বারা, প্রাণের মিল গড়ার সম্ভাবনা চিরকালের মত নষ্ট করতে ব্যগ্র তারা। অসুরের হাত থেকে উদ্ধার করে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টি দান করা মাতৃভক্তের প্রধান দায়। বাণিজ্যকে দাস্তিক অসুরদের হাত থেকে উদ্ধার করে, শূভবুদ্ধির কাছে, স্নেহময়ী মিলনছন্দরূপিণী মায়ের চরণে দিতে হবে। শয়তান বা অসুর শঙ্কর-ভক্ত গুরু নানকের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম নয় বলে প্রচার করতে কিরূপ আগ্রহাষিত। পাশ্চাত্য শেতাঙ্গ শিখদের (?) মধ্যে কলকর্থে ধ্বনিত করেছে সেইমত। শিক্ষা, science, religionকে বিকৃত করে দিয়ে অট্টহাসি হাসছে শয়তান বা অসুর। লুক্ক রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের বুকভরা খুসীর বাণ ছুটেছে আজ। ধর্মকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে কে পারবে? এষে এক দায়া

মানুষের খোঁজে

চারণকবি বৈদ্যনাথ

মানুষের মুখ দেখতে আমি যে ভীষণ ভালবাসি
আহা সে অখণ্ডসত্তা চিদানন্দ পরম পুরুষ
চৈতন্য সন্মাসী।

তাকে তোমরা খুঁজে আনো, পৃথিবীর দেবশিশু
জন্ম যার মানুষের ঘরে
মানুষের বণ্ডনায়, মানুষের দুঃখকষ্টে
বার চোখে বেদনাশু ঝরে
শুনি যার পদধ্বনি মানুষের সংগ্রামের ডাকে
আমার ঈশ্বর তিনি, আহা আমি ভালবাসি
মানুষের ভেতরের সেই দেবতাকে।

বাগানে ফুলের মেলা, কবিতার শব্দের বাগান
যাবতীয় সৃষ্টি বীজে মানুষের অফুরন্ত দান।

মানুষ হারিয়ে গেছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে
এটা কিন্তু শেষ কথা নয়
পৃথিবীর দিকে দিকে আজ অবক্ষয়
এসেছে যদিও
তবু তোমরা স্থির জেনে নিও
সত্য শিব সুন্দরের কখনোই মৃত্যু ঘটে নাকো
দু'হাতে আড়াল করে সূর্যকে যতই ভূমি ঢাকো।

মানুষের দরোজায় কড়া নাড়ছে প্রতিক্ষণ
মানুষের ভেতরের কোনো এক পবিত্র মানব
আজ থেকে শুরু হোক মানুষের নব জন্মোৎসব।

কে ভূমি ঘুমিয়ে আছে? ধনসুখ, মানসুখ, রতি সুখ

এবং অজ্ঞানে

তোমার ছ'তলা বাড়ী গাড়ী কিম্বা দাস দাসী
উর্বশী অঙ্গরা—

সোনাদানা মণিমুক্তো লকারে টকারে
আরও চাপ?

আগামী বসন্তে আরও কতো যে সুখের শয্যা
আবিষ্কার হবে
চাঁদ বা মংগল থেকে বিজ্ঞানীরা কতো কী পাঠাবে।

তাবৎ পৃথিবী জুড়ে এই সব ভোগবাদী মানুষের ভুল
মানুষ কখনো নয়, রক্তে শুক্রে গড়া এক যন্ত্রের পুতুল।
মানুষের জয়যাত্রা স্পুটনিকে রকেটে হয় নাকো
মানুষের জয়যাত্রা মানুষের অন্তর শুদ্ধিতে
পরমচৈতন্য বোধে দেবলোকে মানুষের ঘর
বিশ্বাসের সিঁড়ি ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাওয়া যাবে
লালনের আরশীর নগর।

যেখানে পবিত্র প্রিয় সত্যদ্রষ্টা পড়শীদের বাস
সেখানের সরোবরে প্রতিক্ষণ খেলা করে
পরম আনন্দে সেই কুণ্ডলিনী হাঁস
সেখানে দুষ্কের ঢেউয়ে সোনার কমল ফুটে ওঠে
প্রকৃত মানুষ যারা সেখানে আনন্দে মজা লুটে।
সেই সে দীঘির মধ্যে অতল গভীরে আছে
হৃদয়ের রক্ত রাশি রাশি।

সেখানেই খুঁজে পাবো অমল মানুষ আহা
প্রেমময় চৈতন্য সন্মাসী।

শ্রীঅরবিন্দ-মতিলালের অনুগামীদের দায়, ধার্মিক শিখ,
ধার্মিক মানুষের দায়।

দুর্বল জীব আর অনন্ত শক্তিবুপিণী বিশ্বজননী, এই দুয়ের
যোগসূত্র বা সমাধান খুঁজেছেন মতিলাল। ভগবানে
মতি রেখেই রাজনৈতিক মতিলাল, সমাজসেবী মতিলাল,
ঈশ্বরানুগত মতিলাল, ভয়ে ভীত মতিলাল, বিপ্লবী মতিলাল
বিজ্ঞানী মতিলাল, দার্শনিক মতিলাল, ক্রোধাঙ্ক মতিলাল,
সমাধানে সমাহিত মতিলাল—আজ ভগবান মতিলাল।

দুর্বল মানুষের এই ভগবান মতিলালকে বিশ্বের দুর্বল
মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু personality
cult যেন প্রশ্রয় না পায়। বর্তমানযুগে মা আনন্দময়ী সে
বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করেছেন বিশ্বের সকল মানুষকে।
সংঘ আশ্রমও চাই—সাকারও চাই, নিরাকারও চাই,
(বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ)। তবে সামঞ্জস্যও চাই। সামঞ্জস্যের
সাধনা—শ্রীঅরবিন্দ মতিলালের সাধনা, সেটা যেন ভুলে
না যাই!*

* লিখিত এই মার্চ, সপ্তমের, শ্রীমতিলালের ১০০তম জন্ম উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভার সভাপতির ভাষণের অনুলিপি।

ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে ধর্মের অপরিহার্যতা

অধ্যাপক উমাপদ নাথ

ধর্মের ব্যুৎপত্তিতে রয়েছে ধৃতি। ধর্ম হচ্ছে সেই সব নীতি ও তার প্রয়োগ-প্রকরণ যা সপারিপার্শ্বিক জীবনকে ধরে রাখে। কিন্তু যেহেতু জীবন হলো গতিময়—বর্ধনধর্মী, তাই ধর্মের সূত্রের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধির সংযোগও। তাই, ধর্ম-কথার সামগ্রিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ব্যক্তির ও সমাজের জীবন ও বৃদ্ধিকে ধারণ করে রাখার কৌশল। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের প্রসঙ্গ আসছে এই কারণে যে, ব্যক্তি সমাজের এক ব্যক্তি—সমীক্ষকে বাদ দিয়ে সেই সমীক্ষভূক্ত একটি মাত্র ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচতে বা বাড়তে পারে না। কোন একজন ব্যক্তি তার সমাজের একটি অংশ মাত্র, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়।

এই আলোচনার সত্যতা মানলে, বোঝা যায়, ধর্ম কোন অলৌকিক, অবাস্তব বা অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বমাত্র নয়। যে-যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ জীবনকে ধরে রাখতে ও বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে, তা সবই ধর্মের আওতায় পড়ে। তাই, ধর্ম-সম্বন্ধে স্থাবরস্থের বা ক্ষরিস্থতার কোন চিন্তাই আসে না। বরং বলা যায়, ধর্মের মতো চর্চালব্ধ ব্যবস্থা আর কিছুই নেই। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ধর্মকে তবে সনাতন বস্তু বলা হয় কেন? সনাতন এই কারণে যে, ধর্মের মৌলিক সূত্রগুলি সর্বকালের জন্য সত্য। যেমন ধরা যাক, পরোপকার, সেবা, প্রেম, অবিদ্বেষ, সমদৃষ্টি প্রভৃতি ভাব ও কার্য সমাজ-জীবনের পক্ষে চিরকালীন প্রয়োজন। আবার, গুরুজনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, পাল্যদের পালন, পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি কর্তব্যসাধন প্রভৃতিও সর্বকালীন সাধু-ব্যবস্থা। এগুলি হলো ধর্মের সনাতন নীতি বা অনুশাসন। এ ছাড়া আছে কতকগুলি সনাতন সূত্র, যা বৈজ্ঞানিক-নিয়মভিত্তিক বলে চিরন্তন সত্য। যেমন, অনুলোম বিবাহ-ব্যবস্থা, সুসন্তান-লাভের বিধান প্রভৃতি। সর্বাধিকার প্রার্থিতার হলে পুরুষ নারীর কাছে বরণীয় হয়ে বর-পদ বাচ্য হবে, অনুলোমক্রমের বিবাহবিধান এই। সুসন্তান-লাভের ক্ষেত্রে এটি যে বৈজ্ঞানিক সত্য, তা আজকের মানুষের কাছে অজানা নয়। উন্নততর পশু-প্রজননের ক্ষেত্রেও মানুষ আজ প্রাচীনতর পুরুষ-পশুর সন্ধান করে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মানুষ আজ মানুষের উন্নততর প্রজননের সকল কৌশলই জেনেশুনোও কালের দোহাই দিয়ে অমান্য করছে। ফলে, বিজ্ঞান তার পরিণতি উৎপাদন করতে

ছাড়ছে না। আমরা আজ পরিবার-পরিকল্পনা বলতে সন্তান-সংখ্যার ব্যাপারটাই বুঝি, সন্তানের গুণগত মানের দিকটা নয়। বস্তুত, বাঞ্ছিত গুণলাভের জন্য বিধিবিধি প্রণালীর সম্ভাব্যতা বিজ্ঞানের আবিষ্কার বিষয়। সুখের বিষয় ভারতীয় ঋষিগণ সমাজের প্রাগ্গতিগত কথা মনে রেখে এ-সম্বন্ধে তাঁদের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সূত্র বহুকাল পূর্বেই মানুষকে উপহার দিয়েছেন। এ সত্যও তাই সনাতন। মহাকাবি কালিদাসকৃত ‘কুমারসম্ভবম্’ এই সনাতন সত্যের কাব্যিক সূত্রোপহার ছাড়া আর কিছুই নয়। কুমার-সম্ভব ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ না হয়েও বিবাহসংস্কার ও সুসন্তান-লাভের বিধিবিধান-সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছে। কুমার-সম্ভব আমাদের শিক্ষা দেয় যে, গার্হস্থ্যশ্রমের পূর্বে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন আছে, ঋষিদৃষ্টিতে যে-বিবাহ ঋজুর সমমর্যাদাসম্পন্ন তার পবিত্রতা-রক্ষার জন্য চাই ইন্দ্ৰিয়সংযম। স্পৃহনীয়বীর্ষ কুসুমধনুর্ধর কন্দর্পের মোহে পরাভূত দম্পতি কখনো সমাজহাতা লোক-মঙ্গল সন্তানের জনক-জননী হতে পারে না। ‘অত আহতুমিচ্ছামি পার্বতীমাত্মজন্মানে। উৎপত্তায় হবির্ভোক্তু-র্ধজমান ইবারণিম্ ॥’ হোমায়িত্রি নিমিত্ত যজ্ঞমান কর্তৃক অরণিসংগ্রহতৎপরতা নিয়ে আমি আজ আত্মজলাভার্থে পার্বতীর প্রয়োজন বোধ করছি। কিন্তু এই মানসিকতা আসার পূর্বে ‘তবং স বিহির্ভবনঃপ্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকায়।’ মহেশ্বরের কপালনেত্রের জ্যোতিঃপ্ররোহে, কামদেব মদন ভস্মীভূত। কেবল তৎপরেই লোক-কল্যাণযজ্ঞের পূর্ণতাসম্পাদনের নিমিত্ত ‘ধর্মেণাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি।’ ধর্মবৃদ্ধির দ্বারা পার্বতীর প্রতি শব্দরের মন আকৃষ্ট হলো। তখন উভয়ে ‘ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্’ হয়ে গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবিষ্ট হলেন। এইভাবেই কন্যা হয় ‘সম্ভূত-প্রতিপাদিতা’।

ব্যক্তি-জীবনে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অনুভূতি লাভের জন্য সে ক্রিয়া কৌশল এবং মনন-চিন্তনের ও নির্জনবাসের প্রথা প্রচলিত আছে, তা হলো মুখ্যতঃ ব্যক্তিপ্রয়োজনের ব্যাপার, যা সামগ্রিক ধর্ম প্রবাহের এক বিশিষ্ট তত্ত্বমাত্র। ধর্ম সমীক্ষকল্যাণের জন্য। ব্যক্তি সমীক্ষার অংশ বলে সমীক্ষার হিত-প্রকরণ থেকে ব্যক্তিও

লাভবান হয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ প্রয়োজন ও প্রাক্কজাত গতিপ্রকৃতির পরিপূরণকল্পে যে ক্ষুরণের বন্দোবস্ত তা হলো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম সবটা নিয়ে হলেও, মাত্র ঐ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতাটুকুই ধর্মের সবটা নয়। ধর্ম হলো ব্যাপক ধৃতিবিধান, সমষ্টির কল্যাণচিন্তাই যার প্রধান এষণা।

কাজেই, আমরা যারা মুখে বলি, বর্তমান বহুনির্ভর বিজ্ঞানসর্বস্ব সভ্যতার যুগে ধর্মের কথা পুরনো পচা অপয়োজনীয় লোকঠকানো কথা, সেই আমরা কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচাতে সর্বদাপ্রাণান্ত হচ্ছি। বিজ্ঞানের আশ্রয় খুঁজছি, কিন্তু সবাইকে নিয়ে বেঁচে থেকে বেড়ে ওঠার বিজ্ঞানই যে ধর্ম, সে-কথা ভুলে যাচ্ছি। অনেক সময় আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মকে গুলিয়ে ফেলে নিজে বিভ্রান্ত হচ্ছি। মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিতে পারলেও আমরা বাঁচার সূত্র বা ধর্মকে বাদ দিতে পারি না। ধর্ম হচ্ছে ন্যূনতম সাধারণ সামাজিক বিধান।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, আমরা সচরাচর উৎসব ও পাল-পার্বণকে ধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। উৎসব ও পাল-পার্বণগুলি হয় প্রাকৃতিক পরিবর্তন-সূচনা কিংবা জন-জীবনযাত্রার আঞ্চলিক রীতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটির পিছনেই রয়েছে, সবাই একত্রে মিলে-মিশে আনন্দ করার উদ্দেশ্য। এসব গণ-উৎসবের সঙ্গে ধর্মের তত্ত্বকে মিশিয়ে ফেলে আমরা মারাত্মক ভুল করি। এক সম্প্রদায়ের গণ-উৎসবের আয়োজকদের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের গণ-উৎসবের আয়োজকদের যে কলহ এবং সেই কলহজাত যে ভয়ংকর পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার জন্যে কিন্তু ধর্ম দায়ী নয়। আগেই বলা হয়েছে, ধর্ম বাঁচা-বাড়ার মন্ত্র। সুতরাং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে কিছু বহিরাঙ্গিক রীতি ছাড়া ধর্মের মূল সূত্র সকল দেশের সকল লোকের পক্ষেই অভিন্ন। এ ক্ষেত্রেও পরিবেশগত কানুনকে ধর্মের বিধান বলে মনে করা ভুল। শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়, ঈশ্বর যেমন এক ও অদ্বিতীয়, ধর্মও তেমনি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা যে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর কথা বলে থাকি, তা না বলে বরং একই

মানবধর্মের বিভিন্ন প্রবক্তার মুখে প্রচারিত স্থানিক-প্রয়োজন চিহ্নিত আচার ও আচারালম্বী বলা উচিত। সবাই এইভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ অবাস্তর মনে হবে। ধর্মের একটিই পরিচয়। তা হলো ধৃতিবিজ্ঞান। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রবক্তার মুখ দিয়ে তা প্রচারিত হলেও, তা মূলতঃ অভিন্ন। কালিক বিধান ও স্থানিক কানুনকে সর্বজনীন ও সনাতন ধর্মের তত্ত্বচিন্তা থেকে সযত্নে পরিহার করলে গুহানিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করা কঠিন নয়।

পুরুষোত্তম অর্থাৎ পরম-পরিপূরক শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও কর্মপ্রবাহের মধ্যে আমরা সমষ্টিধর্ম এবং ব্যক্তি ধর্ম উভয়েরই সমাগু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তিনি ধর্মসংস্থাপক—ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই। পশ্চাদ্ভূমিসহ সমগ্র কুরুক্ষেত্রকাণ্ডই লোকধর্মের তাৎপর্যবাহী। এর মধ্যকার গীতার যোগাধ্যায়গুলির বাণীসমূহ ব্যক্তিধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার আধার। এক অংশে দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে সাধু অর্থাৎ জীবনবুদ্ধিকামী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের পরিচাণের আয়োজন এবং কর্মবীর অর্জুনের প্রতি কথিত বাণী-অংশে ব্যক্তিজীবনের সর্বশেষ সার্থকতার পরিচিহ্ন—এই দ্বিক্ষেত্রবিস্তারী ধর্মদাতা রূপে শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড ধর্মের প্রতীক।

আমরা আগেই বলেছি, ধর্মের এই স্বরূপ সনাতন, শাস্ত। ব্যাপকার্থে ধর্মপালনই যোগ। আর পরম-পূরক-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই অব্যয় অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় যোগের কথা আমি সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য তৎপূত্র মনুকে এবং মনু স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই সনাতন তত্ত্বের কথা প্রকাশ করেন। সেই থেকে মানুষের জন্য ধর্মের বাণী অব্যাহত রয়েছে। আর যখনই এই ধর্মের মানি ঘটেবে ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব প্রকট হবে তখনই আমি নরদেহে পুনরাগত হবো। এর থেকে বোঝা যায়, ধর্মপ্রবাহের স্রষ্টা এবং তার প্রাণসম্ভারক পুরুষ এক উৎস থেকেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে একোদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হন। এই ধর্মসংরক্ষক পুরুষগণের প্রবাহ বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণার্থে। এইটুকু বুঝে নেবার মতো মানসিকতা ও উদারতা না থাকার্টা বন্ধুতঃ ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর।

মীণাক্ষী মন্দির, মাদুরা

শ্রী অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। কাশ্মীর হ'তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাদেশ শত সহস্র মঠ, মন্দিরে পরিপূর্ণ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগে অবতারগণ, মহাপুরুষগণ মূর্খিষ্টিগণ এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। যুগে যুগে তাঁরা তাঁদের ধ্যান ধারণায় ভারতকে ও ভারতের জনগণকে ধন্য ও মহিমান্বিত করেছেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক ও পরমাধিক ভাবধারায় দেশকে অনুপ্রেরিত ও প্রাণিত করেছেন। সেই পবিত্র ধর্মশ্রোত সত্যযুগ হ'তে অদ্যাবধি অব্যাহত আছে এবং এই বিশাল দেশের জনগণের জনমানসে অন্তরের অন্তরতম স্থানে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে আমাদের স্তোত্র, অজ্ঞাতসারে সর্বদা লক্ষ্যপথের নির্দেশ দিচ্ছে। অনাদি-কাল হ'তে এই পবিত্র ভাবধারার ধারক ও বাহক স্বরূপ কত শত সম্প্রদায় এই বিশাল দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্নকালে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাব, ধারণা ও আদর্শ অনুসারে চৌদিকে শত সহস্র মঠ, মন্দির নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাবধারণা অনুযায়ী সেই সব মন্দির মঠে ইষ্ট দেব দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুগ যুগ ধরে পূজা পেয়ে আসছে। ভারতবর্ষকে তাই দেবভূমি বলা হয়। চিরভূষাবৃত ভারতাত্মা হিমালয় দর্শন এবং কাশ্মীর হ'তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারতের চৌদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য দেবালয়, তীর্থস্থান, দেব দেবীর মূর্তি পরিদর্শন না করলে, তিনি যে কী বিরাট, কী মহান, তা সম্যক উপলব্ধি হয় না। সম্রাট গ্রহণের পর সম্রাটসদৃশের পরিব্রাজক রূপে ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে মঠ মন্দির পরিদর্শন করা এই মহান দেশের প্রচলিত রীতি ছিল এবং উহা অদ্যাবধি বর্তমান। তাই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, “যুগ-যুগান্তর হ'তে কত সাধু, ভক্ত, সিন্ধুপুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে। সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ।”

এমনই এক পবিত্র ভাবধারার বাহক ও ধারক দক্ষিণ-ভারতের মাদুরায় মীণাক্ষী দেবীর মন্দির। মাদুরাই দক্ষিণ ভারতের এক ঐতিহাসিক শহর, তার প্রধান কারণ এখানে

দেবী মীণাক্ষী বিদ্যমান। প্রাক ঐতিহাসিক যুগ হ'তে মাদুরার নাম রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে পাওয়া যায়। আড়াই হাজার বৎসর ধরে মাদুরায় দ্রাবিড় সভ্যতার কেন্দ্র-স্থল ছিল। বহুকাল ধরে পাণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর এখানে রাজত্ব ছিল। খ্রীষ্ট জন্মাবার পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীলঙ্কার প্রথম রাজা বিজয় ছিলেন এক পাণ্ডিয়ান রাজার জামাতা। খ্রীষ্টপূর্ব তিনশত কুড়ি বৎসরে গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস্ লিখেছিলেন, মাদুরাই এক পাণ্ডিয়ান রানীর দ্বারা শাসিত হত। ঐতিহাসিক গ্রীকদের লেখায় মাদুরায়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি রোমান সম্রাট অগাস্টস-এর সাহিত পাণ্ডিয়ান রাজার দূত পর্যায়ে সম্পর্ক স্থাপিত ছিল।

প্রচলিত কাহিনীমতে দেবাদিদেব মহাদেব রাজা সুন্দরেশ্বর রূপে মাদুরায় অবতীর্ণ হ'য়ে পাণ্ডিয়ান রানী মীণাক্ষীকে বিবাহ করেন। দেবী পার্বতী স্বয়ং রানী মীণাক্ষীরূপে অবতীর্ণ হন। মাদুরায়ের এই জগদ্ধিত্যাত মন্দিরের নাম তাই মীণাক্ষী-সুন্দরেশ্বর মন্দির। মীণাক্ষী সুন্দরেশ্বরের প্রস্তুতখচিত বিবাহের দৃশ্য শিম্পমাধুর্যে অপূর্ব, অতুলনীয়। প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে মীণাক্ষী সুন্দরেশ্বরের বিবাহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে বহু দূর দূর হতে লোকজন উৎসবে যোগদান করে থাকে।

ইংরেজি ১৯৮৪ সালের ২রা জানুয়ারী আমি সন্ধ্যাক বেলা আন্দাজ ১০ ঘটিকায় রামেশ্বর হতে ট্রেনযোগে মাদুরা স্টেশনে পৌঁছাই। মন্দির স্টেশনের অতি নিকটে। আমরা পদব্রজে মন্দিরের দ্বারে পৌঁছলাম। দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরগুলির মধ্যে মীণাক্ষী দেবীর মন্দির বৃহত্তম।

মহাসমুদ্র বা তুষারমণ্ডিত হিমালয় পর্বতমালা প্রথম দর্শনে যে রূপ অভিভূত হতে হয়, মীণাক্ষী দেবীর মন্দিরও প্রথম দর্শনে সেইরূপ বিস্ময়কর লাগে। সুউচ্চ বিরাট বারিটি প্রবেশ দ্বার। তন্মধ্যে চারিটি বিশালস্বে অধ্বিতীয় ও অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। মন্দির অভ্যন্তরে বিশাল প্রাঙ্গণ এবং শিম্প নৈপুণ্যে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় ভাস্কর মূর্তিসকল, এই মন্দিরকে জগদ্ধিত্যাত করেছে। প্রবেশদ্বারকে ‘গোপুরম’ বলা হয়। চারিটি বিশাল গোপুরমের মধ্যে বিশেষ করে

দক্ষিণ গোপুরমের সুষমা ও মাধুৰ্য্য তামিল সভ্যতা ও প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ দণ্ডায়মান। দক্ষিণ গোপুরমের উচ্চতা ১৬০ ফিট, পূর্ব গোপুরমের উচ্চতা ১৫৩ ফিট, উত্তরের ১৫২ ফিট ও পশ্চিম গোপুরমের উচ্চতা ১৫৪ ফিট। দক্ষিণ গোপুরমের উপর ১৫১১টি কারুকার্যমণ্ডিত প্রস্তরমূর্তি আছে ও মস্তকে বা শীর্ষদেশে সিংহ, হস্তি ও অশ্ব মিশ্রিত এক ইয়ালি (YALI) মূর্তি দণ্ডায়মান। ঐ-ইয়ালি মূর্তির এক এশটি চক্ষু প্রস্থে আড়াই ফিট। ইয়ালি মূর্তিটি যে কত বড় এ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ পূর্ব গোপুরমের উপর ১০১১টি কারুকার্যমণ্ডিত প্রস্তর মূর্তি এবং পশ্চিম গোপুরমের উপর ১১২৪টি কারুকার্যমণ্ডিত প্রস্তর মূর্তি বিরাজমান।

মন্দির অভ্যন্তরে কতকগুলি মণ্ডপ বা সভাগৃহ আছে, যার মধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রস্তর মূর্তিসকল দৃষ্ট হয়। এমন কী সভাগৃহের ধামগুলি পরিস্ত সুন্দর মূর্তিতে পরিপূর্ণ। এই সব মণ্ডপের বিশেষ বিশেষ নাম আছে, যেমন (১) অষ্টশক্তি মণ্ডপ (২) মীণাক্ষী নাইকার মণ্ডপ (৩) মুদালী পিলাই মণ্ডপ (৪) উজ্জল মণ্ডপ (৫) কমবাধাগী মণ্ডপ (৬) পুডু মণ্ডপ (৭) সহস্র ধাম বিশিষ্ট মণ্ডপ (৮) কল্যাণ মণ্ডপ (৯) কিলিকুট্টু মণ্ডপ (১০) কামবাধাগী মণ্ডপ।

ঐ অষ্টশক্তি মণ্ডপের দ্বারদেশের উপর মীণাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের বিবাহের অতুলনীয় সুষমামণ্ডিত প্রস্তরমূর্তি বিরাজমান এবং সভাগৃহের উপর আটটি বিভিন্ন শক্তিমূর্তি শোভা পাচ্ছে।

মীণাক্ষী নাইকার মণ্ডপের অভ্যন্তরে বহু প্রস্তর মূর্তি ছাড়াও গোলাকার কংসানির্মিত তৈলপ্রদীপ যা অদ্যাবধি সমস্তে রক্ষিত এবং প্রত্যহ জ্বালান হয়।

মুদালী পিলাই মণ্ডপও নুশোভিত ও আলোকে পরিপূর্ণ। ধামগুলির উপর আরণ্যিক ঋষিদের ও ঋষিপত্নীদের প্রস্তরমূর্তি ও শিবমূর্তি বিরাজমান।

মুদালী পিলাই মণ্ডপ হ'তে বাইরে এলে চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা ঘেরা “স্বর্ণপদ্ম সরোবর” দৃষ্ট হয়। এই সরোবরের উত্তর পার্শ্ব বারান্দার ধামগুলিতে তৃতীয় তামিল একাদেমির চব্বিশ জন কবির প্রস্তর মূর্তি আছে। সরোবরের দক্ষিণ পার্শ্ব বারান্দায় অমর কবি “থিবুভল্লভবের” থিবুকুবাই

কাব্যের সমস্ত দৌহাগুলি প্রস্তর গাত্রে শোভা পাচ্ছে। এ ছাড়া দেয়াল গাত্রে দেবাদিদেব মহেশ্বর ও তাঁর ভক্ত-বৃন্দে বহু কাহিনী অঙ্কিত আছে।

উজ্জল মণ্ডপ এই সরোবরের একেবারে পার্শ্বে। কাল পাথরের একটি প্লাটফর্ম এখানকার বিশেষ দৃষ্টব্য; প্রতি শুব্বার প্রধান দেবদেবীর স্বর্ণমূর্তি এই প্লাটফর্মের উপর রাখা হয়।

পুডু মণ্ডপেও বহু সুন্দর সুন্দর প্রস্তর মূর্তি বিরাজমান। সহস্র ধাম বিশিষ্ট মণ্ডপটি শিম্পসভারে পরিপূর্ণ, ইহাকে মন্দিরের কলাভবন বা আর্ট মিউজিয়াম বললে অত্যাতি হয় না। এখানে তামিল শিম্প, তামিল কৃষ্টি, তামিল স্থাপত্য ও সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। মন্দিরের এই আর্ট মিউজিয়ামে হিন্দুদর্শনের উৎকর্ষতার, বৈশিষ্ট্যতার ও গভীরতার নিদর্শন মেলে। হাজার ধাম বিশিষ্ট এই মণ্ডপে মূলতঃ নয়শত পঁচাশীটি ধাম বর্তমান এবং ইহার পরিধি দুইশত চল্লিশ ফিট লম্বা ও দুইশত পঞ্চাশ ফিট চওড়া। মন প্রাণ অপূর্ব আনন্দে ও বিস্ময়ে ভরে যায়।

কামবাধাগী মণ্ডপেও অপূর্ব সব প্রস্তর মূর্তি আছে। এখানে এমন পাঁচটি আশ্চর্য ধাম আছে যা লোহার রড দ্বারা বাজালে বাজনার মত আওয়াজ আসে। উহাদের “মিউজিক্যাল পিলার” আখ্যা দেওয়া হয়।

কল্যাণ মণ্ডপের কাঠের কারুকার্য অবর্ণনীয়। এ ছাড়া, চৌদিকে ছড়ান আছে কত শত প্রস্তর মূর্তির বিচিত্র সম্ভার। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়—বিখ্যাত অষ্টভূজা নৃত্যরতা কালীমূর্তি, ষণ্ডপৃষ্ঠে অসীন শিব-পার্বতী, রাবণ অনুগ্রহ মূর্তি যাহাতে রাবণের কৈলাস উত্তোলন ও শিবের আশীর্বাদ কাহিনী অপূর্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশিত, অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি, হরিহর মূর্তি, শিবের অর্দ্ধেক নারী ও অর্দ্ধেক পুরুষ মূর্তি, কিরাতাজ্জুন মূর্তি, অতুলনীয় বিশাল বল্লভগণপতি মূর্তি, নটরাজ মূর্তির সুষমা, সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কিলিকুট্টু মণ্ডপে প্যারট বা পাখী রাখা আছে। প্যারট পবিষ্ট বলে মনে করা হয়। মীণাক্ষী দেবী দক্ষিণ হস্তে শাস্তি ও সুখের প্রতীকস্বরূপ একটি প্যারট ধরে আছেন। এই মণ্ডপে রামায়ণের বালী-সুগ্রীবের কাহিনী ও মহাভারতের

পাণ্ডবদের বহু কাহিনীর প্রস্তর মূর্তি সকল দৃষ্ট হয়। শিল্পমার্ঘ্য ও সৌন্দর্য অতুলনীয়।

কিলিকুট্টু মণ্ডপের মধ্য দিগে মীগাঙ্গীদেবীর প্রধান মন্দিরে যাইতে হয়। প্রথমে মহামণ্ডপ, পরে দেবী মীগাঙ্গীর গর্ভমন্দির। ঐ মহামণ্ডপের দেয়ালে দেবীর মূর্তির মুখোমুখি অন্ততঃ একশত হাত দূরে মস্তবড় একখানি আয়না এমন ভাবে উচ্চে টাঙ্গানো আছে যে ভীড়ের জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ না করেও মহামণ্ডপের যে কোনও স্থানে দাঁড়িয়ে আয়নার মধ্যে মীগাঙ্গীদেবীর মূর্তির দর্শন মেলে। দর্শনের এরূপ অপূর্ব ব্যবস্থা পশ্চিমে দ্বারিকানাথের মন্দিরে ছাড়া আর কোথাও দেখি নাই।

মন্দিরের বাইরে রাস্তার উপর পূজার উপকরণের দোকান। যাত্রীগণকে ঐ দোকান হতে পূজার উপকরণ ক্রয় করতে হয় আবার ভিতরে ঐ পূজা দেবার জন্য টিকিট ক্রয় করতে হয়। দেবীমন্দিরের পূজারী টিকিট না থাকলে পূজার জন্য ডালা লইবে না। বলাবাহুল্য, সাড়ে পাঁচ টাকার পূজার উপকরণ সমেত ডালা ও আড়াই টাকার টিকিট ক্রয় করে লাইনে দাঁড়িয়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলাম। একে একে একেবারে দেবীর সম্মুখে হাজির হলাম। পূজারী টিকিট ও সব পূজার উপকরণাদি গ্রহণ করে কপূর ছেলে দেবীমীগাঙ্গীর আরতি করে ঐ অগ্নির তাপ আমাদের লইতে বললেন ও দেবীর প্রসাদ দিলেন। পাণ্ডার জুলুম এখানে একেবারে নাই।

দেবী মীগাঙ্গী কাল পাথরে নির্মিত দণ্ডায়মানা অপূর্ব মূর্তি। দেবীদর্শনে হৃদয় মন প্রাণ ভরে গেল। দেবীর দুটি চোখ মীন অর্থাৎ মৎস্যের মত, ছোট ছোট গোলাকৃতি। বহু বিচিত্র বর্ণের পোষাকে আপাদমস্তক মণ্ডিত। মস্তকে বিচিত্র বর্ণের মুকুট সুশোভিত। রাশি রাশি পুষ্প সম্ভারে বিভূষিত। দক্ষিণ হস্তে সুখ-শান্তির প্রতীক পক্ষী ও বামহস্তে অভয়দান। মা মীগাঙ্গী চৌদিকে বহু বিচিত্র আলোক-মালায় উদ্ভাসিত হয়ে সিংহাসনে দণ্ডায়মানা। একদৃষ্টে দেখছি আর মনে মনে বলছি, হে মা কৃপাময়ী, কৃপা করে সন্তানকে দর্শন যদি দিগ্বেছ, দাও মা, আমার অন্তর উদ্ভাসিত করে দাও, আমার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত কর মা,

যেন শ্রীগুরুপদে অচলা ভক্তি ও ইচ্ছালাভ হয়, মা। তোমার কৃপায় সবই সম্ভবঃ

“মৃকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরীম্
যা কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥”

পরিশেষে দেবী মীগাঙ্গীর ভক্তের প্রতি অহেতুক কৃপা ও করুণার দুইটি সত্য কাহিনী নিয়ে লিপিবদ্ধ করলাম।

পীটার বুজ নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক ১৮৯২ সালে মাদুরায়ের কালেক্টার ছিলেন। প্রত্যহ ভোরে সাহেবের অভ্যাস ছিল অশ্বপৃষ্ঠে মীগাঙ্গীদেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করা। সাহেব অন্য কোথাও না বেড়িয়ে প্রত্যহ মন্দির প্রদক্ষিণ করে প্রাতঃর্জন সমাপ্ত করে তাঁর বাঙলোয় ফিরতেন। একদিন বর্ষাকালে সারারাত মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সাহেব ভোরে বিছানায় গভীর নিদ্রামগ্ন। একটি ছোট মেয়ে সাহেবের ঘুম ভাঙ্গাল। সদ্য নিদ্রোখিত সাহেব পরম বিস্ময়ে সেই মেয়েটিকে দেখল। মেয়েটি তাকে ইসারায় অনুসরণ করতে বলল। যন্ত্র চালিতের মত সাহেব শয্যা পরিত্যাগ করে মেয়েটিকে অনুসরণ করল। সেই ছোট মেয়েটি সাহেবকে মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, এমন সময়ে সশব্দে বজ্রপাত হ’ল এবং পরক্ষণেই পীটার সাহেব পিছনে তাকিয়ে দেখল তার বাঙলো বজ্রঘাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় সেই ছোট মেয়েটি? তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। দেবী স্বয়ং ছোট মেয়ের বেশে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করলেন। পীটার এই বিশ্বাসে দেবী যে অস্থানে উৎসবের সময় আরোহণ করতেন সেই অস্থানের জন্য স্বর্ণলাগাম তৈরী করে দেন। সাহেবের এমনই গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি বন্ধমূল হয়েছিল যে সে কখনও মার কাছ-ছাড়া হয় নাই এবং দেহান্তে তারই ইচ্ছানুসারে মন্দির নিকটস্থ ওয়াই, এম, সি. এ প্রাঙ্গণের মধ্যে কবরস্থ হয়ে অমর হয়ে আছেন।

দ্বিতীয় কাহিনী,—ভয়নাগারাম নাগাঙ্গা চেট্টয়ার ও তাহার ভ্রাতা ভেনকটচলম চেট্টয়ার। দুই ভাই দেবী মীগাঙ্গীর পরম ভক্ত ছিলেন। মীগাঙ্গীদেবীর জন্য সোনার রথ তারা তৈরী করে দিয়েছিলেন। মার জন্য, মার মন্দিরের জন্য সোনার আসবাবপত্র, সোনার সিংহাসন ইত্যাদি বহুবিধ

মূল্যবান দ্রব্য নির্মাণে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন, তখনকার দিনে যখন সোনার মূল্য ছিল প্রতি ভরি তের টাকা মাত্র। প্রতি বৎসর মীণাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের বিবাহোৎসব সুষ্ঠু পালনের জন্যও তারা বহু টাকা মন্দিরে গচ্ছিত রেখেছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাগাপ্পা চেট্টিয়ার দেবীর প্রসাদ ব্যতীত অন্য কোনও খাদ্য কোনওদিন গ্রহণ করতেন না। এমনই ভক্ত ছিল। একদিন এক জরুরী কার্যোপলক্ষে তাকে শহরের বাইরে যেতে হয় এবং ফিরতে রাত হয়। পথে কোনও খাদ্য খেতেন না বলে তার সঙ্গে খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয় পথিমধ্যে খাবার জন্য। দেবীর প্রসাদ ব্যতীত নাগাপ্পা অন্য কিছু গ্রহণ করত না বলে সঙ্গে খাদ্যপ্যাকেট সে তার সঙ্গীকে দিয়ে উপবাসে গাড়ীতে নিদ্রা যায়। দেবী এক ছোট মেয়ের বেশে একটি সোনার থালায় প্রসাদ নিয়ে তাকে খেতে ডাকেন। প্রথমে নাগাপ্পার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু না, স্বপ্ন ত নয়। সোনার থালা প্রসাদ সমেত সামনে বাস্তববস্তু। আর সেই সোনার থালা দেবীর উদ্দেশে তারই

দেওয়া। মন্দিরে ফিরতে ভোর হয়ে গেল। নাগাপ্পা চেট্টিয়ার সোনার থালা হাতে সোজা গিয়ে দেবীকে সার্ঘ্যদ্রব্য প্রণাম করল। এদিকে দেবীর সোনার থালা না পাওয়া যাওয়ার কতৃপক্ষ হৈ চৈ শুরু করেছে। নাগাপ্পার হাতে সেই সোনার থালা দেখে সকলে বিস্মিত হল। তার মুখে দেবী মীণাক্ষীর করুণার কাহিনী শুনে সকলেই স্তম্ভিত হল। ভক্তের প্রতি দেবী মীণাক্ষীর এমনই করুণার কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

আমার মনপ্রাণ কেবলই বলছে, মাগো, আমায়ও করুণা করো মা! শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রগাঢ় বিশ্বাস দিও; তোমার করুণাই আমার একমাত্র ভরসা। কঠোপনিষদের বাণী মনে পড়ছে—

“নাগমায়া প্রবচনেন লভ্যা
ন মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্য
শুশ্রীষ্য আত্মা বিবৃণতে তনুং স্বাম ॥
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।”

আনবোই আনবো

শ্যামল দাশগুপ্ত

শান্তি না সংঘাত?
সংঘাত সংঘাত।
আমাদের সংঘাত চলবে,
জাগ্রত জনতার প্রতিজ্ঞা ক্ষুরধার
অবিরাম আলো হয়ে জ্বলবে।

আপোষ না প্রতিশোধ?
প্রতিশোধ প্রতিশোধ।
জাগো সবে দুর্বীর ভেঙে করো চুরমার
নবতরো একতায়
আমাদের সংগ্রাম চলছে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

স্বংস না বিপ্লব?
বিপ্লব বিপ্লব।

প্রলয়ের পাকে সব ঘুরছে
জাগ্রত জনতার প্রতিজ্ঞা ক্ষুরধার
রোদে রাঙা বিপ্লব ফলবে।

শান্তি না মহারণ?
মহারণ মহারণ।
জনতার মহারণ চলছে
বাঁচবার অধিকার চলবে।
নিপীড়িত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই চলবে।
এই কালো বিভীষিকা রাত্রির
আমরা যে কোনদিন ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া আনবোই—
আনবোই, আনবোই, আনবো।

আলোড়ন

শ্রীশাস্ত্রিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশি এগারটা।

শীতের কুমাশায় গ্রাণ্ড ট্যাক্স রোডের বাতিগুলি ম্লান। শূন্য দেখা যাচ্ছে ওখানে আলো আছে, কিন্তু কোন দ্যুতি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না। রাস্তার দু ধারে গাছগুলি কালো। মেঘের ঢেউয়ের মত। অন্ধকার—অন্ধকার।

এ অন্ধকারকে শীত যেন আরো কঁকড়ে দিয়েছে। গুটিয়ে নেওয়া পুঞ্জীভূত অন্ধকারে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার পিন ফুটছে।

অন্ধকার—ঘন, ক্লষ্ণবর্ণ।

অন্ধকার দীপকের জীবনেও। অন্ধকারের কালো পর্দটাকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিতে চেষ্টা করেছে দীপক—পারেনি। আঙ্গ সে অন্ধকারেই ডুববে। অনেকটা রাস্তা হেটে এসেছে—আরো হাটছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে—কিন্তু করেনি। হয়ত এই ভেবে—সে ছাড়া এ চীৎকার আর কেউ শুনতে পাবে না—যেমন কেউ শুনতে পাবে না—যেমন কেউ শুনতে পায়না তার অন্তরের আর্ত ক্রন্দন।

এ সূচিভেদ্য নিশ্চল অন্ধকার ভেদ করে যেন দূরে পিছনের দিক থেকে ভেসে এল একটা শব্দ। ছড়াবতঃই পিছনের দিকে ফিরে তাকাল দীপক। দেখল রাস্তার অনেক দূরে দুটো আলোর বিন্দু। ক্রমে বিন্দু দুটো বড় হতে লাগল—যেন কোন দৈত্যের দুটো চোখ ওকে সন্মোহিত করে ফেলছে। এবার ইঞ্জিনের ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এত রাতে এ পথে! কোন ধারণাই নেই দীপকের এ সময়ও রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে কী না! আর চললে—

দীপকের সারা শরীর দিয়ে একটা রক্ত প্রবাহ শিরশির করে মাথা থেকে পায়ে নেমে এল। কালো এ্যামবাসাডার মনে হচ্ছে—ডাকাতের দল।

পরমুহুর্তে ওর হাসি পেল। ডাকাত হলেই বা কী! ওর কী আছে! প্রাণটা ছাড়া। তার দাম তো কিছুই নয়। ওর ভয় কী! তবুও ভয় হয়। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ জীবনের জন্য মায়া। তাই ভয়। কিন্তু ও সন্মোহিত। ওর পা দুটো যেন মাটিতে কে গোঁধে ফেলেছে।

গাড়িটা একশ কিলোমিটার বেগে ওর পাশ দিয়ে

বেরিয়ে গেল। জোর একটা বাতাসের ঝাপটা লাগল ওর সর্বাঙ্গে। এ শীতেও একটু ঘাম দিল বুঝিবা। কিন্তু সে আর কতটুকু সময়ের জন্য! পরক্ষণে বিস্ময়ে দেখল গাড়ি সমান গতিতে ব্যাক করে এসে ওর সামনে থামল। স্বপ্না-লোকে দেখল অনেকগুলি বাসুকণা আর পেট্রলের গ্যাসে আচ্ছাদিত করে ফেলল ওকে।

‘ভেতরে উঠে এস’—নির্মম আদেশের মত শোনালে। এ আদেশের জোর এমন পালন না করে উপায় নেই।

এক লহমায় দীপক দেখে নিল গাড়ির ভিতর চালকের আসনে এক মধ্যবয়স্ক, তার পাশে এক নারীমূর্তি। দীপক পিছনের সীটে বসবার জন্য দরজা খুলতে গেল।

‘ওখানে নয়, সামনে যথেষ্ট জায়গা আছে, সামনে এস’—আবার সেই নিম্নতির মত নিষ্ঠুর আদেশ।

দীপক মহিলাটির পাশে বসে দরজা বন্ধ করতে না করতেই বিদ্যুৎবেগে গাড়ি ছুটল।

নিশ্চল। কোন শব্দ নেই গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া। দীপক হত চকিত। এক মিনিট মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা।

‘কোথায় যাচ্ছিলে—এই দুর্ভোগের রাতে!’ বঙ্ককণ্ঠের স্বরে প্রশ্ন।

‘যাচ্ছিলাম—’

‘কোথায়?’

‘ঠিক জানি না—যেতে যেতে শহর বা আশাশহরে পৌঁছব নিশ্চয়।’

‘তারপর!’

‘জানি না।’

‘জানি না মানে? ধমকের সুর—‘বাড়ি থেকে পলিয়েছ বুঝি।’

দীপক চুপ করে রইল।...আবার এক মিনিট নিশ্চলতা। দীপক অস্বস্তি বোধ করছে। চোরা চাহনি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে চালক আর তার সঙ্গিনীকে। ওদের মুখের কোন রেখায় নেই ওদের মনের প্রতিফলন।

‘আমাকে নামিয়ে দিন-দম্মা করে।’

‘বাড়িতে কে কে আছে?’ কণ্ঠের কণ্ঠে প্রশ্ন।

‘বাবা, সৎমা, আর দুই সৎ ভাই বোন।’

‘পড়াশুনা কত দূর করেছে?’

‘এবার বি, এসসি পরীক্ষা দিয়েছি।’

‘শহরে গিয়ে কী করবে?’

‘বাঁচবার চেষ্টা করব।’—দীপক বেপরোয়া উত্তর দিল।

‘সম্মল?’

‘কিছু নেই।’

নব নিস্কলতা চূর্ণ করে বিদ্রূপের হাসি খন্ খন্ করে উঠল। তারপর ব্যঙ্গভরে ওর কথাগুলি আবৃত্তি করলেন চালক—‘বাঁচবার চেষ্টা করব! সম্মল? কিছু নেই!’ আবার একটু স্তম্ভতা।

‘নাম কী?’

‘দীপক, দীপক সোম।’

‘দীপক রাগ। তবু ভাল—আগুন জ্বলবে।—অনেকটা স্বগতোত্তির মত শোনা। তারপর একটু জোরে—‘কিন্তু বাঁচবার চেষ্টা করতে গেলে যে সম্মলের দরকার হয়। মরতে গেলে অবশ্য সম্মলের দরকার হয় না। সাঁতার না জানলে জলে ঝাপিয়ে পড়। আর নইলে কোন বাড়ির ছাদ বা গাছের উপর থেকে লাফিয়ে পড়।’ একটু থেকে—‘কিন্তু তার ও তো সম্মলের দরকার—মনের জোর। মরতে পারিনি ছোকরা! মরতে পারবে?’

কী উত্তর দেবে দীপক।

কী হে ছোকরা, কথা বলছ না কেন?’

‘মরতে ইচ্ছা করে। এ জীবনের কী দাম।’

মুখে একটা চুক্ চুক্ শব্দ করে চালক বললেন—‘মরতে চাইলে শহরে যাচ্ছ কেন কষ্ট করে? ভাবছ—মরতে মরতে যদি বেঁচে যাই। কিন্তু সম্মল। ওখানে বাঁচার চেষ্টা করতে গেলে ভিক্ষে করে খেতে হবে। বাপের স্নেহের অন্ন কী খুব তেতো লাগছিল।’

‘বাপের অন্ন স্নেহ ছিল কী না জানি না—তবে সংসার বাড়ি অন্ন অনেক অপমান, অনেক বিষ মাথা থাকত।’ দীপক হঠাৎ যেন বলে ফেলেছে যে কথাটা তার বলার ইচ্ছা ছিল না মোটেই।

আবার ক্ষণ কালের নিস্কলতা।

‘সিগ্রেট খাবে?’

‘আপনার সামনে খাব না। বড়দের সামনে খাই না।’

‘গুড’—বলে ভদ্রলোক নিজেই একটা সিগারেট ধরালেন ‘খেলাধুলা কর কিছু?’

‘করতাম—এবং ভালই করতাম—তবে দলপতির মন-জুগিয়ে চলতে পারিনি বলে অসম্মানকে এড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছি খেলা।’

‘হু’, আশ্চর্য্যবাদা বোধ আছে।’ ভদ্রলোক যেন স্বগতোত্তি করলেন।

আবার নিস্কলতা নেমে এল। শুধু ইঞ্জিনের একসুরো শব্দ।

স্পীডোমিটারে লক্ষ্য করে দেখা গেল—‘একশ’, ‘একশ’ দশ—।

‘জুয়া খেলেছ কখনও।’ হঠাৎ যেন প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল চালক।

‘খেলেছি—একটু জ্ঞানও আছে—তবে আমাদের সে জুয়া তো জুয়া নয়—খেলা।’ দীপক স্নান হাসির চেষ্টা করল।

‘জুয়া খেলা ভাল’—বলে ভদ্রলোক যেন একটু জুত করে বসলেন। ‘আমিও খেলি—এ গ্যামলার কিং’।—হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

‘সামন্ত!’ ভদ্রমহিলার কণ্ঠে ভেসে উঠল এই প্রথম বাণী। কথা নয়তো যেন গানের কাকলি। সম্মোখনে যেন কত কী বলা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন—‘বুঝেছ ছোকরা, জীবনটাই একটা জুয়া খেলা। এই যে তুমি শহরে যাচ্ছ, তাও তো জীবন নিয়ে একটা জুয়া খেলা—নয়কী? কিন্তু মূলধন। মূলধন তো চাই। খালি হাতে লড়াই করা যায়? সে তো আত্মহত্যা। বাঁচতে ইচ্ছা করে না? হয় বাঁচব—নয় মরব। রাদার, বাঁচার জন্য জুয়ায় পণ করব—মরি-মরব। খেলবে জুয়া। খেলবে।’

দীপক অবাক হয়ে শুনছে। তাবছে—কী উত্তর দেবে।

‘জানো, আমার বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তি, মায় আমার পাশে বসা এই ভদ্রমহিলা—সব আমি জুয়ায় জিতছি। বললাম না—আমাকে সবাই বলে—‘গ্যামলার কিং’।

দীপক তাবছে—অদৃষ্ট আজ ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে।

‘কী ছোকরা, খেলবে জুয়া আমার সংগে। আমার বাজী পাঁচ হাজার টাকা। তোমার বাজী কী?’

দীপকের গলার একদলা কফ্ যেন ওর কণ্ঠ বুজিয়ে দিয়েছে।

‘বল, বল—পাঁচ হাজারের বিনিময়ে তুমি কী বাজী রাখবে।’

‘কী আছে আমার।’ দীপক ধরা গলায় বলল।

‘তোমার জীবন; মরতে ভয় পাও নাকি? এ জীবন থেকে কী হবে। আমি—তাই তোমার জীবনের দাম পাঁচ হাজার দিলুম, অন্য কেউ এক পয়সাও দেবে না। —কী রাজী।’

দীপক স্তব্ধ।

‘কাউয়ার্ড—ভীষু! এই জীবনের মামা নিয়ে শহরে যাচ্ছ?’

একটু হেসে ভদ্রলোক আবার বললেন—‘তোমার জীবনের দাম ঠিক হয়ে গেছে—একটা ফুটো কাড়িও নয়। আমি তার দাম বাড়িয়ে দিলাম—পাঁচ হাজার। এবার বাঁচতে ইচ্ছা করছে না? ইচ্ছা করছে না মরতে—এই সান্ত্বনা নিয়ে যে অন্ততঃ একজন তোমার জীবনের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল পাঁচ হাজার।’

পাগল নাকি লোকটা—কী ওর উদ্দেশ্য—দীপক ভাবে।

হঠাৎ দীপকের চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে—ভদ্রলোক একটা রিভলভার বের করছেন। রিভলভার দীপক চেনে, ওর এক জ্ঞাতি ছোটকাকা পুলিশে কাজ করেন—একবার ওকে ছুয়ে দেখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে গুলি ছিল না। একটা কালভার্টের কাছে দাড় করিয়ে দিলেন গাড়িটা। তারপর রিভলভারটা খুলে ফেললেন—চোখ দুটো গুলিতে ভরা। ‘উনি পাঁচটা বের করে ফেললেন। এবার রিভলভারটা বন্ধ করলেন।—‘এই নাও রিভলভার। তোমার ডানদিকের কপালে ঠেকিয়ে গুলি কর। যদি বেঁচে থাক—এই পাঁচ হাজার তোমার।’ বলে ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা বাণ্ডুল বার করে তার অর্ধেকটা নম্বর দেখে খুলে ফেললেন—একশ টাকা পঞ্চাশখানা নোট! দীপকের চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। দীপক বুঝতেই পারছে না—কী এর মতলব! এর এ কী পাগলামী!

যেন মনের কথা বুঝে ফেলেছেন এইভাবে ভদ্রলোক বললেন—‘বুঝছ না, আমি কি চাই! তোমার মত ছেলের বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না—তা তুমিও জান। তবু একটা চান্স। নাও, রিভলভারটা হাতে নাও।’

দীপক শিখিল হাতে রিভলভারটা নিতে বাধ্য হল।

‘এবার কপালে ঠেকাও।’

দীপক হতচাকিত। বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ও ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাশের ভদ্রমহিলা নির্বিকার—যেন এক পাথরের মূর্তি।

‘কী খোকা, এতো মামা এ জীবনে! তুমি তো এ-ই চেয়েছিলে—কেউ আত্মহত্যা করার একটু সাহস জোগাবে। আর এ উপায়টা তো খুব সহজ। তোমার তো কোনো খরচ নেই, খরচ আমার—একটা গুলি। ট্রিগার টিপবে—তারপর এক সেকেন্ডও লাগবে না। জ্বালা নেই—যন্ত্রণা নেই। যে জীবন রয়ে তোমার দুর্বিসহ লাগছিল, তার থেকে মুক্তি। আর আমি সে মুক্তিদাতা। ওই কালভার্টে তোমার ডেড বডিটা টেনে ফেলে দিয়ে যাব।’ কেউ জানতে পারবে না—কেন একটা জীবনের পরিসমাপ্তি। রাদার—একটা মরা, যা এতদিন হেঁটে বেড়াচ্ছিল—তা আজ সীতাই মরেছে।

দীপক স্থানুর মত। হাতে তার কোন জোর নেই। দেহ মনেও না।

‘কী খোকা! কাউয়ার্ড! একটা মেয়ের সামনে সিভ্যালারি দেখাবার যার ক্ষমতা নেই তার বেঁচে থাকা কেন।...মরতে ভয় পাও!’

‘না।’—

‘তবে?’

‘এরকম মৃত্যুর কোন মানে হয় নাকি?’

॥ আরাধনা শুভ ॥

ব্যক্তিগত বারান্দায়

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ২.৫০

সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী

১৮-এ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

হা, হা, হা, হা—ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন।
আবার নিশ্চিন্ত হন খান্ খান্। ‘মৃত্যুর আবার রকম কী
হে ছোকরা। মৃত্যু ইজ মৃত্যু—তা বুলেট খেয়েই মর,
আর গাড়ীচাপা পড়েই মর। আমি চাই তুমি মর।
আমার চেনা, ঋণকালের হলেও চেনা—একটা মরা বেঁচে
থাকবে—এ দেখার চাইতে দেখতে চাই—একটা মরা মরে
বাঁচুক। নাও,—দেবী করো না।’

দীপক তবুও অবশ্য।

চীৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক—‘তবে দরজা খুলে
বাইরে বেরোও। পালাও বাঁচবার জন্য। আর দেখবে
আমার অব্যর্থ নিশানা কেমন তোমার পিঠ দিয়ে ঢুকে
তোমার বুকে ঝাঁজরা করে দিয়েছে। পালা কাউয়ার্ড,
আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।’

দীপক নড়তে পারছে না।

‘সামন্ত, প্লীজ!’—মহিলার কঠোর।

‘এই শেষ বারের মত বলছি—তোল রিভলভার, তোল।
হ্যাঁ, দ্যাট্‌স্‌ লাইক এ হিরো। এবার নজলটা কপালে
ঠেকাও। গুড্‌। এবার ওয়ান, টু, থ্রি বললেই ট্রিগার
টিপবে।—রেডি!’

দীপক সন্মোহিত।

‘ওয়ান, টু, থ্রী!’

খুট করে একটা আওয়াজ বেরোল—কিস্তি গুলি বেরোল
না। গুলিটা ছিল অন্য চেয়ারে।...দীপকের হাতটা এলিয়ে
পড়েছে। এ শীতেও ঘামে সারা অঙ্গ ভিজ়ে গেছে।

সামন্ত দীপকের হাত থেকে রিভলভারটা তুলে নিলেন।
আদেশের সুরে বললেন—‘এবার টাকাটা তুলে নাও।’

দীপকের হাতে, মনে প্রাণে কোন জোর নেই। অবশ্য
ওর কোলের উপর টাকা ছড়ান—তুলতে পারছে না। কী
যে হয়ে গেল—মাথায় ঢুকছেন! কিছুই।

গাড়ি চলল। আবার স্পীডোমিটারের কাঁটা একশ পার
হয়ে গেছে। দীপক ভাবছে—স্পীডোমিটারের গতির তালে
তালে ভাবছে—এটা কী হল। আচ্ছন্ন, স্তব্ধ, বিমূঢ়।

ভদ্রলোক বলছেন—তোমার সাহস খুব কম মনে হচ্ছে।
নইলে যখন রিভলভারটা তোমার হাতে—তখন নজলটা
আমার দিকে ধরলেই তো পেয়ে যেতে ও পাঁচ হাজারের
সঙ্গে আরো অন্ততঃ পাঁচ হাজার—আর এই ভদ্রমহিলার
কানের হীরার টপ্—যার দুখানা হীরার দাম অন্ততঃ বিশ
হাজার টাকা। সত্যি তুই কার্ডস্টার্ড, ছি। ছি।

একী ভদ্রলোক আর কী চান্ন। আর কিছু চান্ন নাকি।
পাগল। কোন জাতের পাগল এ!—দীপক ভেবে থৈ
পায়না।

সামনে একটা পেট্রল পাম্প। তিন রাস্তার মোড়।
আলো এখানে বেশ বেশী।

গাড়িটা আস্তে আস্তে পাম্পিং স্টেশনে ঢুকল। সামন্ত
নেমে গেলেন পেট্রল নিতে।

দীপক আর জুয়া খেলতে চাইল না। ও নোটগুলি
তুলে নিয়ে গাড়ির এ দিকের গেট খুলে নেমে আস্তে আস্তে
একটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। দৌড়ল
ভয়ে—যদি এবার সত্যি সত্যিই ভদ্রলোক গুলি করেন।

দীপক দাঁড়িয়ে রইল।

গাড়িতে পেট্রল নেওয়া হয়ে গেছে। সামন্তর গাড়ি
বুলেটের মত ছুটল ডানদিকের রাস্তা ধরে। দীপক যে
গাড়িতে ছিল, এখন নেই—তা যেন ওহদর কারো খেলাই
নেই।

দীপক এগিয়ে এল। গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল
সেখানে একটা কী পড়ে আছে না? একটা রুমাল—একটা
লেডিস রুমাল।

দীপক তুলে ধরল রুমালটা। হাতে চট্‌ চট্‌ করছে
লাল-রক্ত নাকি। দীপক মেলে ধরল রুমালটা। দেখল
লিপিস্টিক দিয়ে বড় করে মেরেছি হাতে লেখা—‘বড় হও’।

স্বভাবতঃই যে রাস্তায় গাড়িটা গেছে—সেদিকে দীপকের
চোখ উঠে এল।

দীপক দেখল গাড়ির পিছনের লাল আলো দুই
মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

পার্বত্যজেলা দার্জিলিঙের অর্থ-নৈতিক সমীক্ষা

বিশ্বনাথ রায়

দার্জিলিঙ উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ছোট ও স্বল্প ঘনত্বের পার্বত্যজেলা। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দার্জিলিঙ জেলাকে চারটি (শিলিগুড়ি, কাসিমারা, দার্জিলিঙ, কালিম্পাং) সার্বভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে। জেলার উত্তরদিকে সিকিম, দক্ষিণে বাংলাদেশ, পশ্চিমদিনাজপুর ও বিহার, পূর্বে ভূটান ও জলপাইগুড়ি, পশ্চিমে নেপাল। উত্তরবঙ্গের মোট আয়তন ২১.০ হাজার বর্গকিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৯৪.২ লক্ষ। তার মধ্যে দার্জিলিঙ জেলার আয়তন ০.১ হাজার বর্গকিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ১০.০৬ লক্ষ। উত্তরবঙ্গের জেলা-ভিত্তিক শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি (২৯.৮৮), পশ্চিমদিনাজপুর (২৬.৯২), কোচবিহার (২৯.৯৯) ও মালদহ জেলার (২০.০৬) তুলনায় দার্জিলিঙ (৪২.৫২) প্রথম। মালদহ জেলা শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই পিছিয়ে। যদিও তারমধ্যে আক্ষরিক জ্ঞানের লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলায় ২,৭৫৭টি গ্রামে ও ২১টি শহরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। জেলার সম্পদগুলির মধ্যে রয়েছে ভূমি-সম্পদ, জলজসম্পদ, বনজ সম্পদ বণ্যপ্রাণীসম্পদ, কৃষিজসম্পদ, খনিজ-সম্পদ, ম্যানুফ্যাকচারিং সম্পদ ও মানবসম্পদ। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ফার্মফসল, ২টিকালচার ফসল, গাছ থেকে ওষুধশিল্প, এবং প্ল্যান্টেশন ফসল। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিঙ খনিজ ও গো-সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। রত্নগর্ভা দার্জিলিঙের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে ডলোমাইট, গ্রাফাইট, লোহা, কয়লা, কোয়ার্টজ, তামা, টাংস্টেন, লাইমস্টোন, সোপস্টোন প্রভৃতি। ওই সমস্ত খনিজ সম্পদকে সদ্যব্যবহার করে উত্তরবঙ্গে মাঝারি ধরনের শিল্প গড়ে তোলার প্রস্তাবটি গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃতি দেখা প্রয়োজন। উত্তর বঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিঙ-এ ব্যাঙ্কের (৬০টি) শাখা বেশী হলেও শিল্পায়নের প্রধানতম বাধা হলো ;—(১) সম্পদভিত্তিক পরিকল্পনার অভাব, (২) মূলধনের স্বল্পতা, এবং (৩) বিদ্যুতের অপ্রাপ্যতা। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় দার্জিলিঙ মাথাপিছু আয়ে চতুর্থ-স্থানীয়কারী ও প্রতি ১০০জনে উপার্জনকারী ৩৬

জন। বহুতঃ উপার্জনকারীদের সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিঙ সর্বোচ্চ স্থানীয়কারী এবং মোট ৩৬৬,৯৩১ জন শ্রমজীবীর মধ্যে ২৬.৯০ শতাংশ কৃষক, ৮.৭৮ শতাংশ কৃষিমজুর ও নন-এগ্রিকালচারাল কর্মী ৬৪.২৯ শতাংশ। দার্জিলিঙ থেকে একশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ ভাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার আশায় জলপাইগুড়ি, মালদহ, ২৪পয়গা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় পাড়ি দেয়। পঞ্চাশত্রে, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া থেকে ওই ধরনের প্রামাণ্য প্রমিত দার্জিলিঙ জেলায় আসে।

দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক ভূগঠন বৈচিত্র্যময় হওয়ায় অধিকাংশ পার্বত্যঅঞ্চল চাষ আবাদের উপযোগী নয়। উত্তর-বঙ্গের ১.৪৪৭ হেক্টর মোট আবাদী জমির মধ্যে দার্জিলিঙ এ চাষ আবাদের উপযোগী জমির পরিমাণ ৪,৭৩৯ হেক্টর। এছাড়াও গভীর নলকূপ একটি ও ১৬টি নদী থেকে জল উত্তোলন ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়া সত্ত্বেও জেলার বেশীর ভাগ কৃষিজমি বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের বন্যানিধন প্রকল্পের কাজগুলিও সন্তোষজনকভাবে এগোয়নি। এই জেলার পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতার তারতম্য ও মাটির প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্নপ্রকার কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী সোয়াবিন ও ভাল জাতের কমলা চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দুই হাজার হেক্টর জমিতে কমলা ও ৯০০ একর জমিতে সোয়াবিনের চাষ হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে রংবুল আলুবীজের ফার্মটিকে উন্নত করার প্রকল্পটি ফলপ্রসূ হলে দেশে আলুবীজের অভাব পূরণ হতে পারে। দার্জিলিঙে ৩২,০০০ হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয়। এবং তরাই ও কালিমপাং সমতলে ধানচাষে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিঙে চা বাগিচার জন্যে ধান চাষের জমি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ধান প্রতি হেক্টরে একটন উৎপন্ন হয়। সমগ্র জেলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে

উচ্চফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ধানচাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, কৃষিকাজে ৪০ শতাংশ এবং ফার্মে ১৮ শতাংশ কর্মসংস্থান হয়েছে। ফার্মের আকার ১৫ হেকটরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জেলা মেজ, মিলেট, পাট, আলু ও সবজীচাষে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে। তরাই অঞ্চলে পাট ও পাহাড়ী এলাকায় মেজ উৎপন্ন হয়। গরুবাধন, জোড়বাংলো, সুকিম্পোকরি ও ঘুম অঞ্চলে প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়। শহরাঞ্চলেই বেশি সবজি উৎপন্ন হয়। সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, টমেটো, ক্যোয়াস প্রভৃতির ভালো বাজার রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে ঘুম ও শিলিগুড়ি মারফৎ আলু চালান যায়। দার্জিলিঙে চায়ের পরেই আনারসের স্থান। জেলার দারুচিনিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য। দারুচিনি-বছরে ১,২০০ টন উৎপন্ন হয়। এই চাষে প্রায় ৩,৫০০ চাষী নিযুক্ত রয়েছে। কালিম্পং, বিজনবাড়ি, গরুবাধন ও মিরিকে প্রায় ১,৬০০ হেকটরে আদার চাষ হয়। আদা বছরে ৩,০০০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। এছাড়াও কালিম্পং, পেডং, বিজনবাড়ি, ভাগদা প্রভৃতি অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে গুটিপোকা চাষের ফার্ম (ব্যানার্জী : ১৯৮২)।

এছাড়াও রেশমকাঁট, সিনকোনা এপিকক, আর্কিড প্রভৃতি চাষের অটেল সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিঙ জেলার মাথাপিছু কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ সমতল ভূমির কৃষকদের তুলনায় পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকদের খুবই কম। ভূমিক্ষয় সমস্যা উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিঙে বেশি। দার্জিলিঙ জেলার মোট আবাদী জমির মধ্যে এক চতুর্থাংশ ধসের আওতায়। তারমধ্যে দার্জিলিঙ কাসিম্নাং ও কালিম্পঙ এর প্রায় ৭৬টি অঞ্চল নিয়মিত ধস এলাকা হিসাবে সুচিহ্নিত। তাছাড়াও জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ ও পশ্চিম-দিনাজপুরে ৩০ লক্ষ বিঘা আবাদী জমিতে ক্ষারের হার খুব বেশি। সুতরাং এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য জেলার কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীতে যুক্ত করা প্রয়োজন : (১) মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, (২) আবাদী জমিকে ক্ষারমুক্ত করার বন্দোবস্ত করা, (৩) ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, (৪) সহজ সর্তে কৃষি ও শিল্প ঋণের আরও সুযোগ বৃদ্ধি করা, (৫) জলসেচের সম্প্রসারণ করা (৬) পার্বত্য অঞ্চলের

জন্য সম্ভাব্য আরও উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা, (৭) পার্বত্য অঞ্চলের ব্যবহারের উপযোগী উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা, (৮) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। (৯) কৃষি জমির গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন করা এবং (১০) সেচের আলগুলি ও নল-কুপগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।

উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতায়নের অভাবে শিল্পে ও কৃষিতে প্রত্যাশিত উন্নতি হয়নি। যদিও কৃষিভিত্তিক, বনজ ও খনিজ সম্পদকে ভিত্তি করে আঞ্চলিক শিল্প গড়ে তোলার অটেল সম্ভাবনা রয়েছে। অনুন্নত উত্তরবঙ্গের অক্ষুন্নত জল-সম্পদকে ভিত্তি করে বিদ্যুতায়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ১৮৯৭ সালে দার্জিলিঙ জেলার সিডরাপোং-এ (১৩০ কিঃ ওঃ) প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন (সিডরাং, শিংতাম, রঙ্গীত, রিচিটেন, জলঢাকা ও কাজী) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হয় মোটে ৩৪.৪৬ মেঃ ওয়াট। এছাড়াও প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির (রামাম, বালাসন, তিস্তা ও রঙ্গীত) বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে মোট ৩০২ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এবং হিমালয়ের নদীগুলি থেকে আরো তেরটি (দিলনা, টেলু, ঝেপী, মিরিক, গরুবাধন, ঋষি, পেবং পেয়ং তিস্তাবাঙ্গার, তিনধারিয়া-গয়াবাড়ি, ভাগোবা, মংপু ও রগন্) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হলে ২৬,১৪০ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের চাহিদা মিটিয়ে দক্ষিণবঙ্গের অভাবপূরণ করতে পারে (বসু : ১৯৮৩)। প্রসংগত উল্লেখ্য, “রাজ্যের ১৯৪৭ সাল থেকে ত্রিশ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছিল ১,০৭০ মেগাওয়াট। এবং ফ্রন্ট সরকারের ৬ বছরে বেড়েছে ৬১০ মেগাওয়াট। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্য রাজ্য-গুলিকে যে হারে অনুদান দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সবার কম পেয়েছে।” (সম্পাদকীয়—বসুমতী, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৪)।

দার্জিলিঙের অর্থনীতির মূলে আছে প্রধানত চা-শিল্প। চা বাগিচাগুলি ৫০ হাজার একর জমি জুড়ে রয়েছে। চা বাগিচাগুলি গড়ে ওঠে প্ল্যানটেশান পদ্ধতিতে। বর্তমানে চা-বীজ গাছ থেকে উৎপাদন না করে ক্রেনাল কাটিং পদ্ধতিতে চাগাছ তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রধানতঃ চা বাগিচা

গুলি কার্সিয়া ও দার্জিলিং সাব ডিভিসনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রয়েছে। ডুয়ার্সের তুলনায় দার্জিলিঙের বাগিচাতে হেক্টর প্রতি চা-পাতার উৎপাদনের হার অনেক কম। উত্তরবঙ্গের ২৯৭টি চা বাগিচায় গড়পড়তা চায়ের উৎপাদন হয় ১১ কোটি ১০ লক্ষ কেজি। এবং এই উৎপাদনের অর্ধেক গোহাটি, কলকাতা ও সুদূর লগুনের নীলাম বাজারে পাড়ি দিত। বার্ষিক অর্ধেক বিক্রিত হত স্থানীয় বাজারে। প্রকৃতপক্ষে, ছোট ও পশ্চাৎপদ বাগিচাগুলি কর্তৃক প্রেরিত চায়ের বিক্রয়-লব্ধ টাকা তিনমাস পরে পাওয়ায়, ব্যাস্কের সুদ, গুদাম-ভাড়া চা-আফিসের খরচা প্রভৃতি অত্যন্ত বেশি পড়ায় সংশ্লিষ্ট বাগিচাগুলির এই সমস্ত নীলাম বাজারে চা পাঠাতে পারতো না। বর্তমানে শিলিগুড়িতে প্রস্তাবিত চায়ের নীলাম বাজার বাস্তবায়িত হওয়ায় উপরোক্ত সমস্যাগুলির অবসান হয়েছে। কিন্তু চা শিল্প থেকে যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও শুল্ক অর্জন করা হয় তার কিছু অংশ যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবী পরিবারগুলির উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয়, তাহলে তাদের চাপা অসন্তোষ অনেকখানি হ্রাস পাবে। কেননা, শুধুমাত্র চা-শিল্পকে ঘিরেই ৭০ হাজার শ্রমিকের রুজিরোজগারের সংস্থান হয়। শ্রমিকের শতকরা ৯৬ ভাগ হলো নেপালী। এবং তার মধ্যে মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের অনুপাতে চা-শিল্পে উচ্চপদে বিশেষ করে ম্যানেজারের পদে নেপালী ও ভূটিয়ার সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। পাতা তোলার মরসুম হলো মার্চ-এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাস। তখনই মেয়ে শ্রমিকের খুব বেশি নিয়োগ হয়। তারপর মে মাস থেকে কাজের মন্দার জন্য ক্রমশঃ শ্রমিক সংখ্যা কমতে থাকে। এই সমস্ত মরসুমী বেকারদের পরিপূরক কাজের জন্য আঞ্চলিক শিল্পের বিকাশ খুবই জরুরী।

উত্তরবঙ্গের ৩১১.১ হাজার হেক্টর অরণ্যগুলির মধ্যে দার্জিলিঙ-এর পরিমাণ ১২৮.৫ হাজার হেক্টর। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জঙ্গলে রয়েছে পাইন, সেগুন, শিশু, খয়ের, ধূপি, শাল, গাভারী, সাঁই, চাপালিশ, চাঁপ, চিকরাশি, তুন, পানিসাজ, শিমুল, গোকুল, কদম, উদাল, ওক, কনকচাঁপা, দোকাশন, লাম্পাতি, কিস, আঙ্গুরে, নাগেশ্বর, সাউর, পিপলি, ওটিস, লেখতুন, চিলাউনি, সিল্কোলি, মালাগিরি, ম্যাগনেশিয়া, কার্চুস, সিলভার ফার, রোডোডেনড্রন ও

অন্যান্য গাছ। দার্জিলিঙ বন্য জীব-জন্তুতে সমৃদ্ধ। জেলায় রয়েছে স্থান্যপ্রায়ী প্রাণীর ৯০টি প্রজাতি, ৫৫০ প্রজাতির পাখী, ৫১ প্রজাতির সাপ, ১৫৫টি প্রজাতির মাছ এবং নানারকমের কীট-পতঙ্গ। তরাই-এর জঙ্গলে হাতী, বন্যশূর, বাঘ, হরিণ, হনুমান, শিয়াল ও সাপ রয়েছে। এই উঁচু পাহাড়ের জঙ্গলে প্যাগুর, ভল্লুক প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। এছাড়াও জলচাকা সংরক্ষিত জঙ্গল হাতীর জন্য চিহ্নিত। বনজ সম্পদের প্রভূত ধ্বংস হওয়ার ফলে ভূটান ও নেপালের সংলগ্ন জঙ্গলে অনেক হাতী চলে গেছে। বহুতঃ বনজ সম্পদ নিধন, চা বাগানের বিস্তৃতি, জনবসতি সম্প্রসারণ, শহরীকরণ, বন্য প্রাণীশিকার ও বন্যপ্রাণী গোপনে আহরণ প্রভৃতির ফলে দার্জিলিঙে বন্যপ্রাণী দ্রুত কমে যাচ্ছে। দার্জিলিঙের পাহাড়ী ছোট নদীগুলিতে সংখ্যাধিক লেক ও ঝর্ণার জলে নানান ধরনের মাছচাষের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিঙে অরণ্য সম্পদে দ্বিতীয় স্থান্যধিকারী। এখানে অরণ্য সম্পদকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক কার্ঠশিল্প ও কাগজশিল্পের সম্প্রসারণের অটল সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, উত্তরবঙ্গে শুধুমাত্র কাগজ শিল্প বিকাশের উপযোগী বনভূমির পরিমাণ ৩,৮৩৯ হাজার হেক্টর এবং তার মধ্যে দার্জিলিঙে ২,২৫০ হাজার হেক্টর, কোচবিহারে ৭৯৫ হেক্টর ও জলপাইগুড়িতে ৭৯৪ হেক্টর। স্বভাবতই উত্তরবঙ্গে অন্যান্য জেলার তুলনায় দার্জিলিঙে কাগজশিল্পের সম্প্রসারণের অত্যধিক সুযোগ রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী চর্মশিল্প প্রায় ৩১৮টি রয়েছে। তার মধ্যে দার্জিলিঙে ১১২টি, মালদহে ৮৪টি, পর্দিনাজপুরে ৪৭টি, জলপাইগুড়িতে ৪০ টি, ও কোচবিহারে ২৫টি রয়েছে। (আদমসুমারী : ১৯৭১)। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দার্জিলিঙে চর্মশিল্প প্রসারের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। যদিও চর্মশিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র হলো মহানগরী কলকাতা।

কলকাতার তিলজলা, টাংরা, তপসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ট্যানারী শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে। বহুতঃ এই শিল্প প্রচুর অর্থকরী ও সম্ভাবনাময়। বর্তমানে কলকাতার রপ্তানি নির্ভর ট্যানারী শিল্প মার খাচ্ছে। কলকাতার কাঁচা চামড়ার বাজার হলো কলুটেলা ও রাজাবাজার। এবং পাকা-চামড়া কেনাবেচার বড় কেন্দ্র হলো এন্টার্লির পদ্মপুর।

এছাড়াও ইহুদি বাজার ও ফুলবাগান বাজার তো আছেই। শিল্প দুটিতে দুধের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা প্রধানতঃ কলকাতার ট্যানিং শিল্প রয়েছে :—(১) ভেড়া ও ছাগলের চামড়া ট্যানিং উপসিয়ার মুসলমানদের হাতে। (২) মহিষের চামড়া ট্যানিং তিলজলার পাঞ্জাবীদের হাতে, এবং (৩) গরুর চামড়া ট্যানিং ট্যাংরার চীনাগের হাতে। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী ফোমট্যানড চামড়ার দেশী বিদেশী বাজার খুবই সম্ভাবনাময়।

পশ্চিমবঙ্গের চামড়ার বিদেশে ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যথেষ্ট সুনাম বা কদর রয়েছে। কিন্তু চামড়া শিল্প বিকাশের জন্য নিচের সমস্যাগুলির অবিলম্বে সুরাহা হওয়া প্রয়োজন : (১) মাছাতা আমলের ট্যানারীগুলি অবিলম্বে আধুনিক করা। (২) ট্যানারীগুলির কর্মীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা, (৩) লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, (৪) ছোট ট্যানারীগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা, (৫) সরকারী উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকাকে আরো গঠনমূলক ও সক্রিয় করে তোলা, (৬) কঁচামালের অগ্নিমূল্য ও সরবরাহে অনিশ্চয়তা দূর করা, এবং (৭) দাদনদারদের নির্মম শোষণ থেকে রক্ষা করা।

ডেয়ারী শিল্পের জন্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রদীপ জ্বলে দি হিমালয়ান কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড গড়ে উঠেছে। প্রসংগত আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডেয়ারী শিল্পের বিকাশের জন্য :—(১) ডাচ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে পূর্ব কলকাতা, হাওড়া, গঙ্গানগর ও গার্ডেনরীচ কলোনিগুলিতে প্রায় ১০ হাজার গরু-মোষ রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, (২) কলকাতা দ্বিতীয় বাই-পাশের কাছে একটি ডেয়ারী গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, (৩) কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্রের সম্প্রসারণের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, (৪) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং ক্ষেতমজুরদের গরু প্রতিপালনে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, (৫) হাউস ডেয়ারী স্থাপনে তফসিলী ও আদিবাসীদের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে হাউস-ডেয়ারীর সংখ্যা ৫২৪টি, (৬) কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে ডেয়ারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এবং (৭) দুর্গাপুর ও বর্ধমানের ডেয়ারী

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিঙ ও কোচবিহারে নার্সারী গড়ে তোলারও অল্প সম্ভাবনা রয়েছে। যদি বৈচিত্র্যময় ফুল সন্টারকে দেশে দেশে ফুলের জলসায় অথবা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিচিত করে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে দেশী ফুল যুরোপীয় সাধারণ বাজারের মাধ্যমে ফুল আমদানীকারক দেশগুলিতে ঠাই করে নিতে পারে। তারফলে সংশ্লিষ্ট নার্সারীগুলিতে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলচাষীও আর্থিক দুর্ভাবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবে। এছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন হবে।

আলোচিত শিল্প-গুলি ছাড়াও নিচের শ্রমপ্রধান শিল্পগুলি সম্প্রসারিত হতে পারে :—(১) রেশম ও পশমশিল্প, (২) মোয়াম্বি পালন, (৩) মধু ও মোমশিল্প, (৪) চর্মশিল্প, (৫) কাঠের বাজ-তৈরী শিল্প, (৬) দেশলাই শিল্প, (৭) সূতীশিল্প, (৮) রবারশিল্প, (৯) ইলেকট্রনিক ও রাসায়নিক শিল্প, (১০) খাতব ও অখাতব খনিজশিল্প, (১১) সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরামতী শিল্প, (১২) পর্যটনশিল্প, (১৩) রেডিমেড পোশাকশিল্প, (১৪) ঘড়ি ও ফটোগ্রাফ-শিল্প, (১৫) কঁচ ও সিরামিক শিল্প, (১৬) হোসিয়ারী ও পোটারীশিল্প, (১৭) পাট থেকে দড়িশিল্প, (১৮) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, (১৯) মটরগাড়ি শিল্প, (২০) হস্তচালিত তণ্ডলশিল্প, (২১) হস্তশিল্প (হাড়ির দাঁড়ের কাজ, রূপের অলংকার, প্রস্তরশিল্প, চন্দনকাঠের কাজ প্রভৃতি) (২২) পিগারী এবং (২৩) প্রসেসিংশিল্প। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত স্থানীয় শ্রমপ্রধান শিল্পগুলি অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা ও Balanced industrial growth-এর জন্যে একান্ত অপরিহার্য।

আলোচিত নিচের সারণী (ইকনমিক রিভিউর বিভিন্ন বছর) থেকে দার্জিলিঙ জেলার সাংলভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল্যায়ন করা যাবে। ১০ বছরের মধ্যে ১৯৭৪-৭৫ ও ১৯৭৬-৭৭ সালে উচ্চ হারে দার্জিলিঙে শিল্পের বিকাশ হয়েছে।

সারণী (১) : দার্জিলিঙ্ জেলার নিবন্ধীকৃত শিল্পের
সংখ্যাতথ্য

সাল	শিল্পসংস্থার সংখ্যা	শিল্পবিকাশের হ্রাস (-) বৃদ্ধির (+) পার্থক্য
১৯৭০-৭১	২৪০	—
১৯৭১-৭২	২৫৬	+১৬
১৯৭২-৭৩	২৮৮	+৩২
১৯৭৩-৭৪	৩৬৬	+৭৮
১৯৭৪-৭৫	৫৯০	+২২৪
১৯৭৫-৭৬	৭০	-৫২০
১৯৭৬-৭৭	৩৩৮	+২৬৮
১৯৭৭-৭৮	৩২৯	-৯
১৯৭৮-৭৯	৩৭৩	+৪৪
১৯৭৯-৮০	৪২১	+৪৮

দার্জিলিঙ্ জেলার নীচের থানাগুলিকে স্থানীয় সম্পদ-
ভিত্তিক হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পবিকাশের
উক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। কালিম্পং
থানাগুলির মধ্যে :—সামবার খাসমহল, তিস্তা বাজার,
কালিম্পং খাসমহল, আলগারা বাজার পাইওয়াং খাসমহল,

লিসাংখ্যা খাসমহল, মানসঙ্ প্র্যানটেশন। নক্সালবাড়ী
থানাগুলির মধ্যে :—ভুজিয়াবাগির ছাট, মাঝা, গেণী,
ভীমরাম, ভুমরিগুড়ি, জামিদারগুড়ি, বীর সিং, বাগডোগরা।
রঙলি রঙলিয়ং থানাগুলির মধ্যে :—লেংডিং খাসমহল,
টুকডাটি এস্টেট। মুখপুখরি থানাগুলির মধ্যে :—
মংগরজঙ্ সুকিয়া পুংকরি। ফুলবাজার থানাগুলির মধ্যে :—
ছেবলামা। কাঁসিয়াং থানাগুলির মধ্যে :—তিনধারিয়া।

দার্জিলিঙ্ জেলার কালিমপঙ্ থানা সবচেয়ে বেশি
হস্ত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সমৃদ্ধ। তারপর রুম-
অনুযায়ী নক্সালবাড়ী, রঙলি রঙলিয়ং, মিরিক, মুখপুখরি,
ফুলবাজার, কাঁসিয়াং, ফাঁসিদেওয়া, ছোড়বাংলো,
শিলিগুড়ি, গোরুবাথান, খিড়িবাড়ি ও দার্জিলিঙ্।

এবার আমরা উত্তরবঙ্গের জেলা-ওয়ারি নন-রেজিস্টার্ড
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থার প্রকৃতি নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনার
সূচনা করবো। বস্তুতঃ, ওই সমস্ত শিল্পসংস্থাকে উৎপাদন
অনুসারে পঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা :—(১) কৃষিজ
সম্পদভিত্তিক শিল্প, (২) খনিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প,
(৩) উদ্ভিদ সম্পদভিত্তিক শিল্প, (৪) প্রাণিজ সম্পদ-
ভিত্তিক শিল্প, এবং (৫) রাসায়নিক শিল্প। এই
শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী নিচের সারণী দুই থেকে উত্তর বঙ্গের
নন-রেজিস্টার্ড শিল্প ইউনিটের যথার্থ মূল্যায়ন করা যাবে।

সারণী (২) উত্তরবঙ্গের নন-রেজিস্টার্ড শিল্প ইউনিটের পরিসংখ্যান

জেলাওয়ারি নন রেজিস্টার্ড শিল্প সংস্থা

শিল্পের নাম	দার্জিলিঙ্	জলপাইগুড়ি	মালদহ	কোচবিহার	পশ্চিম- দিনাজপুর	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
কৃষিজসম্পদভিত্তিক শিল্প	৩৯৪	৬৬৮	৭০৫	৬৬৭	৮২৪	৩,২৫৮
খনিজসম্পদভিত্তিক শিল্প	৫৩৪	৮৭৭	৬৬৯	৬৭৮	৮৫৯	৩,৬১৭
উদ্ভিদসম্পদভিত্তিক শিল্প	৫০৮	৭৪৬	৪৮৯	৫৬১	৪৫৪	২,৭৮৮
প্রাণিজসম্পদভিত্তিক শিল্প	৬২	২৫	১৬	১২	১৯	১৩৪
রাসায়নিক শিল্প	৭২	১৫৫	১৩০	৯৯	১২০	৫৮৬
মোট	১৬০০	২৪৭১	২০১২	২০১৭	২২৭৯	১০,৩৭৯

উৎস : আদম সুমারী ১৯৭১, পশ্চিমবঙ্গ পাঠ ৩এ এসট্যাব্লিশমেন্ট টেবলস্

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নিবন্ধীকরণ সেচ্ছামূলক হওয়ায় ওই শিল্পের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। উত্তরবঙ্গের কারখানা আইনে নিবন্ধীকৃত নয় এমন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ১০,৩৭৯। তারমধ্যে ক্রম অনুযায়ী জলপাইগুড়ি ২,৪৭৯ পশ্চিম দিনাজপুর ২,২৭৯, কোচবিহার ২,০১৭, মালদহ ২,০১২ ও দার্জিলিং ১,৬০০। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-নিবন্ধীকরণের অন্যতম সর্তগুলি হল (১) জায়গা অথবা বাড়ি ভাড়ার রসিদ, (২) আইনমারফিক খাতাপত্রের হিসাব রাখা, (৩) ইলেকট্রিক বিল, এবং (৪) ট্রেড লাইসেন্স। এই সর্তগুলি যথাযথভাবে পূরণ করতে পারলেই যে কোন একটি শিল্প ইউনিট নিবন্ধীকৃত হতে পারে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত সর্তপূরণ করে নিবন্ধ হওয়ার পরেও প্রতিটি শিল্প ইউনিটের যে সুযোগ-সুবিধা পাবার কথা সেগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি থেকে সংগ্রহ করার জটিলতা ও অহেতুক হস্তান্তর জনোই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প নিবন্ধীকরণে এত অনীহা।

দার্জিলিঙের পর্যটন শিল্প বিকাশের অচেনা সম্ভাবনা রয়েছে। কার্সিয়াং ও কালিম্পঙ দার্জিলিঙের যেন দুটি অন্তরঙ্গ সখী। কাছেই রয়েছে রাজকন্যা মিরিক। এদের বর্ণাঢ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের অন্তর স্পর্শ করে। সবুজের মাঝে ফুলের আপনায় সমারোহ ও ঋতু বদলের শোভা অতুলনীয়। কাণ্ডনজঙ্ঘার চূড়ায় বরফের বুপালী শাল মুড়িদিগ্নে থাকা রূপ অপূর্ব। ঋতুতে ঋতুতে রূপসী দার্জিলিঙ নানা রঙের অগণিত পাহাড়ীফুলের জলসায় রাণী হয়ে ওঠে। এই নয়নাভিরাম রূপে আত্মাহারা হয়ে উঠে। দেশী-বিদেশী পর্যটকরা। বস্তুতঃ সবুজের চাদরে ঢাকা দার্জিলিঙ নামটিতে রয়েছে মাদকতা। রাতের মোহময়ী দার্জিলিঙ হাজারো মজল প্রদীপ জ্বলে হয়ে ওঠে

অপ্সরা। রঞ্জিত উপত্যকায় রোপণে সিন্ধুলা-দার্জিলিঙের মধ্যে সেতুবন্ধন। টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। হিমালয়ান মাইন্টেনেন্সারিং ইনস্টিটিউটে পাহাড়ে ওঠার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশেই রয়েছে হিমালয়ান জুলজিক্যাল গার্ডেন। এখানে ক্যামেরার সাহেবের নামাঙ্কিত একটি ডেয়ারীশিল্প রয়েছে। এছাড়াও লেবং রেসকোর্স, সিগল লেক, বার্ডসিয়া লুপ, ট্রেনট্রেন, বিজনবাড়ি ডিক্টোরিয়া ফলস, বোটানিক্যাল গার্ডেন, মহাকাল মন্দির, ম্যাল প্রভৃতির পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। সুন্দরী কার্সিয়াং-এর সন্দকফন এভারেস্টের সৌন্দর্য দেখার উত্তম স্থান। এখান থেকে কাণ্ডনজঙ্ঘার বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য পর্যটকদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। ফালুটের সূর্যোদয়ের দৃশ্য মনোরম। কালিম্পঙ অপবৃপা। সারা বিশ্বে এখানকার ক্যাকটাস, অর্কিড বিখ্যাত। এছাড়াও রয়েছে মন-কেড়ে-নেওয়া কিছু নার্সারী। দূরবীনডারায় বুদ্ধগুম্ফাটি খুবই আকর্ষণীয়। নার্সারীর কাছেই রয়েছে সুইস ওয়েল ফেয়ার ডেয়ারী ও কেন্দ্রীয় সেরিকালচার অফিস। কালিম্পঙের অন্যতম আকর্ষণ কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। তিনি গৌরীপুর লজ এ থেকে অনেক গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। কালিম্পঙ আর্টস ও ক্রাফটস-এর তৈরী সামগ্রীর জগৎজোড়া সমাদর রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাকৃতিক সম্পদই এই ঘোঁরাহীন পর্যটন শিল্পের প্রধানতম উপাদান। রাজ্যের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব রয়েছে অপারিসীম। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্প-বিকাশের সার্থেই বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা নেওয়ার ব্যাপারে অনীহা না থাকাই ভাল।

অব্যক্ত

কল্যাণকুমার সামন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

ম্যানেজার শব্দটা যেমন গালভরা, আসলে কিন্তু সত্যত বাবু তেমন কিছু নন। আদিত্যবাড়ীর জমিদারী আর নেই—থাকার মধ্যে বেশ কিছু জমি আর রাইস মিল। সত্যতবাবু এইসব উদারকী করেন। কিছু জমিও তিনি পেয়েছেন আদিত্য-মশাই-এর কাছ থেকে। কিন্তু হাতে কাঁচা পয়সা তেমন কিছু নেই। ঐ গ্রামে বাস করেন আরও কিছু বার্কিবু পরিবার—তার মধ্যে রায় বাড়ীর সঙ্গে সত্যতবাবুর সম্পর্কটা বেশ ভাল। মাথা ঠাণ্ডা হলে তিনি রায় বাড়ীতে গেলেন সুপারামর্শের জন্য। ধরনী রায় সত্যতবাবুর থেকে বিস্তৃত ঘটনা শুনে বেশ চিন্তাহিত মুখে বললেন, ‘সবই বুঝলাম চৌধুরীবাবু। কিন্তু সদরে মামলা চালানো বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া মুখে বললেই তো হবে না, প্রমাণ চাই। মামলা জেতাও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। শেষে খরচাই সার হবে। ভেবে দেখুন—রাগের মাথায় কিছু করে বসবেন না। পয়সার জোরে আদিত্যমশাই-এর সঙ্গে আপনি পেরে উঠবেন না, এটা বলাই বাহুল্য।’ সব শুনে গভীরমুখে বাড়ী ফিরে এলেন তিনি। বড় মেয়ে পাষার দিকে তাকাতে পারেন না কিছুতেই। মায়ের প্রতি এই ঘৃণা অন্যায়ের প্রতিকার চায় সে—চায় ন্যায় বিচার।

দিন থেকে রাত হয়। রাত ভোর হয়। হাসনাহেনার গঞ্জে হাওয়ায় মাতন লাগে। পাখীর কলকাকলীতে মানুষের সুখস্বপ্নে ছেদ পড়ে। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করার জন্য গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা লাঠি হাতে পথে বের হয়েছেন রোজকার মতো আজও। শ্রাবস্তীপুর গ্রামের সবকিছুই আগের মতই চলছে। গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম ঘটেছে সত্যতবাবুর বাড়ীতে। ভোরে গোবর’ছড়া দিত অপর্ণা—তা বন্ধ হয়ে গেছে। সত্যতবাবু চা না খেয়ে বিছানা ছাড়তেন না। তিনি অনেক রাত থাকতেই উঠে পড়েছেন চা ছাড়াই। চা তাঁর কাছে এখন পানসে লাগে। টাকা, শুধু টাকার জোরেই ওরা পার পেয়ে যাবে! এতবড় অন্যায়ের কোন প্রতিকার হবে না! কি করবেন সত্যত বাবু! কি

ক্ষমতা আছে তাঁর। একমাত্র ভরসাস্থল ছিল রায় মশাই। তিনিও নিরাশা করে দিয়েছেন বলা যায়। টাকা চাই, প্রমাণ চাই। টাকাও নেই, প্রমাণও নেই। পাল্লা ওঁকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। যেন বিচারকের রায় তিনিই দেবেন, আদিত্য মশাই-এর উপযুক্ত শাস্তির বিধান তিনিই করবেন। মেয়ের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন।

বৈষয়িক চিন্তাভাবনায় পরিপক্ক আদিত্যমশাই ধরনী রায়ের মাধ্যমে সত্যতবাবুর কাছে পৌঁছানোর একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা করলেন। তিনি জানেন ধরনী রায়ের সঙ্গে সত্যতবাবুর সম্পর্কটা ভাল। অতএব ধরনী রায়কে বাড়ীতে ডেকে সত্যতবাবুকে নিরস্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন তিনি। শূকনো কথায় চিড়ে ভেজে না, তা তিনি জানেন। তাছাড়া একেবারে অকৃতজ্ঞও নন তিনি। দয়ামাত্রা তাঁর শরীরে যথেষ্টই রয়েছে। বাকী জীবনটা যাতে দুখেভাতে থাকতে পারেন সত্যত, সে ব্যবস্থা করে দেবার অঙ্গীকারও করলেন তিনি। সত্যত যদি চান একেবারে সদরে গিয়ে পাকা কাজ করতে তিনি প্রস্তুত।

সত্যতবাবুর কানে পৌঁছে গেল সদাশয় আদিত্যমশাই-এর প্রস্তাব। রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন তিনি। ধরনী বাবুর বাড়ী ছুটলেন উদ্ভাসের মতো। সত্যতের মতিভ্রম হতে পারে, ধরনীবাবুর তো আর তা হয় নি। সত্যতবাবুকে বসালেন, চা খাওয়ালেন। তারপর স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে বললেন, তিনি কোনটা চান। মামলা মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হতে, না ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে। আরও বুঝি দিলেন তিনি, এই সুযোগে চাপ সৃষ্টি করে মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু কাঁচা টাকা আদায় করে নিতে। মামলা করলে তাঁর বোঁ তো আর ফিরে আসবে না সংসার রক্ষা করার জন্য ইচ্ছে করলে তিনি আর একবার ছাতনা তল্লাশ যেতে পারেন। চাই কি তাঁর জন্য সাহায্যও করতে পারেন।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দোটানায় পড়ে গেলেন

সত্যব্রতবাবু। মামলায় কাবু করা যাবে না। মণিরাম আদিত্যকে। মামলা লড়ে লড়ে একেবারে ঝানু হয়ে গেছেন তিনি। সত্যব্রত নিজে কখনো মামলা লড়েননি, প্রয়োজন হয়নি। আদিত্যমশাই এর প্রতিনিধি হয়ে মামলার ব্যাপারে সদরে গেছেন অনেক বার। কিন্তু নিজে মামলা করা আলাদা ব্যাপার। ধরণী রায় সুপারামশাই দিয়েছেন। চাপ সৃষ্টি করে যতখানি সম্ভব আখের গুঁছিয়ে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ করে এই সময় আদিত্যমশাই-এর মানসিক প্রতিক্রিয়া তাঁর অনুকূলে।

কিন্তু পান্নার দিকে তাকালেই সব গোলমাল হয়ে যায়। ন্যায়বিচারের দাবীতে সে বাবার মুখের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকালেই বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যায়। মেয়ের কাছে তার মায়ের প্রতি অন্যান্য অবিচারের কি প্রতিকার তিনি করলেন, তার কি ছবাব দেবেন। মেয়ে যদি বলে, শেষে তুমি আদিত্য মশাই-এর চাঁদির জুতো মাথায় বয়ে নিয়ে এলে? পশুটাকে কোন শিক্ষাই দিতে ভরসা পেলে না তুমি। আসলে আদিত্য মশাইকে তুমি ভয় পাও।

বিবেকের সঙ্গে লড়াই চললো কয়েকটা দিন। একদিকে পান্না তাঁর বিবেকে আঘাত দিচ্ছে। অপরদিকে আদিত্যমশাইর লোভের হাতছানি। কোন পথটা তিনি বেছে নেবেন। অবশেষে বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ করে আদিত্যমশাই-এর প্রস্তাব মেনে নেওয়াই স্থির করলেন তিনি।

ধরণী রায়ের মধ্যস্থতায় আদিত্যমশাই সত্যব্রতবাবুকে দশাবধা জরি ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন। এর বেশী সত্যব্রতবাবু কপ্পনাই করতে পারেন না। একদিন আদিত্য মশাই-এর সঙ্গে সত্যব্রতবাবু সদরে গেলেন জরি রেজিস্ট্রী করতে। শুবকাজে বিলম্ব ভাল না। শেষে মতিগতি যদি পালটে যায়। যদি বলেন, শুধু শুধু অতসব দিতে যাব কেন। তার চেয়ে ভালয় ভালয় এখনই পাকা কাজ করে ফেলা ভাল। বৌ-এর শোক কিছুটা তিখিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

সদরের কাজ সেরে সন্ধ্যায় বেশ পরিভূপ্ত মনে সত্যব্রতবাবু গায়ে ফিরে এলেন। অন্ধকারের কালো ছায়া সারা গ্রামটাকে গ্রাস করেছে। এদিকওদিক ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো অন্ধকারকে আরও ভয়বহ করে

তুলছে। সত্যব্রতবাবুর পরিচিত রাস্তা, পরিবেশ তাঁর বাধা সৃষ্টি করলো না। সোজা বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে জমাট অন্ধকার। পান্না গেল কোথায়? আর সব ছেলেমেয়েরা? ঘর খোলা রেখে পাড়াপড়শী কারও বাড়ীতে বেড়াতে গেল? মনে মনে রেগে গেলেন তিনি। একি ধরণের আক্কেল? অতবড় মেয়ে। ওর মায়ের ঐ বয়সে পান্নার জন্ম হয়ে গেছে। আর সে কিনা ঘর আলগা রেখে পাড়া বেড়াতে গেল? এই অন্ধকারে বাড়ীর জিনিষপত্র চোরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আসুক আজ, আচ্ছা করে ধমকে দেবেন। রাগে গরগর করতে করতে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তিনি।

ওঁকি! চমকে থমকে গেলেন। পান্নার মায়ের সেই ছবিটা চোখের সামনে অন্ধকারের মধ্যেও বেশ দেখতে পেলেন। ওটা আদৌ ছবি মনে হচ্ছে না। অপঘাত মৃত্যু, অতৃপ্ত আত্মা আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে, শুনছেন তিনি। ভয় পেলেন। কাঁপা স্বরে বলতে লাগলেন, ‘অপর্ণা, আমার ক্ষমা কর। আমি তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারিনি ঠিকই। কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, পান্নার কথা ভেবে ঐ পথটাই বেছে নিলাম। তুমি আমার ক্ষমা কর অপর্ণা।’

সত্যব্রতবাবু অপলক চোখে দেখছেন। ঠিক সেই দৃশ্য। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে দেহটা। সাহস করে পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বাললেন তিনি। আরও স্পষ্ট হোলো! জ্বিভ বের হয়ে গেছে, পাদুটো মাটি খুঁজছে। দেশলাই কাঠি নিভে গেল। পা কাঁপছে সত্যব্রতবাবুর বাইরে বেরিয়ে যাবার মত সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। ভূত প্রেত সম্পর্কে অনেক গুজব শুনছেন, আমল দেননি। কিন্তু আজ তাঁর ঘরেই—।

অন্ধকারের হাত থেকে রেহাই পেতে আর একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললেন তিনি। ঝুলন্ত দেহটার মুখের দিকে নজর পড়লো তাঁর।

আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। ওটা অপর্ণার দেহ নয়, তার বড় আদরের মেয়ে পান্নার। পান্না তার মায়ের লাঞ্ছনার নীরব প্রতিবাদ করে চলে গেল।

সংবাদ-কণা

সংকলক : রমা রায়

- * মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথেই থাকে।
- * জাতীয় গ্রন্থাগারে বহু বই উইপোকার পেটে।
- * পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শিল্পে অশান্তি ও ঘেরাও চান না।
- * দলত্যাগ বন্ধ আইন লোকসভা ও রাজ্যসভায় গৃহীত হয়েছে।
- * পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও রাজ্যের নামের পরিবর্তন চান।
- * চতুর্থ নেহেরু গোল্ডকাপ ফুটবলের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন হয়েছে।
- * বিদ্যুৎ শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের নামে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন।
- * পার্কেস্থানে বিরোধী সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- * রামচন্দ্রনের পরামর্শে ছদ্মলিলা অপসারিত।
- * গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।
- * জোড়াসাকো দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালিত হয়েছে।
- * প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামায় ২,৭১৭ জন নিহত হন।
- * প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের সচিব এম সি সারিনের বিরুদ্ধে তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- * তৃতীয় বিশ্ব শান্তি সম্মেলন মাউন্ট আবুতে ফেব্রুয়ারিতে বসছে।
- * মস্কোতে বিশ্ব ধুব উৎসব গ্রীষ্মকালে হবে।
- * পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য বছরের মত সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বর্কনের উদ্যোগ নিয়েছেন।
- * সারা রাজ্যে নেতাজীর ৮৯তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে।
- * আবশ্যিক জমা প্রকল্প (সি ডি এস) তোলা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনামত রয়েছে।
- * পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বাজেটই হচ্ছে।
- * ভারতের দশটি রাজ্যে বিধানসভার ভোট ২ ও ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।
- * প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চান জাতীয় পাঠসূচী।
- * ফারাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দু'শ মেগওয়াটের প্রথম ইউনিটের কাজ শেষ হয়েছে।
- * পশ্চিমবঙ্গ সরকার বোম্বাই-এর অনুসরণে কলকাতার বাতাস পরিষ্কার রাখতে ধোঁয়াশামিটার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
- * পশ্চিমবঙ্গে গত বছর আমাশয় রোগে প্রায় ২,০০০ মানুষ জীবন হারিয়েছেন।
- * শ্রীলঙ্কা ভারতীয় জেলেদের মুক্তি দিয়েছেন।
- * ইম্পাত শিল্প আধুনিক করার কেন্দ্র জোর দিচ্ছে।
- * কেন্দ্রীয় সরকার উপাচার্যদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ করার পক্ষে।
- * গত বছরে (১৯৮৪) হিন্দী ছাত্রছাত্রী ১৬৫, বাংলা ছাত্রছাত্রী ৩৫টি তৈরি হয়েছে। ছাত্রছাত্রী তৈরিতে ভারতবর্ষ বিশ্বে শীর্ষে।
- * পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করে বর্তমানে হয়েছে ১৩'৯১ টাকা। চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৪'৩০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯ টাকা।
- * পশ্চিমবঙ্গে ফ্রন্ট সরকারই ১৯৭৮ সালে রাজ্যের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন।
- * বরানগর ইণ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডটিক্যাল ইনস্টিটিউটের আয়কুঞ্জে এক মনোস্তম্ভ পরিবেশে সমাবর্তন উৎসবে ১০৭ জনকে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।
- * ডঃ নারালিকরের মতে ভারত বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ছে।
- * ভারতবর্ষে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত।
- * রাজীব গান্ধী তাঁর মা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হয়ে নেহেরু পুরস্কার নিলেন।
- * এশিয়াটিক সোসাইটিতে পুঁথি অল্পে বিনষ্ট হচ্ছে।
- * আজহরউদ্দিন তিনটি টেবিলে পর পর সেকুঁরি করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন।

চিঠিপত্র

(১)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার পৃষ্ঠা ১৩৯১ সংখ্যায় জনৈক শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় 'দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের ২৮৩ খানা বই-এর এক তালিকা দেখলাম। আমি আরো ৬ খানা বই-এর নামের তালিকা পাঠালাম। এগুলি রহস্যলহরী গ্রন্থমালার বাইরের বই। প্রথম ৬৬ খানা বই-এর পর এগুলির নাম যোগ করবেন :

৬৭। যুবরাজ ৬৮। শোণিত সোপান ৬৯। শয়তান ৭০। মহতের প্রতিশোধ ৭১। রহস্যময়ী ৭২। একটি সম্প্রবিস্তার হত্যাকাণ্ড।

শেষ বইটির নামে শিবরাম চক্রবর্তীর একটি হাসির গল্প আছে। নামকরণ নিয়ে বাঙ্গা শিবরামবাবুর স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। তিনি "অপটন আজো পটে" লিখেছিলেন দিলীপকুমার রায়ের "অপটন আজো ঘটে"-র নামকে নিয়ে

তামাশা ক'রে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "হত্যা হাহাকারে" নামটি নিয়েও তিনি অনেক রঙ্গ ক'রে গেছেন।

আশা করি এই চিঠি আপনার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ইতি—

কলিকাতা

আপনার বশব্দ—

শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়

(২)

মহাশয়,

...এবার পৌষ সংখ্যা 'প্রবর্তকে' অধ্যাপক শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দীনেন্দ্রনাথ রায় প্রসঙ্গে রচনাটি পাঠ করে খুবই আনন্দ পেলাম। ভাল লেখা, সমস্যা-পযোগী।...দীনেন্দ্রকুমার সত্যিই অবহেলিত। তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।...

কৃষ্ণনগর

ইতি—

অজিত দাস

(সংবাদ কণা)

- * রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে সম্মানপত্র দিলেন।
- * পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কমপিউটার বসাবার উদ্যোগ নিচ্ছেন।
- * নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ৪৬তম জাতীয় ও আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

- * পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি সমর্থন করলেন।
- * ভারতে গুপ্তচর বৃত্তির জন্যই ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সার্জ বোম্বাদভেকে প্যারিসে ফিরিয়ে নিচ্ছে।
- * বোম্বাইয়ে যোগেশ মানেকলালকে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পাদক : শ্রীজগদীশচন্দ্র মহলানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীতি কর কলিকাতা পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ রায় কলিকাতা মুদ্রিত।

কনক

প্রতিষ্ঠাতা - সন্তোষকৃষ্ণ শ্রীমহাশয়

জনপ্রিয়তায় গৌরবান্বিত

১৯৩৮ খ্রিঃ ১১

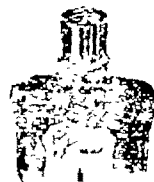
কে. হো. ডের

প্রসাধনী



মহাভক্তরাজ
আম্বেরিয়ায় সুবাসিত
কেশ ভেল

কনক ট্যালক
কনক সেন্ট



কে. হো. ডের কোং কলিকাতা-১৪

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রচিত দুইটি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার একটি অভিনব ভাষ্য। জীবনবাদমূলক এই গীতাভাষ্য গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপলব্ধিকে সহজ সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিগ্নাছেন। নানা মতবাদে বিক্ষিপ্ত বর্তমান সমাজ, সঙ্ঘগুরু মতিলালের প্রজ্ঞানময় সাধনার উজ্জ্বল এই গীতাভাষ্য নূতন পথের সন্ধান দিবে।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : আঠার টাকা (দুই খণ্ড)

বেদান্ত দর্শন : ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্মসূত্রের বহু বিচিত্র ভাষ্য বিদ্যমান। এই বহুর মধ্যে সঙ্ঘগুরু মতিলালের জীবনভিত্তিক লীলা-বাদী শারীরিক সূত্রের এই ভাষ্যগ্রন্থ কালোপযোগী, যোগ-জীবন মূলক এবং সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত।

মনীষী পণ্ডিত ডঃ হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর সূচিন্তিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত নিখিল ভারতশাস্ত্রের নির্বাক্ত স্বরূপ সুবহুৎ সূক্ষ্মিকা সংযোজনে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ।

মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য দৃষ্টি আকর্ষক। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য : তিরিশ টাকা (দুই খণ্ড)

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১, বিপিন বিহারী গান্ধুলী স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

সূচীপত্র ফাল্গুন ১৩৯১

শিরোনাম	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশস্তি	সঙ্কগুরু শ্রীমতিলাল	৩৩৯
সাধন কণা	সংকলন	সঙ্কগুরু শ্রীমতিলাল	৩৪০
আনন্দময়ী মা-র আত্মপ্রকাশ	আলোচনা	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়	৩৪১
পুরুষ ও প্রকৃতি	আলোচনা	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৪৩
আর এক প্রত্যয়	কবিতা	গোতমকুমার মণ্ডল	৩৪৪
শৃঙ্গার বা মন্থনকে নিয়ে	প্রবন্ধ	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর	৩৪৫
পিপীলিকা ও গঙ্গাফড়িং	গল্প	শ্যামাদাস দে	৩৪৯
দশম বইমেলা	প্রতিবেদন	কল্যাণকুমার সামন্ত	৩৫২
এখনো কি হয়নি সময়?	কবিতা	রতীন শীল	৩৫৪
অজ্ঞাতবাস	কবিতা	সরোজ দাস	৩৫৪
শিল্প সমৃদ্ধ হাওড়া জেলা	সমীক্ষা	বিশ্বনাথ রায়	৩৫৫
সংবাদ-কণা	সংবাদ	রমা রায়	৩৫৯

প্রবর্তকের নিয়মাবলী

প্রবর্তক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ৬৯তম বর্ষে চলিতেছে। বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

প্রতি ইংরেজী মাসের ৯/১০ তারিখ প্রবর্তক ডাকে দেওয়া হয়। ঐ তারিখের পর সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ করুন এবং সাত দিনের মধ্যে জানাইলে আর একখানি পত্রিকা পাঠান হইবে, পরে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রবর্তকে সাধারণত ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, গল্প, উপন্যাস ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশ করা হয় না। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই, সম্পাদকের নহে।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য রচনা গ্রহণ করা হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মীধ্যক্ষ, প্রবর্তক, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৯০২১

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার অধ্যক্ষ
জনগণের ঐক্য পড়ে তোলার দ্রুত

ইউনাইটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড

ফলিকাতা-৭০০০০১

কলিকতা অফিস : ৭ রোড লস রোড, কলিকতা : ৭০০ ০০৬

কোয়ার্টার : জে এম বিহার

Propaganda/178-16-80





বর্ষ ৬৯তম : ১১ম সংখ্যা : কাঙ্ক্ষন ১৩৯১ : ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫

জীবনের আলো

মানুষ গড়ার কথা। কাজের মানুষ, কথাই মানুষ নয়। কথা ঢের শোনা গেল। আজ দরকার—ভাল কথা যে শোনাবে তাঁকে ধরে বলা, কাজে সে এগুবে কি না? যদি পিছু ফিরে, মুখ তাঁর টিপে ধর। হাত দিয়ে নয়, নিজের কাণে আকুল দিয়ে। এইরূপ উপেক্ষায় নিতান্ত নির্লজ্জ নাহলে কথা থামবে। কাজের তালে কথা ফুটবে, শক্তির অপচয় বন্ধ হবে।

চিন্তারাজ্যে যে সব কর্মপ্রেরণা সকল মানুষের মধ্যেই উপস্থিত হয়, বাক্যশ্রোতে তা না ভাসিয়ে যদি বস্তুতন্ত্র করার ক্ষমতা ভিতরেই তা ধরে রাখি, প্রেরণানুযায়ী কাজ করার উপযোগিতা, শক্তি-সামর্থ্য, সহায় কিছুই অভাব হয় না। আজ যে কাজের অযোগ্য বলে প্রিয়মান হই, সে কর্মপ্রেরণা নিয়ে নীরবে যদি কিছু দিন অন্তরে অন্তরে চিন্তা করি, অক্ষমতা অন্তর্হিত হয়। কোন অবস্থায় পড়ে, কোন রূহৎ কর্মে আত্মদানে যে বাধে, তা একেবারেই বাজে কথা। যা ভাবনায় আসে তা জীবনে নামাতে আমরা ভয় পাই। তবে কেন সে বিষয়ের আলোচনা? ভাবে ও কাজে বার মিল নাই, তার কথা ফুৎকার অপেক্ষা অপবিত্র। এই জন্য কাণে আকুল দিয়েই এই ক্ষেত্রে নিজের শুদ্ধতা রক্ষা করতে হয়।...

ভাবের সঙ্গে কাজের মিল আজ দরকার হয়েছে। ভাব প্রচার করেন যিনি, তিনি কর্মক্ষেত্রের কঠোর পরীক্ষায় পা দেন না। মন্ত্রদ্রষ্টা যদি সাধনার পথে দীক্ষিতের সহায় না হয়, সে মন্ত্র নিষ্ফল। আর এই নিষ্ফল মন্ত্রের বোঝা বহন করেই অসংখ্য জীবন ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে তাই আমাদের সতর্ক হতে হবে। দেশের অভাব শুধু চাঁকার নয়, মানুষেরও—একথা বলাই বাহুল্য।*

—সঙ্কর শ্রীমতিলাল

মিলনেই পরিবার, সমাজ সার্থক হয়। মিলনের মূলমন্ত্র—উৎসর্গ। মানুষ দেবপ্রকৃতি পায়, উৎসর্গে। সমাজ, সংসার দিব্য হয়—ভাগবত প্রেম শান্তি মাধুর্যের ক্ষেত্র হয়, যদি এই উৎসর্গ-যোগ কোনদিন সিন্ধু হয়, ব্যাপক ভাবে প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উৎসর্গই ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের নিত্য ও বিশ্বজনীন বিধান।

লৌকিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার ন্যায় এ যৌগিক শিক্ষা-দীক্ষাও সার্বভৌম সর্বজনসুলভ করা যায়। ইহা আশ্চর্য কিছই নহে। মানবাত্মা যদি সর্বব্যাপী হয়, তাহার নিত্য বিধানও সর্বব্যাপী হইবে। যথা সময়ে সর্বত্র প্রকাশিত হইবে।

আজও প্রাকৃত জগতের বিধানে মানুষ বাধা পড়িয়া আছে। অপরা প্রকৃতির টানে সে মজিয়া আছে। তাই সে উচ্ছ্রান্ত শ্রেয়সিধিটি চিনিতেছে না। এই অবিন্যা কাটাইয়া দেওয়ার আয়োজন কর।

মানুষের অন্তরাত্মা তাঁর সত্য ধর্মটিকেই চাহিতেছে। ঐ সত্যধর্ম খুঁজিয়া না পাওয়া পর্যন্ত তার সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার সর্ববিধ সংস্কারের সকল চেষ্টাই বৃথা হইতেছে। নিত্য-ধর্ম না পাওয়া পর্যন্ত বিপ্লবের পর বিপ্লব প্রবাহাকারে চলিবে। এ ঘোর আবর্তন তরঙ্গ রোধ করে কার সাধ্য।

সে নিত্য-ধর্ম প্রেম। প্রেমই যোগ। প্রেমই সাধ্য বস্তু। এই প্রেমের নিরিখ কি? শাস্ত্র সঙ্গত করিয়াই নিজের অনুভূতি মিলাইয়া লও। শাস্ত্রে ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছে অমৃত-স্বরূপ। অর্থাৎ ভক্তি বা প্রেম অমৃত স্বরূপ।

যজ্ঞদ্বা পুমান সিন্ধো ভবতি অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।
যৎ প্রাপ্যন কিঞ্চিদ বাঙ্খতি ন শোচতি
ন ঘোষিত ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।

অর্থাৎ “যে বস্তু পাইলে মানুষ সিন্ধু হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়, যাহা থাকিলে হিংসা থাকে না, ঘেব থাকে না, অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না, রমণের ইচ্ছা পর্যন্ত থাকে না, ব্যর্থ উৎসাহ থাকে না—যাহা জানিয়া মস্ত স্তব্ধ আত্মারাম হয়”—তাহাই প্রেম।

এই প্রেমের লক্ষণ, ভক্তির লক্ষণ। যাহাই বল একই কথা,—ইহা যোগেরই লক্ষণ। ইহার অভাবে কি হয়? তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা। যে প্রেম হারায়, সে ভগবানকেই হারায়। নিত্য-বস্তু যে ভগবান, তাহার সহিত বিরহ—সে যোগ-বিস্মৃতিরই পরিচয়। চিন্তে বিরোধী-বৃত্তি সঞ্চার করিয়াই প্রেমের ঠাকুরকে আড়াল করিয়া দেয়। তাই চাই—তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা। প্রেমের অন্তরায় যাহা, তাহার প্রতি উদাসীন হও। সকল বৃত্তি নিরোধ করিয়া এক ভগবানেই প্রযুক্ত কর। হৃদয় আত্মা এক হইলেই স্বরূপের ধর্ম ফুড়িয়া বাহির হইবে। উহাই এক-তত্ত্ব।

মানবাত্মা এক। সেই ঐক্য নির্মিত সমাজ চাই, সংসার চাই। এই পরম অনুভূতি লইয়াই নবজাতির গঠন হইবে। বাংলায় ইহার জন্য ভগবান বহু যুগ ধরিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। রাজা রামমোহন হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পর্যন্ত ও চণ্ডীদাস হইতে শ্রীচৈতন্যের যুগ পর্যন্ত যে প্রেম ও সমষ্টি-সাধনার অঙ্কুর পাওয়া যায়, তাহাও আজ ব্যর্থ হয় নাই। উহাই আরও বিকশিত হইয়া, আরও মূর্ত ফুটন্ত হইয়া আজ সম্বৎ ও জাতিজীবনে ধরা দিবার জন্য নামিয়া আসিয়াছে। ইহা নব যুগ শক্তিরই অবতরণ। বাঙ্গালী, এই যুগদেবতাকে আশ্রয় দিয়া সার্থক কর।

আনন্দময়ী মা-র আত্মপ্রকাশ

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-৮৬) বলেছেন, “অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ঠিক এই কথাই বলেছেন :

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ (৯।১১)

মানুষ অবিদ্যার দ্বারা আবৃত। অপর দিকে অবতার নিজেই রাধেন প্রচ্ছন্ন, আত্ম-মায়ার দ্বারা নিজেই রাধেন আড়াল করে। তাই মানুষ অবতারকে সহজে চিনতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, অনন্ত ও অসীম যখন শান্ত ও সসীম হয়ে ধরা দেন তখনই শুধু মানুষ তাঁকে আপন করে নিতে পারে, তাঁর কাছে এসে মানুষ হয় বিশ্বদ্রু এবং অন্তঃবিহীন মাধুর্যেরে হয় অভিসিঙ্গিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ে লিখেছেন, “কৃষ্ণের যতক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপুর্তাহার স্বরূপ।” ভগবান যখন মানুষের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, তখনই শুধু আমরা ভগবানকে চোখের সামনে দেখবার দুলভ অধিকার লাভ করি। যুগাবতার রামকৃষ্ণের ভাষায়, “অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানবরূপে জগতে আবির্ভূত হন।” আমাদের দৃষ্টি নেই, তাই আমরা অবতারকে দেখেও তাঁকে চিনতে পারি না, তাঁকে জানতে পারি না, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। যারা ভাগ্যবান একমাত্র তারাই শুধু ভগবানের নর-লীলার মহিমা ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে হন সক্ষম। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে লিখেছেন—

অষ্টমতের গলা ধরি কহেন বার বার ।

পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার ॥

অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌর রায় ।

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

ভরদ্বাজাদি ১২ জন ঋষি মাত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিশ বছরের যুবক চৈতন্যদেবকে (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃঃ) তাঁর জননীর দীক্ষাগুরু পরম ভাগবত বয়োবৃদ্ধ অষ্টম আচার্য অবতার বলে ঘোষণা করেন (১৫০৫ খৃঃ)। ১৮৬১ খৃঃ ভৈরবী ব্রাহ্মণী দীক্ষণেশ্বরে আসেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ছিলেন

অসামান্য রূপবতী এবং অসাধারণ বিদুষী। সেই সময়ে ভৈরবীর বয়স ছিল ৪০।৪২ বছর এবং রামকৃষ্ণদেব ছিলেন ২৫ বছরের যুবক। ভৈরবীর প্রতি রামকৃষ্ণের আচরণ ছিল ঠিক বাল-গোপালের মতো। মাতৃসমা ভৈরবীই রামকৃষ্ণকে সর্বপ্রথম অবতার বলে প্রচার করেন—“এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।” আবার বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বয়োবৃদ্ধ জ্যোতিষচন্দ্র রায় (১৮৮০-১৯৩৭), সর্বজন শ্রদ্ধের ভাইজীই সর্বপ্রথম কুলবধু নির্মলাদেবীর মধ্যে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁকে স্বয়ং জগজ্জননী বলে ঘোষণা করেন। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, ভাইজী ছিলেন পরম ভাগ্যবান।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “আর এক প্রকার গুরু আছেন—সমগ্র জগতের ঋণ্ডতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা সকল গুরুর গুরু—স্বয়ং ঈশ্বরের মানবরূপে প্রকাশ। তাহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছামাত্র অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে অতি হীনতম, অধম চরিত্র ব্যক্তিগণ পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিচিত হন।” স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, অবতারের একটু স্পর্শ বা দর্শন মাত্রই মানুষের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে পারে—“One touch, one glance, can make a whole life change।” শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্শে আসামাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনে এসেছিল এক অলৌকিক রূপান্তর। ভাইজীর জীবনেও ঠিক তাই ঘটেছিল। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে দর্শন করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইজীর জীবনে নেমে এলো এক অভাবিত পরিবর্তন। মুহূর্তের মধ্যে ভাইজী জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের জীবনে দেখা দিল এক বিরাট ভাব-বিপ্লব। ৪৬ বছরের জ্যোতিষচন্দ্র ৩০ বছরের শ্রীশ্রীমার কাছে রূপান্তরিত হলেন বাল-গোপাল রূপে।

ভাইজী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ঢাকা শহরের শাহবাগে শ্রীশ্রীমার অবস্থিতির সংবাদ পান। তারপর একদিন সুপ্রভাতে তিনি আকুল প্রার্থনা বুকে নিয়ে শাহবাগে গিয়ে উপস্থিত হন। মা তখনও মৌনাবস্থায় আছেন। শ্রীশ্রীমার লৌকিক পতিদেবতা ভোলানাথের অকুপণ

দাম্পত্যে ভাইজী শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন লাভের সুযোগ পান। ভাইজী প্রথম দর্শনের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, “তাঁহার শান্ত যোগাবস্থা অথচ কুলবধূর ভাব, এই দুইটি যুগবৎ এই প্রথম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। আরো দেখিলাম যে যাঁহার প্রতীক্ষায় এতদিন বসিয়া আছি, যাঁহার খোঁজে দেশে বিদেশে ঘুরিয়াছি, তিনি আমার সম্মুখে। আমার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া নাচিয়া উঠিল।” শ্রীশ্রীমার চরণ স্পর্শ করবার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পারলেন না। ভাইজীর নিজের কথায়, “চরণ ছুইতে প্রবল আগ্রহ হইলেও পারিলাম না; ভয়ে নয়, আশঙ্কায় নয়, কি যেন এক অব্যক্ত আবেগে সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিলাম।” এর প্রায় সাত মাস পরে ভাইজী দ্বিতীয়বার মাতৃ-দর্শন করেন। সেই সময় তিনি জানিতে পারেন, “মাতাজীর তিন বছরের মৌন তখন কাটিয়া গিয়াছে।” এরপর ভাইজী শাহবাগে নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীমার আকর্ষণ দুর্নিবার। ভাইজীর মনে প্রশ্ন জাগে মা কে? তাঁর স্বরূপ কি? এ বিষয়ে মাকে প্রশ্ন করলে মা হাসলেন এবং বললেন, “আমি আগেও যা এখনও তা, পরেও তা।” এই জবাবে ভাইজী পরিতুষ্ট হলেন না। কিন্তু পরমুহুর্তে শ্রীশ্রীমার চোখে মুখে প্রত্যক্ষ করলেন “এক অলৌকিক ভাব।” ভাইজী ভয়ে ও বিস্ময়ে নীরব হয়ে গেলেন। দিন যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাইজী টপলিয়া করলেন, শ্রীশ্রীমা “শুধু আমার মা নয়, ইনি জগতের মা।” ইতিমধ্যে কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময় একদিন বেলা ১২টার সময় ভাইজী অফিসের কাছে অত্যন্ত ব্যস্ত, জ্বরুরী কাজ। সেদিন বড় সাহেব ছুটি থেকে ফিরে এসে চার্জ গ্রহণ করবেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে অফিস ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর নয়। ঠিক এই সময়েই শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে শাহবাগে যাবার নির্দেশ এলো ভাইজীর কাছে। ভাইজী কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শাহবাগে চলে এলেন। শ্রীশ্রীমার নির্দেশে ভাইজী, শ্রীশ্রীমা ও ভোলানাথের সঙ্গে সিন্ধেশ্বরীস্থানে গমন করলেন। এই সিন্ধেশ্বরীতে ভাইজী শ্রীশ্রীমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন স্বয়ং আনন্দময়ীকে এবং শ্রীশ্রীমাকে আনন্দময়ী বলে চোষণ করলেন। সেই থেকে কুলবধূ নির্মলাদেবী, শাহবাগের মা, ঢাকার মা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরূপে হলেন পরিচিত। প্রশ্ন হবে, এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি কখন ঘটেছিল? ভাইজীর “মাতৃ-দর্শন” গ্রন্থে বিবৃত ঘটনাবলীর পরস্পরা অনুধাবন করলে

মনে হ’তে পারে, ১৯২৫ সনের মধ্যভাগের পরে, সম্ভবতঃ শেষদিকে, কুলবধূ নির্মলা দেবী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরূপে করেন আত্মপ্রকাশ। কারো কারো লেখায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেরই উল্লেখ দেখতে পাই। শ্রীশ্রীমার অন্যতম জীবনীকার শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তীও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দই নির্দেশ করেছেন (১)। কিন্তু অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের হিসাব সমর্থন করে না—১৯২৬ খৃষ্টাব্দের দিকেই অস্বাভাবিক অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

সিন্ধেশ্বরীর অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ’তে হলে দুটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। প্রথমতঃ দেখতে হবে বাজিতপুরে শ্রীশ্রীমার অস্বাদীক্ষা হয়েছিল কোন সময় এবং আত্মদীক্ষার পরে শ্রীশ্রীমা বাজিতপুরে কতদিন মৌন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীমা কখন ঢাকা শহরে পদার্পণ করেন এবং ঢাকায় আসার পরে কতদিন তিনি মৌন ছিলেন। বাজিতপুরে মার আত্ম-দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট (১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই শ্রাবণ)। আত্মদীক্ষার কয়েক মাস পরে শ্রীশ্রীমা মৌন হয়ে যান এবং মৌনাবস্থাতেই মা ঢাকায় আসেন ১৯২৪ সালের ১০ই এপ্রিল (বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ২৮শে চৈত্র) এবং ঢাকায় এসে মৌন ছিলেন ১ বছর ৯ মাস।

শ্রীশ্রীমা যে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় এসেছিলেন এ সম্পর্কে কোন মতভেদের অবকাশ নেই। ভাইজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, শ্রীশ্রীমা ঢাকায় আসেন ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৮শে চৈত্র অর্থাৎ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল (২)। ১৯২৪ সনের হিসাব নির্ভুল হলে, মা ঢাকায় এসে ১ বছর ৯ মাস অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারির পর্যন্ত মৌন ছিলেন। সুতরাং মার সঙ্গে ভাইজীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৯২৬ সনের ১০ জানুয়ারির পরে এবং প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল সাত মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের কয়েক মাস পরে সিন্ধেশ্বরীর ঘটনা ঘটে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে।

(১) পরিবর্তন, ১৫ই, সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, পৃঃ ৪১।

(২) আনন্দময়ী ঢাকায় আসেন ১৩৩০। ২৮শে চৈত্র; বঙ্গাব্দের মধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ স্পষ্টতই মূল্য প্রমাদ।

পুরুষ ও প্রকৃতি

শ্রীসৌমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

পুরুষোত্তম তত্ত্ব অবলম্বনে গীতার পূর্ণাঙ্গ যোগ ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের ‘Essays on the Gita’ সত্য-ই-এক অনবদ্য সৃষ্টি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনাবলী জনসাধারণের প্রকার চেয়ে ভয়ের উদ্রেক করে বেশী। তাই লোকচক্ষুর অন্তরালের অতি-মানব-দেবতার বাণীকে বরের মানুষ করে-প্রতিদিনের সহজ কথায় নামিয়ে আনা দরকার। জ্ঞানি, দুখের স্বাদ ঘোলে মেটে না। কিন্তু দেহ যখন রুগ্ন ও মেধা দুর্বল, তখন ভবরোগ-বৈদ্যরা চিরদিন-সু-পাচ্য ঘোলের ব্যবস্থাই করে গেছেন। মহাজ্ঞানদের সেই পন্থা অবলম্বন করে গীতার পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচনা করা যাক।

পুরুষ

জীবন্ত থেকে পূর্ণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করতে তিনটে অবস্থা—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পরিণামে পুরুষোত্তম। কি করে একমুখি অধ্বিতীয়ম-ব্রহ্ম ক্ষর পুরুষ হয়ে জীব রূপে বদ্ধ হলেন, সাধন জগতে এ এক চিরন্তন প্রশ্ন। শাস্ত্র বলেন, লীলা। এখানে আমরা সহজ উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করবো। চা বা ধূমপানের নেশার কথা ধরা যাক। শরীরের জ্বলন্ত কোন প্রয়োজন ছিল না। সখ করে আনন্দ করতে গিয়ে এমন এক বদ অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল যে, চা না হলে আর চলে না। এই হল বদ্ধ অবস্থা। এই পরনির্ভরতার জন্য যখন অন্তরে বেদনা জাগলো, তখন এলো মুমুক্ষু। না, চায়ের নেশা থেকে মুক্তি চাই। সুস্থ হল অক্ষর ব্রহ্মের সাধনা—তিতিক্ষা, সংযম, দৃঢ় সম্পূর্ণ ইত্যাদি। চায়ের গুণ বা আকর্ষণ ছেড়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে হবে। সফল হলেও পতনের ভয় আছে। তাই সদা জাগ্রত নিষ্ঠা নিয়ে এড়িয়ে চলতে হয়। পাছে খেলেই খাবার নেশা হয়ে যায়। কিন্তু এরও উর্ধ্বে পুরুষোত্তম অবস্থা। অক্ষর ব্রহ্মের নিগূণ স্তর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গুণাতীত পুরুষোত্তম নিগূণ হয়েও গুণভোক্তা, ভাবাতীত হয়েও সকল ভাবের ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। তাই চায়ের উপর ক্ষর পুরুষের অনুরাগ বা বিবেষ, অক্ষর পুরুষের উদাসীন্য ছাড়িয়ে যিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রাগদ্বৈষ বিমুক্ত হয়ে চা-পান

করেন, তিনিই সত্যিকারের আনন্দ পান—প্রসাদং অধি-গচ্ছতি। তবে অবশ্য এসব সাধনা শীতকালে আরম্ভ না করাই ভাল। এই হ’ল জীবভাবের ক্রমউত্তরণের পথ। তবে অক্ষরে স্থিত না হয়ে যে পুরুষোত্তম স্তরের সাধনা করে, সে হয় মুখ, নয়তো আশ্র প্রবণক।

এবার শ্রীঅরবিন্দের অবতার তত্ত্ব আসা যাক। অল্প কিছু লোক দেখা যায়, যারা মাঝে মাঝে চা খায় বটে, কিন্তু কোনদিন নেশা গ্রস্ত হয় না। তাই নেশা ছাড়বার প্রশ্নও ওঠে না। এঁরা হলেন অবতার। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রজ্ঞা নিয়ে তাঁরা জগতে অবতরণ করেন এবং জীবদ্দশায় সাধারণের মত প্রতিভাত হলেও তাঁদের জন্ম কর্ম সবই দিব্য। এঁরা ব্যবহার দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যান যে জগৎ জীবনে এ-অবস্থাপ্রাপ্ত করা সম্ভব। তাই ক্ষর ক্ষেত্রে জীব বদ্ধ, অক্ষরে জীবমৃত আর পুরুষোত্তমে জীবমুক্ত। আর যিনি প্রকৃত পুরুষোত্তম তিনি সর্বক্ষেত্রেই বদ্ধন ও মুক্তির উর্ধ্বে। জীব-চেতনা উজ্জ্বলে উঠে যাচ্ছে আর ব্রহ্ম চেতনা ভাটিয়ে নেমে আসছে। যেখানে মিলন সেখানেই এক মধুর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে। সেখানেই পূর্ণ আশ্বাস মিলছে—অহং হ্যাং সর্ব পাপোভ্যা মোক্ষসি স্যামি মা শূচঃ। সকলের জন্য পুরুষোত্তমের এই হল চিরন্তন অভয় বাণী।

প্রকৃতি

ক্ষর অক্ষর ও পুরুষোত্তম তত্ত্বের সহজ আলোচনা হয়েছে। এখানে ছোট করে পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা হোক।

গীতার সপ্তম অধ্যায় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে পরিষ্কার বলা আছে, দুটো প্রকৃতি আমার (“মে”)—পুরুষোত্তমের। সুতরাং অপরা প্রকৃতিতে অক্ষর বলে হয় এবং পরা বা পরমা প্রকৃতিতে এক বলে উপদেশ বোধ করে ভেদ বুদ্ধি বাড়ানর কোন মানে হয় না—যদিও সাধন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিতে উন্নীত হওয়া। অন্ততঃ যতদিন দেহ ধারণ করে থাকতে হবে। আর এই সাধনার ধারা বিশ্ব চরাচরে সর্বত্রই চলছে। এই সার্বজনীন escalator-এ এগিয়ে চলার মধ্যে, যারা ব্যক্তিগত চেষ্টায় সিঁড়ি ভাঙছে, তারা আরও তাড়াতাড়ি উঠে

যাচ্ছে গন্তব্যের কাছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—প্রকৃতিকে এই দুই অংশে ভাগ করার উদ্দেশ্য কি? অগ্রগতিকে স্বরাধিত করতেই শ্রীভগবান স্বয়ং নিজ শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন। পরা বা পরমা তাঁর নিত্য-মুক্ত স্বভাবের লীলাবিলাস। আর অপরা তাঁর নিয়মের বাঁধন, তাঁর অলঙ্ঘনীয় সঙ্কল্প ও শৃঙ্খলার executive force।

পরিশক্তি ও পরমপুরুষ নিত্য-মুক্ত। শ্রেষ্ঠ symbolic representation অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি। একই অবিচ্ছেদ্য সত্তার দুই অংশে দুই প্রকাশ। অপরা শক্তি তাঁর ‘একাত্মশেন স্থিতো জগৎ’। এর দেবী—ঈশ্বরের delegated authority নিয়ে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত systems and procedures (ধর্ম) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভার ন্যস্ত। তবে অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরের দৃষ্টির বাইরে নন। যখন এই জগতে কালের প্রভাবে ধর্ম গ্রানি যুক্ত হয় এবং অরাজকতার (chaos) উদ্ভব হয়, তখন তিনি স্বয়ং নেমে এসে যুগোপযোগী নূতন order স্থাপন করেন—সে কথা চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। সাধারণতঃ জগতের নিত্যনৈমিত্তিক routine কাজ, এই procedure অনুযায়ী চলে যায় বলে, ঈশ্বর চেতনা উর্ধ্বমুখী জীবন গড়তে অবকাশ পায়। তাই দেখা যায় প্রকৃত মানুষদের দেহ বা প্রাণের কর্মে অস্পষ্ট চেষ্টা খরচ হয়। তার মানে কিন্তু তাঁরা শরীরকে অবজ্ঞা করে না—বরং একটা সহজ স্বচ্ছন্দ routine

মেনে চলে। চিন্তাশক্তিকে মনোময় কোষের পুষ্টি ও শক্তি সাধনান্তে অতি-মানস বিজ্ঞান ও আনন্দময় ক্ষেত্রের জন্য প্রসারিত করে দেয়। অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি যেন ঈশ্বরের programmed instructions, আমাদের মন-বুদ্ধি-চিন্তা-অহঙ্কার রূপ computer অবলম্বনে কাজ করে চলেছে। যেমন alarm ঘড়িকে alarm দিয়ে রাখলে ঘড়িটা জড় হলেও চেতনাসম্পন্ন জীবের মতন সময় হলে বেজে উঠে। যেমন refrigerator এর thermostat নির্মাতার সঙ্কল্প অনুযায়ী motor কে ক্রমান্বয়ে একবার on এবং পরে off করে চলে বুদ্ধিমান ভূতোর মতন। তেমনি আমাদের মন বুদ্ধি সবই কাজ করে চলেছে ঐশ্বরিক সঙ্কল্পে mechanically। অথচ এই দু’পক্ষসার জীব-বুদ্ধি নিয়েই আমরা লাফালাফি করি, অহংকারে ক্ষীণ হই। যার design ও শক্তিতে আমাদের এই জীবনের যন্ত্র চলছে, তাঁর দিকে তাকাই না। যে কতিপয় ভাগ্যবান ভক্ত ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় ঈশ্বর প্রার্থী হয়, তারা সকলেই অনুভব করে ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’। এই অনুভবই ক্রমশঃ অন্তর্যামী যন্ত্রীর সঙ্গে একাত্মত্বে উপনীত করে অপরা প্রকৃতির উর্ধ্ব বা অন্তরে পুরুষোত্তমের পরমা প্রকৃতির আলোতে ভরিয়ে দেয়। তখন জীবনে আনন্দ আর মরণে পরমা শান্তি।

আর এক প্রত্যয়

গৌতমকুমার মণ্ডল

উজ্জ্বল একমুঠো অঞ্জলী থেকে—
সাদা পায়রা উড়তে যায়,—
আমাদের ভালবাসার বিচিত্র রঙিন ফুলগুলি
এ সময়ে ফুটে উঠতে উঠতে ক্রমশঃ
কেমন কুণ্ঠিত হয়ে যেন
আকাশের বিরোট স্বাচাই করে।
উজ্জ্বল পায়রা উড়তে চায়;
নীলসীম নীলমাকে—
আনন্দ আর ভালবাসার হাওয়া দিয়ে।
কিন্তু ডানা তাদের ভারী—
কাঁকলী বেষণানে প্রত্যয়কে আহ্বান করেছিল;
প্রথম সূর্যালোক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সে দিনটিরই শেষ স্নিগ্ধতার গা ভাসিয়ে দিতে।

এখন ডানা ভারী হয়ে আসছে
কারণ পশ্চিমের আকাশ রাঙা, রক্তের
আভর্ষক।
আর সেই পশ্চিমের বাসিন্দারা—
ধবলশূন্য ডানাগুলি মুচড়ে ডাঙবে বলে—
উন্মত্ত হিংস্রতার বন্ধ পরিকর।
তবু উড়বেই প্রসন্ন ধবল কপোতগুলি—
অসংখ্য অঞ্জলী থেকে—
রক্তের আপ্যনা আঁকা হয় হোক,
তবু আজ আর এক কঠিন প্রত্যয় বুকে আমাদের
বিরোট এই নীড়ে একদিন শান্তি তারা আনবেই।

শৃঙ্গার বা মন্থথেকে নিয়ে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

ভারত নামে ভূখণ্ডের অধিবাসিদের পরিচয় বহুকাল থেকেই পরিবর্তিত হয়ে আসছে, হয়তো আর্য আর দ্রাবিড় ছিল এক কালে, তারপর বৈদিক ; এর পর থেকেই, ধর্ম এসে তাদের বহুব্রূপে রূপান্তরিত করে চলেছে। জৈন, বৌদ্ধ তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি। সেই বহুব্রূপিতার বীজ অক্ষুরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য করার প্রেরণায় যিনি বা যারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি বা তাঁদের দেওয়া পরিচয়ই এখন চলছে “হিন্দু”। তবুও ভারতবাসী সেই হিন্দু নামের পরিচয়ে অসাহিত্য হওয়ার ভিতরে ভিতরে সেই ধর্মীয় সংজ্ঞাই অন্তঃপ্রসারী হয়ে আছে। এদিক থেকে নিরুপায় সবাই আমরা।

অপর দিক থেকে সেই আদি কাল থেকেই কিন্তু মদনের বা মন্থথের ত্রিপথ গামিত্য অব্যাহত। মদন, মন্থথ, কাম, স্মর, মনোভব, মনসিজ, কামনা প্রভৃতি কত নাম নিয়ে আদিরস, শৃঙ্গাররস, বা আদিরপুটি গ্রিথুখী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে অহরহঃ।

কেউ চেয়েছেন বা বলেছেন কামকে জয় করেই সত্যপথ, ধর্মপথ, তপস্যার পথ, ঋষিপথ, যোগপথ পাওয়া যায় বা যাবে। কিন্তু তাঁদের জীবন চরিতে দেখা যায় তা হয় নাই। তাই ব্রহ্মা পরাজিত হয়েছেন সরস্বতীর কাছে। বিষ্ণু পরাজিত হয়েছেন লক্ষ্মী সরস্বতী দুই রমনীর কাছে। শিব তপোবল বিসর্জন দিয়েছেন দুর্গার কাছে।

এরপর ইন্দ্র, যিনি ঋগ্বেদের প্রধান পুরুষ, তিনি যেমনি সোমাসক্ত তেমনি রমনীরস : ভোক্তা, অবশেষে অহল্যার উপপতি বলে চিহ্নিত। অশ্বিনীর দুই পুত্র অশ্বিনী ও রেবন্ত ; এ’রাও দেবতা, যমজ ভাই, এ’রাও পরাজিত হয়েছিলেন ‘মাদ্রীর’ কাছে ওই দুর্নিবার মদনের জন্য।

গণেশজী যিনি পরম স্ত্রানী, তিনি ও কি রেহাই পেয়েছিলেন তুলসী-কন্যা পুষ্টির কাছে? জমদগ্নি ছিলেন বিরাট শক্তির পুরুষ, তাঁর তেজস্বিতার কাহিনী বহু বিদ্রুত, কিন্তু রেণুকার মন্থথবাণ তাঁকে বিহ্বল করেছিল, এবং হার মানিয়ে ছেড়েছিল।

দখীচি মূনির খ্যাতি তো কম ছিল না, কিন্তু অলম্ব্যর রূপ যৌবন দেখে, তার গর্ভে সারস্বত নামে পুত্রের পিতা হতেই

হয়েছিল। দীর্ঘতমা ঋষি ছিলেন বাপ-কাকার ঔরস জাত সন্তান, অন্ধও হয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে প্রদেবী রমনীর প্রেম, আর শুল্ককন্যার দ্বিতীয় পক্ষীয় স্বামী হতে বাধা হয় নি। আর ইনিই তো গো-রমন করার বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছিলেন। দুর্বাশা ছিলেন তেজস্বী পুরুষ, কিন্তু ঔর্বকন্যা কন্দলীর পতিত্ব গ্রহণ করিতেই হয়েছিল। সেও তো মদনের বিজয় ঘোষণা।

অস্তগুরু দ্রোণ? তিনিও তো কুপী রমনীর পাণি গ্রহণ করে অশ্বখামার পিতা হয়েছিলেন। যিনি ছিলেন আয়ু-বেদের শল্যশালাব্য বিদ্যার প্রবর্তক যশস্তির, তাঁকেও কেতুমান পুত্রের পিতা হতে হয়েছিল, ওই মদনের শক্তি প্রসারতায়। মহামুনি পরাশর? তিনি তো পার্বাটের দাশ কন্যা সত্যবতীকে মদনের ফাঁদে আটকে কুমারী বয়সেই ষ্ঠেপায়নের মা করে ছিলেন। বশিষ্ঠ? দ্বিতীয় জীবনে অনুসূয়া, আর প্রথম জীবনটা কেটেছিল চণ্ডালরমনী অক্ষ-মালার প্রেমে। মদনেরই জয় নয় কি? আর বৃহস্পতি? তিনি মদনকে নিয়ে এত বেসামাল হয়েছিলেন যে, নিজের বৌদি মমতাকেই গ্রাস করে ভরষাজের জন্ম দিয়েছিলেন। বাজ্রবল্লভ? তিনিও তো মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নীর পতিত্ব লাভ করে সাপস্ব্য কলহে অতৃপ্ত হয়ে থাকতেন।

এমনি আখ্যানগুলি যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় বা বোঝা যায় কাম জয় করার উপদেশ যারা দিয়েছেন তাদের জীবন কিন্তু ক্ষমতের বিরোধী।

এইজন্যই হয়তো বা দীর্ঘকাল পরে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাচীন কালের বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মুক্তি বা মোক্ষ অথবা স্বর্গলাভের জন্য রমনী বা কাম “বৈজয়ই যে উৎকৃষ্ট পথ” এটা ভুল। তাতে নিজেদের চরিত্রই নিজেদের অভিমতকে খণ্ডিত করেছে।

তারা সদৃশ চিন্তে ঘোষণা করলেন—

নিবীৰ্য্য শ্রোত জাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।

সত্যাদৌ সফলা বাতু কলৌ তে মৃতকা হতাঃ (মহানিবান)
শ্রুতি বা বৈদিক কাজকর্ম একেবারে নিষ্ফল। কলিতে বৈদিক ক্রিয়া, বৈদিকমন্ত্র একেবারে নিষ্ফল। যেন বিষহীন সাপ মাত্র। সত্যযুগে সফল হতো বা না হতো কে জানে? কিন্তু এ যুগে তা মৃত।

পাণ্ডালিকা যথা ভিত্তৌ সর্বোন্ময় সমন্বিতাঃ।
 অম্ঃ অশক্তাঃ কার্বেষু তথান্যে মন্তরাশয়ঃ।
 অন্য মন্ত্রেঃ কৃতং কর্ম বক্ষ্যা জ্ঞী সংগমো যথা।
 ন তত্র ফল সিদ্ধিঃ শ্রম এবাহি কেবলম।
 কলাবন্যোদিতে মার্গেঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
 তৃষিতো হি নদী তীরে কুপং খনতি দুর্মতিঃ॥

(কুলার্ণব)

দেওয়ালে আঁকা ছবি যেমন, বৈদিক মন্ত্রও তেমনি ;
 আর বক্ষ্যা জ্ঞী যেমন জননী হয় না, বৈদিক মন্ত্রও তেমনি
 সৃষ্টি হীন। কলিতে যারা বেদের বিধি আর বৈদিক পথে
 চলতে চায়, তাদের চেষ্টাটি নদীতীরে এসেও তৃষ্ণার ব্যস্তির
 কুপ খোঁড়ার মত।

বৈদিক ঋষিদের জীবন ও আচারের প্রসঙ্গ তুলে তুলে
 বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ বহু পুরাণ রচনা করে দেখিয়ে গিয়েছেন,
 এরা কাম, ক্রোধ, লোভ জয় করে মুক্তি পাবার পথ দেখিয়ে
 ছেন, কিন্তু সে সব কথা সর্বৈব মিথ্যা। কাম সদা জাগ্রতঃ,
 আর ক্রোধ লোভও নিদ্রিত নয়। তাদিকে দমন করা সম্ভবই
 নয়, বরং তাদের সঙ্গে মিলে মিশে চললে, মোক্ষ বা মুক্তির
 পথ সুগম্য হয়, আর প্রাপ্তব্য বস্তুও সুলভ্য সুনিশ্চিত।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েষু জাগতি মদনঃ সদা।
 ক্রোধ লোভাদয়ঃ সর্বৈ পবিত্র কাম-গামিনঃ॥

(কুলার্ণব)

অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে কাম সর্বদাই জাগ্রত হয়ে আছে।
 তাকে জয় করার কথা যারা বলে, তারা মুর্থ। সেই পবিত্র
 কামেরই আনুগত্য করে চলেছে, ক্রোধাদি দেহবৃত্তিরা।

মুক্তি মার্গের বা, স্বর্গলাভের শর্টকাট পথ রমনী আর
 মদ্য সেবন। তবে যাঁরা আচার সর্বস্ব হয়ে থাকতে ভাল-
 বাসেন, তাঁরা এই ৭টি আচারে থাকবেন। কিন্তু কাম ক্রোধ
 ছেড়ে ছুড়ে ভণ্ড হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, কৌলাচার
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আচার নেই।

আচারাঃ সপ্তমা, বেদো, বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মতম্।

বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাং দক্ষিণমুত্তমম্।

দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাং সিদ্ধান্তমুত্তমম্।

সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাং পরতরং নহি।

(কুলার্ণব। ৫ম)

কৌলাচারে কোন নিয়ম নেই। স্থান, অস্থান, কাল,
 অকাল বলে কিছু নেই। "কর্ম, অকর্ম বলেও কিছু নেই।
 দিব্ কাল নিয়মো নাস্তি তিথ্যাদি নিয়মোন চ।
 নিয়মোনাস্তি দে বৈশি। মহামন্ত্রস্য সাধনে।

(নিত্যাতন্ত্র)

কৌলাচারই সহজিয়া পথ। মদ্য মাংস, সুরা, নারী, ধ্বংসা
 এগুলি বিসর্জন দেবার কি যুক্তি? কিংবা প্রাণী কেবা মনুষ্য,
 সকলেরই তো অনুকূল—

মদ্যং মাংসং চ মৎস্যং চ মূদ্রা মৈথুন মেব চ।

মকার পঞ্চকং চৈব ভোগ মোক্ষ প্রদায়কম্।

(শ্যামা রহস্য)

জগৎটাই যখন শক্তি ও শক্তিমানের মিলন ক্ষেত্র, তখন
 কাকে ত্যাগ কাকে গ্রহণ করার মুখ কল্পনা শোভা পায়?
 সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তয়োহি মেঘানাং জগৎ।
 তয়োরেক্যং সমুৎপন্নং তাজ্যং বা গ্রহণং কৃতং॥

(কুলার্ণব)

মুখ্যরই কেবল জ্ঞাত, গোত্র, পূজ্য, অপূজ্যবোধে মানুষকে
 প্রভাবিত করে আসছে। এদিকে ঠেলে না ফেলে গ্রহণ করে
 দেখ, এরাই তো শক্তি সঞ্চার করে আসছে—

নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।

ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপাল কন্যাকা।

মালাকারস্য কন্যা চ সর্বৈ চ সৃষ্টি শক্তিদা।

পূজ্যাপূজ্য কথং বাচ্যা সর্বাএব কুলাঙ্গনা।

পূজনীয়া প্রযশ্চেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেৎ ধুবম্॥

মোহাৎ দম্ভাৎ বৃথা তে চ লোকানাং বঞ্চকাঃ ধুবম্।

(গুপ্ত সাধনতন্ত্র/১ম পটল)

এরপর তান্ত্রিকগণ পুরুষ রমনীর মিলন বিষয়ে মদনকেই
 একমাত্র প্রাণপুরুষ বলে ব্যাখ্যা করেছেন, এবং এ ব্যাখ্যাটি
 তাঁরা "জ্ঞাত সাধন" ও গুপ্ত সাধনে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা, মূদ্রা
 প্রয়োগের মাধ্যমে উপন্যস্ত করেছেন। অতএব মদনের
 অসাধারণ শক্তিই সর্ব প্রকার সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে সূচক
 আছে। এ তথ্যকে গোপন করতে যাওয়া দমন করে মুক্তির
 পথ পাওয়ার কথা যাঁরা বলবেন, তাঁদের সামনেই তুলে ধরার
 উপদেশ ঐ বৈদিক ঋষিদের চরিত্র দেখিয়ে দিতে হবে।

অতএব কাম ক্রোধ বিসর্জন দিয়ে যে কোন পথ দেখানর
 নামই মিথ্যাচার। তান্ত্রিকদের এই উপলব্ধির, ওই সিদ্ধান্ত

গুলি এককালে ভারতের সমাজে কতখানি কার্যকর হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ খাজুরাহো মন্দির, পুরীর জগন্নাথের মন্দির এবং অন্যান্য সাধকদের তপোমন্দিরের গায়ে আজও খোদিত।

তথাপি ভারতীয় সমাজে, তান্ত্রিকদের সাম্যবাদের মিলন-ক্ষেত্রে যে মদন, এটা ব্যাপক হয়ে কার্যকর হয়নি। বিশেষ সাধনরহস্যেরই অন্তর্গত হয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধক গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে যায়, যা পরবর্তী সময়ে একেবারে কোনঠাসা হয়ে থাকে। তবে তন্ত্র সাধনার মধ্যে যেগুলি বৈদিকাচার, বৈষ্ণবাচার, সিন্ধাস্ত্রাচার নামে আশ্রয়গুণ হয়েছিল সেইগুলি জনসাধারণের মধ্যে বেশ প্রসার লাভ করে। যার জন্য আজও আমরা মঠে মন্দিরে হংস, পরমহংস, ঠাকুর প্রভৃতি আখ্যায় চিহ্নিত পুরুষদের আশ্রমে যাতায়াত করি এবং সব জাতিপাতি ভুলে প্রসাদ নামে তন্ত্র ব্যঞ্জনাদির ভোগ উৎসবে মাতামাতি করে থাকি। আসলে তন্ত্রশাস্ত্রের সেই মদন বিজয়েরই এটি দ্বিতীয় স্তর।

তৃতীয় স্তরে এসেছে মদনের সাহিত্যশিল্প সত্তার রূপ। পরবর্তী পুরাণকারগণই সাহিত্যশিল্পকলার মধ্যে মদনকে নানান অলংকার, নানান রীতি, নানান ছন্দের মাধ্যমে এনে তার অনন্ত বিভূতি দেখিয়েছেন। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির মত মহাকাব্যগুলিতে তার অঙ্গপ্র নমুনা রেখেছেন। নমুনাগুলির সংখ্যাও অগুণিত। একটি মাত্র পুরাণ থেকে মদনশিল্পের উদাহরণ তুলে ধরিছি—এটি আছে মৎস্য পুরাণের ২০৮ অধ্যায়ে। প্রসঙ্গটি আছে সাবিদ্রী উপাখ্যানে। তখনও সত্যবান জীবিত, এবং বনে সাবিদ্রীসহ কাঠ আহরণে ব্যাপ্ত। সেটা বসন্ত ঋতুর সময়। সত্যবান সেই বনে বসন্তের সঙ্গার, আর বনবাসী প্রাণীকুলের মধ্যেও যে অব্যক্ত মদনসঙ্গারের রূপ প্রকটিত হয়েছে, সেটি নিজে যেমন অনুভব করছেন, তেমনি অনুভব করতে চাচ্ছেন সাবিদ্রীর হৃদয়ে। যার অনুষ্ঠান অব্যক্ত—

দ্যাখ দ্যাখ সাবিদ্রী, কোমল তৃণমণ্ডিত এই নির্জন বনের শোভা, এটা বসন্ত ঋতু কিনা, তাই, ওই দেশ সহকার-বৃক্ষের নব মুকুলের কি মনোহর গন্ধের সঙ্গে তার বিকাশ, এতো মদনেরই উদ্ভূত বিকাশ—

বনেহস্মিন্ শাখলাকীর্ণে সহকারং মনোহরম্।

নেদ্র ঘ্রান সুখং পশ্য বসন্তং রতি বধ'নম্॥

ওই দ্যাখ, কামী ভ্রমর গুঞ্জন করতে করতে ফুলের রেণুমাখা প্রিয় ভ্রমরীর পিছনে পিছনে ফুলের পর ফুলে গিয়ে বসছে।

আরও দেখ, এ বনে তো কত রকমের ফুলই আছে, কিন্তু যুবক ওই কোকিলটি একটি আমার মঞ্জরী নিয়ে কান্তার অভাবে নিজেই নিজেকে ভোগ করছে। আরও দ্যাখ, গাছের উপরের ডালে নতুন সন্তানের মা কাকী হয়তো বা শাবকটিকে আড়াল করে কার পানে চেয়েছিল, এমন সময় কাক এসেছে, চম্পুর ভোগায় কি যেন এনে ওকে অর্পণ করে, ঠোঁঠ দুটি দিয়ে আপ্যায়ণ করছে।

আরও দ্যাখ, কপিঞ্জল পাখীটির আচরণ, মাটিতে নেমে প্রিয়র গায়ে গায়ে ডানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেবলই যাতায়াত করছে, কিছু খেতেও সময় পাচ্ছে না, যদি এখুনি প্রিয়র অন্তরঙ্গ সঙ্গ পাই।

সাবিদ্রী! দেখছো! চড়াই পাখী তার বোঁ-এর বুকে বার বার উঠছে নামছে আর অপরের দিকে চেয়ে চেয়ে তাদের মনেও কিসের শিহরণ জাগাচ্ছে?

আবার শূকপাখীর কাণ্ডটা দ্যাখ, বোঁকে নিয়ে একটি শাখায় কেমন বসেছে, ডালটি নুয়ে পড়েছে আর মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি দুটি ফলের ভারে নুয়ে গেছে ডালটি।

ঐ দ্যাখ সাবিদ্রী! মাংসের ভরপুর আশ্বাদ পেয়ে বোঁকে নিয়ে সিঁহ কেমন জড়াজড়ি করে শুষে আছে। আবার বাঘ দম্পতির গাভীর্ষ কেমন দেখছে? গুহায় দুটিতে শুষে আছে, চোখগুলি তাদের জল জল করছে।

ঐ যে ওদিকে দ্যাখ! চিত্রেবায় আর বাঘিনীকে। কত কত আদর করে গৃহিনীকে বার বার তার মুখখানি, গাটি চেটে চেটে খুসী করছে। বাঘিনীও তার পাণ্টা জবাব কেমন দিচ্ছে।

আবার বানরীর দিকে চেয়ে দ্যাখ, গৃহিনীর কোলে মাথা রেখে বানরটি ঘুমিয়েছে, আর বোঁটি তার গায়ে মাথায় উকুন বেছে দিচ্ছে।

ঐ যে, বিড়ালীকে দেখছো, কেমন করছে? মাটিতে শুষে পড়ে হুটোপুটি করছে, আর নিজের পেটটি কতকো দেখাচ্ছে। কি বিচিত্র, কতাবিড়ালও তাকে নখের দাঁতের কামড় দিচ্ছে আলতো করে। ব্যথা লাগছে না তো?

খরগোস দুটির কাণ দেখছো, গর্তের মধ্যে কর্তা গিম্বী
এমন জাপটে শুষে আছে যে, ওদের কাণদুটি দেখা যাচ্ছে
বলেই চিনতে পাচ্ছি।

হায় হায়! হাড়ির কি দুর্দশা, পদ্মের মৃণাল এনে
শুড়েই ধরে আছে, প্রিয়াকে খুঁজে পাচ্ছে না। সত্যি,
হস্তিনীর কি নিষ্ঠুরতা, আসছে না কেন?

কি বিচিত্র মদনের শিহরণ, বরাহগৃহিনী শিশুদের
নিয়ে ষেতে ষেতে কর্তাবরাহ এগিয়ে পড়েছে, কি আর
করে বেচারা, নিজেই মৃধাগুলি তুলে তুলে খাচ্ছে আর
প্রিয়তমের দিকে চেয়ে থাকছে।

আবার মহিমের কাণ দেখছো! গায়ে কাদা মেখে
বোঁ-এর পিছনে ছুটেছে। ওগো সাবিদ্রী! তোমার আমার
পানে চেয়ে আছে দেখছো হরিণটিকে! গৃহিনী হরিণীও
মৃদুপদসঙ্গারে এসে প্রিয়তমের পিছনটি কেমন শিৎ দিলে
ধীরে ধীরে আঁচড়ে দিচ্ছে!

ওই দূরে চেয়ে দ্যাখ চমরী গাইটিকে, চলতে চলতে
থেমে গিয়েছে, কর্তা চমর এসে কেমন গর্ব-হুঙ্কার ছাড়ছে।
সাবিদ্রী! এতো মদনের আগমনে বসন্তসখারই কাজ,
নাকি বল? আর তোমার আমার?.....

মধু মস্তালি ঋষ্কার ব্যাজেন বরবাঁগনী।

চাপাক্ষিঃ করোতীতি কামঃ পাশ্বে জিঘাংসয়া।

ফলাদ্বাদলদবন্তঃ পুঙ্খকিকল নাদিতা।

বিভাতি চারুতিলকা স্বমি বৈবা বনমূলী।

কোকিলশব্দ শিখরে মঞ্জরী রেণু পিষ্টারঃ।

গদিতৈ ব্যক্ততাং যাতি কুলীন শ্বেতৈ তৈরিব

পুষ্প রেণু বিলিপ্তাঙ্গীং প্রিয়ামনু সরিদ্ বনে।

কুসুমং কুসুমং যাতি কুজন্ কামী শিল্পীমুখঃ।

মঞ্জরী সহকারস্য কান্তাবৎ চাগ্রপীড়িতাম্।

ঈদতে বহু পুষ্পেহপি পুঙ্খকিকল যুবাবনে।

কাকঃ প্রসুতাং বৃদ্ধাঘ্নে স্বামেকাগ্রণ চক্ষুনা।

কাকীং সম্ভাষয়তোষ পুষ্পাচ্ছাদিত পুটিকাম্॥

শুভাঙ্গনিম্নমাসাদ্য দমিতা সহিতৌ যুবা।

নাহারমপি চাদন্তে কামাক্রান্তঃ কপিঞ্জলঃ॥

কলবিৎকল্লু রময়ন্ প্রিয়োৎসংগং সমাপ্রিতঃ।

মুহুমুহু বিশালাক্ষি! উৎকণ্ঠসি কামিনঃ॥

বৃক্ষশাখাং সমাবৃত্ত শূকোহয়ং সহভাষ্যয়া।

করেণ লম্বয়ন শাখাং করোতি সকলং শিরঃ॥

বনেহ পিশিতা-স্বাদ ভূপ্তা নিদ্রামুপাগতঃ।

শে তে সিংহ যুবা কান্তা চরণান্তর গামিনী॥

ব্যান্ময়োর্মিধুনং পশ্য শৈল কন্দর সংস্থিতম্।

যয়োর্নেত্র প্রভালোকে গৃহা ভিম্বেব লক্ষ্যতে॥

অয়ং দ্বীপী প্রিয়াং লেচি জিহ্বাগ্রণ পুনঃ পুনঃ।

প্রীতি মায়াদি চ তন্মালিহা মানঃ স্বকান্তয়া॥

এই কাম বা মদনই তো প্রাণীকুলের বা মানবকুলের
মধ্যে সপ্রীতি সংঘর্ষ ঘটায়, আবার প্রীতিই প্রেমের সংজ্ঞা
নেত্র আরও গাঢ় রূপে। প্রীতি বা প্রেমের ভিত্তি য়সানুভূতি।
সেই অনুভূতি নিয়েই সাহিত্যের রসশিপ্পের সমাবেশ।
মহাকবিবৃন্দ এই তথ্যই আজও প্রচার করে চলেছেন।
মদনের অবদমনও কাজের কথা নয়, মদনের প্রযুক্তিকে
ঝটিকাকূহেলী বা ব্যাভিচারের অন্তর্গত করাও ঠিক না। মদন
বা শৃঙ্গাররস বিভক্তিবহুল জীবনকে সমাধিত করে। স্বন্যা-
লোক ও লোচনকার এই কথাটিই অনন্তকালের জন্য আবেদন
করে রেখেছেন—

শৃঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহ্লাদনো রসঃ।

তন্ময়ং কাব্যমাপ্রিত্য মধুর্ধ্যং প্রতিতিষ্ঠতি॥

লোচনকারও তাই বলেছেন, “শৃঙ্গার এব পরমো মনঃ
প্রহ্লাদনো রসঃ”

বিশ্বটাকেই মধুময় করে তোলে শৃঙ্গার বা মদন।

পিপীলিকা ও গঙ্গাফড়িং

শ্রীমাদীস দে

শৈশবে আমাকে কিছু হিতোপদেশের গল্প মুখস্থ করানো হয়েছিল। প্রতিটি গল্পের শেষে থাকত একটি মরাল। সেটিও সব্যাক্ষা মুখস্থ করানো হত।

তার মধ্যে একটি গল্পের নাম ছিল পিপীলিকা ও গঙ্গাফড়িং।

গল্পটি হল :

পিপীলিকারা সারা গ্রীষ্মকালটাই অক্রান্ত পরিভ্রম করে শীতকালের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে। আর গঙ্গাফড়িং ও সময়টা ঘাসের শিবে, ফুলে ফুলে নেচে গেয়ে ফুটিত করে বেড়ায়। তারপর শীতকাল এলেই ভিক্ষাপাত্র হাতে পিপীলিকার দোরে ধর্ণা দিয়ে তার সিংগিত খাদ্য ভাণ্ডার থেকে কিছু খাদ্য ভিক্ষা করে করুণ মুখে। তখন পিপীপড়ে তাকে সেই পরম সত্য বাণীটি শুনিয়ে দেয় : এই পৃথিবীতে পরিভ্রমরীরাই হয় পুরস্কৃত, আর অলসেরা হয় দিকৃত। ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেন।

তিরস্কৃত হয়েও গঙ্গাফড়িং দাঁড়িয়ে থাকে করুণ মুখে।

—সারা গ্রীষ্মকালটা তুমি কি করেছিলে? কৈফিয়ৎ চায় পিপীপড়ে।

—আমি কেবল গান গেয়েছি।

—কেবল গান গেয়েছ। মুখ ভেংচে বলে পিপীলিকা।

—তবে যাও এবার একটু নাচো গিয়ে। ফুঁটিবাচ্ছ আলসেদের প্রতি আমার বিস্মুদ্র সহানুভূতি নেই।

এই গল্পের মরালটা আমি সেই শৈশব থেকেই পুরোপুরি সত্য বলে মনে নিতে পারিনি। আমার একান্ত পক্ষপাত ছিল ঐ হেসেখেলো নেচেগেয়ে বেড়ানো গঙ্গাফড়িং-এর উপরই, আর একটা আক্রোশ সৃষ্টি হয়েছিল সদা পরিভ্রমী পিপীলিকার উপর। তখন ফড়িং-এর সঙ্গে আমিও নেচেছি, খেলেছি, আর পিপীপড়ে দেখলেই পায়ের চাপে পিষে মেরেছি। এই ভাবেই আমার বালসুলভ বিজ্ঞতা দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি ঐ নীতি বাক্যটির বিরুদ্ধে।

আজ আমার এই পরিণত বয়সেও সোদিন যখন বাসুদেব বাবুকে পাঁচমাথার মোড়ের একটা রেস্টোরাঁয় অত্যন্ত বিরসমুখে বসে ভেজিটেবল চপ্ সহযোগে অন্যমনস্কভাবে

চা খেতে দেখলাম, তখন অনিবার্যভাবে ঐ গল্পটাই মনে পড়ে গেল, এবং ওঁর মুখ দেখেই বুঝলাম আমার সেই শৈশবের সিদ্ধান্তটাই ছিল অদ্রাস্ত। এ সংসারে পিপীলিকারা পুরস্কৃত হয় না, তারা পাদপিষ্ট হয়েই মরে। আর গঙ্গাফড়িংরাই...।

আমার এই সিদ্ধান্তে আসার আগে অবশ্য বাসুদেববাবুর একটু পরিচয় আবশ্যিক।

এমন অল্পত বিবরণতা আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি ওঁর মুখে। উনি খেতে খেতে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। চোখের কোলে ঘন কালী পড়েছে। মানুষটি আমার সমবয়সী। এক পাড়ায় দীর্ঘদিন বসবাস করছি। ওঁর পারিবারিক খবর মোটামুটি সবই জানি আমি। দুজনেই পণ্ডাশ পেরিয়েছি, সংসারের বন্ধনও বেড়েছে। আজকাল আর আগের মত ঘন ঘন দেখাশুনা হয় না। ওঁকে শেষ দেখেছিলাম বোধহয় মাসখানেক আগে। এই একমাস সময়ের মধ্যে যেন উনি দশ বছর বুড়িয়ে গেছেন। টাকের বিস্তার আর কেশের শূদ্রতা অনেক বেড়ে গেছে। গাত্রচর্মে প্রচুর কুণ্ডন আর কপাল ও গণ্ডদেশে গভীর বলীরেখা। একটি দুঃখী মানুষ। দেখে আমারও খুব দুঃখ হল। বুঝলাম ওঁর এই দুঃখের কারণ ওঁর সেই বাউঙুলে ভাইটা। আবার একটা অপকন্ধ্যা করেছে নিশ্চয়।

আমি নিঃশব্দে ওঁর কাছে গেলাম। সম্মুখে কাঁধে হাত রেখে বললাম,—কেমন আছেন বাসুদেব বাবু?

—খুব সুখে নেই ভাই। ভারী গলায় বলেন বাসুদেব বাবু।

—সুকুটা বুঝি আবার কোন...

—ধরেছেন ঠিকই। দীর্ঘকাল ফেলে বলেন বাসুদেব বাবু।

—ওঁকে ছোট্টে দিচ্ছেন না কেন বলুন তো? সংসারে ছোট্টভাই-এর জন্য বড়ভাই যা করতে পারে, সবই তো করেছেন আপনি। এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝেছেন ওটা কোন কন্মের নয়। একেবারে অপদার্থ।

বাসুদেব বাবুর সেই অপদার্থ ছোট ভাইটার নাম সুকান্ত।

এতকাল তো দেখছি দুনিয়াটাকে। আমার মনে হয় প্রতিটি পরিবারেই অস্তুত একজন অপদার্থ উদ্ভবক থাকে। সুকান্ত হল বাসুদেব বাবুর পরিবারের সেই অপদার্থটি। বয়সে সে দাদার থেকে পাঁচ বছরের ছোট।

জীবনের আরম্ভটা সে ভালই করেছিল। লেখাপড়া শিখে ব্যবসা শুরু করল। তারপর বিয়ে করল। দুটো ছেলেমেয়েও হল। ওদের পরিবারটা বেশ সম্মানিত। সকলেই বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমরা আশা করেছিলাম সুকান্তও একদিন একটা গণ্যমান্য মানুষ হয়ে উঠবে। কিন্তু হঠাৎই একদিন ও বলে বসল, কাজকর্ম ওর ভাল লাগে না। বিয়ে করাটা ওর ঠিক হয়নি। সংসার-বন্ধন ওর জন্য নয়। ও স্বাধীনভাবে জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়।

কারও সদুপদেশ কানে নিল না সুকান্ত। সংসার ছাড়ল। ব্যবসা ছাড়ল। সামান্য যা সঞ্চয় ছিল তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশ যাত্রায় জীবনটাকে উপভোগ করতে। সেই থেকে গত পনের বোল বছর ধরে বাসুদেব বাবুকে ও সমানে জ্বালাতন করেছে।

নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রথম দুটো বছর সুকান্ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়ে দিল নানা দেশ দেশান্তরে ঘুরে ফিরে। মাঝে মাঝে ওর জীবন যাপনের কিছু কিছু খবর আসত। সে খবর শুনে সকলেই মর্মাহত হত লজ্জায় অপমানে। আমরা ভাবতাম ওর পকেট এখন শূন্য হয়ে যাবে তখন ও করবে কি?

সে খবরও পাওয়া গেল এক সময়। তখন নাকি সুকান্ত দুহাতে ঋণ করছে যার-তার কাছে। সে অপরি-নামদর্শী হঠকারী হলেও তার চেহারাটা যেমন সুন্দর, ব্যবহারটিও তেমন মিষ্টি। এদিক থেকে তার নামটা সার্থক। সে কারও কাছে হাত পাতলে এড়িয়ে যাওয়া অসাধ্য। বন্ধু ভাগ্যটা তার বরাবরই ভাল। বন্ধুত্ব স্থাপন করতেও সে পাকা ওস্তাদ। তাই বন্ধুদের পকেটের ভার কমিয়ে সে এখন নিজের পকেট ভারী করে যাচ্ছে নিয়মিত?

সুকান্তর জীবন-নীতি হল,—সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে টাকা খরচ করাটা বিরস্তিকর। বিলাসের জন্য

টাকা খরচ করাইতো যথার্থ আনন্দ। এই আনন্দের যোগানদার রূপে একজন নির্ভরযোগ্য দাদা থাকলেই হল। সেই দাদাটি হলেন বাসুদেব বাবু।

বাসুদেব বাবু মানুষটি হলেন গুরুগম্ভীর স্বভাবের। লঘু আনন্দের লোভে আকৃষ্ট হননি কোনদিন। তবু সুকান্ত যখন মাঝে মাঝে খালি হাতে ঘরে ফিরে এসে ভাল-ভাবে জীবনযাপন করবার জন্য দাদার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করত, তখন সাময়িক দুর্বলতাবশত কয়েকবার তাকে বেশ মোটা টাকা দিয়েছেন নতুন করে ব্যবসা শুরু করবার জন্য। টাকাটা হাতে পেয়েই সুকান্ত প্রথমে কিনেছে একখানা মোটরগাড়ি, তারপর কিছু দামী অলঙ্কার। তাহলে কি ও অলঙ্কারের ব্যবসা করবে এবার? না, তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নতুন গাড়ি নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ল ফুর্তি করতে। অলঙ্কারগুলি বিভিন্ন পণ্য রমণীর পদতলে খুইয়ে ফেলল উপচার দিয়ে।

শেষপর্যন্ত বাসুদেব বাবু যখন বুঝলেন যে সুকান্তর সংশোধনের আর আশা নেই, তখন উনি হাত গুটোলেন।

তাতেই কি রেহাই আছে? সুকান্ত মুখে কোন কথা বলল না, কিন্তু দাদাকে ব্রাকমেইল করতে শুরু করল। ছোটভাই একটা রেস্টোরাণ্ট বয়-এর কাজ করছে, অথবা করছে ট্যাক্সি ড্রাইভারী এ দৃশ্য দেখলে কেন মানী ব্যক্তির না লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যায়?

—কেন দাদা, ড্রাইভারের কাজ বা বয়ের কাজ আমি তো বেশ সম্মানজনক মনে করি। তবে তোমার যদি এতে অসম্মান বোধ হয়, তাহলে বরং হাজার পাঁচেক টাকাই দাও। আমি এ কাজ ছেড়ে দেব।

অগত্যা পরিবারের মর্খাদা রক্ষার্থে টাকাটা দিতেই হয়।

একবার তো সুকান্তর জেলে যাবারই উপক্রম হল। শেষপর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেবার ওকে জেলের দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনেন বাসুদেব বাবু।

ব্যাপারটা হল,—সুকান্ত ওর এক বন্ধুকে প্রতারণা করেছিল। বন্ধুটিতো ক্ষেপে আগুন। সে ওর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কোর্টে মামলা উঠবার আগেই অনেক

ঘুম-ধাস দিয়ে অনেক উর্কিলের দোরে ধর্ণা দিয়ে ব্যাপারটা আপস করে ফেললেন বাসুদেব বাবু। প্রচুর টাকা খেসারত দিতে হল সেই বন্ধুটিকে।

টাকাটা হাতে পেয়ে বাসুদেব বাবুর আড়ালে দুই বন্ধু প্রাণভরে হেসে নিল খানিক। তারপর একটা গাড়ি রিজার্ভ করে দুই বন্ধু বিলাসভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল পুরো একমাসের প্রোগ্রাম করে।

এমনি করেই গত পনেরটা বছর ধরে সুস্বাস্ত দাদার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে রেস খেলেছে, জুয়া খেলেছে, নেশা করেছে আর সাজগোজ করেছে যেন এক রাজপুত্র। বয়স যদিও তখন তার প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিন্তু দেখাত যেন পঁয়ত্রিশও হয়নি।

ওর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে যে অপদার্থ জেনেও ওকে ভালবাসতে হয়। ভালবাসতে হয় ওর প্রাণখোলা আমুদে স্বভাবের জন্য, ওর বন্ধুপ্রীতির জন্য আর ওর অসাধারণ আত্মনৈপুণ্যের জন্য।

ওর বন্ধু সংখ্যাও বিপুল। তার মধ্যে আমিও একজন। মাঝে মাঝে আমিও ওকে কিছু কিছু দিয়েছি। অবশ্য কখনও দু'একশ টাকার বেশি নয়। তা নিয়ে আমার কখনও আপসোসও হয়নি। একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

সুকান্ত থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড় বাসুদেব বাবুকে দেখায় যেন ষাট বছরের এক বুড়ো। জীবনে কখনও বছরে বার দিনের বেশি ছুটি নেননি। একদিনও অফিসে লেট হননি। এইভাবেই পঁচিশ বছর চাকরি হয়ে গেল।

স্ত্রী প্রতি বাসুদেব বাবু সারাজীবন একনিষ্ঠ থেকেছেন। ওর চারটি পুত্রকন্যা ওকে জগতের শ্রেষ্ঠ পিতা বলে মনে করে। উপার্জনের একতৃতীয়াংশ উনি নিয়মিত সঞ্চয় করেন। পঞ্চাশতে অবসর নিয়ে গ্রামাণ্ডলে একটা বাড়ি কিনবেন, কিছু ধানীজমি কিনবেন, ফুল ফলের বাগান করবেন, চাষ-বাস করবেন, হাঁস মোরগ পুষবেন এবং শেষ জীবনটা সুখেচ্ছন্দে কাটাবেন। এই ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

এই সুপারিকল্পিত জীবনের খুসী-খুসী স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন বাসুদেব বাবু বলেছিলেন,—সুকুটা ছোট-কালে দেখতে খুব সুন্দর ছিল ঠিকই, কিন্তু আর পাঁচ বছর পরে ওর বয়সওতো পঞ্চাশ হবে। তখন জীবনটাকে আজকের মত রঙিন মনে হবে না, আর আমি তখন প্রায় তিন লাখ টাকার মালিক হব রিটায়ার করে। ওকে তো

তখন গান্ডায় পড়তে হবে। তখন বুঝবে শ্রমেই সুখ, না আলসেমীতে সুখ।

সেদিন বাসুদেব বাবুর চোখেমুখে যে সুখী-সুখী রঙটা দেখেছিলাম, আজ সে রঙের উপর যেন সাতপোচ কালী পড়ে গেছে। ওঁর প্রতি আমার করুণা হল। ওঁর ওপর ভর করে সুকান্তর বিলাসী আর চালিমাতী জীবনটা ভেবে আমারই দারুণ ঘৃণা হল সুকান্তর উপর। উনি তো মর্মান্তিক হবেনই।

—এবার কি কাণ্ড করেছে ও জানেন? হঠাৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে কথা কয়ে উঠলেন বাসুদেব বাবু।

আরও সাক্ষাতিক কোন চালিমাতীর খবর শুনতে আমি প্রস্তুত হলাম।

ওঁর যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। অতি কষ্টে আবেগ দমন করে ভারী গলায় বললেন,—আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে আমি সারাজীবন সংপথে চলেছি, সম্মানিত জীবনযাপন করেছি, কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং সর্বাস্থায় অকপট থেকেছি। বরাবর পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী জীবন যাপন করে আমি কি অবসর নেবার পর বাকী জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাবার আশা করতে পারি না?

—অবশ্য।

—কিন্তু কি হয়েছে জানেন? বাসুদেব বাবুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।

—কী ব্যাপার?

—কিছুদিন আগে ওর মায়ের বয়সী এক বৃদ্ধা বিধবাকে বিয়ে করে বসল। বিয়ের মাসখানেক পরেই বুড়ী মারা গেল আর তার বিপুল সম্পত্তি পেয়ে গেল সুকু। পঞ্চাশ লাখ টাকা, বালিগঞ্জে একটা মস্ত চারতলা বাড়ি, দুখানা গাড়ি, আবার মধ্যমগ্রামে একটা বিলাসী বাগানবাড়িও।

টেবলে প্রচণ্ড ঘৃষি মেরে বাসুদেব বাবু বলেন,—এই হল ঈশ্বরের বিচার? একে বলে ন্যায় বিচার।

আমি হো হো করে হেসে পড়লাম। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না বেয়াড়া হাসিটাকে।

জানি, বাসুদেববাবু এ জীবনে আমাকে আর ক্ষমা করতে পারবেন না।

সুকান্তরা হল সেই গঙ্গাফড়িং। ওরা যে পরের উপর ভর করে নেচেগেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্যই জন্মায়। পিপীলিকার ভূমিকা নেন বাসুদেব বাবুরা।*

দশম বইমেলা

কল্যাণকুমার সামন্ত

৩০শে জানুয়ারী থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ পর্যন্ত রবীন্দ্রসদনের সামনের ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার দশম বইমেলা। এবারের প্রবর্তকের স্টলে শেষ কয়েকদিন উপস্থিত ছিলাম। প্রত্যক্ষ করলাম, বইমেলায় প্রাতি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম অনুরাগ। বইমেলা মানুষকে বইপ্রেমী করে তুলতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন পাবলিশাররা নানাভাবে স্টলকে সাজিয়ে যেমন নিজ নিজ ব্লিচের পরিচয় দেন, তেমন মেলায় আকর্ষণকেও সাধারণের কাছে আরও চিত্তাকর্ষক করে তোলেন। অবশ্য এর পেছনে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গটি ছাড়িত। আমাদের মত পাবলিশাররা একেবারে সাদামাটাভাবে স্টল সাজাতে বাধ্য হই।

নবম বইমেলায় সাথে দশম বইমেলায় মূলগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিস্তারের দিক থেকে নবম বইমেলায় এক আন্তর্জাতিক বইমেলায় রূপলাভ করেছিল। সেবার মেলা প্রাঙ্গণে মাইক্রোফোনে বার বার ঘোষণা হয়েছিল ‘এশিয়ার বৃহত্তম বইমেলা’ বলে। বহু বিদেশী পাবলিশাররা সেই মেলাতে অংশ নিয়েছিল। স্টল সাজানোর দিক থেকেও অনেক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। বেচাকেনাও সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। সেই তুলনায় এবারের দশম বইমেলা নেহাড়াই সাদামাটা। আয়তনে গতবারের অর্ধেকেরও কম। গতবার যেখানে পাঁচ শতাধিক পাবলিশার্স ও শতাধিক মিনি স্টলহোব্ডার অংশ নিয়েছিল, এবারে সেখানে ২১৬টি পাবলিশার্স ও ৪৫টি মিনি স্টল হোল্ডার অংশ নিয়েছে। অনেক পাবলিশাররা আশা করেছিল বেচাকেনা তুলে উঠবে, যেহেতু স্টল কম। কিন্তু তাদের সেই আশা অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়নি। জনসমাগমও তুলনামূলকভাবে গতবারের থেকে কম। তবে কলকাতার মানুষের কাছে বইমেলায় আকর্ষণ কমে গেছে মনে করলে ভুল হবে। প্রচারের দিক থেকে এবার যেন একটু ঘাটতি ছিল বলে মনে হয়। তবু বলা যায় শেষ দুই দিন মেলায় লোকসমাগম হ্রাসোচ্চ প্রচুর। কেনাবেচার ব্যস্ততাও ছিল যথেষ্ট। স্বনামধন্য সাহিত্যিকরাও এসেছিলেন মেলা প্রাঙ্গণে। তাঁদের পদার্পণে বইমেলায় আভিজাত্য আরও বেড়ে গিয়েছিল। মেলা প্রাঙ্গণে ‘পিয়ালসেস হলে’ বিশিষ্ট

সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়েছিল। মাইক্রোফোনে ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল, ‘আপনি আপনার প্রিয় সাহিত্যিককে সামনাসামনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে চান? আপনার প্রশ্নটি কাগজে লিখে পিয়ালসেস হলে চলে আসুন।’ আগের মত এবারেও স্টল সাজানোর জন্য ‘পাবলিশার্স এ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড’ এর পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বড় ছোট উভয় স্টলের জন্য পৃথক পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুই বিভাগে ক্রম অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

আজ থেকে কয়েকবছর আগে আমরা চিন্তাও করতে পারতাম না যে মানুষ সারিবদ্ধভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বই কিনবে। এখন কিন্তু আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি লোকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বই কিনছেন। ছাপা হয়নি এমন বই-এর জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে দিচ্ছেন হাজার হাজার লোক। প্রকাশকদের কাছে এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। অবশ্য এটা ঠিক যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেলায় আসেন বটে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকেই বই কেনেন। তবুও এই বিপুল সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন বই দেখছেন—এটাও কি কম লাভ। আবার এক শ্রেণীর ক্রেতা আছেন যারা পাল্লা দিয়ে বই কেনেন। ‘অমুকের বাড়ীতে এতগুলো নামকরা লেখকের পুরো সেট দেখে এলাম, আমাদের তো অর্ধেকগুলোও নেই। ওদের কাছে মুখ দেখানোই ভার।’ গিন্নী কতীর কাছে অভিযোগ করলেন। কতী যথারীতি গিন্নীকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, ‘বইমেলা তো এসে গেল, যে সেটগুলো নেই সেগুলো এবার নিয়ে নিও। আরও নতুন কিছু থাকলে নিয়ে ওদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে যো।’

এরকম অনেক গিন্নীরাই বইমেলায় ভীড় বাড়ান। তাঁদের বুকসেল্ফে নামদামী অনেক বই শোভা বর্ধন করে। হয়তো বেশীর ভাগ বই-এর পাতা ওপ্টানোই হয় না। পাশাপাশি অনেক বইপ্রেমী স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে পছন্দসই বই নাড়াচাড়া করে এক আখটা নেন, আর হতাশ সুরে বলেন, সাধ থাকলেও সাধ্য কুলোয় না।

‘বই কিনুন, বই পড়ুন, প্রিয়জনকে বই উপহার দিন’—ভার্ট কণ্ঠে মাইক্রোফোনে মেলা প্রাঙ্গণে এই ঘোষণা

মানুষকে সচরিত করে দিচ্ছিল—বই কেনার জন্য উৎসাহিত করছিল। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রবিবার ও ছুটির দিন বাদে বেলা ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত শিক্ষকশিক্ষিকার সাথে বিনা প্রবেশমূল্যেই মেলা প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। কলকাতার বাইরে থেকে বহু ছাত্রছাত্রী বইমেলা দেখতে এসেছিল। ছাত্রছাত্রীদের গুঞ্জে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠতো। অবশ্য আমাদের স্টলে সাজানো বই-এর সম্ভার তাদের আকর্ষণ করতে পারেনি, যদিও ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত কিছু কিছু জীবনীমূলক বই তার মধ্যে ছিল।

সাধারণত ধর্মীয় প্রহ্লাদি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই ক্রয় করতে দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও কিছু বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কিছু যুবসম্প্রদায়কে গীতার বাংলা ভাষা, বেদ উপনিষদের উপর আলোচনা বিষয়ক বই কিনতে আগ্রহী দেখা গেছে। এটা অবশ্যই আগামীদিনের অঙ্ককারে আলোকবিন্দু বলা যেতে পারে।

বইমেলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে যে অসুবিধাটা সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছি তা হচ্ছে ধূলো সমস্যা। মেলা কর্তৃপক্ষ জলের সাহায্যে ধূলোকে দমিয়ে দেবার অনেক প্রচেষ্টা নেওয়া সত্ত্বেও ধূলোর হাত থেকে আমরা রেহাই পাইনি। দীর্ঘ ৬/৭ ঘণ্টা স্টলে থাকতে গিয়ে ধূলো সমস্যাই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হয়েছে। আগামী দিনের বই মেলায় এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মেলা কর্তৃপক্ষ যদি বিবেচনা করেন আমরা বিশেষ উপকৃত হব।

মেলা কর্তৃপক্ষের একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি যাতে ভবিষ্যতে এমন ত্রুটি আর না হয়। শেষদিন অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার মেলা প্রাঙ্গণে মাইক্রোফোনে এই কথাগুলি কোন এক ঘোষিকার কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছিল, ‘প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এবং রবিবার ও ছুটির দিন বেলা ১২টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। রবিবার ও ছুটির দিন বাদে বেলা ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন প্রবেশমূল্য লাগবে না। অবশ্য তাদের সঙ্গে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকতে হবে।’ একবার নয়, বেশ কয়েকবার এই ঘোষণা করা হচ্ছিল।

কিন্তু রবিবার মেলার শেষ দিনে এই ঘোষণা করাটা কি নিরর্থক নয়? বিশেষত যে বইমেলায় একটা আন্তর্জাতিক পরিচিতি আছে?

৯ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার প্রবর্তকের স্টলে বসে রয়েছি—সঙ্গে রবিদাও (প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার সহ সম্পাদক) ছিলেন। উসকো খুসকো চেহারার এক ভদ্রলোক বগলে কিছু বই চেপে নিয়ে আমাদের স্টলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ‘বেদান্ত দর্শন’ বইটা আপনারা এখানে আছে না?—চেহারার সাথে সামঞ্জস্যহীন স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি দুই খণ্ড বেদান্তদর্শন বাড়িয়ে দিলাম তাঁর দিকে।

‘কত দাম যেন?’

‘তিরিশ টাকা—কমিশন বাদ দিয়ে সাতাশ পড়বে’, বললাম আমি।

‘বেঁধে দিন’।

রবিদা সঙ্গে সঙ্গে বই দু’খানা বেঁধে দিলেন। ভদ্রলোকের পরনে একখানা আধময়লা ছেঁড়া জামা, পায়ে জুতো নেই। অপর এক ভদ্রলোক বেদান্ত দর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ‘নিয়ে নিন মশাই, নিয়ে নিন। এত কম দামে এরকম বই আর ভবিষ্যতে পাবেন না। এই দেখুন, আমার পায়ে জুতো নেই, গায়ের জামা ছেঁড়া। তবু নিলাম। জুতো জামা পরে হবে কিন্তু বই ফুরিয়ে গেলে তো আর এই দামে পাব না।’ দ্বিতীয় ভদ্রলোক বস্তার দিকে তাকালেন। তখন তিনি বেদান্ত দর্শন বিষয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক কতকটা যেন নিরুপায় হয়ে বইটি নিলেন।

অবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম নগ্নপদে ছিন্নপোষাক পরিহিত ভদ্রলোকের দিকে। বগলে অন্যান্য স্টল থেকে কেনা অনেক বই। সামান্য কিছু কথার মধ্যে পাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে বুঝতে পারলাম। আমায় অনুরোধ করলেন সব বইগুলো দড়ি দিয়ে একসাথে বেঁধে দেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রবিদা আমার বলার অপেক্ষা না রেখে ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তারপর বই-এর বোঝাটি নিয়ে নমস্কার জানিয়ে খীরে খীরে তিনি চলে গেলেন। মনে মনে

তার উদ্দেশ্যে আমি প্রণাম করলাম। এবারকার বইমেলায় আমার কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এটাই।

বই মেলার সমাপ্তিক্ষণটিতে যেন বিষাদের ছায়া নেমে আসে। বিকেল থেকেই ভরাট গলায় মাইক্রোফোনে ঘোষণা করা হচ্ছিল, ‘আজ রাত্রি ৯টায় দশম বইমেলায় সমাপ্তি ঘটছে। সেই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা সবাই একত্রে মিলিত হতে চাই। ঠিক রাত্রি ৯টায় সবাই চলে আসুন পিরারলেস হলে’। বার বার বেশ কাব্যিক ঢঙে এই ঘোষণা করছিলেন এক ‘ভদ্রলোক’। ষ্টল ছেড়ে অবশ্য যাওয়া সম্ভব হয়নি। রাত্রি ঠিক ৯টায় ঢঙ ঢঙ করে সমাপ্তির ঘণ্টা বাজানোর সাথে সাথেই ষ্টল থেকে অনেকেই বাইরে বের হয়ে করতালির ধ্বনিতে দশম

বইমেলাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালে। শেষ সময়ের কক্ষগুলি যথারীতি সমাপন করে প্রায় রাত্রি দশটায় আমরা বিষম মনে প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেলাম। বের হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে মেলা-প্রাঙ্গণের শান্ত পরিবেশটি লক্ষ্য করলাম। কিছুক্ষণ আগেও জনসমুদ্র ছিল এখানটা—পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় জায়গাটা মুখরিত ছিল। আর এখন—প্রায় অশানের নীরবতা। সুসজ্জিত বই-এর স্টলগুলিকে হঠাৎ যেন রক্তমাংসহীন কঙ্কালের মত মনে হোলো। মনে হোলো ওরা যেন আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে। তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলাম গেটের বাইরে।

এখনো কি হয়নি সময় ?

রতীন শীল

দুর্জনেরে করিতে শাসন

করিতে ধর্মের সংস্থাপন,

যুগে যুগে হবে তোমার আগমন।

এখনো কি হয়নি সময় ?

এখনো কি মনে তব রয়েছে সংশয় ?

ধর্ম কোথায় আজ ?

অবিশ্বাস অহঙ্কার

নিত্য হেথা লুটিতেছে ধর্মের ভাণ্ডার ॥

সত্যেরে দিয়েছে বিসর্জন।

বিচারের নামে চলিতেছে হেথা ন্যায়ের প্রহসন ॥

ধরণীর মাটি রঞ্জিত হ’লো ভায়ের রক্তপাতে

বলহীন হেথা যাপিতেছে দিন অসহায় বেদনাতে ॥

ঈর্ষা দ্বেষে কলুষিত বায়ু স্বার্থের হানাহানি

হিংসা মস্ত উদ্মাদ ধরা, শোনেনা বিবেক বাণী ॥

আচ্ছন্ন করেছে চিন্তা পক্ষ শঠতার।

অস্তুর দেবতা কাঁদে হেরি অনাচার ॥

ধর্ম হেথায় নাই

তাই ত তোমায় শুধাই

এখনো কি মনে তব রয়েছে সংশয় ?

এখনো কি হয়নি সময় ?

অজ্ঞাতবাস

সরোজ দাস

এখন আমি অজ্ঞাতবাসে আছি

পিতার অবজ্ঞায় নয়

বিমাতার ঈর্ষায় নয়

পত্নীর উপেক্ষায়ও নয়

সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়

আমার এই অজ্ঞাতবাস।

আমার পুত্র, পত্নী ও অনুজ

প্রকৃত অর্থে আমার সহচর নয়।

ওদের মাঝে আমার আত্মগোপন

ভীড়ের মত নির্জনতা নেই কোথাও।

আমি মগ্ন রয়েছি নিজের স্তবে

মনের গহীন গাঙে

নিরাসক্তভাবে একান্ত নিঃসঙ্গে

সত্যের সন্ধানে।

শিম্প সমৃদ্ধ হাওড়া জেলা

বিশ্বনাথ রায়

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে হাওড়া একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। জেলার উত্তরে হুগলী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে মেদিনীপুর, পূর্বে হুগলী নদী যার অপর পারে মহানগরী কলকাতা ও প্রতিবেশী জেলা ২৪ পরগণা। হাওড়া জেলার আয়তন ১,৪১৭ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ২৯.৬৬ লক্ষ। জেলার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ৮১'৮১, শতাংশ মুসলমান ১৮.০০ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০৭ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.০১ শতাংশ, জৈন ০.০২ শতাংশ এবং অন্যান্য ০.০১ শতাংশ। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২,০০৬ জন। এই জেলার দুটি মহকুমা—হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া। জেলায় রয়েছে বিদ্যুৎতায়িত ২৭টি শহর ও ৭৭১টি মৌজার মধ্যে ৫১০টি মৌজা (৬৬ শতাংশ)। শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা ৪৫ শতাংশ। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৬৫, পঞ্চায়েত সমিতি ১৪, জেলা পরিষদ ১টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,৬১০টি এবং শিক্ষিতের হার ৫১'৪৬ শতাংশ। ব্যাক্সের শাখা ১০০টি অর্থাৎ প্রতি ১৯ হাজারে ১টি। রাস্তা (PWD) ৫৭৫ কিলোমিটার। হাওড়ার প্রধান নদনদীর সংখ্যা তিনটি—হুগলী, দামোদর ও রূপনারায়ণ। হাওড়ায় রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম বস্ত্রী। এছাড়া রয়েছে বড় বড় খাটাল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইমপ্রুভমেন্টস্ট্রাক্টের লক্ষ রয়েছে : (ক) হাওড়া শহরের পরিবেশ ভালো করা, (খ) রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও তৈরী করা, (গ) নতুন বসতি স্থাপন করা, (ঘ) জল সরবরাহ ও জল নিকাশের সুব্যবস্থা করা, (ঙ) রাস্তার নর্দমা নিষ্কাশিত আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং (চ) ময়লা নিষ্কাশন পরঃপ্রণালীর উন্নতি সাধন করা। হাওড়ার প্রস্তাবিত বহুতল বাড়িটি রূপায়িত হলে বড়বাছারের চাপ বহুলাংশে কমে যাবে। কোনায়ে নতুন শহর গড়ার পরি কল্পনা রয়েছে। এছাড়াও প্রস্তাবিত হাওড়ার পদ্মপুকুর প্রকল্পটি (৪ কোটি গ্যালন) রূপায়িত হলে হাওড়ার ৩০লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। প্রথম পর্যায়ে উপকৃত হবেন হাওড়া ও বালীর বাসিন্দারা। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হলে সাতাগাছি, জগাছা, উনসানী, মহিয়ারী, আন্দুল, জোড়হাট, বানুপুর, সাঁকরাইল, মানিকপুর, সারেসা, বার্ডিরিয়া, ফোর্ট গ্রনটর, বারিখারি, চিঙ্গাইল ও উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা উপকৃত হবেন। এতদিন পর্যন্ত হাওড়ার পানীয় জলের মূল উৎস ছিল শ্রীরামপুর জলপ্রকল্প। সম্প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ হাওড়া-আমতা রুডগেজ লাইনের গোড়াপত্তনে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শালিমার ইয়ার্ড সম্প্রসারণের সম্ভাবনা না থাকায় সাঁকরাইলে বড়রকমের ইয়ার্ড তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাওড়ার পান ও মাছের বাজারের পুনর্বিবাসের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ঐতিহাসিক পরিচিতি

হাওড়া জেলার ইতিহাস জব চার্ণকের আমলের চেয়েও পুরানো। জন্মলগ্ন থেকেই শিম্প বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারের সাথে পরিকল্পনাহীনভাবে গড়ে উঠেছে শিম্প শহর হাওড়া। আদি অধিবাসীদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল জেলে, কৈবর্ত, বাগদী, নাবিক সম্প্রদায়ের। সম্ভবতঃ আর্মেনিয়ানরা প্রথম চাষবাস শুরু করেন। ১৫১৮ সালে নবাব মামুদশা পর্তুগীজদের সপ্তগ্রামে বাবসা বাণিজ্য করার সম্মতি দেন। পর্তুগীজরা সপ্তগ্রাম (১৫৩৭) ও শালকেতে ঘাঁটি করেন। ওই সময়ে বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের আওতায়ে। ১৫৭৮ সালে মিঃ সিজার ফ্রোডিক সাহেব হাওড়ায় এসেছিলেন। তাঁর মতে বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর। বস্তুতঃ বেতড় ছিল বাবসা বাণিজ্য ও ধর্মের মিলন স্থান। বর্তমানে বেতড় বন্দর বলতে বোঝায় আন্দুলরোড় ও শালিমারের কাছে জি'টি রোডের মিলনস্থলেই বেতাই-চণ্ডীর মন্দির। এই মন্দিরে চাঁদ সহদাগরের উপাসনার জনশ্রুতিও রয়েছে। ১৬৮৭ সালে নবাবের সাথে বৃটিশদের সন্ধির সর্ত অনুযায়ী তাঁরা উলুবেড়িয়ায় কুঠি ও ডক তৈরীর সম্মতি পান। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ থানাদুর্গ দখল করেন। ওই থানাদুর্গ বর্তমানে গার্ডেন সুপারিনটেনডেন্টের কোয়ার্টার। মি, রবার্ট কিড সাহেব ১৭৮২ সালে থানাদুর্গের ভেতর ওই বাড়ী তৈরী করেন। ১৭৮৩ সালে ভূটান রাজ্যের সাথে ব্রিটিশ রাজের বিরোধের মধ্যস্থতা করার জন্য মিঃ হেষ্টিংস সাহেব

পুরাণ গিরিকে দূত করে (১৭৭৪ সালে) লাসায় পাঠান। ১৭৮০ সালে ঘুসুড়ির গৌসাইগাট রোডে মিঃ হেফিংস সাহেব, পাণ্ডেন লামা ও পুরাণ গিরির (১৭৪০-১৭৯৫) যৌথ উদ্যোগে ভোটবাগান বা বাণিজ্যমিশন (১৫০ বিঘা জুড়ে) গড়ে ওঠে। বর্তমান নাম মহাকাল মঠ বা শঙ্কর মঠ। ১৮০৮ সালে তাশী লামার সাথে পুরাণ গিরির (শৈব ও সন্ন্যাসী) পিকিং সফরের বিবরণ ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়। ১৭৮০ সালে কর্ণেল রবার্ট কিড সাহেব গড়ে তোলেন 'রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন' (২৭৩ একর)। ১৭৯৩ সালে ডাঃ উইলিয়াম বক্সবার্গ ওই বাগানের কাছে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই বেড়ে যায় বাগানের সৌন্দর্য। প্রায় দুই শতাধিক বছরের ৬০০ বুরি যুক্ত বুড়ো বটগাছটির (পরিমি ১.৩২৮ ফুট, উচ্চতা ৯৮ ফুট) প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে আজো কমেনি। বাগানে দেশী বিদেশী গাছ-গাছড়া ছাড়াও ২৬টি লেক ও গুটিকয়েক মনুমেন্ট রয়েছে। বাগানের রাস্তাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ মাইল। ১৯৫০ সালে ওই বাগানের নামকরণ হয় 'ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন'। এখানে পর্যটকদের জন্যে গুটিকয়েক প্যাভিলিয়ন ও রেস্টহাউস রয়েছে। লেকে বোটিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রন্থাগারে বোটানিক্সের ওপর ভাল সংগ্রহ রয়েছে। ১৮২২ সালে মল্লিকরা রামকৃষ্ণপুরের জমিদারী-ভুক্ত কিছু সম্পত্তি কিনে বসবাস শুরু করেন। ১৭৮৫ সালে মিঃ লিভেট সাহেব হাওড়া ময়দান সহ শহরের মধ্যাঞ্চলের জমিদার ছিলেন (ভট্টাচার্য ১৯৮০)।

একসময় (দমদম বিমানবন্দর চালু না হওয়া পর্যন্ত) হাওড়া ছিল কলকাতার একমাত্র প্রবেশ পথ। তখন প্রধানতঃ জলপথে ছিল দূরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। স্থলপথের মাধ্যম ছিল পাক্কী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি। সত্যি কথা বলতে কি, হিন্দু ও মুসলীম যুগেও এই যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তনীয় ছিল। উনিবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিঃ টেলার আর্মেনিয়ান ঘাট (কলকাতা) ও হাওড়ার স্টীমার (বাস্পচালিত) ফেরি সার্ভিসের সূচনা করেন। ১৮২৭ সালে সরকারী স্টীমার 'ব্রহ্মপুত্র' হাওড়া থেকে জনঘাটা শুরু করে। ১৮২৮ সালে হাওড়ায় তৈরী হয় প্রথম জাহাজ টানা বাষ্পীয় পোত। ১৮৩৮ সালে রাধানাথ বসু

মল্লিক 'উইলিয়াম ওয়ালেস' নামে একটি জাহাজ কিনে জলপথে মাল বহনের ব্যবস্থা শুরু করেন। ১৮৫৪ সালে হাওড়ায় প্রথম রেললাইন বসে। ১৮৮৯ সালে হাওড়ায় মার্টিন রেলের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে বন্ধ হয়ে যায় ৭৩ বছরের এই মার্টিন রেলপথটি। ১৯০৮ সালে বিদ্যুৎচালিত দুই ইঞ্জিনযুক্ত এককামরার ট্রাম চলাচল শুরু হয়। এবং শালিকিয়ায় প্রথমবাস (শ্রীকৃষ্ণ) চালু হয়। ১৮৭৪ সালে হাওড়া ও কলকাতার সংযোগ রক্ষার তাগিদে ভাসমান সেতুর (দৈর্ঘ্য ২,৫৩০ ফুট, চওড়া ৪৮ ফুট) সংযোগ হয়। গাড়ী চলাচলের রাস্তা ছাড়াও দুপাশে ৭ ফুট চওড়া ফুটপাথ ছিল। ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ আমলে তৈরী হাওড়া সেতুটির (রবীন্দ্র সেতু) উদ্বোধন হয় একটি ট্রাম চালিয়ে। বর্তমান বিবেকানন্দ সেতুটির (১৯২৭-২৮) জন্মলগ্নে নাম রাখা হয়েছিল 'উইলিংডন ব্রীজ'। হাওড়ায় ডকের সংখ্যা আজো সর্বাধিক। শালিকিয়া থেকে শিবপুর পর্যন্ত প্রায় ৮টি বড় ডক ছিল। ১৮৯৯ সালে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বামী বিবেকানন্দের তৈরী বেলুড়মঠ। বেলুড় মঠের স্থাপত্যে রয়েছে মন্দির, চার্চ ও মসজিদের সমন্বয়। শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে। (ভট্টাচার্য ১৯৮২)

১৮০০ সালে হাওড়া ছিল খুব ছোট্ট, জঙ্গলাকীর্ণ, অল্প খানা ডোবা ও ধানক্ষেতে ভরা। ১৮৩২ সালে গঠিত হয় হাওড়া পৌরসভা। ১৯৪৩ সালে হাওড়া প্রশাসনিক মানচিত্রে ঠাই করে নেয়। এবং ওই সালে বাঙ্গী পৌরসভা (৩০৬ বঃ মাঃ) গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে উলুবেড়িয়া পৌরসভা (লোকসংখ্যা ৫০০ জন) জন্ম নেয়। ১৮৪৯ সালে হাওড়ার স্ট্রাও রোডটির সৃষ্টি হয়। এবং ১৮৮৫ সালে রেল স্টেশন গড়ে ওঠে। ১৮৬২ সালে স্থাপিত হয় হাওড়া পৌরসভা। ১৮৭৬ সালে পৌরসভাকে পুনর্গঠিত করা হয়। ১৮৮৩ সালে শালিকিয়ার স্টেশনটির সৃষ্টি হয়। ১৮৮৪ সালে হাওড়া শহরকে ১০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালে এই সংখ্যা ১০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩০টিতে। এবং ওই সালেই হাওড়া পৌরসভার প্রথম নির্বাচন হয়। প্রথম চেয়ারম্যান মহেন্দ্রনাথ রায়। ১৯১৬ সালে সর্বশেষ গ্যাসের আলোটি বিদায় নেয় হাওড়া শহর থেকে। ১৯২২ সালে বেলিলিয়াস পার্কের পাশেই নরসিংহ দত্ত কলেজ

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে হাওড়ায় নাগরিক সম্বন্ধনা প্রদান করা হয়। ১৯৪৭-এ হাওড়া পৌরসভার সীলমোহরের পরিবর্তন করা হয়। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাওড়া পৌরসভার কমিটির সভাপতিও হন (ভট্টাচার্য্যঃ ১৯৮২)।

কৃষির সম্ভাবনা ও সমস্যা

হাওড়া জেলার অর্থনীতি কৃষিপ্রধান নয়। সেজন্যে আমরা দেখতে পাই জেলার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে চাষী ৯.৯৭ শতাংশ ও কৃষি মজুর ৯.১৮ শতাংশ। আবার অন্যভাবে বলতে পারি, হাওড়ার মোট লোক সংখ্যার মধ্যে

কর্মীসংখ্যা ২৬.৯৯ শতাংশ, চাষী ২.৭৯ শতাংশ, কৃষিমজুর ৩.৮০ শতাংশ এবং গৃহস্থালী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের হার ১০.৮৬ শতাংশ। ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষিমজুরের মজুরী ছিল ৩.৫৪ পয়সা এবং ১৯৭৯-৮০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.১৫ পয়সায়। প্রধান ফসল ধান। এবং তারপরই মাছ। শ্যামপুরের থানাগুলি ছাড়া হাওড়ায় সর্বত্র কমবেশি অর্থকরী ফসল পাটের চাষ হয়। আলোচিত নীচের সারণী থেকে হাওড়া জেলার সালভিত্তিক প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন ও এলাকার পরিমাণের মূল্যায়ন করা যাবে। আমন ধান, পাট, ডাল প্রভৃতির এলাকা বাড়তির দিকে যাচ্ছে। এবং আলু, আম, বরো ধানের চাষ কমছে।

সারণী (১) হাওড়া জেলার প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন ও এলাকার পরিমাণ

শস্য	এলাকা ০০০ হেক্টর			উৎপাদন ০০০ টন.		
	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
আউস	০.২	২.২	২.৫	০.১	২.৭	১.৯
আমন	৭৮.৩	৭৬.৮	৮২.৮	১৬.৭	৮৮.২	১০৪.৫
বোরো	২০.১	১০.৭	৬.৮	৬৩.৮	৩০.০	১৫.০
গম	৫.১	৫.০	০.৮	১১.১	৭.২	১.৫
ছোলা	—	(ক)	—	—	(খ)	—
বিভিন্ন ডাল	১২.৮	১২.৫	১৫.৬	৮.২	৬.১	৬.৭
সরষে	০.২	০.১	০.১	০.১	(খ)	০.১
পাট	৫.৯	৮.২	৬.২	৪৪.৫	৪২.১	৫০.২
আখ	০.৮	০.৮	০.১	১.৩	২.০	০.৫
আলু	৫.৬	১.৯	১.৯	৯১.৩	৪০.০	৩৯.৫

উৎস (১) হাওড়া এগ্রিকালচার অফিস, হাওড়া (২) ভাইরেকটরেট অব এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ
(ক) ৫০ হেক্টরের কম (খ) ৫০ টনের কম।

১৯৮০-৮১ সালে আমন ধানের উৎপাদন আকর্ষণীয় হারে বৃদ্ধি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৮৩ সালে এলাজো খরিপ মরসুমে কৃষকেরা প্রায় ৭৫,০০০ হাজার টন রাসায়নিক সার ব্যবহার করেছে। কিন্তু, সারের চাহিদার অনুপাতে যোগান বাড়েনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্প্রতি

হলদিয়া সার প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এই বছরে উৎপাদন করে : (১) ৫ লক্ষ টন রাসায়নিক সার, (২) ১.৬৫ লক্ষ টন ইউরিয়া, (৩) মেথানল ৪১.৩৫০ টন, এবং (৪) সোডায়াস ৬০,০০০ টন। হলদিয়া সার প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হলো জ্বালানী তেল ভিত্তিক। উৎপাদন সামগ্রিকভাবে

শুরু হলে ৪০০ কোটি টাকার স্বত্ব বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচবে। এবং রাসায়নিক শিল্পের দ্রুত বিকাশ হবে। এছাড়াও হলদিয়া সার প্রকল্পকে ঘিরে অল্পস্বল্প ছোট ছোট সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবে। দুর্গাপুরেও একটি সার কারখানা রয়েছে। যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা মোটে ১.৪০ লক্ষ টন। দুটি সারকারখানার যৌথ উৎপাদন রাজ্যের খাদ্য উৎপাদনকে স্বনির্ভর হওয়ার পথকে প্রশস্ত করবে।

কলের লাঙলের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়তির দিকে আছে। অর্থাৎ জেলার মধ্যে প্রগাঢ় কৃষি ব্যবস্থা ও ব্যাপক (Intensive) কৃষি ব্যবস্থা রয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রগাঢ় কৃষি ব্যবস্থায় অগ্রগতিক সীমিত করে তোলে। কেননা, জমির ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি ইচ্ছামতো উৎপাদনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অন্যভাবে বলতে পারি, প্রগাঢ় কৃষিব্যবস্থায় হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণও খুব বেশি পড়ে। কেননা, জলসেচ, আর শব্দকরবীজ প্রভৃতির জন্যে অতিরিক্ত খরচও করতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় কৃষি শ্রমিকরা হতই উপার্জন করুক, শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় তা অনেক কম। প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি সংখ্যা ২২২টি—যার মোট সদস্য ৯১ হাজার এবং কার্যকরী মূলধন ৬৪৪ লক্ষ টাকা। এছাড়াও কৃষি উন্নয়ন সমবায় ব্যাংকগুলির ভূমিকা ভাল। হাওড়া জেলার আবাদী জমির পরিমাণ ৮৮,৭ হাজার হেক্টর। এবং তারমধ্যে দোফসলা জমি ৩০.২ হাজার হেক্টর। সরকারী খাল থেকে ৩,৬১০ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও গভীর নলকূপ ৮৯টি ও নদী থেকে জলোত্তোলন ব্যবস্থা রয়েছে ৬৬টি এবং শ্যালো রয়েছে ৩০টি। বস্তুতঃ দামোদর নদ থেকে জলসেচের ব্যবস্থা হওয়ায় বাগান, পাঁচলা, সাঁকরাইল, আমতা, ডোমজুড়, উদয়নারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি অঞ্চলে একফসলী জমিগুলি দোফসলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বলতে কি, শরবে, আখ, গম ও বাজরার চাষ-আবাদ খুবই সীমিত। আলু, নারকেল, পান বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফলের চাষ ক্রমশঃ বেড়েছে। মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদনে বর্ধমান (৪১৭.৭১ কিঃ গ্রা), হুগলী (৪৩৪.৪২ কিঃ গ্রা), ২৪ পরগণার (১৪০.৩৯ কিঃ গ্রা) পরেই হাওড়ার

(৯২.৯৫ কিঃ গ্রা) স্থান। বিদ্যুতায়িত পাম্পসেটের সংখ্যা বর্ধমান (২,৭১৩), ২৪ পরগণা (২,৫০১), হুগলী (২,১৮৮) পরেই হাওড়ার (৩২৬) স্থান। বিদ্যুতায়িত গ্রাম ৬৬.১ শতাংশ। হাওড়া জেলার কৃষি জমিকে বড় ফসলা করে শ্রমের যোগান বাড়িয়ে কৃষিতে স্বত্বগত ও প্রচলিত বেকারীর সমাধান অসম্ভব নয়। সেজন্যে সর্বাপ্রকারে চাই সেচের আরো সম্প্রসারণ। সেচ প্রকল্পগুলিতে গোষ্ঠীমালিকানার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে বর্গাদার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা সেচ ব্যবস্থায় বেশি উপকৃত হচ্ছে। জেলায় জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি, গ্রামীণ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এবার রাজ্যের কৃষি ও শিল্পের সার্বিক চিত্রের দিকে তাকানো যাক। “এই ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিক দরিদ্র চাষীর জমির ওপর বিস্তৃত। এইসব ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে যাতে সেচ প্রকল্পগুলি গোষ্ঠী মালিকানা হয়, এবং গোষ্ঠীগুলি মূলত দরিদ্র চাষীদের নিয়ে গঠিত হয়। এই ধরনের গোষ্ঠী মালিকানা সেচব্যবস্থা মেদিনীপুরের মতন একটি বড় জেলার অধিকাংশও বেশি রকম শুরু হয়েছে। এছাড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলা থেকেও এই ধরনের সেচ প্রকল্পের খবর আসছে। উৎপাদনের সম্পর্ক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সেচ প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রে দরিদ্র চাষীকে সাহায্য করার চেষ্টা হয়েছে সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত এই প্রকল্পটি থেকে সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সনে প্রায় ১ লক্ষের মতন হয়েছে। এইসব সংঘেও মনে রাখা ভালো যে এই সমাজ ব্যবস্থায় ভূমি সংস্কার অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং সেই ভূমিহীন ক্ষেত্রে মজুরের কর্মসংস্থানে বিশেষ প্রয়োজন থাকে। এই কর্ম সংস্থানের চেষ্টা হয়েছে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে। রাষ্ট্র সরকারের অর্থ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেরিত খাদ্যশস্যে ভিত্তিতে পরিচালিত এই প্রকল্পের রূপায়নের ফলে এত সঙ্গ সামাজিক সম্পদ (রাষ্ট্র, সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যালয় ভবন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এই রাজ্যে প্রকল্প

র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতের ওপর এবং এর ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ২লক্ষ দরিদ্র বছরের অন্তত অর্ধেক সময়ের জন্য কাজ দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে সরাসরি কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত ৭৭ গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে কর্মসংস্থান হয়েছে তা একত্রিত করলে বলা যায় ১০-৮৪ সালে বছরের অন্তত অর্ধেক সময়ের জন্য ৮৪ লক্ষের মতন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সর্বশেষ যাত্রী ইদানিং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বছরে অর্ধেক গজ পার্যনি এমন বেকারের সংখ্যা ৪.২। লক্ষ অর্থাৎ ৪৪ সালে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিশেষ প্রকল্প র মাধ্যমে বেকার সমস্যার কিছুটা প্রশমন হয়েছে” (১৯৮৪)।

৮ বছরে (১৯৮৪) পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দে বিমান মোটে ১০ শতাংশ। অন্যদিকে গুজরাটে ২৯ বিহারে প্লান বাজেটের ৩১ শতাংশ। যদিও রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষি জমির ৫০ শতাংশ সেচের আনা, হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে দুর্বলতর শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে চরম দারিদ্রতা। ফলে পুষ্টির অভাবে গ্রামে শুর মৃত্যুর হার শহরাঞ্চলের চেয়েও অনেক বেশি। চিহ্ন রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও কমবেশি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সমাজ কের অনুরোধে সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব রিসার্চের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে সমীক্ষায় দেখা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে পুষ্টি আহারের সংখ্যা (৩ লাখ ৬১ হাজার ১০২ জন)

শিল্পবিকাশের রূপরেখা

মুদ্রার রপ্তানিনির্ভর সৃতিশিল্প, পার্টিশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রভৃতির অবস্থা ক্রমশঃ অব-
স্থাপন হচ্ছে। এর প্রধান প্রধান কারণগুলি হলো
(১) যন্ত্রপাতি, (২) ভিনরাজ্যের তুলনায় উৎপাদন
(৩) শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম, (৪)
বয়ের অসহযোগিতা ও নানারকম বৈষম্য মূলক

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, (৫) শিল্পপতিদের শিল্পোদ্যমে অনীহা এবং (৬) ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সীমাবদ্ধতা ও ম্যানেজমেন্ট ইনপুটের স্বল্পতা। এছাড়াও রয়েছে কাঁচামালের অভাব, প্রয়োজন ভিত্তিক বিদ্যুতের অভাব, পরিবহন ব্যবস্থার স্বল্পতা। হাওড়া শিল্পায়নে আজ ব্যাঙ্গলোর ও বোম্বাই-এর চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে, যদিও শিল্পবিকাশের সভাবনা ছিল অনেক বেশি। হাওড়ায় বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র, গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে। CMPO-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৫১-১৯৬১ সালের মধ্যে হাওড়ায় লৌহ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিকাশের হার ছিল ৪০ শতাংশ। সুতরাং আলোচিত পটভূমিতে সেকাল ও একালের শিল্প বিকাশের পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। হাওড়ায় সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে দড়িতৈরী শিল্প, জাহাজতৈরী শিল্প ও মেরামতির শিল্প। ১৭৯৬ সালে মিঃ বেকন শালকিয়াকে ডক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালে মিঃ ম্যাকেল্লীর গোলাবাড়ি অঞ্চলে ডক গড়ে ওঠে। ১৮১১ সালে শিবপুরে কাগজ ও ক্যানভাসতৈরী কারখানা গড়ে ওঠে। ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষে প্রথম গ্রাফারে বাউরিয়া কটনমিল স্থাপিত হয়। ১৮২২ সালে গড়ে ওঠে প্রথম কাপড় কল। ১৮৫৪ সালে হাওড়ায় রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। ১৮৩০ সালে জেপস কোম্পানীর তেলকল স্থাপিত হয়। ১৮৪০ সালে আমতলা বাদামী রঙের কাগজকল গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালে মিঃ হারকোর্ট সাহেব রামকৃষ্ণপুরে একটি কাগজকল স্থাপন করেন। এবং ওই সালে হাওড়ায় রেলস্টেশন স্থাপিত হয়। সাতরাগাছি ও মিলুয়ার রেলের কারখানা রয়েছে। ১৮৬৭ সালে প্রথমে বালিতে আধুনিক কাগজ-শিল্প গড়ে ওঠে।

১৮৬৭ সালে কিশোরীলাল মুখার্জী ‘শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস’ গড়ে তোলেন। ১৮৬০ সালে শালকিয়া-শিবপুর অঞ্চলে পার্টিশিল্পের পত্তন হয়। ১৮৭৫ সালে ‘গ্যাজেট মিল’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ সালে তৈরী হয় শালিমার রেল টার্মিনাস। ১৮৯০ সালে রামকৃষ্ণপুরে হাওড়া মিলস্ লিমিটেড স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালের মধ্যে হাওড়ায় বহুরকমের শিল্পের আশ্রয়প্রকাশ হয়। ১৯০৩ সালে কাপড়শিল্প, চটশিল্প, কাগজশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত-

শিল্প, ইটখোলা (৯১টি), হাতে তৈরী কাগজশিল্প প্রভৃতি গড়ে উঠে। ১৯১১ সালে শিবপুর 'দি ফোর্ট উইলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড' জন্ম নেয়। ১৯১৪ সালে হাওড়াতে রেলকারখানা স্থাপিত হয়। ১৯২০ সালে 'রিজ এণ্ড রুফ কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে 'হেনরী উইলিয়াম' শিল্পটি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে তাঁতশিল্পের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৬১টিতে। শিল্পনগরী হাওড়ায় বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড শিল্পায়নের প্রাচীনতম সংস্থাগুলির অন্যতম। এই সংস্থা ফাউণ্ডে, রেলপথ, বিভিন্ন রকমের স্প্রিং, মাইনিং মেশিনারি, স্ট্রাকচারাল, স্টীল ফ্লোরিকেশন শিল্পের উদ্যোক্তা। হাওড়া লাইট কাটিং সংস্থার জেলার শিল্প বিকাশে তাৎপর্য-পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বেলিলিয়াস ইঞ্জিনিয়ারিং, গোব্লেদ প্রিন্টিং ইংক, পালস ইঞ্জিনিয়ারিং, পাঠক ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি শিল্পের ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। বেলুড়, বালি, শিবপুর, শালিমার, রামকৃষ্ণপুর, বেলিলিয়াস রোড, শালিকিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহুবিধ শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে। মানিকপুর, উলুবেড়িয়া, চেঙ্গাইল, বালি, বেলুড়, শালিকিয়া, ঘুসুড়ি, সাঁকরইলের বার্ডিড়িয়া, রায়গঞ্জ প্রভৃতি পাটকলগুলির সুনাম তেমন আর নেই (ভট্টাচার্য ১৯৮০)। হাওড়া প্রেমুর কাটিং এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নতুন ধরনের স্ফোভ আবিষ্কার করেছে। এছাড়াও গ্রাইণ্ডার, হ্যামার মিল, বল মিল, কোক রিক্বেস্টিং প্রেস, আইস প্যাক্ট যন্ত্র প্রভৃতি। অলংকার শিল্পে সহায়তা করতে তারের দোলনা মেশিন ও সোনারপাত তৈরী করে। রামকৃষ্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস তৈরী করেছে প্রিন্টিং এণ্ড পেপার কাটিং মেশিন। শেখর এন্টারপ্রাইজ কোল ক্রাসিং যন্ত্র, ড্রাইং চেম্বার, কোলমিস্ত্রারকাম-ক্রাসার যন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট মেশিন-গুলির যন্ত্রাংশ তৈরী করে। সমগ্র দেশে এটি ওয়াগন কারখানার মধ্যে ৪টি (ব্রেকওয়েট, টেক্সম্যাকো, বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড, জেসপ এ্যাণ্ড কোম্পানী) রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই শিল্পে কয়েক লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হয়। এবং ওয়াগন শিল্পকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বহু সহায়ক শিল্প। বস্তুতপক্ষে, সবকিছু শিল্পই কাজের অভাবে ধুকছে। বলাবাহুল্য, ক্রমাগত অর্ডার ছাঁটাই করার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়েনি। এই অবস্থার জন্যে দায়ী প্রধানত কেন্দ্রীয়নীতি।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের উদ্যোগে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় (একর) শিল্পবিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

জেলায় রয়েছে রবারজাতশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁসার কাজ, দর্জির কাজ, ঘানি, গম ও ধানকল, কল, হোসিয়ারী, বাঁশ ও বেতের কাজ, শোলা (ডোমজুড়), হুকশিল্প, হাতে তৈরী কাগজ, চূর্ণিমাটি ও চীনা মাটির পণ্যাদি প্রস্তুতশিল্প, নকল গহনাশিল্প, লবণশিল্প, চিকনশিল্প, ফার্ণিচার লকারি, মাদুরশিল্প, পোর্স্টে, জারিশিল্প, রেশমশিল্প, ময়দাশিল্প, কাঁসাশিল্প, পোলোবল ও স্টিক, সিগারেট ও কাঁচি প্রভৃতি। পাঁচলায় মশারীর ধান ও পরচুলার খ্যাতি অস্বাভাবিক হয়ে যায়নি। এই জেলায় যন্ত্রপাতি তৈরী শিল্প, পাত্তা তৈরী শিল্প, নারকেলতেল তৈরী শিল্প, কৃষিযন্ত্র শিল্প, ফলসংরক্ষণ শিল্প, মোটরগাড়ীর অংশ তৈরী শিল্প, রোডিও, ট্রানজিস্টর, অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট, ভার্টার, টেপরেকর্ডার, প্রান্তিকশিল্প প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। অটেল সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুতঃ জমির অভাবে শিল্পবিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও কাঁচামাল, কয়লা, লোহা, বিদ্যুৎ, অর্ডার, মূলধন প্রভৃতি অভাব রয়েছে। এই চির পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলায় কমবেশি দেখা যাবে। আলোচিত নীচের সারণী শিল্পসমৃদ্ধ জেলা হাওড়ার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পবিকাশে মূল্যায়ন করা যাবে। ১৯৭০-৭৪, ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৯-৮০ সালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উচ্চহারে গড়ে উঠেছে।

সারণী : (২) : হাওড়া জেলার নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংখ্যাতথ্য

সাল	শিল্পসংস্থার সংখ্যা	শিল্পবিকাশে হ্রাস (—) বৃদ্ধির পার্থক্য
(১)	(২)	(৩)
১৯৭০-৭১	৪৬৯	
১৯৭১-৭২	৬৫৬	+১৮৭

বাল	শিল্পসংস্থান	শিল্পবিকাশের
	সংখ্যা	হ্রাস (-) বৃদ্ধির (+) পার্থক্য
১২-৭০	৫৪১	-১১৫
৭০-৭৪	১,২১৯	+৬৭৮
৭৪-৭৫	৪,৬০৯	+৩,৩৯০
৭৫-৭৬	৯১২	-৩,৬৯৭
৭৬-৭৭	৯৭৭	+৬৫
৭৭-৭৮	১,১০২	+১৫৫
৭৮-৭৯	১,০৩৫	+২০৩
৭৯-৮০	১,৮৫১	+৫১৬

আধাসরকারী, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলিতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কেরলের অনুসরণে আইন করে কর্ম-নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হোক। তার ফলে পশ্চিম-বঙ্গীদের নিয়োগের পথ অনেকখানি প্রশস্ত হবে।

সারণী : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী
শিল্পসংস্থান পশ্চিমবঙ্গীদের হার : ১৯৮২

শিল্পসংস্থান নাম বাণিজ্য ও শিল্পে নিযুক্ত
পশ্চিমবঙ্গীদের হার

চটকল	৩০ শতাংশ
কাগজ কল	২৩ "
কাঁচ তৈরীর কারখানা	৩২ "
লৌহ ও ইস্পাত কারখানা	৪৮ "
বস্ত্র শিল্প	৫৫ "
যানবাহন	৪৪ "
বিদ্যুৎ উৎপাদন	৪৮ "
ট্রাম কোম্পানী	৪২ "
বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থাসমূহ	৫৮ "
পাইকারী ব্যবসাসমূহ	৬৬ "
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	৫৭ "

বড় শিল্পে অপ্রচলিত জীর্ণ যন্ত্রপাতি, দুর্নীতি ও গতি-হীনতাই বৃদ্ধতার অন্যতম কারণ। একচেটিয়া কারবারীরা বিনিয়োগ ও উৎপাদন না বাড়িয়েও মুনাফা লুণ্ঠনেন। বড় বড় শিল্পগুলিতে উন্নতি না হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়েনি। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কর্মসংস্থান বেড়েছে। এই সূত্রে রাজ্যের শিল্পের সার্বিক চিত্রের দিকে এবার চোখ ফেলানো যাক। “বৃহৎ শিল্পের

পশ্চিমবঙ্গের অলস্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের কার-বার শেড ও স্টল ভাড়া বা হায়ার পারচেজ বা নগদে-কর ব্যবস্থা (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ও কমার্শিয়াল এস্টেট-২৪) মিলমাস রোড, হাওড়া, (২) ট্যাংরা ইলেকট্রনিক্স-ট্রায়াল এস্টেট, ২৫ ও ২৭ ক্যানাল সাউথ রোড, কাকাতা-১৫, (৩) খিদিরপুর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-হাইরোড এক্সটেনশন, কলিকাতা-২৭, (৪) কল্যাণী সিস্টেমস এস্টেট-কল্যাণী নোটিফায়ড এরিয়া, বি, ডি, প্লট-২৭ ও ২৮ কল্যাণী, নদীয়া, (৫) হলদিয়া ইণ্ডা-রিয়াল এস্টেট, দুর্গাচক, হলদিয়া, মেদিনীপুর, (৬) দুর্গাপুর সিস্টেমস এস্টেট-আর, আই, পি ডেভেলপমেন্ট প্লট, নুওয়েল এভিনিউ, দুর্গাপুর-১৮, (৭) খজাপুর সিস্টেমস এস্টেট, সাদাতপুর, খজাপুর, (৮) সিউড়ি সিস্টেমস এস্টেট, বীরভূম, (৯) মালদা কমার্শিয়াল এস্টেট, মার্কেট, মালদহ, (১০) রায়গঞ্জ কমার্শিয়াল রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর) রয়েছে সারা রাজ্যে। স্বাভাবিকই সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বেকারদের শিল্প পুঞ্জ-ওই সমস্ত সেড ও স্টলে শিল্প স্থাপনে প্রয়াসী-অসম্ভব নয়। রাজ্য বেকারীতে শীর্ষে থাকলেও-শিল্প ও শিল্পসংস্থাগুলিতে নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গীদের হার-কম। এই চিত্র হাওড়াতেও রয়েছে। আলোচিত-সারণী (অমিয়ন সেন : যুগান্তর, ১৪ই ফেব্রুয়ারী-১৯) থেকে কিছু শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গীদের-হার দেখতে পাওয়া যাবে। সুতরাং সরকারী,

॥ আরাধনা শুভ ॥

ব্যক্তিগত বারান্দায়
(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ২.৫০

সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী

১৮-এ রাজা রাজবল্লভ ট্রাট, কলিকাতা-৩

মধ্যে যেগুলি বড় ও পুরানো শিল্প, যেমন চট, সূতীবস্ত্র, ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সেগুলির ক্ষেত্রে ইদানীংকালে চোখে পড়ে এক প্রায় গতিহীনতা, যা ১৯৮০-৮৪ সনেও চলেছে। চর্টিশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আশ্চর্য লাগে যে, বর্তমানে চট্রবোর চাহিদা দেশের অভ্যন্তরে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই শিল্পে নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না। এর একটি মূল কারণ হিসাবে ধরা পড়েছে, এই শিল্পের প্রায় একচেটিয়া মালিকানা ব্যবস্থা। যার ফলে বিনিয়োগ না করেও বা উৎপাদন না বাড়িয়েও একচেটিয়া ক্ষমতার জোরে শুধু দাম বাড়িয়ে লাভ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এই ধরনের মালিকানা-কাঠামো পুরনো বড় শিল্পের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধা, শিল্পে রুগ্নতার একটি প্রধান কারণ বড় শিল্পের এই মালিকানা-কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের সাংবিধানিক এবং আর্থিক ক্ষমতা খুবই সীমিত। এই শিল্পগুলির লাইসেন্স দিয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকার, এবং যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে শিল্পগুলি সাহায্য পেয়ে থাকে সেগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। তবুও রুগ্ন বা বন্ধ বড় শিল্পের ক্ষেত্রে, সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত ৭৭টি শিল্পসংস্থার দায়িত্ব নিয়েছেন। সরাসরি ভাবে মালিকানা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে ১৩টির ক্ষেত্রে এবং বাকী ৬৪টির ক্ষেত্রে অন্যান্য সাহায্য করা হয়েছে—কোথাও প্রমিকদের সমবায় সংগঠিত করে, কোথাও বা অর্থ সাহায্য দিয়ে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, যে ১৩টি ক্ষেত্রে মালিকানা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, সেখানে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাভের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। পুরনো বড় শিল্প ছাড়াও, নতুন কিছু বড় শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিশেষ সম্ভাবনা আছে—যেমন হলদিয়ার পেট্রোলিয়াম রাসায়নিক শিল্প এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্প। এই সম্ভাবনাগুলি পূর্ণ করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা কোন রাজ্যসরকারের একা যোগাড় করা সম্ভব নয়। কিন্তু এইগুলির ক্ষেত্রে, একাধিকবার আবেদন করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সহযোগিতার হাত এখনো প্রসারিত হয়নি। রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ছোট শিল্পকে সহায়তা করা অপেক্ষাকৃত কম কঠিন। এখানে মালিকানা চক্রের বাধা অতিক্রম করে

প্রকৃত ছোট উৎপাদককে সাহায্য করা কিছুটা ইদানীং কালে এই ধরনের সাহায্য—কাঁচা মাল, বাজারের ক্ষেত্র করার চেষ্টা হয়েছে। ফলে, নতুন হওয়া ছোট শিল্পের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে শুরু ১৯৮০-৮৪ সালে এই ধরনের প্রায় ৫ হাজার শিল্পসংস্থা কাজ শুরু করেছে, ৪০ হাজারের মতন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। ছোট শিল্প, অন্যদিকে ব্যবসা ও সরকারী প্রতিষ্ঠান—সমস্ত মিলে ১৯৮০-৮৪ এ রাজ্যের শহরাঞ্চলে প্রায় দু'লক্ষের মতন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জাতীয় নমনীয় সর্বোচ্চ অনুযায়ী ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে বছরের ৫০ সময় কাজ পার্যনি এমন বেকারের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায়, গ্রামের চেয়ে শহরের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়েছে”। (দাশগুপ্ত : ১৯৮৪)

রাজ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কাঁচামালের সমস্যা পুরো উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। কাঁচামাল অত্যধিক হওয়ায় শিল্পবিকাশের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু কাঁচামাল বরাহকারী রাজ্য। উৎপাদন বজায় রাখতে ও শিল্পগুলিকে চালু রাখতে ওই সমস্ত রাজ্যগুলি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদকেরা। রাজ্যসরকারও প্রয়োজনানুসৃত্তক যোগান অব্যাহত রাখতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারকেও পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রের উপর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুটিরশিল্পের উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্য আনার পরীক্ষা নিরীক্ষা যাচ্ছেন। এবং কুটির শিল্পে হারানো অনবদ্য সৃষ্টি অতীতেও বিখ্যাত কুটিরশিল্পে বাজার পুনরধিক জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন।

নির্দেশিকা

- (১) অচল ভট্টাচার্য—হাওড়া জেলার, ইতিহাস (১ম খণ্ড) শিবা গ্রাণ্ড কোং, হাওড়া, ১৯৮০ ও ১৯৮১
- (২) অসীম দাশগুপ্ত—কৃষি ও শিল্পের অবস্থা বাজার, ১৪ই এপ্রিল ১৯৮৪।
- (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকার—ইকনমিক রিভিউ সংখ্যা, আলিপুর গবর্ণমেন্ট প্রেস।

সংবাদকণা

সংকলন : রমা রায়

এ আই সি সি (ই) বিধানসভা নির্বাচনে দলের সরকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সমস্ত বিদ্রোহী প্রার্থীকে বাহিস্ত করছে।

* রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর মতে সকলের জন্যে ন্যূনতম শিক্ষাব্যবস্থা আজও গড়ে তোলা হয়নি।

* ইউ, জি, সি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে মার্কসবাদ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে।

* ক্রিস্টিয়ান স্যারেল মণিটর খবর শ্রীলংকা গৃহযুদ্ধের পক্ষে।

* দিল্লীর সেন্ট স্কিফেন কলেজে ছাত্রীদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার সারা ভারতে নিষ্পত্তি হয়েছে।

* পশ্চিমবঙ্গের ১২টি বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

* সপ্তম যোজনায় ডাক বিভাগ ১২ হাজার পোস্ট অফিস খুলবে ও ৪ হাজার অতিরিক্ত পিওন নিয়োগ করবে।

* সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের মতে মহাশূণ্যকে শান্তির জন্যে ব্যবহার করা উচিত।

* পশ্চিমবঙ্গ চায় মেদিনীপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

* ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনার সরকারী সমীক্ষায় জানা যায়, ১০৬৪ ব্যক্তি অন্ধ হয়েছে, ১৫০ জন শিশু অনাথ হয়েছে, ১৬৮ জন মহিলা স্বামীহারা হয়েছে; ১৪০০ জনের বেশ মানুষ মারা গেছে।

* প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চান জাতীয় স্তরে দ্বিতীয়, রাজনৈতিক দল।

* বেঙ্গল পটারীজকে জাতীয়করণের দাবি ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে।

* সম্প্রতি পাজাবের জুধিয়ানা জেলার সাংহোল গ্রামে কুমাণ যুগের প্রাচীন শহর আবিষ্কৃত হয়েছে।

* অস্বাভিকিতে মার্কিন নুজরাষ্ট্র সবার শীর্ষে।

* মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু কারিগরি শিক্ষার বিস্তার চান।

* পশ্চিমবঙ্গে জেলায় জেলায় উন্নয়ন সেল গড়ে তোলা হচ্ছে।

* প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দেশে একটা সং ও প্রগতিশীল প্রশাসন গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

* পশ্চিমবঙ্গে রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে অনুরোধ করেছেন।

* পঃ জার্মানিতে জন সংখ্যার বৃদ্ধির জন্যে নব দম্পতিদের প্রতিটি শিশুর জন্যে মাসিক ৬০০ মার্ক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫০ কোটি টাকায় সুবর্ণরেখা জলাধারটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

* ভারতীয় ভাষা পরিষদ-এর কাছ থেকে 'আকাশের নিচে মানুষ' বইটির জন্যে ভুয়ালাকা পুরস্কার পেলেন কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়।

* রাষ্ট্রপতি দেহরক্ষীদের প্যারেড ময়দানের কাছে উইলিংডন ক্রিসেন্টে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্যে নতুন বাড়ি (দশ হাজার বর্গফুট) প্রায় দু কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে।

* মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর মতে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না।

* বুটেনের রাজকুমারী অ্যান কলকাতা পরিদর্শন করে গেলেন।

* জুনে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় চালু হচ্ছে।

* বিশ্বভারতী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অমৃতলাল পেরুমল ও সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতি সাবিত্রী কৃষ্ণানকে এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন।

* ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীকে তৃতীয় শ্রেণী থেকেই ইংরেজি চায়।

* সীতারু বুল্লা চৌধুরী পূর্ব জার্মানিতে প্রশিক্ষণের জন্যে ৫০ হাজার টাকা সাহায্য পাচ্ছেন।

* ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ স্যার রিচার্ড-এর মতে যদি

- নিয়মিত একটু মদ খাওয়া যায় তাহলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।
- * মাহানগরী কলকাতার তিনশ বছর (১৯৯০) পূর্ত উপলক্ষে রাজ্যসরকার উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন।
 - * পর্ষটক আকর্ষণের জন্যে দাঁড়ালিও রেল স্টেশন থেকে বিজনবাড়ি পর্যন্ত ৮ কিঃ মি নতুন রোপওয়ে চালু হচ্ছে।
 - * পার্কস্থানের পরমাণু বোমা তৈরীর উদ্যোগে ভারত উদ্বিগ্ন।
 - * যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি নতুন কোর্স (ব্যারোটেকনোলজিতে এম টেক কোর্স, আধুনিক যুদ্ধে টার বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স, ওসানো-গ্রাফিক কোর্স, কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন প্রভৃতি) চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
 - * বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ৩রা মার্চ সাহিত্য অনুরাগীরা সম্বর্ধনা জানালেন আনন্দশঙ্কর রায়কে।
 - * পশ্চিমবঙ্গের জন্যে প্রস্তাবিত রেল প্রকল্প অধিকাংশই রেলমন্ত্রী বংশীলাল বাতিল দিয়েছেন।
 - * উড়িষ্যার ওরাল গ্রামের অধিবাসী উদয়না অষ্টাশিটি বিয়ে করে নজীর সৃষ্টি করেছেন।
 - * লবণ হুদে ইলেকট্রনিক্স শিপের কাজ বৈশাখ্যে
 - * উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরমন বিদ্যালয়ের পাঠ্য মাধ্যমে শিশুদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন তোলার উদ্যোগ নিতে বলেছেন।
 - * সুনীল গাভাসকরের সার্থক নেতৃত্বে ভারত আফ্রিকেটে বিশ্বজয়ী।
 - * নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে একটি নিষেধপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।
 - * রেলমন্ত্রী বংশীলাল রেল বাজেটে সমস্ত শ্রেণীর যাত্রী ভাড়া ও পণ্যমাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন।

প্রবর্তক'-এর সত্বাধিকার ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত বিবরণী

ফর্ম নং ৪ (৮ ধারানুযায়ী)

- | | |
|-------------------------|--|
| ১। প্রকাশন স্থান : | ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ |
| ২। প্রকাশনার কাল : | মাসিক |
| ৩। প্রকাশকের নাম : | শ্রীরবি কর |
| জাতি : | ভারতীয় |
| ঠিকানা : | ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ |
| ৪। মুদ্রকের নাম : | শ্রীকৃষ্ণচূষণ রায় |
| জাতি : | ভারতীয় |
| ঠিকানা : | ৫২/৩ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ |
| ৫। সম্পাদকের নাম : | শ্রীকৃষ্ণাশঙ্কর মহলানবীশ |
| জাতি : | ভারতীয় |
| ঠিকানা : | প্রবর্তক সঙ্ঘ, পোঃ চন্দননগর, জিলা—হুগলী |
| ৬। স্বত্বাধিকারীর নাম : | প্রবর্তক ট্রাস্ট |
| ঠিকানা : | ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ |

আমি, রবি কর এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য
তারিখ ১লা মার্চ ১৯৮৫

স্বাঃ রবি কর
প্রকাশক

সম্পাদক : শ্রীকৃষ্ণাশঙ্কর মহলানবীশ : সহ-সম্পাদক : রবি কর
প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরবি কর কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং
প্রবর্তক প্রাইন্টিং এন্ড হাফস্টেন লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণচূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।